স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ ও রচনা

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

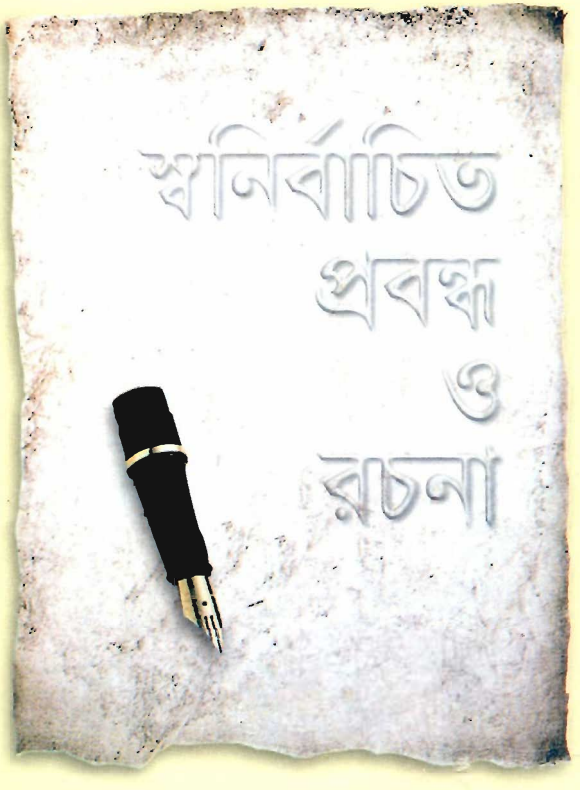

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

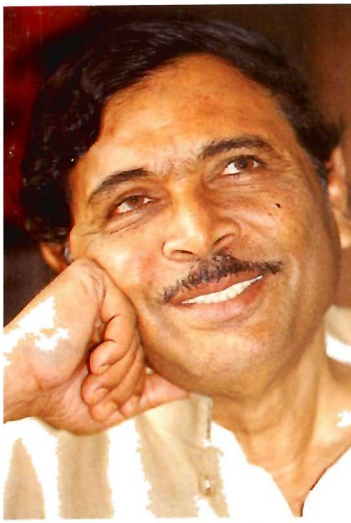

আলোকচিত্র : এম এ. তাহের

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জন্ম ২৫ জুলাই, ১৯৪০, কলকাতায়। পিতা মরহুম আযীমউদ্দিন আহমদ ছিলেন কলেজ-শিক্ষক। তাঁর কর্মসূত্রে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশের নানা জায়গায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ (অনার্স) ১৯৬০ সালে ও এম এ (বাংলা) ১৯৬১ সালে। অধ্যাপনা করেছেন ১৯৬২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের সাহিত্য আন্দোলনের মুখপত্র ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'কণ্ঠস্বর'-এর তিনি ছিলেন সম্পাদক (১৯৬৫-১৯৭৬)। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় তিনি পথিকৃৎ, বিনোদন ও সৃজনশীলতার গুণে টিভি উপস্থাপনাকে নিয়ে গেছেন মননশীলতার উচ্চতর স্তরে। তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ১১টি, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, জার্নাল, অনুবাদসহ সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি রেখেছেন তাঁর সৃজনশীলতা ও মননের পরিচয়।

'আলোকিত মানুষ চাই'-এ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে সত্তরের দশকের শেষ পর্বে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। সারা দেশে চালিয়ে যাচ্ছেন মানুষের চেতনাজগতের উৎকর্ষবৃদ্ধির কার্যক্রম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুপরিচয়ে পরিচিত আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : অধ্যাপক, সম্পাদক, সংগঠক, টেলিভিশনের অতিজনপ্রিয় উপস্থাপক এবং লেখক। লেখকতায়ও তিনি বহুচারী, তবে প্রধানত প্রাবন্ধিক। ষাটের দশকে আমাদের সাহিত্যে যাঁরা নতুন চিন্তা ও চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁদের অন্যতম। তাঁর ভাবনার দূরপ্রসারিত জগৎ যেমন, তেমনি তাঁর উপলব্ধির অনন্যতা, প্রকাশের সাহস এবং রীতির নিজস্বতা তাঁকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে। কোনো মতবাদের দাসত্ব করেননি তিনি; ব্যক্তিগত আলোপাতেই সাবয়ব করে তুলেছেন তাঁর ভাবনাপ্রণালী। সাহিত্য নিয়ে ভেবেছেন তিনি; সমাজ বিষয়ে ভেবেছেন; স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর জীবন ও পরিপার্শ্বকে মিলিয়ে। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় আছে নতুনত্ব, সমাজভাবনায় আছে বহুধা বিস্তার, স্মৃতিচারণায় আছে মাধুর্য লাবণ্য আর মর্মস্পর্শিতা। কথনকুশলী আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের রচনাপ্রবাহে তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর তাঁর বহুচ্ছুরণময় ব্যক্তিত্বকেই নির্দেশ করে। *স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ ও রচনা* তাঁর কয়েক দশকের রচনা থেকে তাঁর নিজেরই নির্বাচিত একগুচ্ছ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধমালায় মুদ্রিত রইল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসেরই একটি অনিবার্য অংশ।

–আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ ও রচনা

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক

অনন্যা

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০১

স্বত্ব ❑ লেখক

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ ❑ হেরা প্রিন্টার্স
২৭ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা

দাম ❑ দুই শত পঞ্চাশ টাকা

Swanirbachita Probandha o Rachana : Abdullah Abu Syeed
Published by Moniroul Hoque Ananya 38/2 Banglabazar Dhaka 1100.
First Edition : February 2001. Price : 250.00 Tk. only. US $: 11.00

ISBN 984-412-173-6

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

প্রয়াত সহযাত্রী
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

গত তিন-চার বছরে আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় আমি লেখার জন্য কিছু সময় পেয়েছিলাম। ফলে এই সময় আমার বেশকিছু বই বাজারে বেরোয়। এর মধ্যে প্রবন্ধ ও রচনাজাতীয় কয়েকটি বই ছিল। কিন্তু বইগুলোকে ঠিকমতো পাঠকের হাতে আমি পৌঁছোতে পারিনি। এর কারণ আমার ব্যক্তিগত জীবন। আমার অধিকাংশ সময় সাংগঠনিক ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততায় ঠাসা। একজন লেখককে শুধু লিখলেই চলে না; তাঁর জীবনটাকেও করে তুলতে হয় লেখকের জীবন। নিজের লেখাকে নানাভাবে পাঠকের চোখের সামনে আনার চেষ্টা তাকে করতে হয়। এজন্য সেগুলোকে পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করার পাশাপাশি সেগুলোর প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন, সমালোচনার ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপন দেওয়া এমনি নানান কাজ করার দরকার পড়ে। জীবনকে অনুক্ষণ জড়িত রাখতে হয় লেখকদের সাহচর্যে; লেখকোচিত ভাবনায় ভাবিত থাকতে হয়। লেখকজীবনের এসব ওতপ্রোত শর্ত। এর কোনোকিছু করাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমার বইয়ের অনেকগুলোই বেরিয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে, খানিকটা অনাদরে ও অমনোযোগে এবং অনেক সময়েই পাঠকের প্রায় অগোচরে। সেজন্যে দুয়েকটি বইয়ের বাইরে অন্য বইগুলোকে ঠিকমতো পাঠকের চোখে পড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আমার লেখা প্রবন্ধ ও রচনা সংখ্যায় খুব বেশি নয়; লেখা হিসেবেও হয়ত উন্নত মাপের নয়। তাই 'স্বনির্বাচিত' নামের আড়ালে 'শ্রেষ্ঠরচনা' জাতের কোনোকিছু সংকলন করার দুরভিসন্ধি আমার নেই। লেখাগুলোকে পাঠকের চোখে পড়াবার জন্যেই মোটামুটি এই সংগ্রহটির প্রকাশ।

এই বড় আকারের ব্যয়বহুল বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে অনন্যা প্রকাশনীর মনিরুল হক আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

যাঁর দু'মাসব্যাপী পরিশ্রমের ফলে এই বই এবং এ বছরের বইমেলায় আমার আরও দুটি নতুন বই প্রকাশিত হতে পারল, তিনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আলাউদ্দিন সরকার। তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ। কেন্দ্রের সাইফুল ইসলাম ও কাজল ঘোষের সহযোগিতার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রদুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

সা হি ত্য

১১ দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ — বাংলা সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮
২৬ শিশুসাহিত্যের শিশুহীনতা — বক্তা মুনীর চৌধুরী ৩০
৩৭ 'সন্ধ্যাসংগীতে'র রবীন্দ্রনাথ — 'প্রভাতসঙ্গীতে'র রবীন্দ্রনাথ ৪২
৪৬ ধূর্ত কবিতা — কবিতা ও অন্ত্যমিল ৫২
৭৪ অতিক্রমণের গান : রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল — ফররুখ আহমদ ৭৯
৮৭ ষাটের কবিতা — ষাটের গদ্য ৯৬
১০২ লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তুর দশক — কণ্ঠস্বরের সম্পাদকীয় ১০৮
১১৪ ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত — জনপ্রিয় লেখকরা কি অলেখক ১২৪
১৪১ রবীন্দ্রনাথ কি মৌলিক লেখক — বাংলা সাহিত্যে অন্তত একটি পুরুষ চরিত্র চাই ১৫০
১৫৪ শিল্পের বাস্তব — আধুনিক কবিতায় ইঙ্গিত ১৫৮
সূত্রাকারে 'শেষের কবিতা' ১৬৬

সা হি ত্য স মা লো চ না

১৭১ লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া — আবদুশ শাকুরের রম্যরচনা ১৮০
আবদুল মান্নান সৈয়দ–এর — আবদুল মান্নান সৈয়দ–এর
১৮৯ জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ — জ্যোৎস্না–রৌদ্রের চিকিৎসা ২০৩
রফিক আজাদ–এর অসম্ভবের পায়ে ২১১

স্মৃ তি চা র ণ মূ ল ক

২১৯ জাহানারা ইমাম — বিদায়, অবন্তী ! ২৩২
২৫৭ 'নীরব সঙ্ঘ' ও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী — ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক ২৭৩
২৭৭ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য — জাতির পিতার মৃত্যু ২৮১
২৮৬ কোদালা চা–বাগান — আমার শৈশব ২৯৩
আমাদের বাড়ি ২৯৯

অ ন্যা ন্য

৩১১ নিউইয়র্কের আড্ডায় — চাই সাহিত্যের আড্ডা ৩৩২
৩৩৮ চাই লেখকে–লেখকে সহযোগ — জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা ৩৪৭
৩৫১ সক্রিয় লাইব্রেরি — আমার সময় ও আমি ৩৫৪
বিদ্যাসাগরের ওপর আলোচনা — টেলিভিশনের 'মুক্তধারা' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা ৩৬৬
৩৫৮ সভায় বক্তৃতা — রণদাপ্রসাদ সাহার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা ৩৭০
৩৭৬ বিতর্ক : প্রতিভাবান প্রতারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সা হি ত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ

১

শিবনারায়ণ রায় কোনো প্রবন্ধে এই বলে কটু মন্তব্য করেছিলেন যে, আমাদের নায়ক নায়িকারা যে 'হাঁচে কাশে মলমূত্র ত্যাগ করে,' রবীন্দ্রসাহিত্যের কারণে তা এখন আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।

উক্তিতে একটা অভিযোগ আছে। অভিযোগ এই যে রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর জনৈক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, হৃদয়ে দুর্বার প্রাচুর্য ও অনুভবে অসাধারণ স্পর্শকাতরতা নিয়ে জন্মেও পরিপূর্ণতম অর্থে জীবনবাদী ছিলেন না। এমন বাস্তব ও মানবিক কণ্ঠস্বর সাহিত্যে দিয়ে যান নি যার প্রভাবে আমরা সুস্থ বলিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখি।

অন্তত জীবনের আলোকোজ্জ্বলতার পাশে এর নিহত রক্তাক্ত চেহারা দেখতে তাঁর ভীরুতা ছিল। (রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যিকভাবেও ভীরু ছিলেন, অর্ধেক জীবন ধরে ক্রমাগত বঙ্কিমি গদ্যধারার অসহায় অনুকরণ ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত ব্যাপারই তার প্রমাণ। বাইরে বেরোতে ভয় পেতেন) বিশ শতাব্দীতে জীবনকে শ্রদ্ধা করার এদেশীয় শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হয়েও জীবনকে বহুলাংশে অস্বীকার করলেন। ('অস্বীকার করো না, অতিক্রম করো'—বলে এই জীবনের অস্বীকারই যিনি করেছিলেন মহত্তর নামের ছদ্মাবরণে।)। আমার মনে হয় নিজস্ব দুর্বলতাকে মহত্ত্বের পরিচয়ে তুলে ধরার ব্যাপারে কেউ এযাবৎ এত অদ্ভুত সুন্দর ভাষায় এমন অদ্ভুত সপারগ ঋদ্ধ কথা বলতে পারেন নি—অন্তত আমাদের সাহিত্যে। অসংখ্য নিশ্চিত ভুলকে মহৎ জীবিত সত্য বলে অনায়াসে প্রমাণ করবার সবচেয়ে লাবণ্যময় ও ঐশ্বরিক ভাষা এই দানবীয় প্রতিভাবান ঈর্ষাজনকভাবে জানতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়বার পর তাঁর বক্তব্যের অসঙ্গতিগুলোকে বুঝতে যার কয়েকমাস সময় না লাগে, আমার বিশ্বাস, সে রবীন্দ্রপ্রতিভার কুহকী শক্তিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে নি। উদ্ধত স্তনের সুখদ তৃপ্তি অনুভব করলেন, রমণীয় নারীদেহের দুপাশে ধুলায় রক্তে অনেক দীর্ঘশ্বাস আর উদ্ধত পৌরুষের লাশ দেখলেন, কিন্তু শরীর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না। 'চতুরঙ্গ'র সুরেশ হত্যাকারী হল তার সুস্থ রক্তমাংসের জীবনের, আজীবন অন্ধত্ব পেল সুরদাস, আত্মঘাতী

হল 'ঘাটের কথা'র কুসুম এবং 'শেষের কবিতা'য়[১] অমিত রায়ের নির্দোষ নিরপরাধ প্রেম ইনটেলেক্টের মহিমান্বিত নামের হঠকারিতায় দুটো অনন্য কবিতার সঙ্গে ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হল। (আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় চিত্রাঙ্গদার জন্যে। নারীর যৌবন নিংড়ে মঙ্গলময় রূপ উদ্ধার করার নির্দয় অজুহাতে কবি চিত্রাঙ্গদাকে আমরণ কুশ্রিত্ব ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন !) এবং মুক্ত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে নন্দিনী, হাতে রক্তকরবী ও রূপে 'সুন্দরপানা' নিয়েও অদ্ভুতভাবে অনিন্দ্য ও প্রাণহীন হয়ে থাকল।

বোঝাতে চাচ্ছি যে, রক্তমাংসের সুস্থ জীবনের অস্বীকার আছে রবীন্দ্রনাথে, তাঁর অধিকাংশ প্রধান চরিত্র কোনো-না-কোনো মহৎ তত্ত্বের উপায়হীন শিকার। কামরিরংসাতাড়িত মানুষকেও তার হাতে লোভ-কামনাহীন উন্নত অতীন্দ্রিয় জীবে পরিণত হতে হয়েছে, যা জীবনের অন্যায়জনক মৃত্যু। এসব দৃষ্টান্ত অসংখ্য। যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের নির্ঘণ্ট ঘেঁটেছেন তাঁরা চোখের সামনে এইসব সম্ভাবনাহীন, রোগা, ফ্যাকাশে মানুষদের নিঃশব্দে পথ হাঁটতে দেখেছেন (বিশেষত মেয়েদের : যেন তাদের শরীর, জঙ্ঘা, কমনীয়তা সবকিছু কোনো অতিসাধারণ তত্ত্বের ধাতুতে গড়া)। ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের অধিকাংশ মানুষই মানুষ নয় ; এবং অনেক মানুষই অতিমানুষ। বিবস্ত্র জীবনকে শাদা চোখে দেখতে শিউরে উঠেছেন আজীবন। ভয়াবহকে সহ্য করার এই স্নায়বিক অক্ষমতাই তাঁকে চালিত করেছিল সুস্থ নীরোগ রক্তমাংসময় সজীব মানুষকে কাম-ক্ষুধা-উত্তাপহীন পবিত্র প্রতীকী মানুষে পরিণত করে তার তথাকথিত আনন্দরূপ[২] দেখতে। আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় এ ভেবে যে তিনি এ সবকিছুই করেছিলেন 'সুন্দর থেকে সুন্দরতরে'র পেলব অজুহাতে ; এবং তাঁর বহুকথিত 'দেহ থেকে দেহাতীত' বা 'সীমা থেকে অসীম' জাতীয় অসংখ্য কথার মহৎ ছদ্মবেশের নিচে জীবনকে মুখোমুখি হবার জীবনব্যাপী ভীরুতাকে চাপা দিয়েছিলেন।

ফলে, যে কদর্য বীভৎস চেহারা আধুনিক মানুষের প্রকৃত মুখচ্ছবি তা ঠাঁই পেল না তাঁর সাহিত্যে। তাঁর পাত্রপাত্রীরা হয়ে থাকল কোনো হারানো ঐশ্বর্যশালী জগতের ঈর্ষাজনক মানুষ, আমাদের এই হতভাগ্য যুগের অপচয়ী যন্ত্রণা; অন্ধকার, মৃত্যু যাদের কোনোদিন ছুঁতে পারবে না। আর তাদের সেই সুদূর নির্লিপ্ত জগতের মাঝখানে বসে তাদের সেই

---

১. সেই সুন্দর, অনিন্দ্য ও মৃত্যুর মতো ভয়াবহ বই যা এখনও আমার চেতনাকে তাড়া করে। কোনো বই যে একই সঙ্গে এই সুন্দর, অপূর্ব অথচ এমন প্রাণহীন, অনুভূতিহীন, শীতল, কঠিন ও নির্মম হতে পারে তা এই বই পড়তে গিয়ে আমি অনুভব করি। আগাগোড়া বইটা মানুষহীন ; গোরস্তানের মতো শূন্য ও নিঃসঙ্গ। মানুষেরা বুদ্ধির শিকার ; নিষ্ঠুর, হৃদয়বর্জিত। সেই শীতল ভয়াবহতার গভীর অদ্ভুত শৈত্য আত্মাকে ঘিরে ধরে—বইটা পড়বার সময় সেই মৃত্যুর ভয় আমাকে রুগণ্ করেছিল। আমার বিশ্বাস, এর সমস্ত উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর শব্দগুলোকে সাঁড়াশি দিয়ে তুলে নিয়ে বাকি বইটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেও বাংলা সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হবে না।

২. বিবেকানন্দের পক্ষাঘাতগ্রস্ত মতবাদের বিরোধিতা করলেও জীবনসাধনার ব্যাপারে তাঁর মতোই মনে করতেন : We do not travel from false to truth ; but from truth to truth ; from smaller truth to higher truth. *(শিকাগো বক্তৃতা)*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিমান্বিত স্রষ্টা, অবিস্মরণীয় ঔজ্জ্বল্য এবং অতুলনীয় বৈভব নিয়েও দুঃখজনকভাবে আমাদের থেকে দূরে সরে গেলেন। মানুষত্বের যে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত চেহারা তুলে ধরতে পেরে শেক্সপিয়ার চারশ বছর আগের হয়েও আমাদের অনুভবের দোসর, শুধু সেই একটিমাত্র বিষয়ে অপারগ হওয়ার ফলেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের থেকে অনেকখানি দূরের।

২

রবীন্দ্রনাথের যে প্রবণতা তাঁর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল তা হল, ঋষিত্বের প্রতি তাঁর দুরপনেয় লোভ। (ভুলতে পারি না যে, লোভ দমনের যত মহৎবাক্য রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন, গীতার মহাকবিও হয়তো তত করেন নি। বস্তুত আমাদের শতাব্দীর 'নিষ্কাম মন্ত্রের' অন্যতম উদ্গাতা তিনি—গানে, কবিতায় এবং প্রবন্ধে নিরাসক্তির প্রধান প্রবক্তা; অথচ আশ্চর্য, এই মহৎ লোভের উপভোগ্য শিকার হয়েছিলেন।) "গুরুদেবের" মহিমান্বিত সিংহাসন আজীবন কঠোর সততার সঙ্গে আগলে গেলেন। সম্মানের স্বারোপিত নির্বাসন থেকে নিম্নবিত্ত ধূলার সঙ্গে বজায় রাখলেন শ্রদ্ধেয় দূরত্ব। নিজস্ব চরিত্র এবং মানবিক পরিচয়কে দুর্গমতর অচলায়তনের বস্তু ক'রে ভাস্বর ব্যক্তিত্বে উদ্ঘাটিত হলেন এবং বৃদ্ধ বয়সের শ্বেতশুভ্র দেহকান্তি এবং অনন্যসাধারণ পোশাককে দাঁড় করাতে চাইলেন নিজের মহান চরিত্রের প্রতিনিধি করে।

বলা হবে, অন্যদের মতো এই ব্যাপারে যুগধর্মকে অতিক্রম তাঁর অসাধ্য ছিল। কিন্তু যুক্তিতে এই বক্তব্য অচল। বিদ্যাসাগর (এ যাবৎ বাংলাদেশের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পুরুষ) যে প্রলোভনকে নির্দ্বন্দ্বে অগ্রাহ্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রলোভনের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। একজন সুস্থ, উজ্জ্বল, স্বাভাবিক মানুষ—মানুষীয় প্রবৃত্তির উদ্বুদ্ধ ঘোষণায় দিক রটনা করতে করতে 'কড়ি ও কোমল' পেরিয়ে হঠাৎ কোন্ আকস্মিক শৈত্যের প্রভাবে যে জীবনের উত্তপ্ত পেলব একটা দিকে শক্ত ও অসাড় হয়ে পড়লেন—যা রুক্ষ, কঠিন কৃচ্ছ্রতাসাধনার নামে বর্ধিত পঙ্গুত্বচর্চায় দিনের পর দিন উৎকট হয়েই চলল। এই পর্যায়ে মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। 'মানসী'র কবি সুরদাস কে? কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে??? হঠাৎ তাঁর আত্মনিগ্রহের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা এবং অন্ধত্ববরণের ক্ষমাহীন চেষ্টা কেন? কোনো বিগত পাপের বিরাট গ্লানির ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত এ? কোনো জীবনব্যাপী গ্লানিবোধকে চিরদিনের জন্য কবর দিয়ে ফেলবার প্রচেষ্টায় এই জীবনব্যাপী অক্লান্ত নিষ্প্রাণ শুদ্ধাচার পালন করলেন?[৩] আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের এই আকস্মিক দিক-পরিবর্তনের গভীর রহস্য খুঁজে দেখা প্রয়োজন, যা অনুদ্ঘাটিত থাকলে রবীন্দ্রসাহিত্যের চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে একটা বিরাট সমস্যা সমাধানহীন থেকে যাবে।

'মানসী'র রবীন্দ্রনাথই পরের জীবনের রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় ঋষি—যিনি বহুপরিচিত, বহুকথিত, শ্রদ্ধেয়, মহান, চরিত্রে প্রায় অমানুষিক—তাঁর জন্ম এখান

৩. কিংবা অন্তর্গত রক্তেই রবীন্দ্রনাথ শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন—'কড়ি ও কোমলে' তার ঘটেছিল ব্যতিক্রম? সুরদাসের প্রার্থনা কি সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই। 'কড়ি ও কোমল'[৪] পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি বদলে গেলেন। ঋষিত্ব দখল পেতে শুরু করল। সুস্থ মানবিক জীবনকে হেয় করার জন্যে 'নিষ্ফল কামনা'র মতো অপূর্ব কবিতা লেখা হল (আমরা জানি না কী সেই হতাশা যার জন্যে নিজেকে এভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মারতে হবে।) 'বিজয়িনী'তে মদনকে দিয়ে অন্যায় বাধ্যতায় নির্জনে নগ্ন লুব্ধ নারীর পায়ে পূজা উপচার দেওয়ানো হল। আর এদের রচয়িতা?— ব্যক্তিগত জীবনে হতে লাগলেন দূর থেকে সুদূর, শান্তিনিকেতনের গুরু, আচার্য, ব্রাহ্ম উপাসনার গীতিকার, দেশের মহত্তর কল্যাণে উদ্বুদ্ধ। সাহিত্যপ্রয়াসের ক্রমাগত চর্যায় শুচিতা শুদ্ধতার ভিত্তি শক্ত করলেন। এবং বৃদ্ধবয়সে এই প্রাণহীন চরম শুদ্ধতায় আক্রান্ত হয়ে জীবন ও শিল্পকে অস্বীকার করে মহামানবের দুর্ভাবনায় প্রাণ হারালেন।

সঠিক মনে পড়ছে না রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবনবিমুখতার প্রতি এই পক্ষপাতকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে সুধীন দত্ত গ্যেটিয় জীবনবোধের তুলনায় একে পঙ্গু বলেছিলেন কি না। কিন্তু পঙ্গু হোক না হোক, লোকচক্ষে মহৎ হওয়ার প্রচেষ্টা তাঁর সুস্থ জীবনবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এ-কথা বলছি এজন্যে যে সামাজিকভাবে ভালো বা মহৎ হবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। এইজন্যে যুগীয় রুচিবোধ ভেঙে উচ্চতর কোনো শ্রেয়োবোধের আদর্শ তিনি গড়তে অক্ষম হলেন; নিজের প্রতিষ্ঠাকে কোনোভাবে হেয় দেখতে তিনি ভীত হতেন[৫]। ফলে তিনি ভূমিকা নিলেন সেই কারিগরের যিনি সমস্ত উনিশ শতকের দীর্ঘ সাধনায় নির্মিত সত্যশিবসুন্দরের নৈতিক প্রাসাদের শেষ ইঁট গেঁথে বিদায় নিয়েছিলেন। নিকট-যৌবনের ক্ষুব্ধ দায়িত্বহীনতায় হঠাৎ একবার বিদ্রোহী হলেও ('কড়ি ও কোমল') অচিরেই ভুল বুঝলেন, স্বকীয় জীবনবোধকে পঙ্গুত্ব দিয়ে নিয়মিত আত্মক্ষয়ে নিজেকে ও যুগকে বিভ্রান্ত করলেন এবং শ্রদ্ধেয় আসনে ঋষিত্বের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিদায় হলেন।

এ-কথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথ পারতেন অনেক কিছু, করেছেনও অনেক কিছু এবং করতে চাইলে পারতেন না, এমন বিষয় কম। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, শ্রদ্ধেয় হবার,

---

৪. যদি কোনো বই-এ রবীন্দ্রনাথ অস্থিমাংসের জীবনকে পুরোপুরি আস্বাদ করে থাকেন তবে তা 'কড়ি ও কোমল'। রক্তমজ্জায় উত্তপ্ত ও সুস্থ এই বইকে কেউ যদি খানিকটা অরাবীন্দ্রিক চোখে দেখেন, তবে আমার বিশ্বাস, তিনি এমন কিছু পাবেন যা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পক্ষে দস্যুতা।

৫. রবীন্দ্রনাথ এ যুগের সেই আশ্চর্য প্রতিভা যাঁর ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অদ্ভুতভাবে অজ্ঞ। নিজের জীবনের সামান্যতা, ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতাগুলোকে এমনভাবে মাটিচাপা দিয়ে গিয়েছেন যে আগামীকালের যুগব্যাপী গোয়েন্দা অন্বেষণও তাকে খুঁজে বের করতে পারবে বলে মনে হয় না। আমি জানি না, সুধীন দত্ত কোন্ তথ্যের ওপর এত নিশ্চিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর প্রেম ও রবীন্দ্রনাথের বিবাহের সঙ্গে জড়িত কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার ব্যাপার অত জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনা যদি আদৌ সত্য হয় তবু ব্যাপারটাকে অব্যর্থ বলে প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট তথ্য এখনও কারো হাতে নেই। এমন নিষ্ঠুর, কঠিন, নিরাসক্ত ও হৃদয়হীনভাবে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি লোকচক্ষুর সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেছেন যে তাঁর কোনো সামগ্রিক জীবনীগ্রন্থ রচনার সম্ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে নির্মূল হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠিত থাকার লোভ রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে খণ্ডিত আত্মহত্যা দিয়েছিল।

বহির্বিশ্বে 'কবি' রবীন্দ্রনাথের অবহেলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধে বলেছেন যে, গীতাঞ্জলির প্রথম প্রতীচ্য পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের ললাটে 'ধর্মীয় কবি'র মারাত্মক তিলক এঁকে দিয়েছিল।

আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের এই ভুল পরিচয়ের জন্যে (যদি হয়ে থাকে) অন্য অনেক কিছুর মতো রবীন্দ্রনাথ নিজেও খানিকটা দায়ী। নিজের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দিহান রবীন্দ্রনাথ (সে যুগের রুচিহীন বাঙালি সমালোচকদের নিকৃষ্ট সাহিত্যবোধই এই দুঃখজনক ধারণা সৃষ্টির জন্যে দায়ী) 'প্রতিষ্ঠার' সকরুণ প্রত্যাশায় প্রতীচ্য মনীষীদের কাছে নিজেকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন ভারতীয় মিলনমন্ত্রের উদ্‌গাতা হিশেবে, উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদের মরমী প্রবক্তার পরিচয়ে—তাঁর ভঙ্গুর (এবং তখন পর্যন্ত অনিশ্চিত) কবি পরিচয় নিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে সাহসী হলেন না। তাঁর যত্নলালিত ঋষিসুলভ সৌম্যকান্তি এই ধারণার পক্ষে সহায়তা করল। এই সময় 'One hundred poems of Kabir' প্রকাশ, ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে মূলের শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার পরিবর্তে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অধ্যাত্মবাদী কবিতা গ্রহণে আগ্রহ, পরবর্তীকালে হিবার্ট বক্তৃতা এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও ধর্মসংক্রান্ত[৬] আলোচনা রবীন্দ্রনাথকে সন্দেহাতীত মূল্যে তুলে ধরল অতীত ভারতের অসামান্য ঋষির ভূমিকায়। আর রবীন্দ্রনাথ—নোবেল প্রাইজের মতো অভাবনীয় ঘটনা অথবা সেই সম্ভাবনাময় বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যাঁর জীবনে সে সময় পর্যন্ত (১৯১৩) অকল্পনীয় ছিল—যে পরিচয়ে এই প্রতিষ্ঠাকে অর্জন করলেন, পরবর্তীকালে তাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে নিজের সত্যিকার পরিচয়কে তুলে ধরতে আর সাহসী হলেন না। বহির্বিশ্বে 'কবি' রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচ্যের ঋষি' নামের মহিমান্বিত আড়ালে, একটা মৃদু আলোড়ন তুলে, চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন।

কোনো মহৎ কবি বর্হিজগতে তাঁর আপাতখ্যাতিকে সুগম ও সুলভ করার অভিপ্রায়ে প্রতিভার তুচ্ছতর একটা দিককে (এ সত্যি যে তাঁর 'কবি' পরিচয়কে ইউরোপবাসীর কাছে তুলে ধরতে হলে তাঁকে যতটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হত, তার চেয়ে এই পথ ছিল সহজতর)[৭] বিজ্ঞাপিত করে নিজের মহৎ কবিপ্রতিভার এমন

---

৬. উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এই আলোকেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

৭. রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন যে ইউরোপীয়রা বাইরে গণবাদী হলেও গোড়ায় ব্যক্তিপূজক। (১৯২৫ সালে কল্লোলগোষ্ঠীর কাছে রোঁমা রোলাঁর স্মরণীয় আহ্বানটি উধৃত করা যেতে পারে : I would request the young writers of India to publish in English the biographies of the great personalities of India. Europe is strongly individualistic. She will be always struck more by a figure by a person than by an idea. তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন যে ঐহিকতাবাদী ইউরোপবাসীর বিস্মিত শ্রদ্ধা আয়ত্তের ব্যাপারে তাঁর আকাশস্পর্শী ব্যক্তিত্ব যতখানি কার্যকর, তাঁর অতুলনীয় কাব্যসম্পদও ততখানি নয়। দ্বিতীয়ত নানান কারণে তাঁর স্বকীয় কাব্যের তুলনায় অতীত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি সমকালীন ইউরোপের ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্যের ফলে তিনি ইউরোপবাসীর কাছে তাঁর কবি পরিচয়ের চেয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের উজ্জ্বল প্রতিভূর পরিচয় সহজতর অনুধাবন করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখজনক ক্ষতি করেন নি। হতে পারে রবীন্দ্রনাথ কবি ছাড়া আরও অনেক কিছু ছিলেন, যে পরিচয়ও উপস্থাপনযোগ্য ; কিন্তু তিনি যে সবকিছুর ওপরে কবি ছিলেন, এ-কথাটা গোড়াতেই মেনে নেওয়া ভালো এবং এই প্রধান পরিচয়টা উপেক্ষিত হলে তাঁর আর কোনো বিশেষত্বই যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, এমনকি তাঁর মৃত্যু অথবা শতবার্ষিকীও যে তাঁকে সেই অন্ধকার মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম—দুঃখজনক হলেও তা এতদিনে প্রমাণিত হয়েছে।

বক্তব্যে আমার প্রতিপাদ্য যে 'কবি' পরিচয়ের ছাড়পত্র ছাড়া বাইরের পৃথিবীতে তাঁর পুনরুদ্ধার অসম্ভব, আর রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে পথ দুরূহ করে গেছেন। যাঁরা হট্টগোল করেন এই বলে যে 'হিন্দু'—এই জাদুশব্দ থেকে তাঁরা (বিদেশীরা) রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন নি, তাঁরা এই বিষয় খতিয়ে দেখবেন।

(রবীন্দ্রনাথের মহত্তম ত্রুটি সম্ভবত যে তাঁর অসাধারণ একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। এই দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকলে, ব্যক্তিত্ব ও দেহকান্তির গুণে অভাবিত মর্যাদা সুলভ না হলে, বহির্বিশ্বে তাঁর কবি পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা সহজ হত বলে মনে করি)।

১৯৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

আমাদের জনৈক সগোত্র (যাঁকে ওপার বাঙলার তরুণ লেখকদের মধ্যে অন্যতম অনুপ্রাণিত ভেবে একসময় আশান্বিত হয়েছিলাম) উত্তেজিত রবীন্দ্রবিরোধে কণ্ঠ দিয়ে একবার এমন মন্তব্য আমাদের শুনিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে উঁচুদরের শক্তিমান (শ্রেষ্ঠতমদের পাশে) ভাবতে তাঁর আপত্তি আছে। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এরকম : বাল্যকালে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল এমন এক সুদূর প্রদেশে যেখানে বাংলাদেশের শতকরা একশজন নিরাপরাধ শিশুর মতো রবীন্দ্রকাব্যে মেরুদণ্ডহীনভাবে অভ্যস্ত হওয়ার সুবিধা তিনি পান নি। অনেক পরে, মন ও বয়সগত পরিণতির পর, যখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি হাতে পান তখন তার একটা বড় অংশ তাঁর কাছে অপাঠ্য ঠেকে। তাঁর মত : সারা রবীন্দ্রকাব্য জুড়ে এমন একটা কাঁচা দুর্বল অপরিণতির লক্ষণ পরিব্যাপ্ত যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ঘেঁটে গোটা তেরোর বেশি রচনাকে ভালোমাপের কবিতা বলতে তিনি অপারগ। এবং এগুলোর কয়েকটাই 'সঞ্চয়িতা'র বাইরে।

এই মন্তব্যে সত্য থাকতে পারে। তবু নানা কারণে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ শতকের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান বলে জানি। কথিত ভদ্রলোকের অবস্থায় পড়লে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের কেমন লাগত, জানি না। আমার বিশ্বাস ভদ্রলোক সাহিত্যের কলাকৈবল্যের ভিড়ে চোখ হারিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'প্রতারক' সরলতাকে বুঝতে পারেননি। আমি অবাক হই এ দেখে যে, তাঁর মধ্যে জাগতিক বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে মহত্তর হৃদয়চেতনা অদ্ভুত প্রণয়ে বিবাহিত ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেই মহান রবীন্দ্রনাথকে যখন জীবনদেবতার মতো একটা জোলো তরল বিষয় নিয়ে ভাবিত, আন্দোলিত ও তদগত হতে দেখি, তখন সেই বিরাট বুদ্ধির মূলে এই ক্ষুদ্র অসহায়তার দিকটি আমাকে প্রলুব্ধ করে। (আমি যতটা বুঝেছি রচনার মুহূর্তে কবির অবচেতন মনের রহস্যময় বিশাল গহন জগতই রবীন্দ্রনাথের সেই 'অতিলৌকিক' জীবনদেবতা।) আশ্চর্য লাগে, যখন রবীন্দ্রনাথের মতো একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এমন একটা মনস্তত্ত্বিক বিষয়কে তাঁর জীবনের নিয়ামক দেবতা নাম দেন, তাঁর সঙ্গে অপার্থিব লীলা করেন, তাঁর কৌতুকে বিস্মিত হন এবং গদ্যে-পদ্যে শিশুসুলভ উৎসাহে তাঁর কৌতুককর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এবং কৃপা জাগে যখন রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রবুদ্ধ অধ্যাপক আবেগ-আক্রান্ত কণ্ঠে এই বালখিল্য বিষয়ের দিকে পরীক্ষাভীত নিরীহ ছাত্রদের নির্বোধ শ্রদ্ধা আকর্ষণে মূল্যবান জীবনীশক্তির দুঃখজনক অপচয় ঘটান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা সমালোচনা প্রসঙ্গে

আমরা যে-যুগের অধিবাসী হবার দুরদৃষ্ট লাভ করেছি, রুচির বিচারে সে-যুগ আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে দুশ্চরিত্র সন্তান। আমাদের সংস্কৃতির এ এমন একটা সময় যখন কাল ও পরিপার্শ্ব অভাবিত দুর্ঘটনায় আত্মাহীন, শরীর ব্যভিচারী, বোধ অকর্ষিত ও রুচি গর্হিত। গত একশ বছর সাহিত্যক্ষেত্রে অবিরল অতিবর্ষণের পর অনিবার্য শীত ঊষর অধিকার নিয়েছে এক্ষেত্রের। এই যুগের মহাকবির বংশধরেরা মৌন, খ্যাতি ক্ষণজীবী, কবিকল্পনা উদ্ভাবনহীন এবং একটানা রোদ্দুরের ক্লিষ্ট তাপে শতাব্দীব্যাপী প্রেরণা অবসিত। এ-যুগে গ্রন্থসংখ্যা বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে, পাঠকসংখ্যা আমাদের পূর্বসূরিদের ঈর্ষার বিষয়। তবু শুকিয়ে গেছে সেই মজ্জা—সেই কান্তিমান আলো—যাকে আমরা নাম দিই 'প্রেরণা'।

সবচেয়ে খেদের কথা, রুচি নেই এ-যুগের। মানতেই হবে—নেই। নিজের প্রতি জন্মান্ধ বিশ্বাসে রক্তাক্ত কোনো নায়ক এ-যুগে আমরা দেখছি না। গাছের মতো মহান ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। দাঁড়াতে পারছে না সেই রুচির উদ্ভাস, কিংবা সেই সর্বজনীন বিকীরণ আলোকস্তম্ভ, যেখান থেকে বৈদগ্ধ্যের উন্নতমান বিচ্ছুরিত হতে পারে জানালায় জানালায়। সংশয় এবং নৈরাশ্য, নিঃস্বতা ও ক্ষয় অধিকার করে ফেলেছে আমাদের যুগের মহত্তম হৃদয়। আত্মশক্তির অধর্ষ বিশ্বাসে কোনো গভীর আরণ্যক লিখিত হতে পারছে না।

ফলে নিদারুণভাবে অভিভাবকহীন আমাদের সমকাল। জ্ঞানের ব্যভিচার, বুদ্ধির আলস্য, চিন্তার নিস্পৃহতা নিঃশেষ করেছে এই নিষ্ক্রিয় যুগের মেরুদণ্ড। মাংসকাম ও স্বর্ণলালসা শুদ্ধতম চৈতন্যকেও শবের দুর্গন্ধ দিয়েছে। এবং সেই অমানুষিক ক্লেশ—সেই উদ্যম-স্পৃহা-উৎসর্গ—কোনো নিশ্চিত উদ্দেশ্যের প্রতি নিরাপোষ আনুগত্য ও একাগ্রতা—ভারতীয় পরিভাষার সেই 'সাধনা'—শুদ্ধতম চৈতন্য যার ফসল, অনুপ্রেরণা ও সৎ অন্বেষা যার ফলদ পোস্টাই—'ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত শরীর' এই যুগে—স্থূল, মুদ্রাসর্বস্ব, ব্যভিচারী। বৈশ্যের পণ্যের গর্হিত প্রেরণা সবচেয়ে অণুপ্রাণিত শিল্পীর তুলিকেও অধিকার করে ফেলেছে।

অথচ এই ওষ্ঠহীন আলোহীন যুগকে বাঙালি সংস্কৃতির চিরকালীন পরিচয় ভাবলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল হবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কাল দূরস্মৃতি নয় যখন শত-কর্তৃত্ব-বিভক্ত বাংলা সাহিত্য নৈরাজ্য ও অবাধ স্বেচ্ছাচারের বর্বর ত্যাজ্যপুত্র হয়ে ওঠে নি, যখন গভীর কণ্ঠস্বরকে নিরর্থ করবার হীন ষড়যন্ত্রে একহাজার একশ অর্ধশিক্ষিতের বিরতিহীন স্বর অকথ্য উল্লাসে সোচ্চার হত না। পক্ষান্তরে সর্বজনমান্য কোনো-না-কোনো ব্যক্তিত্ব সবসময়েই এই সাহিত্যের অলিখিত চালকের ভূমিকা নিয়েছেন। সুশীল বোধ এবং মেধাবী উপলব্ধি ফলবান মর্যাদা পেয়েছে। মোটকথা ধী এবং শালীন শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য ও সাবালক রসবোধ সাহিত্য আলোচনায় অত্যাবশ্যক সামগ্রী হিশেবে গণ্য হত।

ফলে সে-যুগের সাহিত্য সমালোচনারও একটা ন্যূনতম মান লক্ষ করা গেছে। ন্যূনতম মান—কথাটি বলার সময় সেকালের মহৎ সমালোচনা কীর্তিগুলোকে আমি শুধু ধরছি না। সে-যুগের সাধারণ লেখকদের অসংখ্য অপরিচিত রচনাকেও এর সাক্ষ্য হিশেবে ধরতে চাচ্ছি। সেসব রচনার দিকে তাকালে অন্তত এটুকু ধারণা জন্মাতে চাইবে যে সাহিত্যের সমালোচনার জন্যে সেকালে একটা ন্যূনতম শিক্ষা এবং যোগ্যতাকে অপরিহার্য মনে করা হত যা এখন হয় না। সেটুকুর অনটন হলে সে-যুগের কোনো সাহিত্যকারের হাত সমালোচনায় এগিয়ে আসতে লজ্জিত হত। এককথায় সজীব সাহিত্য-প্রেরণা, সমালোচনার বড় আদর্শ ও 'সংস্কৃত' রুচিবোধ এই যুগের গায়ে শ্রদ্ধাবান লেবেল ঝুলিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগুলো এই যুগেরই উপহার।

তবু বাংলা ভাষার সমালোচনা সাহিত্যের জগৎ এখন পর্যন্ত সত্যি সত্যি বিত্তহীন। এর কারণ হয়তো এই যে, বাংলাভাষার 'প্রকৃত' সমালোচক প্রতিভারা কেউই প্রধানত সমালোচক হতে চাননি। এঁদের প্রায় সকলেই 'সৃষ্টিশীল' প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁদের লেখনীর পক্ষপাত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের দিকে যতখানি কালির যোগান দিয়েছে, সমালোচনার ব্যাপারে ততখানি দেয়নি। উপরন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গঠন-যুগের লেখক। তাঁদের যুগের বাংলাসাহিত্যের দরিদ্র ভাঁড়ার, ধনবান হবার দ্রুত প্রয়োজনে, তাঁদের কাছে অজৈব সমালোচনার চাইতে সৃষ্টিশীল রচনার অবিরল উৎপাদন প্রার্থনা করেছিল। এ কারণেই সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রতিভারা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ এই প্রত্যঙ্গটির চর্চায় এতটা অমনোযোগী এবং নির্বিকার। উপরন্তু অনেকে তা অপ্রয়োজনীয়ও ভাবতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—যাঁকে আমি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রতিভা ভেবে থাকি—তাঁর বিপুল প্রতিভার খুব বড় অংশ সমালোচনায় নিয়োগ করেননি। অবশ্য এই অনীহা উপরোক্ত কারণে নয়। এর জন্যে দায়ী তাঁর যুগের বাংলাসাহিত্যের অবিশ্বাস্য শূন্যতা। মনে রাখা দরকার যে এই সাহিত্যের প্রায় একটা অতীতবিহীন যুগে তিনি জন্মেছিলেন, যখন অতিজীবিত লেখক বা দীর্ঘায়ু গ্রন্থ এই সাহিত্যে সুলভ ছিল না। মোটকথা তাঁর যুগের বাংলা সাহিত্য তাঁকে সমালোচনার চারণভূমি দেয়নি। তবু সাহিত্যালোচনার ছোট্ট এলাকায় তিনি জরিপ-প্রতিভার যে অসামান্য নিদর্শন রেখেছেন, পরবর্তী একশ বছরের বাংলাসাহিত্য তার সমপর্যায়ের কিছু আজ অব্দি দিতে পারেনি। আমি এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বহুবার একাকী ভাবতে ভালোবেসেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি আজীবন তাঁর গম্ভীর, লোমহর্ষক, অলৌকিক এবং প্রতিভাময় উপন্যাসগুলোর রচনায় তাঁর সৃজনীপ্রতিভার ব্যবহার না করতেন, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত মনীষাদীপ্ত রচনায় থাকতেন উদাসীন, কেবল চেতনার সম্পদ হিশেবে রেখে যেতেন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অনুকম্পাময় গভীর উক্তিগুলো, তবু মনীষাসম্পন্ন বাঙালিদের মধ্যে তাঁর স্থান খুব ছোট হত না।

রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যবয়সে তখন বাংলাসাহিত্যের নতুন শহর-প্রকল্প অনেকখানি গড়ে গেছে এবং বেশ কয়েকটা বিস্ময়কর অট্টালিকার নির্মাণ সমাপ্ত। মোটকথা সাহিত্য সমালোচনার একটা চলনসই ক্ষেত্র তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্ব-স্বভাবে রবীন্দ্রনাথ সমালোচক ছিলেন না। তাঁর সমালোচনায় সাহিত্যের সর্বজ্ঞ দৃষ্টি নেই ; যে দৃষ্টি ব্যাপ্ত, গভীর, সর্বদর্শী—যা ছিল বঙ্কিমের।[১] তাঁর সমালোচনায় সম্রাটের উদারতা আছে ; বহুদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকের মূল্যায়ন নেই। তিনি সাহিত্যের কোনো বিশেষ দিকের ওপর তীব্র, জোরালো ও ব্যক্তিগত আলো ফেলে সাহিত্যকে দেখতে চেষ্টা করতেন এবং এইসব উপলব্ধিগুলোকে এমন প্রোজ্জ্বল, প্রতিভাময় কবিতার ভাষায় কথা বলতে পারতেন যে সে লাবণ্যপ্রভার পাশে অনেক গভীর অবলোকনও নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

বড় মাপের সমালোচনায় তাঁর প্রতিভা যে সায় দেয়নি, তার কারণ : সাহিত্যের যে-কোনো চেষ্টাকেই তিনি শ্রদ্ধেয় মনে করতেন ; ফলে সমালোচনাকে তিনি ভাবতেন সশ্রদ্ধ প্রশংসা। 'সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী'—এই উদ্বেলিত অদ্ভুত মতের নিশ্ছিদ্র প্রতিভূ ছিলেন তিনি। এবং এমন অলীক ও শ্রদ্ধেয় ভাষায় তিনি তাঁর বিস্মিত পূজা সমাধা করতে পারতেন যে সেই লোকশ্রুত স্তবক্ষমতায় (তাঁর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে), ঢের নিরেট অসুরও দেবতা হয়ে উঠেছে। তাঁর সমালোচনায় অনেক প্রগাঢ় রচনার সঙ্গে ঢের অপাঠ্য গ্রন্থেরও অনিন্দ্য বন্দনা খচিত হয়েছে অসংখ্য উজ্জ্বল শব্দে, ঢের সাধারণ লেখক তাঁর বিস্ময়কর বাক্যরাজির অবিস্মরণীয় প্রাসাদে অমর ঘর পেয়েছে। এই মনোরম শ্রদ্ধাচর্চা, তাঁর যুগের বহু দরিদ্র রচনাকে অসামান্য উচ্চতা দিলেও বাংলা সাহিত্যে বিশ্বস্ত সমালোচনা দেয়নি। মোটকথা তিনি সাহিত্যের নিরাসক্ত সমালোচক হননি ; সম্ভবত হতে চানও নি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষমাময় প্রগাঢ় পিতা ও লালনকারী হিশেবে এই সাহিত্যের শিশু-উদ্যমকে স্পষ্টোক্তির নির্বিবেক আঘাতে প্রহত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। হয়তো এইজন্যেই সমালোচনার কঠিন দায়িত্ব থেকে আজীবন পালিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার তুলনায় সমালোচনা বিভাগ যে সংখ্যাস্বল্পতায় এত দীন, ব্যাপারটি ভেবে দেখার মতো।

---

১. না মানলে ভুল হবে যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিকাল লেখক মাইকেল নন, বঙ্কিম। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে সৎ মন্তব্য : তিনি সর্বজ্ঞ। একবার মনে হয়, জীবনের সব রহস্য, সব গভীরের শেষ দেখেছেন তিনি; সব সমস্যার সমাধান জানেন। বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে 'প্রৌঢ়'। তিনি সবচেয়ে ভারসাম্যময় ; সবচেয়ে সর্বদর্শী, সর্বগামী ও স্মিত ; প্রগাঢ়, সৌম্য, ব্যথিত ও রোদনময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনার নির্দয় দায়িত্বকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হল বলে সমালোচনা সম্বন্ধে তিনি যে মতবাদ ব্যক্ত করলেন, তাও অনেকটা পলায়নবাদী। সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর মত হয়ে দাঁড়াল যে তা যদি সমালোচনা না-ও হয়, অন্তত সাহিত্য যেন হয়। কেননা সময়ের লোনা জল ঢুকে যদি আগামীযুগে ক্ষয়ে যায় তার অস্থি, তার সব অকাট্য যুক্তিগুলো যদি একে একে ঝ'রে যায় কালের হাওয়ায়, তবু বেঁচে থাকবে তার সৌন্দর্য—তার শিল্পের আলো—যে লাবণ্যময় শরীর সময়ের দাঁতের তীক্ষ্ণ উল্লাসকে অনায়াসে পার হয়। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা এই নান্দনিক মতবাদের সার্থক প্রতিনিধি। তাঁর সমালোচনা শৈল্পিক বিচারে সব জায়গায় অভ্রান্ত না হলেও দেবতাত্মা সাহিত্য। এত অতুলনীয় ও রমণীয় এই সাহিত্যশরীর যে সেই অবিশ্বাস্য প্রসাদগুণের বিশ্বজিৎ আভায় সেগুলোর দুর্বলতা চোখে পড়ে না (কিংবা হয়তো সেই সুদর্শন সাহিত্যিকের বিখ্যাত আড়ালে তাঁর সমালোচক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায়!) কিন্তু নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ অভ্রান্ত। যদিও এর আদ্যন্ত সততায় খানিকটা সন্দেহ চলে, তবু এত সম্পূর্ণ, সজ্ঞান, সপ্রস্থ ও তলদেশময় এই আলোচনা, এত স্বয়ম্ভর ও প্রবুদ্ধ যে, মাঝে মাঝে ভুল করে ভাবতে ভালো লাগে যে তাঁর রচনা সম্বন্ধে শেষকথা তিনি বলেছেন। একাল-চরিত্রের কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন না ঘটলেও আমাদের যুগায়ত অনড় ভাবনাগুলোর আমূল বদল না হলে তাঁর নিজের মতবাদের বাইরে গিয়ে তাঁর রচনার ওপর ভিন্নতর আলোকপাত সত্যি সত্যি কঠিন। তাঁর মৃত্যুর পর শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ পার হবার পরও যে তাঁর সম্বন্ধে কোনো ভিন্ন কণ্ঠ নতুন উপলব্ধি ঘোষণা করল না, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার মতো।

একজন যোগ্য সমালোচকের সুলভ শিক্ষা ও দৃপ্ত প্রতিভার অধিকার ছিল প্রমথ চৌধুরীর। তবু তাঁর সমালোচনা যে সংখ্যাস্বল্পতায় পাণ্ডুর, তার কারণ : সাহিত্যব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী দায়িত্বশীল ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্ররোচিত না হলে তাঁর বৈদ্যুতিক রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যের হাতে আসত কিনা সন্দেহ। স্মর্তব্য যে নোবেল-প্রাইজ-উত্তর যুগের রবীন্দ্রনাথ অভিমান-ক্ষুব্ধ উদ্ধত ব্যবহারের জন্যে বাংলাদেশের সাহিত্যসমাজে প্রায় একঘরে হন। ফলে অনেকটা তাঁর বিপুল প্রজননের একক বাহনের দরকারে সবুজপত্র প্রকাশের বিষয় চিন্তা করেন। এই দুরূহ সঙ্কটে প্রমথ চৌধুরী দেখা দেন 'উজ্জ্বল উদ্ধার' হিশেবে। প্রধানত এই সবুজপত্রের দরকারেই প্রমথ চৌধুরীকে ব্যাপক সাহিত্যচেষ্টার সঙ্গে জড়াতে হয়। জড়াতে হয়, তবু গভীর দায়িত্বশীলতা তাঁকে অধিকার করেনি। স্বেচ্ছায়, স্বভাব-আগ্রহে বেছে নিলেন তিনি বাংলা সাহিত্যের আলোকিত বিদূষকের পদ। মাঝে মাঝে প্রগাঢ় হয়ে ওঠার মহৎ সদিচ্ছা দেখালেও মূলত দায়িত্বহীন 'সাহিত্য খেলা' নিয়ে নিমগ্ন রইলেন।[২] সাহিত্যে ভাঁড়ের ভূমিকা যতখানি নিলেন, ভার দিলেন না ততখানি। ফলে শেষ অব্দি দুঃখ করে যেতে হল এই বলে যে বিদূষকের ঘাতক ছদ্মবেশ তাঁকে লোকঠকানোর সঙ্গে

২ এ-কথা যেন আমরা না ভুলি যে 'লেখা লেখা খেলা' কথাটি তাঁরই উদ্ভাবন। আজীবন শুধু খেলা—সমস্ত ব্যাপারে শুধু খেলা করতেই তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর সাহিত্য এই বয়সহীন নাবালক খেলার শিকার হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকেও ঠকিয়েছে; এবং তাঁর লোকশ্রুত হাস্যরসের সপ্রতিভ পাপ, বুদ্ধির অজান্তে, তাঁর গুরুকথাকে লঘুর লেবেল দিয়েছে এবং অর্থহীন ভাঁড়ামিকে গম্ভীর কথা বলে বাজারে চালাচ্ছে।

সাহিত্যব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী যে দায়িত্বশীলতা অনুভব করেননি, তা করেছিলেন মোহিতলাল। সাহিত্যের জন্যে একটা বন্য, জান্তব, পেশিবহুল প্রেম ছিল তাঁর। বাংলা সাহিত্যকে তিনি ভালোবাসতেন কোনো সমৃদ্ধ গোত্রের আদিম জননীর মতো। জন্তুর মতো, পশুর মতো জন্মান্ধ সেই আসক্তি—কামুকের মতো, ধর্ষকের মতো উদগ্র, লোভী, ক্ষমাহীন, নিষ্কৃতিহীন ও বিভীষণ। সাহিত্যকে তিনি নিজের দেহের রক্তমাংস অস্থিমজ্জার সঙ্গে তুলনীয় ভাবতেন। এইজন্যে এই সাহিত্যশরীরে কোনো আততায়ী অভিঘাত বা মৃদুতম পচন তাকে অস্বস্ত করত। সাহিত্যের কুশল চিন্তায় তাঁর সতর্ক, উদগ্রীব ও প্রহরী আগ্রহ ও এর স্বাস্থ্যরক্ষায় তাঁর নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠাই তাঁকে এই সাহিত্যের ভয়ঙ্কর দেহরক্ষক করে তোলে—তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষমাহীন সমালোচক হয়ে দাঁড়ান। স্বাধিকার নিয়োগে তাঁর যে হাত মূর্খের ভিড় হটিয়ে বাংলাসাহিত্যের মাথার উপর রাজছত্র ধরে রেখেছিল, সে হাত নির্ভীক, ঋজু, অনমনীয় ও পরাক্রান্ত; নিদ্রাহীন, বিশ্রামহীন, স্বাস্থ্যময়, সনাতন ও সোচ্চার।

বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে মোহিতলাল এ কারণে দীর্ঘদিন স্মরণীয় থাকবেন যে এদেশে তিনিই প্রথম সমালোচক যিনি সমালোচনাকে সাহিত্যসাধনার প্রধান অবলম্বন করেছিলেন। ভুললে অপরাধ হবে যে রবি-কবলিত অধুনা-মুখর বাংলাদেশে মাইকেল এবং বঙ্কিমের মতো তৎকালে বিস্মৃতপ্রায় দুজন ধ্রুপদী-প্রতিভার স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন তাঁরই অবদান।

তবু তাঁর সমালোচনা অনেকখানিই বিফল। নিজের প্রতিভা ও সাহিত্যবোধের ওপর একটা গরিলার মতো বিশ্বাস ছিল তাঁর। সাহিত্যকেও তিনি একটা গরিলার মতো ভালোবাসতেন। তাঁর সারাজীবনের আলোচনাকে যে উদ্ভটভাবে আসুরিক ও একপেশে লাগে তার কারণও তাঁর ভেতরকার এই গরিলা। একটা পেশল জান্তব অসুরের মতো তিনি চলতেন। স্ব-স্বভাবে তিনি ছিলেন দেহবাদী—শাক্ত; 'দেহের দেহলী'র ওপর মদনের দেউল রচনা করতে চাইতেন। জীবনব্যাপী সাহিত্য আলোচনায় নিজকে তিনি প্রশ্ন বা আক্রমণ করেননি। নিজের বিশ্বাস ও সাহিত্যশিক্ষাকে খুঁটিয়ে দেখে, বিশ্লেষণ করে, নিজকে নগ্ন ও বিবস্ত্র করে দেখা তাঁর জীবন-অভ্যাসের বাইরে ছিল। এ কারণেই তাঁকে মনে হয় একজন মস্তকহীন হারকুলিসের মতো, যাঁর পেশির বিশ্বজয়ী শক্তি প্রদর্শক-আলো পায়নি। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় অভাবিত স্বাক্ষর রাখলেন তিনি, কিন্তু তবু হয়ে রইলেন সমালোচনা-জগতের মূর্তিমান বিভীষিকা—'কালাপাহাড়'; অনেকক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত ও বিরক্তিকর। তাঁর বলবান অতিবিশ্বাস তাঁকে ভারসাম্য থেকে বঞ্চিত করে।

সুধীন্দ্রনাথ গদ্যে রবীন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডারকে পুঁজি করলেও তাঁর গদ্যচরিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরাবীন্দ্রিক। এর কারণ, মানস-গঠনে তিনি, রবীন্দ্রনাথ নন, বঙ্কিমের সগোত্র। বঙ্কিমের মতো তিনিও ক্লাসিকাল লেখক—বুদ্ধিশাসিত, প্রথাসম্মত, নিয়মানুবর্তী ; বঙ্কিমের মতো গদ্যে যুক্তিনিষ্ঠার অবিচল সাধক ছিলেন তিনি।[৩] তাঁর গদ্য বুদ্ধির জীবিত ইস্পাত। এই গদ্য ঋজু, কঠিন ও সংহত। যুক্তির ছেনিতে পাথর খুঁদে বার-করা দেহ, বাহুল্যহীন, নিটোল, সমর্থ ও অস্থিময়; আজীবন তিনি মননের কংক্রিট-করা রাস্তায় হেঁটে গেছেন তাঁর গদ্যে—শৈথিল্য, বিচ্যুতি ও পতনরহিত।

যুক্তির এই ধাতব প্রাধান্যই রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে তাঁর গদ্যকে আলাদা করেছে। শুধুমাত্র গদ্যে নয়, অন্যক্ষেত্রে এই মননমানতাই তাঁর মহান পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। এই নিরাপোষ যুক্তিপ্রাধান্যই তাঁকে মহৎ ও দুর্বল রাবীন্দ্রিক সমালোচনাপদ্ধতি থেকে সরিয়ে এনে মননের নিরপেক্ষ ভূমির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। সুধীন দত্ত বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে লোকোত্তর অবদান খুব একটা রেখে যাননি, তবু সাহিত্যের এই ধারায় দীর্ঘকাল স্মরণীয় থাকবেন এজন্যে যে, সাহিত্যের এই অঙ্গনে আপোষহীন যুক্তিনিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন তাঁরই কীর্তি। সমালোচনায় অযথা উদ্বেলিত হননি তিনি কখনো; সাহিত্যশিক্ষার সংকীর্ণতা বা সাহিত্যবোধের ক্লীবতার বাইরে বাস করেছেন। অর্থহীন স্তব ও অনুদার পক্ষপাত—কোনটাই তাঁর শাণিত মননকে অধিকার করতে পারেনি। মাঝে মাঝে 'নির্মোহের' প্রতি অতিরিক্ত মোহগ্রস্ততা তাঁর সাহিত্যবোধকে বৈকল্য দিলেও সুধীন দত্ত বাংলাসাহিত্যের অন্যতম চরিত্রবান সমালোচক।

বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যপ্রতিভা হিশেবে যতখানি, তার চেয়ে বেশি তিনি সাহিত্যপ্রেমিক। তাঁর প্রেমে মোহিতলালের অধর্ষ পৌরুষ নেই ; একটা স্পর্শকাতর যৌবনের সুকুমার মাধুরী দিয়ে সাহিত্যকে তিনি ভালোবাসেন। বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর নাম যেসব কারণে দীর্ঘায়ু হবে তার অন্তত একটি এই যে, তিরিশের সাহিত্য-আন্দোলনের (বিশেষত আধুনিক কবিতা আন্দোলনের) প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির অনেকটাই তাঁর জীবনব্যাপী সমালোচনার ক্লান্তিহীন চেষ্টার ফসল। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যভাষা জোছনান্বিত। সাহিত্যের ফ্যাকাশে রক্তহীন ও তথ্যময় বিষয়গুলোও তাঁর অনিন্দ্য ভাষার গুণে রমণীয় লাগে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনায় সাহিত্যের নম্র, সুশীল ও সংবেদনমদির অনুভূতি যে-পরিমাণে আছে; ব্যাপ্ত, গভীর ও তলদেশগামী অনুধাবন নেই সে পরিমাণে। বারবারই মনে হয়, সাহিত্যের ত্বকময় উপরিতলকে তিনি ভালো চেনেন। এবং হয়তো এজন্যেই, অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা—তাঁর রচনায় যতখানি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল বিশদ ও মনোরম, গভীরতর লেখকেরা ততখানি নন। প্রগাঢ় লেখকদের বেলায় তিনি প্রায়শ অসমালোচকজনিত, পলায়নবাদী ; দায়িত্বশীল বিচারকে এড়িয়ে গেছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি বহিরঙ্গপ্রধান, বর্ণনামূলক, উদ্ধৃতিময় ; উদ্বেলিত ও বাক্‌বহুল।

৩. তবু তাঁর প্রবন্ধ অনবলীল ; দুরূহ। দুরূহ, কঠিন ও পাণ্ডিত্যক্লিষ্ট। তাঁর প্রবন্ধ যে বঙ্কিমের মতো ঋজু নয়, তার কারণ তাঁর মধ্যে বঙ্কিমের সর্বদেশগামী জীবন-আস্বাদন নেই। বঙ্কিমের মতো তাঁর সমালোচনায় ভদ্রমহোদয় তত্ত্বগণ রসিকতার তুমুল সমাচারে গা ঢলাঢলি করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

এ রচনার স্বল্পায়তন পরিসরে, সংক্ষেপে, বাংলাসাহিত্যের প্রধান সমালোচকদের ঈষৎভাবে ছুঁয়ে একটা আলোচনা দাঁড় করাবার চেষ্টা আছে। আলোচনাটিকে আরও পরিসরময়, তথ্যবহুল ও সম্পূর্ণ করা যেতে পারত। সংকলিত হতে পারত অনেক টীকা, উদ্ধৃতি ও উল্লেখ, যাতে করে এই রচনার যুক্তিগুলোকে পাঠকের চোখে তুলে ধরা যেত স্পষ্টতর অর্থময়তায়। পরিসরাভাবে সেসব অনেক কিছুরই স্থান দেওয়া গেল না। এমনকি এই সাহিত্যের এমন অনেক উজ্জ্বল ও সফল সমালোচক সম্বন্ধেও নীরব থাকতে হল যাঁদের সমালোচনা এযাবৎ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঢের দামী উপহার দিয়েছে—এবং এই সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাঁদের নাম অনুল্লেখিত হওয়া অন্যায়।

তবু এ-কথা হয়তো অল্পবিস্তর মেনে নেওয়া যায় যে, এই নিবন্ধে আলোচিত ব্যক্তিরাই বাংলা সাহিত্যের প্রধান সমালোচক প্রতিভা ; এবং এই সাহিত্যের সমালোচনা-প্রাসাদের এঁরাই মূল ভিত্তি। মূল ভিত্তি, কিন্তু এঁদের সংখ্যাদৈন্য দুঃখজনক। এত দুঃখজনক যে বাংলা সাহিত্যের কতিপয় উৎকর্ষময় শাখার পাশে সৃষ্টির প্রাচুর্যের বিচারে সমালোচনা মর্যাদাবান উচ্চতা পায়নি। অথচ সাহিত্যের গত একশ বছরের অতিপ্রজ সৃজনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও প্রচুর ফলবান সমালোচনা আমাদের হাতে আসবে, এমনটাই প্রার্থিত ছিল। আশা করা গিয়েছিল, ঢের নতুন লেখক সবলতর হাতে এই অসম্পূর্ণ শাখাটির নিত্যনতুন দিগন্ত উন্মোচনে যত্নবান হবেন, সংযোজিত হবে ভিন্নতর অভিজ্ঞতা, স্বাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি ; অনুসৃত হবে নতুনতর পরীক্ষা ও প্রয়াস, যার ফলে এই সাহিত্যকে শততলে ছুঁয়ে চিরে চিরে যাচাই করে দেখা সম্ভব হবে। বলতেই হয়, এই প্রত্যাশা অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে।

এই রচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান সমালোচকদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি একটি দিকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছি। দেখাতে চেয়েছি তাঁদের অনেকের সমালোচনার অসংখ্য উজ্জ্বল দিক থাকা সত্ত্বেও, কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে এসে তাঁরা ব্যর্থ। এর কারণ, ভারসাম্যময় সমালোচক দৃষ্টির অভাব। উপন্যাস বা কবিতার মতো, সমালোচনার ক্ষেত্রে, লোকশ্রুত প্রতিভা আজ পর্যন্ত এ সাহিত্যে আসেনি। এটা বাংলা সমালোচনার পক্ষে সত্যিকার দুঃখের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—যাঁদের মধ্যে এই প্রতিভার উচ্চতম সাফল্য লক্ষণীয় হয়েছিল, তাঁরাও কাল ও পরিপার্শ্বের বিরুদ্ধাচারের কারণে সমালোচকের খণ্ডিত মূল্য পেয়েছেন। এইজন্যেই বাংলা সাহিত্যের 'প্রধান ঔপন্যাসিক' কিংবা এই সাহিত্যের 'প্রধান কবি' বলতে যেমন আমরা চোখের সামনে একজন বা দুজন ঔপন্যাসিক বা কবিকে দেখতে পাই, তেমনি 'প্রধান সমালোচক' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোনো একজন বা দুজন সর্বসম্মত প্রতিভা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান না। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁদেরকে, অপরাপর অনেক প্রতিভার দঙ্গল থেকে আমাদের খুঁজে বার করতে হয়—এবং এই কারণেই তাঁদের প্রতিভার অবধারিত শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সন্দেহ যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার প্রভাব উত্তর–তিরিশের সমালোচনাকে উপকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনায় এমন একটা লঘু ও আপাতশোভন দিক আছে যা সাহিত্যের উজ্জ্বল সাংবাদিকতার নামান্তর। আমাদের সমকালের ঢের সমালোচক–প্রয়াস যে অর্থময় হতে পারেনি, তার কারণ তাঁদের অনেকেই বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পদ্ধতির এই প্রতারক দিকটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশের প্রচেষ্টা সাহিত্যের অবাধ সাংবাদিকতা করেছে সমালোচনার মহৎ নামের ছদ্মাবরণে এবং তথ্যকে নিজের অজান্তে সত্যের নামে বেনামী করেছে। গভীরতাহীন আকস্মিক, ও চোখ–ধাঁধানো উক্তি করার প্রতি বুদ্ধদেবীয় লোভ যা সাহিত্যচেষ্টা হিশেবে একটা ত্বকসর্বস্ব ব্যাপার—আমাদের সমকালীন সমালোচনাকে প্রভাবিত করেছে। তিরিশোত্তর অধিকাংশ সমালোচনা যে দায়িত্বহীন মন্তব্যে ঠাসা, তার মূলেও এই প্রবণতার দান আছে।

বুদ্ধদেব বসুর পর তরুণতর যাঁরা তাঁর পরে সমালোচনায় নেমেছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলা যাবে : 'এই সেই প্রতিভা, যাঁর চেষ্টা শ্রম সাফল্য বাংলা সমালোচনায় লোকোত্তর ফসল দিতে যাচ্ছে।' সাহিত্যের জন্যে সেই ভালোবাসা, শ্রম ও দায়িত্ব নিয়ে কোনো সপ্রতিভ হাত এখন পর্যন্ত দেখা গেল না। গত দুই দশকে, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যাঁরা সমালোচনায় হাত মক্‌শ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের খুব অল্পের চেষ্টার মধ্যেই সত্যিকার দায়িত্বশীলতা দেখা গেছে। সমালোচনার এসব চেষ্টাগুলো আকস্মিক, বিক্ষিপ্ত ও গভীর অর্থে উদ্দেশ্যহীন। আমাদের সময়কার অধিকাংশ সমালোচক প্রতিভা এখনো তিরিশের বহুলব্যবহারজীর্ণ সমালোচনা আদর্শের অক্ষম অনুকরণে অবসিত। নিষ্ঠাবান সমালোচকের হাত, গত দুই দশকে, সাহিত্যের সপ্রেম কর্তব্যবোধের তাড়নায় উদ্যোগী আগ্রহ দেখিয়েছে খুব অল্পই।

১৯৬৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুসাহিত্যের শিশুহীনতা

শিশুসাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে সচেতন পাঠকমাত্রেই যে-বিষয়টি অনুভব করবেন, তা হল যে, শিশুসাহিত্য প্রধানত শিশুদের জন্যে লেখা হয় না। আসলে এই সাহিত্য লেখা হয় বড়দের জন্যে ; শিশুরা সেসব প'ড়ে থাকে।

কথাটা হঠাৎ শুনলে স্ববিরোধী মনে হতে পারে। প্রকৌশল বা রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে যাঁরা বই লেখেন, তাঁরা লেখার সময় স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেন যে তাঁদের বইগুলো পাঠকেরা, অন্ততপক্ষে প্রকৌশলী বা রসায়নবিদেরা বুঝতে পারবেন। কিন্তু শিশুসাহিত্যের বেলায় ব্যাপারটা উল্টো। এই বিষয়ে রচিত সাহিত্যের গভীর বিষয়টা শিশুরা যে কোনোদিন বুঝতে পারবে না, এ-কথা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে ধরে নিয়েই শিশুসাহিত্যের লেখককে লিখতে বসতে হয়।

অবশ্যি শিশুসাহিত্যের লেখকদের এই অন্যায় বা অযৌক্তিক (?) মনোভাব যে একেবারে কারণহীন, তা নয়। তাঁরা-যে শিশুদের বোঝার জন্যে সাহিত্য রচনা করেন না তার কারণ, বোঝার বিষয়টাই শিশুদের বিষয় নয়। প্রকৌশল বা রসায়নশাস্ত্র তো সুদূর, শিশুদের বিষয়ও শিশুরা বোঝে না। আমার ধারণা, শিশুসাহিত্য যদি শিশুদের বোঝার জন্যে লেখা হত, তবে কোনো শিশু এই সাহিত্যের পাঠক হত কিনা সন্দেহ।

শিশুসাহিত্য শিশুদের বোঝার জন্য লেখা হয় না, লেখা হয় শিশুদের আনন্দের জন্যে! 'শিশুসাহিত্য বড়দের জন্য লেখা হয়'—এ কথাটার অর্থ হল, এই সাহিত্যের বোঝার বিষয়টুকু লেখা হয় বড়দের জন্যে। অর্থাৎ এই সাহিত্যের গভীর বক্তব্যটুকু, ব্যক্ত নিবিড় অনুভবটুকু, শোক পিপাসা ও বিয়োগের লোকশ্রুত যন্ত্রণাটুকু শুধু লেখা হয় বড়দের জন্যে। শিশুরা এর বাইরের রঙচঙে রঙিন জামাটুকু হাতে পেয়েই খুশি, এই সাহিত্যের রূপের অলীক জগৎটুকুতে হাঁটতে পেয়েই খুশি, তাদের স্বপ্নের অপরূপ বিস্ময়কর পৃথিবীটুকুকে পেয়ে, কমনীয়তার অনন্য সোনালি মূর্ছনাটুকুকে পেয়েই খুশি। নইলে—

মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশু–কবিতা হয় কী করে? এর ভেতরকার গভীর ব্যাপ্ত দার্শনিকতাটুকু শিশুর দুর্বল ও অপরিণত পরিপাক–ক্ষমতায় গৃহীত হওয়া কি সম্ভব? এই পঙক্তি তিনটির সেটুকুই শুধু শিশুদের যেটুকু সেই রঙিন জামার অংশ—এর অন্তর্গত বক্তব্যটুকুকে বাদ দিয়ে যে–অংশটুকু শুধুমাত্র সঙ্গীতের, মূর্ছনার—যে মূর্ছনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে একসময় গানের অনিন্দ্য জোছনার সমুদ্রকে খুঁজে পায় মধুমতির মোহনায়।

শিশুদের জীবন শিশুসাহিত্যের প্রধান উপস্থাপনার বিষয় নয় বলে শিশুসাহিত্যে শিশুদের সংখ্যাও স্বাভাবিকভাবেই কম। লক্ষ করলে দেখা যাবে, শিশুসাহিত্যে যাদের বড় করে আঁকা হয় তারা প্রায় সবাই বড়সড় মানুষ। লম্বা জোব্বা–পরা তাদের বাবা মামার বয়সী—নিদেনপক্ষে বড় ভাইবোনদের। যাদের জীবনের স্বপ্ন, ক্ষোভ, উদ্যম ও বিফলতার ছোট ছোট অজস্র রঙিন ইঁট দিয়ে রচিত হয় শিশুসাহিত্যের স্বপ্নিল বিচিত্র ঘরবাড়ি—তারাও বড় মানুষই, শিশু নয়। শিশুসাহিত্যের সবকিছুই বড়দের—শুধু চোখদুটো শিশুর।

আসলে শিশুসাহিত্য একটা সজীব নীল অপার অপূর্ব আকাশের মতো। লেখকেরা সেই পৃথিবীর কার্নিশে কার্নিশে, মাঠে, ফুটপাথে, পার্কে, টিনের চালায়, সর্বত্র হৃদয়ের অপার অজস্র বর্ণিলতার অবিশ্বাস্য কারুকাজ ছড়িয়ে দেন জাদুকরের মতো। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে শিশুরা অবাক সেই পৃথিবী–জোড়া হয়ে রঙের হত্যাকাণ্ড দুচোখ ভরে দেখে। তারপর, অনেকটা নিজেদের অজান্তেই সৌন্দর্যের সেই অনুপম পাত্রের মধ্যে তাদের অলীক ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে শুষে নেয় অন্তহীন সে বর্ণিলতার চিন্ময় জগৎ। তারপর, সবটুকু প্রিয় রঙ চুরি করা হয়ে গেলে, শিশুরা যে–যার মতো ঘরে ফিরে যায়। বড়দের জন্যে ফেলে রেখে যায় রচনার 'দরকারি' বক্তব্যটুকু। বড়রা সেই পরিত্যক্ত অংশটুকুকে তাদের হারানো শৈশব থেকে চেয়ে আনা অপরূপতার সাথে মিশিয়ে, জ্যাম মাখানো রুটির মতো স্বাদু করে তুলতে চেষ্টা করে।

২

শিশুসাহিত্যে যে বড়দের চেয়ে শিশুদের পদপাত কম, তার কারণও শিশুরা। শিশুরাই শিশুদের কথা শুনতে চায় না। 'শিশু' তাদের কাছে এক পৃথিবী–জোড়া অসহায়তার প্রতীক। তারা যে শিশু, ভালো করে হাঁটতে পারে না, অশুদ্ধ বাংলা বলে, প্রতিদিন বড়দের লাঞ্ছনা–গঞ্জনায় উৎপীড়িত হয়—এসব কঠিন ও বেদনাদায়ক সত্যগুলো শুনতে তাদের খুব আপত্তি। একজন শিশু যে নেহাতই শিশু, এ–কথা তাকে বোঝাতে গেলে সে যতখানি বিরক্তি ও হতাশা অনুভব করে, আর কোনোকিছুতেই সে তা করে না। ফলে যে–সাহিত্যে শিশুকে নেহাতই শিশু হিশেবে আঁকবার চেষ্টা করা হয়, তার করুণ অসহায়ত্বকে বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, তেপান্তরের মাঠে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে সমর্থ বিজয়ীর বেশে চিত্রিত করা হয় না, বরং বড়দের অন্যায় শাসনের নিচে তার করুণ ও অপমানিত জীবনের বাস্তব ও লাঞ্ছনাপূর্ণ ছবিতে ভরে রাখা হয়—শিশু সে–সাহিত্যে কখনোই খুব একটা উৎসাহ পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা শিশুর মনের প্রবলতম কামনা বড় হতে চাওয়া। সেই চেহারাতেই সে নিজেকে কল্পনা করতে ভালোবাসে, আজ যা সে নেই, কিন্তু যা সে একদিন হবে। কিন্তু খুশিমতো যেহেতু হঠাৎ করে বড় হওয়া যায় না, তাই সে সবকিছুতে বড়দের নকল করে বেড়ায়। লুকিয়ে বড়দের চটি পরে নিজেকে রূপকথার আতিকায় রাজা-বাদশাদের মতো ভাবতে ভালোবাসে, সেলুনে গিয়ে বড়দের মতো চুল ছাঁটতে চায় এবং কবে তার চোয়ালে চিবুকে বড়দের মতো গোঁফদাড়ি উঠে তাকে দশজনের মধ্যে কেউকেটায় পরিণত করবে সেই দুর্লভ ও ইপ্সিত দিনটির আশায় করুণ সময় যাপন করে। সেজন্যে সেই সাহিত্য পড়তেই আনন্দ তার বেশি যেখানে তাকে আঁকা হয় বড়দের মতো করে, সপারগ সপ্রতিভ মানুষ হিশেবে, বড়দের মতো অনেক অসম্ভব ও বিস্ময়োজ্জ্বল অভিযানের দিগ্বিজয়ী নায়ক হিশেবে—যেখানে দাঁতহীন মুখের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের জন্যে তাকে প্রতিনিয়ত উপহাস্য হতে হয় না, ঘরে বাইরে মাস্টারের উৎসাহী হাত কারণে-অকারণে তার নিরাপরাধ দুই কানের দিকে অন্যায়ভাবে এগিয়ে আসে না, যেখানে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরার দুর্লংঘ্য আদেশ মাথার ওপর মৃত্যুদণ্ডের মতো ঝুলে থেকে তার বৈকালিক আনন্দকে প্রতি সন্ধ্যায় নির্দয়ভাবে হত্যা করে না। সেখানে সে নিজেকে দেখতে চায় এইসব নির্ধারিত অত্যাচারের বাইরে কোনো খোলা জায়গায়—মুক্ত স্বাধীন একজন সমর্থ মানুষের ভূমিকায়—যেখানে এইসব সার্বক্ষণিক উপেক্ষা, অবহেলা, অপমান নির্মম আঘাতে তাকে মাটির সঙ্গে নুইয়ে দিতে ব্যর্থ; যেখানে পৈতৃক দারিদ্র্য ও অপমানের চাপে ক্লিষ্ট ছেঁড়া জামা-পরা নিচের ক্লাশের অথর্ব অপদার্থ ছেলেটি সে নয়; যেখানে সে রাজার ছেলে—রাজপুত্র—যেখানে তার বিদেশ যাত্রার আয়োজনে সমস্ত রাজ্যে শোরগোল ওঠে, সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজে, ঘাটে দুঃখিনী মায়ের সঙ্গে অগণিত পুরনারী তাকে অশ্রুজলে বিদায় দেয়; যেখানে অপরিচিত ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী তাকে রাজপুত্র বলে চিনতে পেরে পিঠে বয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে দিয়ে আসে; যেখানে পঙ্খীরাজ ঘোড়ার পিঠে চেপে সে (যে এ যাবৎ একটিবারের জন্যেও ঘোড়ার পিঠে চড়বার সুযোগ পায়নি) অনায়াসে কড়ির পাহাড় শঙ্খের পাহাড় পেরিয়ে যায় এবং তারপর একদিন ঘুমন্ত নির্জন রাজপুরীতে পৌঁছে দামি খাটে গা এলিয়ে শুয়ে থাকা তার চিরকালের রাজকন্যাকে সোনার কাঠির আশ্চর্য জাদুতে জীবনের কোলাহলে ফিরিয়ে আনে। এখানে শিশু যে-রাজপুত্রকে দেখতে চায় তার গল্পের পৃষ্ঠায় সে তার মতো অসহায় কোনো শিশু নয় ; সে বড় মানুষ—সাহসে, শক্তিতে, সম্ভাবনায় উজ্জীবিত ও সম্পন্ন। সেখানে রাজপুত্রের চেহারা তার মতো অল্পবয়সী হলেও ক্ষতি নেই, বরং ভালোই। কিন্তু তার আচার-আচরণ, কার্যকলাপ ও সাফল্য বড়দের মতো হওয়া চাই। দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষদের অঘটনঘটন প্রতিভার উচ্ছ্বত সম্ভাবনা থাকা চাই তার রক্তে।

শিশু তার জীবনব্যাপী অসহায়তার ও উপেক্ষার প্রতিকার দেখতে চায় তার সাহিত্যে—তার জীবনব্যাপী অনাদর ও উপেক্ষার লোকশ্রুত প্রতিশোধ খোঁজে। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নায়ককে হতে হয় বিজয়ী বীরপুরুষ, শক্তি ও সাহসে সোচ্চার, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য গৌরবের প্রতীক। যে জীবনে সে বাস করছে, সে জীবনকে নয়, যে মানুষ হবার সে স্বপ্ন দেখছে প্রতিমুহূর্তে, তাকেই চিত্রিত দেখার আকাঙ্ক্ষায় সে ঝুঁকে পড়ে তার সাহিত্যের পাতায়। ফলে তার গল্পের অগণিত ঘটনার ভিড়ের ভেতর যে সপ্রতিভ নায়কটিকে আমরা অসীম দুঃসাহসে হেঁটে বেড়াতে দেখি সে শিশু নয়—শিশুর স্বপ্ন। শক্তিতে, গৌরবে, সপ্রতিভতায় ও অবিশ্বাস্য কার্যকলাপে সে শিশুর বিপরীত—তারই সব অত্যাচারী বয়সী প্রতিপক্ষ। ফলে শিশুদের গল্পের পাতায় অপরিচিত অগণ্য মুখের ভিড়ের ভেতর শিশুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্বাসিত—শিশু থেকে যায় গল্পের বাইরে, নিঃশব্দে, পাঠক হয়ে শ্রোতা হয়ে। শিশুর আকাঙ্ক্ষিত জগতের গল্প যাদের পদশব্দে সচকিত হয়ে এগিয়ে চলে; যাদের বিচিত্র কার্যকলাপে, কীর্তিতে, বীরত্বে, সংকল্পে, অভিযানে শিশুসাহিত্যের পৃষ্ঠা মুখর হয়ে আছে; তারা সবাই বড় মানুষ। এইজন্যে শিশুসাহিত্যের অপরিণত শিশুতোষ পৃষ্ঠায় বড়রাও তাদের জীবনের আপনজনকে খুঁজে পায়—এসব গল্পের জনাকীর্ণ অলীক ভিড়ের মধ্যে নিজেদেরই হেঁটে বেড়াতে দেখে। এ কারণেই অন্যান্য সব সাহিত্যের মত শিশুসাহিত্যও বড়দের সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে, একই সঙ্গে, এইসব সাহিত্যের অন্তর্গত চরিত্রের খাপছাড়া, অদ্ভুত, উদ্ভট খেয়ালিপনা, কল্পনার মণিমাণিক-চমকানো রঙিন অপরূপ জগৎ, সাতভাই চম্পার ঈপ্সিত দেশ, সত্যালাপী শুকপাখি, স্বপ্ন ও বাস্তবের অলৌকিক আলোছায়া শিশুর কল্পনাকে এক মুহূর্তে সাত সমুদ্র তেরো-নদী পার করিয়ে রূপসী দিগন্তের সোনালি সম্ভাবনায় মুক্তি দেয়। আর শিশু—নিজের অজান্তেই যেন গৃহীত হয়ে যায় সেই রূপময়, স্বপ্নময়, আলোময় পৃথিবীর বিস্ময়বহুল নির্জনতার ছায়ায় ছায়ায়—আত্মবিস্মৃত, সে হেঁটে বেড়াতে শুরু করে এইসব গল্পের আজব উদ্ভট লোমহর্ষক অবাস্তবের রাস্তা ধরে। শিশুর অপার কৌতূহল ও ঔৎসুক্য আমাদের চিরচেনা রাজবাড়ির নিবিড় বাগানে সাতভাই চম্পা হয়ে গান গায়।

১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তা মুনীর চৌধুরী

যে তিনটি বিশিষ্ট গুণের জন্য তরুণ মুনীর চৌধুরী তাঁর সমকালীন সহযাত্রীদের চোখে 'অসাধারণ' হিশেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তা হল : ১. সমকালীন সমাজের পক্ষে অসামান্যরকমে অগ্রসর তাঁর বামপন্থী চিন্তাধারা ; ২. নাট্যকার হিশেবে তাঁর উজ্জ্বল সাফল্য ; ও ৩. তাঁর অসামান্য বক্তৃতা প্রতিভা।

অবশ্য বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে, জীবনের প্রথম পর্বে, স্বল্পকালের জন্য হলেও, তিনি তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তাধারা ও বিস্ময়কর কার্যকলাপের যে অমিত দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, তাকে আমি তাঁর সুস্থির জীবন-বিশ্বাসের ফল না বলে বরং অনুপ্রাণিত ও অপরিণত তারুণ্যের সাময়িক উচ্ছ্বাসই বলব। এর প্রমাণ, অতি অল্পকালের মধ্যেই শক্তি ও বিশ্বাসের উচ্চতম সেই শীর্ষ থেকে তাঁর দুঃখজনক স্খলন। হয়তো নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও দুরতিক্রম্য বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঐ উদ্দাম, উত্তেজনাপূর্ণ ও জনকোলাহল মুখরিত কঠিন সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিতৃপ্তি-প্রত্যাশী গৃহমুখী অন্তর-প্রকৃতির বিরোধের কারণেই অমনটা হয়েছিল।

কিন্তু নাট্যপ্রতিভা ও বক্তৃতাক্ষমতা সম্পূর্ণভাবেই লি তাঁর নিজের জিনিশ। এ দুটি ব্যাপারে তাঁর জীবনময় আগ্রহ ও উদ্দীপনায় কোনোদিন ক্ষান্তি দেখা যায়নি। যৌবনের প্রথম পর্ব পেরোবার পর এ দুটি বিষয়েই তিনি নিজেকে প্রধানভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে নাটক রচনা ছাড়াও, বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাবার ব্যাপারে তিনি ক্ষান্তিহীন ছিলেন।

নাট্যকার হিশেবে প্রথমজীবনে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দেখিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সে প্রতিশ্রুতি কতখানি সফলতাকে স্পর্শ করেছে তা বলা দুরূহ; কিন্তু তাঁর বক্তৃতাপ্রতিভা আজীবন ছিল সমানভাবে উজ্জ্বল সাবলীল এবং প্রতিভা ও স্বতঃস্ফূর্ততায় দীপ্তিমান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বক্তৃতাপ্রতিভা শব্দপ্রয়োগের কুশলী চাতুর্যে বক্তব্যের নিটোল ও বাহুল্যহীন ভারসাম্যময়তায়, প্রাণবন্ততায়, ব্যাপ্তিতে ও সম্পন্নতায় ক্রমশ হার্দ্য ও প্রসাদমধুর হয়ে উঠেছিল। আমার তো মনে হয়, যদি কোনো একটিমাত্র ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী তাঁর সামগ্রিক অন্তর্সত্তাকে সবচেয়ে অবলীলায়, সবচেয়ে আনন্দময়তায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিতৃপ্তিতে ও পূর্ণায়তভাবে উৎসারিত করে থাকেন তবে তা তিনি করেছিলেন তাঁর বক্তৃতায়। বক্তৃতাপ্রতিভার সচ্ছল সাফল্যের তৃপ্তিতে মুনীর চৌধুরী যেন তাঁর জীবনব্যাপী বেদনাময় ও আত্মঘাতী স্ববিরোধের স্বস্তি ও নির্বাপণ খুঁজেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী আমাদের একালের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সবচেয়ে প্রতিভাবান বক্তা। কেবল মুনীর চৌধুরী নন, আরো বেশকিছু উল্লেখযোগ্য বক্তা কালের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে সভা–সমিতির মাধ্যমে আপামর শ্রোতা–সাধারণকে নিজেদের চিন্তার ফসল উপহার দিয়েছেন। আমাদের দেশের গত পঁচিশ বছর, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মতো, অংশত ছিল বক্তৃতার যুগ। আমাদের ইতিহাসে এটা এমন একটা সময় যখন অসংখ্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের জনগণ একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি হিশেবে বেঁচে থাকার আত্যন্তিক দরকার সম্বন্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরই ফলে স্বজাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অভূতপূর্ব ঔৎসুক্য ও কৌতূহল। তারা স্বদেশের যুগ–যুগান্তরের ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সামগ্রিক পরিচয় পাবার আশায় জড়ো হয় এদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের চারপাশে। তাঁদের কাছে থেকে তারা এসবের স্বচ্ছ পরিচয় জানতে চায়। প্রার্থনা করে বিভ্রান্ত সাংস্কৃতিক আবর্ত থেকে নিষ্ক্রমণের আকাঙ্ক্ষিত আলো, উজ্জ্বল উত্তরণের সঠিক পথ ও কর্তব্য। এর ফলে, বাংলাদেশের জন্মলগ্নের ঠিক পূর্বমুহূর্তে, এক মহান ও অভাবিত জাতীয় প্রয়োজন এদেশের সংস্কৃতিসেবীদের কাঁধে অর্পণ করে এক কঠিন ও অপরিসীম দায়িত্ব। সাধারণ, অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের সামনে দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে হয় তাঁদের এবং তা করতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই, তাঁদেরকে লেখার মতোই নির্ভর করতে হয়েছিল মৌখিক বক্তৃতার ওপর। বছরের পর বছর ধরে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত অসংখ্য অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভার মাধ্যমে তাঁরা দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁদের চিন্তাধারাকে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

দেশের এই সার্বিক পিপাসার যুগে যাঁরা জনসাধারণের সামনে বক্তৃতার মাধ্যমে এদেশের নৃতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরবার ভার নিয়েছিলেন, মুনীর চৌধুরী ছিলেন তাঁদের প্রথম সারিতে। অন্যান্য অনেকের মতো এ ব্যাপারটাকে একটা পালনীয় সামাজিক কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। কোনো সভায় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার জন্যে আমন্ত্রিত হলে তিনি প্রায় কখনোই তাতে অসম্মত হতেন না। হয়তো এসব সাংস্কৃতিক ব্যাপারে নিজের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কথা নিমগ্নভাবে অনুভব করতেন বলেই এসবকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত। হয়তো ঐসব সভার অনুপ্রাণিত উদ্যোক্তাদের সপ্রাণ উৎসাহকে প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাতে নিষ্প্রভ ও মলিন করে দিতে তাঁর সহজাত সংবেদনশীলতা পীড়িত হত। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসব সভা–সমিতির মধ্যে নিজেকে প্রায় পুরোপুরি সমর্পণ করে দিয়েছিলেন তিনি। এই 'ভাষণ'–প্রীতি তাঁকে এতদূর অধিকার করেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তিনি তাঁর প্রথম সন্তানের নামকরণও করেছিলেন ঐ অতিপ্রিয় শব্দটি দিয়েই। হয়তো তাঁর অসাধারণ বক্তৃতাপ্রতিভা ও ভাষণ দেবার অপরিসীম আনন্দই, দুর্জ্ঞেয় নিয়তির মতো, তাঁর অজান্তে, তাঁকে সভা-অনুষ্ঠানের অভিনন্দন-মুখর জগৎ থেকে জগতে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে।

মুনীর চৌধুরীর মার্জিত, পরিশীলিত বাচনভঙ্গি, তাঁর সচেতন কুশলী ও অনিন্দ্য শব্দব্যবহারের ক্ষমতা, আপোষহীন অভিজাত রুচি, শাণিত বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয়তা, অসাধারণ পরিমিতিবোধ ও প্রাণবান সাবলীলতা তাঁর বক্তৃতাকে আমাদের কালের শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য ও অনন্য করে তুলেছিল। সাধারণ শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতায় চমৎকৃত, অভিভূত ও প্রশংসামুখর হয়েছে এবং অসাধারণত্বের স্পর্শ অনুভব করেছে। তাঁর বক্তৃতার আশ্চর্য ভারসাম্যময়তা তাঁর পক্ষের বিপক্ষের সবার কাছেই স্বস্তিস্বরূপ মনে হয়েছে—কোথাও তীব্র কটু বা রুক্ষ হতেন না তিনি। সভা-সমিতিতে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যেকার তীব্র বিরোধ তাঁর অনুকম্পামধুর এবং সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়স্পর্শে নির্বিরোধ এবং সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পেত। তাঁর এই সহৃদয়তা এমন উদার ও সর্বব্যাপ্ত ছিল যে যাঁরা বক্তৃতায় তাঁর তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হতেন তাঁরাও তাঁর এই প্রসন্ন সহানুভূতির নিবিড় স্পর্শটিকে অনুভব না করে পারতেন না।

তাঁর বক্তৃতা করবার ঢং ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বলিষ্ঠ ও পৌরুষাশ্রিত, যদিও তা নিখুঁত ছিল না—কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মাধুর্যের অভাব ছিল। শুনেছি মুনীর চৌধুরী তাঁর এই প্রকৃতিগত ত্রুটিটির ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বহুবার তাঁকে এ ব্যাপারে আক্ষেপ করতেও শোনা গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যখন তিনি তাঁর শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব নিয়ে মঞ্চের ওপর দাঁড়াতেন তখন তাঁর বক্তৃতার ঈর্ষাজনক নাটকীয়তা, বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রবল ও হৃদয়বান একাত্মতা, অনন্য বাচনভঙ্গি, শাণিত ও সংগীতময় শব্দচয়ন, দীপ্ত ভাষাকৌশল ও বৈদ্যুতিক সপ্রতিভতা তাঁর কণ্ঠস্বরের অক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দিয়ে যেত। তাঁর বক্তৃতা সবাইকে অভিভূত করত, কিন্তু কেন বা কোন্ গুণে তা হৃদয়কে আক্রান্ত করছে, তার বিশ্লেষণ ছিল প্রায় দুরূহ। আমার মনে হয়, এ থেকেও তাঁর বক্তৃতাশক্তির অপরিমেয়তার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। তাঁর বক্তৃতাকে একদিক থেকে মনে হত সহজ এবং কাছের—যেন সাধারণ প্রয়াসের ফলশ্রুতিতেই পাওয়া যেতে পারে সেই অনন্য প্রতিভার গোপন চাবিকাঠি। কিন্তু প্রকৃত অনুধাবনেই প্রমাণিত হত, কী দুরূহ সে সাধনা, কী দুর্লভ—অপ্রাপনীয় সুদূর কোনো গাছের সুউচ্চ শাখার অবিশ্বাস্য ফুল যেন তা।

অগেই বলেছি, তাঁর বক্তৃতার ঢং ছিল স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। সবার থেকে তা এত বেশিরকম আলাদা ও মৌলিক ছিল যে আমাদের সময়ে তাঁকে অনুকরণের সাহস কারো হয়নি। দুয়েকজন প্রতিভাহীন ব্যক্তি তাঁকে বিভিন্ন সময়ে অনুকরণ করতে গিয়ে অযথা হাস্যকর হয়েছেন। মুনীর চৌধুরীর এই শক্তিমান বাচনক্ষমতা তাঁর জীবনের বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিককে শস্যময় করে তুলেছিল। তাঁর দৈনন্দিন কথোপকথন হয়ে উঠেছিল শাণিত, পরিশীলিত ও সহৃদয়—অন্তরঙ্গ শ্রোতাদের কাছে অফুরন্ত আনন্দের উৎস। অধ্যাপক হিশেবে তাঁর বিপুল খ্যাতির পেছনেও ছিল এই অসামান্য বক্তৃতাপ্রতিভা। মুনীর চৌধুরী ইংরেজি বক্তৃতায় উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ইংরেজি বক্তৃতা বাংলা বক্তৃতার মতোই সাবলীল ও উচ্চমানের ছিল। আজ মুনীর চৌধুরী জীবিত থাকলে, কল্পনা করতে পারি, যাঁদের সুযোগ্য প্রতিনিধিত্বে আমাদের দেশ ও জাতি বিদেশের কাছে গর্বিত পরিচয়ে উপস্থাপিত হতে পারত, নিঃসন্দেহে মুনীর চৌধুরী হতেন তাঁদের অন্যতম।

ভলতেয়ারের মতো একজন দীপ্র, উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর বাচনক্ষমতার অধিকারী মানুষও, জীবনের প্রাথমিক সূচনাতেই অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মৌখিক প্রতিভার সাফল্য তাঁকে মানবসমাজে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না—অমরত্ব পেতে হলে তাঁকে যথাসম্ভব উন্নতমানের কিছু লিখে রেখে যেতে হবে—কেননা, 'লিখিত উক্তিই বেঁচে থাকে, মুখের কথা হারিয়ে যায়।' ইতিহাস তো এমন অসংখ্য সাক্ষ্য দেবে যে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক প্রতিভাধর বক্তা তাঁদের অসামান্য বাকপ্রতিভায় সমকালকে উদীপ্ত ও আলোড়িত করে ও অনেক সময় ইতিহাসের প্রবহমান ধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেও আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেছেন। মৌখিক প্রতিভার অধিকারীদের জন্যে এইটেই হয়তো অলংঘনীয় ও বেদনাময় বিধিলিপি। কেবল মৌখিক প্রতিভা কেন—অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী, ক্রীড়াপ্রতিভাদের জন্যেও তো ঐ বেদনাময় ও দুর্লংঘ্য ভবিতব্য অনিবার্য!

দুর্ভাগ্যবশত মুনীর চৌধুরীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ঘটেছিল এমন এক ক্ষেত্রে যার বিস্মৃতি মানবসমাজে অবধারিত—উত্তরকালের উদগ্রীব হাতে যে সাফল্যের প্রোজ্জ্বলতম নিদর্শনকেও পৌঁছে দেবার পথ আজও কারো জানা নেই। শ্বাসরোধকারী মধ্যযুগীয় অচলায়তন থেকে আমাদের সমাজকে আধুনিক চৈতন্যের হিরণ-সোপানে উত্তরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তার অবদান কতখানি, তার মূল্যায়নের ভার আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের। বিকাশের প্রথমযুগে তাঁর নাট্যপ্রতিভা যে সবল প্রতিশ্রুতিতে ঝিকিয়ে উঠেছিল, পরবর্তী জীবনের ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রায় তা কতখানি শিখর ছুঁয়েছে তা এখনো অনির্ধারিত। সমালোচক মুনীর চৌধুরী বেশ কিছুকাল স্মরণীয় থাকবেন, কিন্তু খুব দীর্ঘ সময়কে তিনি আক্রান্ত করে রাখতে পারেবেন কিনা তা-ও নিঃসংশয় নয়; কিন্তু যে-বিষয়ে তাঁর প্রতিভা শক্তির পরিপূর্ণতম রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিল—সাহিত্য, শিল্প বা সংগীতের ক্ষেত্রে যে প্রতিভার সমকক্ষেরা দীর্ঘদিন মানবসমাজে জীবিত থাকেন—সেই অসাধারণ বক্তৃতাপ্রতিভা, তাঁর বিস্মিত মুগ্ধ ও প্রশংসামুখর অগণিত শ্রোতৃবৃন্দের সাথে একদিন নিঃশব্দে বাংলাদেশের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে—এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে! তাঁর সেই অনবদ্য বক্তৃতাবলি—সেই সাবলীল প্রাণবন্ত বাচনভঙ্গি, সেই মার্জিত পরিশীলিত শব্দচয়ন, সূক্ষ্ম, সুস্মিত কৌতুকরসধারা, সেই প্রোজ্জ্বল বিস্ময়কর সাফল্য যা তাঁর শ্রোতাদের প্রীত, পুলকিত ও আলোকিত করেছে দীর্ঘদিন—যদি সেসবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত বিশটিকেও কোনোমতে সংরক্ষণ করা যেত, তবে, আমার বিশ্বাস, আমাদের উত্তরকাল মুনীর চৌধুরীকে এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে উপলব্ধি করত।

১৯৬৯ সালের জুন মাসে, মাসিক 'কণ্ঠস্বরের' চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুনীর চৌধুরী সভাপতির ভাষণ দেন। ভাষণটি প্রথমে টেপ করে ও পরে টেপ থেকে হুবহু, প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায়, 'কণ্ঠস্বরের' পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। প্রস্তুতিহীন মৌখিক বক্তৃতাতেও যে মুনীর চৌধুরী কী পরিমাণ সপ্রতিভ, সাবলীল, পরিশীলিত ও সুশৃঙ্খল ছিলেন তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ, এযাবৎ প্রাপ্ত তাঁর মৌখিক ভাষণের একমাত্র নিদর্শন এই বক্তৃতাটিকে এখানে সংযোজন করা হল :

"কণ্ঠস্বর গোষ্ঠীর বলবান প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উৎপীড়নের শিকার হয়ে আমি এই সভার সভাপতিত্ব করতে তিন ঘণ্টার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কুক্ষণে রাজি হয়েছিলাম, কারণ আমরা জানা উচিত ছিল যে, 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর স্বভাবের মধ্যে শ্রদ্ধা অন্যতম প্রশংসার বিষয় নয়। এবং তাদের বহু রচনায় আমি পড়েছি যে অধ্যাপকবর্গই তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা অশ্রদ্ধেয়। তবু মনে মনে শুধু এইটুকু সাহস ছিল যে যেহেতু এই বয়সের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই আমার ছাত্র সুতরাং এ সভায় তাদের সাহচর্য কয়েকঘণ্টা সহ্য করা দুঃসহ না-ও হতে পারে।

আমি বিস্তৃততর প্রচার মাধ্যমে এ-কথা অনেকবার বলেছি যে আমি আশেপাশের লেখকদের পাঠ্য অপাঠ্য অসংখ্য লেখা অনবরত পাঠ করে থাকি। বিশেষ করে 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর লেখা আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। পড়েছি এবং একটা কথা ভালোভাবে অনুধাবন করেছি যে, আমাদের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে নানারকম স্তরের উদ্ভব হচ্ছে, বিলয় হচ্ছে, তার একটা স্পষ্ট সন্ধিসূত্র এদের পরিচয়ের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা অর্থাৎ আমাদের বয়সী লোকেরা একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হবার পর অনেককাল ধরে আধিপত্য করে এসেছি এখানকার সম্ভাবনাশীল সাহিত্যের ওপর। এই তরুণদের মধ্যে একজন একবার আমাকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আঘাত করে জানিয়ে দিয়েছিল যে আমার সমগ্র সাংস্কৃতিক চিন্তার মধ্যে একটা মস্তবড় গলদ না হলেও একটা পরস্পরবিরোধিতা আছে। তার মতে, আমরা বাংলাদেশের এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আমাদের মানস গঠন করেছিলাম, যার সঙ্গে এখনকার পরিবেশের একটা মূলগত অমিল রয়েছে। মুসলমান সাহিত্যানুরাগী হিশেবে ও একজন মানুষ হিশেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিপীড়ন আমাকে সবসময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ক্ষুব্ধ ও সচকিত রাখত। ফলে আমার যাবতীয় সংস্কৃতিচিন্তার পেছনে সেই উৎপীড়নকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমার মনের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব কার্যকর ছিল। আমি বহুকাল পরেও সে অভ্যাসটাকে বর্জন করতে পারিনি। আমি যখনি আমার সাংস্কৃতিক চিন্তাকে স্পষ্টতা দান করি, সেই বিরুদ্ধচিন্তা, সেই নেতিবাচক চিন্তা আমাকে অধিকার করে।

'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর এই প্রতিনিধি তার স্বভাবী দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য নিয়ে আমাকে বলেছে, 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীকে গালাগালি করায় কোনো অসুবিধা নেই। নিজেরাই তাদেরকে এত নির্বিচারে গালাগালি করে যে, এ ব্যাপারে সত্যিসত্যিই সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। সেই যুবক আমাকে বলেছে যে, আপনি বরাবর মনে করেছেন, আপনার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তা বা তার অনুপ্রবেশের দ্বারা বিঘ্নিত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। কিন্তু আমি জন্মের পর সে সম্প্রদায়ের কোনো লোককে আমার সামনে অত্যাচারীরূপে দেখতে পাইনি। আমি জন্মাবধি আমার স্ব-সম্প্রদায়ের বয়স্ক লোকদেরকেই আমার গলা টিপে ধরে রাখতে দেখেছি। দেখেছি, তারা আমাকে কথা বলতে দিতে চায় না। আমি তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই। আমার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই ঐ ক্ষমতাবান সম্প্রদায়ের বয়স্ক, বর্দ্ধিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু, প্রাণহীন শক্তির বিরুদ্ধে।

'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর লেখকরা সব জায়গায় হয়তো রচনার পরিপাট্যে প্রবীণদের সেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, হয়তো চিন্তায় সেই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আনতে পারেনি, হয়তো পরিপূর্ণ জীবনদর্শনের ঐক্য ও সঙ্গতি খুঁজে পায়নি যা সাহিত্যের বৃক্ষকে ফলবান করতে পারে; কিন্তু তাই বলে তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নয় যে এইসব প্রবীণরাই, বয়স্করাই, ক্ষমতাবানরাই, প্রতারকরাই এ সমাজে মান্য এবং শ্রদ্ধেয়। এরা এ বেড়া ভাঙতে চেয়েছে ; এই অবাঞ্ছিত শক্তিকে তছনছ করে দিতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে যতটা তাদের ক্ষমতার মধ্যে ছিল, তার অতিরিক্তও হয়তো তারা করেছে। এর মধ্যে প্রশংসার দিকটি এই যে, যা ধ্বংস করা উচিত তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব এরা গ্রহণ করেছিল। হয়তো যেভাবে ধ্বংস করতে পারলে তা সত্যকার অর্থে কার্যকর হতে পারত এবং পরবর্তী সাহিত্যচেষ্টার সৎ, সফল সুস্থ এবং মূল্যবান ভিত্তি হতে পারত; সেটাকে পুরোপুরি খুঁজে পায়নি। কিন্তু অনুসন্ধানের সততায় ও আক্রমণের অমোঘ লক্ষ্যে এরা নির্ভুল ছিল বলে আমি এদের সর্বান্তকরণে অভিনন্দন জানাই।

'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর অস্তিত্বের মূল্য সম্বন্ধে এরা নিজেরাই প্রশ্ন তুলেছে এবং প্রশ্নের ভিত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে মহাদেব সাহা তার প্রবন্ধে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে সেইসব অনিয়মতাচারী অবিনয়ী ও বিপর্যস্ত ভাবের—যেসব ভাবকে ভাষারূপ দেবার সৎ ঐকান্তিকতা তারা অনুভব করেছে। এই কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে একটা কথা বেশিও বলেছ। সে বলেছে : আমরা নাগরিক চেতনার এমন একটা জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, ব্যক্তিত্বের শতধাবিভক্ত এমন একটা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, যার ফলে সাজানো গোছানো সব কথায় কোনো জীবনসত্যকে আর প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এখন আর শালীন শোভন মার্জিত পরিশীলিত বাক্যে সব কথাকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, যে-কথা প্রকাশ করবার জন্যে সকলের অন্তরাত্মা ক্রন্দন করছে, তা অনেকাংশে যৌনতা আক্রান্ত, অনেকাংশে কুটিল, অনেকাংশে অশ্লীল, অনেকাংশে জটিল; অথচ সেইটাকে ধরার জন্যেই আমাকে চেষ্টা করতে হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে সন্দেহের স্থল যেটুকু, প্রবীণেরা তাকে বড় করে তুলবেনই।

প্রায় আতঙ্কিত হয়ে অনেক সময় ভাবি, আমি নিজেও যেন কিছুতেই আর এদের ধরতে পারছি না। তবু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর সাহিত্যে বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রধানতম দুর্বলতাগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমার বরাবর মনে হয়েছে, গ্রাম্যতা, কূপমণ্ডুকতা, আঞ্চলিকতা, অতিসরলতা—এসবই হচ্ছে আমাদের সাহিত্যের প্রধানতম দুর্বলতা। 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠী এসবের বিরুদ্ধে নাগরিকতা, বৈদগ্ধ্য, পরিশীলিত মানস ও সংস্কৃতিপরায়ণতার ছাপ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফেলতে চেষ্টা করেছে। এটা সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তবু একটা কথা সেইসঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক। 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর এই অতিনাগরিকতার মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেইতো?

আমার মনে আছে, কয়েক বছর আগে টোকিওর কোনো এক নাট্যসম্মেলনে আধুনিক নাটকের প্রধান পুরোহিত আয়ানেস্কোর নাটকের প্রশংসায় আমরা যখন পঞ্চমুখ, ঠিক সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় ইসরাইলের প্রতিনিধি মিস বাহাম উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মতের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা করলেন। একটা কথা খুব চমৎকার বলেছিলেন তিনি সেদিন। তিনি বলেছিলেন : শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত আত্মকেন্দ্রিকতার প্রখর ও একক সত্তার বক্তব্যের যে সাহিত্য, যা স্বভাবতই একটু জটিল, রহস্যময় ও প্রতীকী তা সর্বদেশে, সর্বসংস্কৃতিতে সবসময় গ্রাহ্য কিনা। আমরা জানি, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনে এই ধরনের সাহিত্য গ্রাহ্য করা হয় না। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যে সাহিত্যের স্পষ্ট সুস্থ জীবনবক্তব্য নেই, তা সাহিত্য হিশেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং যে চিত্রকলায় মানুষের স্বাভাবিক পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয় না, চিত্রকলা হিশেবে তা অগ্রহণযোগ্য।

অবশ্যি যেসব দেশ অন্যরকম অর্থে প্রাগ্রসরশীল তারাও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন যে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে আঙ্গিকচেতনা স্বাভাবিক, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতেও তা স্বাভাবিক কিনা। যারা শেক্সপিয়ার পার হয়ে এসেছে, শেলী-কীটস-বায়রন পার হয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন টি. এস. এলিয়ট বা একজন ডিলান টমাসের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। এ তার স্বাভাবিক শিল্পকলার ক্রমবিকাশের কোনো একটা বিশেষ স্তরের আবির্ভাব। প্রত্যেক সৎ শিল্পীই চেষ্টা করেন পূর্বতন প্রাচীন শিল্পরূপকে পরিত্যাগ করে নিজের বক্তব্যকে সংরাগময় করে তুলতে। প্রত্যেক কবিরও এই একই চেষ্টা। 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ-অস্থির চঞ্চল কবিরা প্রাণপ্রণে পুরোনোতর কবিদের বাক্য ও শব্দ গঠনের বিশিষ্ট রীতিকে অস্বীকার করেছে। উদাহরণ হিশেবে আবদুল মান্নান সৈয়দকে নেওয়া যায়। তীক্ষ্ণ এবং আলোকোজ্জ্বল অর্থে সে তীব্র না লিখে দীপ্র লেখে ; বিস্তৃতিকে বিস্তৃতি না বলে আতীতি বলে। আমাকে প্রায়ই ওর রচনা পড়ার জন্যে একাধিকবার অভিধান খুলতে হয়। সব সময় যে হতাশ হই তা নয়, মাঝে মাঝে চমৎকৃতও হই। আমি বুঝতে পারি, ওর অন্তরের যে যন্ত্রণা সে হচ্ছে যে, ও প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করছে যে—যারা ওর বিরুদ্ধচেতনার লোক, যাদের কোনো স্বপ্ন নেই, যারা শুধু পুরাতনের অনুকৃতিকারী, যারা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে চমকের আবরণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চায়—তাদের কোনো কথার সঙ্গে যেন ওর কথা না মেলে। এইটের জন্যেই ও প্রধানত ব্যতিব্যস্ত। এবং এজন্যেই ওরা সবসময় এইসব অতিব্যবহৃত শব্দ পরিত্যাগ করে স্বাদে, গন্ধে, আঘ্রাণে নতুন—এমনকিছু চেতনার সম্পদকে আবিষ্কার করতে চায়। এবং এইটে করার উদগ্র কামনা নিয়েই অভিধান হাতড়ে, ব্যাকরণের দুরূহতম নিয়মকে বাক্য গঠনের মধ্যে টেনে নিয়ে ওরা এমন চমৎকার বাক্য গঠন করছে যা আমার স্তিমিত চেতনাকে আঘাত করে নতুন অর্থ অনুসন্ধানের জন্যে আমাকে প্রলুব্ধ করে। আমি এইটের জন্যেই এদের প্রশংসা করি। ওদের এই প্রয়াস আমাকে একটু কষ্ট করায় বটে, আমাকে অপমানও করে বটে, আমার জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষও করে বটে, তা করুক। যদি এই প্রয়াস নিজে একটা সত্য উচ্চারণ করতে পারে এবং অপরকে সত্য উচ্চারণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তবে তা আগামী দিনের সাহিত্যের একটা সত্যিকার বুনিয়াদ গঠন করতে পারবে। ধন্যবাদ।"

১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘সন্ধ্যাসংগীতে’র রবীন্দ্রনাথ

‘সন্ধ্যাসংগীতে’র উজ্জ্বল অপরূপ জগতের রৌদ্রময় পথে যে করুণ নমনীয় কিশোরকে অকারণ উৎসাহে হেঁটে বেড়াতে দেখি নির্ঝরের পাশে, গোলাপ বকুলের হাতে হাত রেখে, যার কমনীয় শরীরের সোনালি সর্বস্বতা জড়িয়ে দোল খেয়ে চলেছে সুনীল আকাশের আনন্দরাশি; নাচিয়ে তুলছে স্নায়ু-ধমনীর সমবেত স্বরগ্রাম—সে আমাদের বহু পরিচিত, বহু কথিত, শ্রদ্ধেয় মহান রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকটাই আলাদা। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীতে’র কবিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও পুরোপুরি নিজের কবিসত্তার পুরোপুরি অংশ হিশেবে ভাবতে পারেন নি। যেন সে ঠিক রবীন্দ্রনাথ নয়, কিছুটা আলাদা ; রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অপারগ পূর্বসূরী ; অসহায়, করুণ ও প্রাথমিক ; অনুভূতিময় তবু অস্ফুট, উৎসুক তবু প্রতিভাহীন, অগ্রসর তবু অপরিণত। ‘তাঁকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে; অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম।’

‘সন্ধ্যা সঙ্গীতে’র রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে আমাদের ভুলে যেতে হয় সেই শুভ্রশ্মশ্রুধারী সৌম্যমূর্তিকে, সেই উজ্জ্বল ঐশ্বর্যমান দেহকান্তিকে, ভুলে যেতে হয় সেই মহান উন্নত ব্যক্তিত্বকে, যার মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির যুগযুগান্তের সাধনা প্রবুদ্ধ স্বরে কথা বলেছে।

‘সন্ধ্যাসঙ্গীতে’র রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হলে এমন একটা শিশুর মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে পৃথিবীর দিকে চোখ মেলেছে প্রথমবারের মতো। এই পৃথিবীর পথ-মাঠ-আকাশ যার অচেনা, পৃথিবীর শিশিরবিন্দুদের নিঃশব্দ ঝরে-পড়াকে যে চেয়ে দেখছে স্নিগ্ধ কমনীয় চাউনিতে। এখানকার প্রতিটি ফুল, প্রতিটি পাতা, বাতাসের এলোমেলোমি, আলোছায়ার কিশোরী নৃত্য তার সামনে অলীক বিস্ময়ের সবগুলো দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন তিনি প্রথম এসেছেন পৃথিবীর এইসব ঋতুচক্রের প্রতারণাময় নিমন্ত্রণে, নিষ্পাপ উৎসুক চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছেন রূপের এই বিস্ময়কর তারাবাজি, হেঁটে যাচ্ছেন নিঃসঙ্গ।

কবিতাগুলো পড়ে মনে হয়, শৈশবের সোনালি স্বপ্নেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চোখের চারপাশে আর একটা অসহায় ভীরু হরিণশিশুর মতো নরম কচি ঘাসের অস্বস্ত কামনায় তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন মাঠ থেকে মাঠে।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র রবীন্দ্রনাথ কবি। কবি এবং শুধুই কবি। শুধু অনুভূতি আর কল্পনার ভালোবাসাবাসি, শুধুমাত্র কপট ক্রোধ ও কৃত্রিম ছলনা, শুধু পাতার গালে আলোর ঠোঁটের উজ্জ্বল চাপল্য। জীবনের কোনো গুরুভার সত্য এই বই-এর হালকা চটুল প্রাণময়তার ওপর জল্লাদের মতো চেপে বসে মৃত্যুর নিশ্বাসে কালো অন্ধকার ঢেলে দেয় নি। একটি কিশোর হৃদয়ের সবখানি নিবিড়তায়, সজীবতায় ও তারল্যে রচিত হয়েছে এর অনাবিল কবিতাগুচ্ছ—এর কোমল কল্পনাময়তার ফাঁকে ফাঁকে যেন রূপসী আঙুলেরা চিকন হয়ে কেঁপে-কেঁপে গেছে। এমন গোলাপের মতো, দোলনচাঁপার মতো, রজনীগন্ধার মতো কবিতা কত লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ? এমন সহজ অনাবিল সঙ্গীতময়তাকে এতখানি অবলীলায় খেলিয়ে দিতে পেরেছেন কতবার? যেন দূরে, আকাশের খুব নিচে, প্রকৃতির বুকে ফুটে উঠছে কবিতা, নিটোল কমনীয় কবিতা, যার চারপাশে মৌমাছিদের নিমগ্ন গুঞ্জনে সময় মুখরিত।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর 'প্রভাতসংগীতে' এসেই এই শুভ্র অম্লান জোছনাময়তার ওপর বাস্তবের পাশব-কঠিন নির্মমতা ক্ষমাহীন দাঁত বসিয়েছে, স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে নির্ঝরের দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার, স্নিগ্ধ শুচিতার চোখে বিদ্ধ হয়েছে ভোরের আলোর হত্যাকারী আক্রোশ। কবি জেগে উঠেছেন স্বপ্নময়তা থেকে সত্যে, কল্পনা থেকে বাস্তবে, একটা রুক্ষ কঠিন পৌরুষের ক্ষমাহীন হাত দলে ধর্ষে তাঁর লাজুক অনভিজ্ঞ কুমারীকে পৌঁছে দিয়েছে পূর্ণতর নারীর বন্দরে। এর পর, ক্রমাগতভাবে, জীবনের ক্ষান্তিহীন প্রহার নির্দয় আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে তাঁর স্নায়ু। আর সেই আঘাতের বিনিদ্র রক্তক্ষরণ থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি একের পর এক কবিতার রক্তগোলাপ। বাস্তবের এই কঠিন ক্রোধ আক্রমণের পর আক্রমণের বন্যতায় অনুভূতির পর অনুভূতিকে ধ্বংস করতে করতে কবিকে উপহার দিয়ে চলেছে জীবন্ত উর্বর স্থিতধী অভিজ্ঞতা, তপ্ত প্রগাঢ় জীবনসত্য। জীবনের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জীবনসত্যেরা ক্রমবর্ধমান হারে অনাবিল অনুভূতির জগৎকে সংকুচিত ও সীমিত করে নিজের আরাধ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে এবং একসময় এই অনুভূতিময়তাকে অবসিত নিঃশেষের শেষপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে কবিকে মর্যাদাবান করে তুলেছে কালদ্রষ্টা ঋষির ভূমিকায়। আর এখানেই, জীবনের শেষ পর্যায়ে, কল্পনাকে অস্বীকার করে, অনুভূতিকে উপক্ষো করে, শিল্পকে পাশে ফেলে ঘোষিত হয়েছে মহান ও শ্রদ্ধেয় ঋষিবাণী :

'তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।'

আমার বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আজীবন সত্যান্বেষণের দিকে ক্ষান্তিহীন যে অগ্রযাত্রা লক্ষ্য করা যায়, যার জন্ম 'প্রভাতসংগীত' থেকে, যার শেষ 'শেষ লেখায়', 'সন্ধ্যাসংগীত' তার বাইরে। 'সন্ধ্যাসংগীত' শুধুমাত্র অনুভূতির ছলাকলা, শুধুমাত্র কল্পনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আলোছায়ার কুটিল কুহক। জীবনের দুর্মর প্রহার এখানেও যে মাঝে মাঝে ত্বককে বিস্রস্ত করে না, তা নয় ; তবে তা সত্য-অন্বেষণের দুরূহ ও দুর্বহ পথে পা বাড়িয়ে শৈশবের সবুজ স্নিগ্ধতাকে কোথাও কঠিন ও রুক্ষ করে তোলে নি।

২

'সন্ধ্যাসংগীত' রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক চরিত্রের প্রতি পাঠককে উৎসাহী করে তোলে। 'সন্ধ্যাসংগীত' যে বয়সের রচনা, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের জীবনে সে বয়সটা যৌবনকাল। কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীত' পড়তে বসে কখনো মনে হয় না এই কাব্যের রচয়িতা একজন পরিপূর্ণ যুবক, যিনি উপনীত হয়েছেন রক্তমাংসময় বয়সের ধ্বংসকারী খররৌদ্রে। বারবার মনে হয় : যৌবনের যন্ত্রণা, রোদন, পিপাসা ও প্রহার তাঁর স্নায়ুশিরাকে বিস্রস্ত করে নি আজো, ক্ষুধিত জাগুয়ার রোমশ আঘাতে আক্রমণ করে নি হাড় ; তেতো প্রেম নির্দয় হাতে তরুণ স্নায়ু গুঁড়িয়ে বিকল করে দেয় নি। বস্তুত 'সন্ধ্যাসংগীত' রবীন্দ্রনাথের সোনালি শৈশবের রূপকথা, তাঁর জীবনের অতিস্থায়ী কৈশোরের কামনা ও ক্রন্দন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জীবনসত্য অন্বেষণের মতো এই স্নিগ্ধ কৈশোরিক কমনীয়তাও দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতোই তাঁর শিল্পকে ছুঁয়ে থেকেছে আজীবন। পরবর্তীকালে, জীবনের দীর্ঘ সিঁড়ি ধরে তিনি যেখানেই গেছেন, হেঁটেছেন যে অপরূপের রাস্তায়; সেখানেই নিবিড় নিষ্পাপ এই কৈশোরিক অনুভূতিরা তাঁর চেতনাকে জড়িয়ে রেখেছে। কৈশোরের এই শুভ্র, সুস্মিত, অম্লান শুচিতার হাত এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন কি তিনি কখনো? পুরোপুরি? পেরেছেন কি কখনো ক্ষুধাময় অগ্নিময় নির্মম নিষ্কৃতিহীন যৌবনের ঘাতক রোগশয্যায় পুরোপুরি জেগে উঠতে? বুঝেছেন কখনো : মাংসাশী উষ্ণতার ক্ষমাহীন হাত কীভাবে আমাদের উজ্জ্বল অস্তিত্বকে ছিঁড়ে নিংড়ে নিঃশেষের কাছে রেখে যায়?

'সন্ধ্যাসংগীত' পড়তে বসে বারবার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে যৌবন এসেছিল দেরি করে। যে বয়সে নজরুল ইসলামের মতো একজন লক্ষ্যহীন তরুণ পর্যন্ত রক্তপিপাসু অস্তিত্বের ঘাতক আক্রমণে রক্তাক্ত ও বিধ্বস্ত, সুকান্তের মতো একজন শিশুকবির কণ্ঠস্বর শুনেও মনে হয় সামগ্রিক মানবভাগ্যের সংগ্রাম ও পরিণতির ইতিহাস জেনে ফেলেছেন; সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ একটি কিশোর শুধু, অসহায় অপরিণত একটি সোনালি কিশোর—'বিশ্বরূপের খেলাঘরে' নীলিমা হাতড়েও যে এই 'আকাশ ভরা সূর্যতারার' শেষ খুঁজে পাচ্ছে না।

৩

আমার অনেকবারই মনে হয়েছে, 'সন্ধ্যাসংগীত' রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে দুর্ভাগা। এর কারণ প্রধানত দুটি। এক, কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের খুব বেশিরকম প্রথমদিকের রচনা ; দুই, এই কাব্য রচনার পরবর্তীকালে রবীন্দ্রপ্রতিভার অপ্রতিহত ও অভাবনীয় উন্নতি। রবীন্দ্রপ্রতিভার উর্বরতম পর্যায়ের অবিশ্বাস্য কীর্তিরাজির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্রজালচ্ছটায় যাঁরা আকণ্ঠ, তাঁদের পক্ষে তাঁর কাব্যজগতের সুদূর প্রান্তবাসী এই অখ্যাত দরিদ্র বাসিন্দাটির উপেক্ষিত করুণ মুখাবয়বকে বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া পরবর্তীকালের কাব্যগ্রন্থগুলোর সঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীত'কে সমমর্যাদা দানের ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সকুণ্ঠ দ্বিধা জনচক্ষে এই বইকে আরো হেয় করে দিয়েছে। কিন্তু আজ এ-কথা ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সূচনার দিনগুলোয় এই বই-ই একদিন তাঁর সামনে বিশ্ববিজয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। পরিণত বয়সের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কঠিন ও নির্মোহ চোখে সন্ধ্যাসংগীতের কুমারী সৌন্দর্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, কিন্তু এ বই-ই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রথম নায়িকা। এই বই-ই একদিন তাঁকে খ্যাতির আলোকিত রাজপথের ওপর এনে দাঁড় করিয়েছিল দিগ্বিজয়ীর পরিচয়ে। এই বই-এর দুর্বল উপেক্ষিত শব্দরাজির মধ্যেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একদিন আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করেছিলেন এই সাহিত্যের ভাবীকালের অনিবার্য রাজচক্রবর্তীকে। সমকালীন সমালোচনার উচ্ছ্বসিত আবেগ একদিন মুখর হয়েছিল এই কাব্যের অক্ষম পঙ্‌ক্তিমালাকে ঘিরেই। রবীন্দ্রকাব্যের মহত্তম শিল্পকীর্তিগুলোর পাশে আজ 'সন্ধ্যাসংগীত'কে ম্লান ও নিষ্প্রভ মনে হতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ধরলে বাংলাকাব্য খুঁজে কয়টি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যাবে যারা শিল্পযোগ্যতায় 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর সমকক্ষ?

একজন ভালো কবি তিনি, যিনি প্রভাবিত করেন। যিনি সত্যিকার ভালো কবি, আগামী যুগের কাব্যধারাকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে কখনো-না-কখনো তিনি আক্রান্ত করবেনই। নিকট ভবিষ্যতে না হলেও দূর ভবিষ্যতে গিয়ে তাঁর সেই সজীব অনিবার্য প্রভাব অনুভব করা যাবে—হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী নিষ্ক্রিয় থাকার পর অকস্মাৎ তিনি জেগে উঠবেন কোনো সুদূর উত্তরসূরীর প্রতিভাবান শব্দরাশির ভেতর।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কাব্যাঙ্গনের চত্বরে 'সন্ধ্যাসংগীত'কে কুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার দিলেও কাব্য হিসেবে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর মূল্য ও গুরুত্ব অর্থহীন হয়ে যায় না। 'সন্ধ্যাসংগীত' যে একটি গতানুগতিক ও সাধারণ কাব্যগ্রন্থ নয়, তার একটা প্রমাণ : রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কাব্যগ্রন্থের মতো 'সন্ধ্যাসংগীত'ও ইতিমধ্যেই উত্তরযুগের বাংলাকাব্যকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদের কথা বাদ দেওয়া যাক, কেবলমাত্র জীবনানন্দের প্রথম জীবনের কবিতার ওপরেও 'সন্ধ্যাসংগীতে'র ব্যাপক প্রভাবের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। 'ঝরা পালক' ও বিশেষ করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে অক্ষরবৃত্তের যে বিশেষ ও স্বকীয় ঢঙ আধুনিক কাব্যপাঠকের জিভে নতুন আস্বাদ এনেছে, তা প্রায় পুরোপুরি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র জগৎ থেকে নিয়ে আসা। তাছাড়া, 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ অক্ষরবৃত্তের এই বিশেষ ঢঙটিকে আশ্রয় করে সংগীতের যে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভুবন নির্মিত হয়েছে, জীবনানন্দের কবিতায় তা-ও প্রায় পরিপূর্ণ রক্ত-মাংসে উপস্থিত। জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার—

> অর্থ নয়—কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে
> আমাদের ক্লান্ত—ক্লান্ত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঙ্‌ক্তিগুলোর পাশাপাশি 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি :

যতদিন বেঁচেছিল
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা
আর কিছু না।
... ...

তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল
দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল।

এ থেকে বোঝা যাবে জীবনানন্দের জীবনানুভূতির ও শব্দব্যবহারের বিভিন্ন পরীক্ষার ওপরেও সন্ধ্যাসংগীতের প্রভাব কতটা নিবিড়। ওপরে উদ্ধৃত অংশটুকুর শেষ পঙ্‌ক্তি—

'দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল'

এর পাশাপাশি জীবনানন্দের—

'সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়
দহে নাকো কিছু'

পাঠ করলে বোঝা যায়, একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করে কবিতার বিশেষ সফলতায় পৌঁছোবার এই একক জীবনানন্দীয় স্বভাবটিও আসলে কী অন্তর্গতভাবে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর দ্বারা আক্রান্ত।

১৯৬৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘প্রভাতসঙ্গীতে’র রবীন্দ্রনাথ

১

‘প্রভাসংগীত’–এর আগাগোড়া জুড়ে এক বিপুল জাগরণের শব্দ শোনা যায়। যেন এক নীরব নিথর অন্তহীন সুপ্তি থেকে জীবনের শব্দিত আলোড়নে জেগে উঠছে কেউ—বিস্মিত নতুনের এক অনাস্বাদিত পুলকে যার আদিঅন্তহীন অস্তিত্ব উন্মুখর। ‘প্রভাতসংগীত’ তারই প্রচণ্ড রক্তপ্রবাহের উন্মত্ত অস্থিরতার গান, তার জেগে–ওঠা অবারিত হৃদয়ের উচ্চকিত বিচ্ছুরিত কলস্বর। সারা প্রভাতসংগীতের জগৎ, তার প্রতিটি কন্দর উপত্যকা নীলিমা ও পৃথিবীর পরিপূর্ণতা এই আকাশপ্লাবী জাগরণ–সঙ্গীতের আনন্দস্বননে ধ্বনিপ্রতিধ্বনিময়। কেবলমাত্র একটি বৈশিষ্ট্যহীন, বর্ণহীন, গতানুগতিক ও সাধারণ উজ্জীবন ভাবলে ‘প্রভাতসঙ্গীত’–এর এই অবিশ্বাস্য বিপুল জাগরণকে ভুল করা হবে। এই জাগরণ ‘সন্ধ্যার’ অস্বচ্ছতা থেকে প্রভাতের আলোয়, অক্ষমতা থেকে শক্তিতে, প্রয়াস থেকে প্রতিভায়, বদ্ধঘরের হত্যাকারী কূপমণ্ডুকতা থেকে মানবতার বিপুল রাস্তায়। জীবনের প্রতিটি স্নায়ু–শিরা–প্রত্যঙ্গকে অশ্রান্তভাবে নাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে আলোড়িত অস্বস্ত করে এই শব্দমুখর জাগরণ—রাশি রাশি প্রস্তরশিলার অবিশ্রান্ত পতনশব্দে কারাগারের উল্লসিত ধ্বংস ঘটিয়ে, শিখর থেকে শিখরের নির্ভীক.দুর্জয় অভিযানের আত্মহারা আনন্দে, ভূধর থেকে ভূধরে অকারণে লুটিয়ে পড়বার উদ্দাম ব্যগ্রতায়।

নিজের বিরুদ্ধে এক দুর্জয় বিদ্রোহে ও অসন্তোষে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের মধ্যে জেগে উঠেছেন। এই বিদ্রোহ তাই কুঁড়ির বিরুদ্ধে ফুলের, রোগের বিরুদ্ধে রক্তের, দেয়ালের বিরুদ্ধে মুক্তির—নিশ্চল প্রাণহীনতা থেকে উজ্জ্বল পাখা ঝাপটানোর রাজ্যে। যেন এক আকস্মিক উজ্জীবন ঘটে গেল চৈতন্যের ব্যাপক অঙ্গনে— ‘পউষের পাতা–ঝরা তপোবনে/ টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস।’ কবি জেগে উঠেছেন জীবনসমুদ্র থেকে ভুবনডাঙার ঘাটে, শৈশবের অতিস্থায়ী মধুর স্বপ্নচারিতা থেকে যৌবনের রক্তাক্ত প্রভাতে। আর তার সঙ্গেই জন্ম হয়েছে লোকোত্তর সেই অনন্যসাধারণ রবীন্দ্রনাথের—সেই প্রবল মহান বিস্ময়কর মানুষের—সেই জীবন-পিপাসায় অস্বস্ত আন্দোলিত নিঃসঙ্গ একান্ত পুরুষটির—আমৃত্যু নিদ্রাহীন বিশ্বতৃষ্ণার শিকার হয়ে জীবনব্যাপী মরীচিকার পেছনে ছুটে যিনি সার্থকতার তাজমহল খুঁজেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রভাতসঙ্গীত' রবীন্দ্রনাথের জীবনে যৌবনের আগমনের গান। প্রথম প্রেমের মতোই, এই প্রথম যৌবন, ধরা পড়েছে সবটুকু রক্তিম মধুর সলজ্জতা নিয়ে ; আবার, প্রথম প্রেমের মতোই তা একই সঙ্গে উন্মুখ, অবুঝ, শক্তিমান, ধ্বংসকারী ও বন্য। কৈশোরের সোনালি স্বপ্নচারিতার ভেতর নিঃশব্দে বেড়ে উঠে এক সুন্দর অম্লান ফলের মতো জেগে উঠেছে যৌবন, যেন সমুদ্রের নিঃসীম অতলান্ত থেকে জেগে উঠছে সুন্দরী ভেনাস। শৈশবের পাপড়িগুলোকে নির্দয় হাতে দলে ধর্ষে জীবনের ঘরে জন্ম নিল সেই ঈপ্সিত অবধারিত অতিথি— সহজ প্রবল নতুন সেই যৌবন, নিষ্ঠুর নতুন সেই যৌবন। কবি জেগে উঠলেন এক আকাশ-ভরা বিস্ময়ের রাজ্যে— পৃথিবীর প্রতিটি আলোর নৃত্য, বাতাসের প্রতিটি উন্মুখ লাস্য তাঁর চোখের সামনে রূপকথার অনিন্দ্য দরজা মেলে ধরল।[১]

প্রভাতসঙ্গীতের রৌদ্রময় জগৎ থেকে বিস্ময়ের যে উজ্জ্বল আলো কবি জড়িয়ে নিয়েছিলেন দুই চোখে, পরবর্তী জীবনের দীর্ঘ বন্ধুর নিঃসঙ্গ যাত্রার দিনগুলোতে তা কোনোদিন তাঁকে ছেড়ে যায় নি। বিশ্বভরা প্রাণের মাঝখানে হৃদয় জেগে উঠেছে অপলক বিস্ময়ে, যেখানে 'বিশ্বরূপের খেলাঘরে' অপরূপকে তৃপ্তিহীন দেখে যাবার বিপুল প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো মহত্তর প্রয়োজনকে খুঁজে পান নি।

প্রভাতসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রাণ জেগে-ওঠার গান। এক উত্তাল অকারণ হাওয়া খ্যাপা মাতালের মতো হঠাৎ বন্ধ-ঘরের দরজা হুমড়ি খেয়ে সমস্ত দেয়ালের বাধাকে উড়িয়ে দিল যেন, কবি নিজেকে আবিষ্কার করলেন উন্মুক্ত বিশাল আকাশের নিচে এক স্বাধীন সম্রাটের ভূমিকায়—যেখানে নির্দয় নির্বাসনের হত্যাকারী হাত অন্ধকার কুঠুরিতে তাঁকে টুঁটি চিপে মারতে অক্ষম, যেখানে তাঁর খুলে-যাওয়া আনন্দিত হৃদয়ের অঙ্গনে জগতের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আসা-যাওয়ার খেলা। 'প্রভাতসংগীত' নামগ্রাসী কবরের মৃত্যু ও অপচয় থেকে উঠে-আসা ল্যাজারাসের দৃপ্ত প্রত্যাবর্তনের সঙ্গীত। 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও বলেছেন, 'জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান', তবু প্রভাতসংগীত সম্বন্ধেই কথাটা প্রথমে প্রযোজ্য। জীবনের অর্থহীনতার ঘর থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বল আলোর মহোৎসবে আনন্দিত মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার গাথা এই প্রভাতসঙ্গীত। প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম অংশ বন্ধগুহার অচলায়তন ভেঙে

---

১. এ গান শুনিনি এ আলো দেখিনি
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরাণ পুরিয়া
করেনি রে সুধা দান,
এমন প্রভাত কিরণ মাঝারে
কখনো করিনি স্নান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের প্রবহমানতার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বার শব্দে উচ্চকিত; দ্বিতীয় অংশ গৃহহীন যাযাবর হৃদয়ের পৃথিবী ও মানবতার সঙ্গে গভীর মমতায় মিলিত হবার তৃপ্তিতে নিবিড়। প্রভাতসংগীতের দ্বিতীয় অংশ তাই এত আনন্দময়, কোলাহলমুখর, উদ্বেল–প্রেমের, মিলনের, ভালোবাসার উন্মুখতায় এমন উদগ্রীব, মানুষের প্রকৃতির বন্ধহীন আসা–যাওয়ায় এমন আলোময় ও সচকিত।[২]

৩

এক কথায় বলতে গেলে : 'প্রভাতসঙ্গীত' রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের আরম্ভ। এর আগে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোয় কবিতার কমবেশি সাফল্য ফোটে নি, তা নয়। তবু 'সন্ধ্যাসংগীত' আবর্ত, 'প্রভাতসংগীত' স্রোত। 'সন্ধ্যাসংগীত' সন্ধ্যা—নিষ্ক্রিয় নিশ্চুপ সন্ধ্যা, যদিও স্বপ্নে ও জোছনায় বিস্ময়কর, কিন্তু 'প্রভাতসঙ্গীত' ভোর—প্রভাত—জাগরণ ; অপারগতায়, তবু জাগরণ। 'প্রভাতসঙ্গীত' রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক জীবনের শুরু—তাঁর সুস্পষ্ট জীবন–বক্তব্যের জন্মলগ্ন। 'প্রভাতসঙ্গীত' মানুষের প্রাথমিক অসহায়তা থেকে জীবনের সক্ষম শক্তিময়তায় উত্তীর্ণ হবার গান। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কবির ক্ষেত্রেই জীবনের কোনো–না–কোনো পর্যায়ে অস্তিত্বের এই মুক্তি, নিজের প্রকৃত ও অনিবার্য অন্তঃস্বরূপে উদ্বুদ্ধ জেগে উঠবার এই বিস্ময়স্পন্দিত মুহূর্তটি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, দেখা দেবেই। 'প্রভাতসঙ্গীত'–এর মতো অন্তঃসত্ত্বা নয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', কিন্তু 'প্রভাতসঙ্গীত'–এর তুলনায় অনেক নিটোল ও পরিপাটি। কাব্যাঙ্গিকের দিক থেকেও 'প্রভাতসঙ্গীত' 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'–এর তুলনায় দুর্বল। 'প্রভাতসংগীত'–এর মাত্রাবৃত্ত এখনো নিটোল পূর্ণতায় ফলে ওঠে নি। এখনো এখানে–সেখানে পতনঙ্খলন সুলক্ষ্য। 'প্রভাতসঙ্গীত'–এর অসাধারণ জীবনাবেগ প্রতিভাবান শব্দের প্রয়োগে কবিতার সাফল্য পাবার ব্যাগ্রতায় কেবলি 'হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়/ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়', কিন্তু লোকোত্তর শব্দ–ছন্দ–উপমার অনটন তাকে

---

২ কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বলে
কাছে এসে কেহ করে খেলা,
কেহ হাসে কেহ গায়, কেহ আসে কেহ যায়,
এ কী হেরি আনন্দের মেলা।
[পুনর্মিলন]

অথবা

চারিদিকে সৌরভ চারিদিকে গীতবর
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধো আধো বুলি
চারিদিকে স্নেহ প্রেমরাশি।
[সমাপন]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোমতেই মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে দেয় না। তবু 'প্রভাতসঙ্গীত' মূল্যবান এ কারণে যে, 'প্রভাতসঙ্গীত'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য যা একান্তভাবে তাঁর নিজের। এই কাব্য রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ও প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট সূচনা–ক্ষেত্র। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রয়াস, 'প্রভাতসঙ্গীত' প্রতিশ্রুতি। 'প্রভাতসংগীত' দুর্বল, অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল ; কিন্তু আলাদা, সম্ভাবনাময় ও গতিবান। 'প্রভাতসঙ্গীত'–এর উদ্বেল পৃষ্ঠায় জীবনের যে মহান ও লোকশ্রুত জাগরণ উচ্চকিত হয়েছিল রবীন্দ্র–যৌবনের জন্মমুহূর্তে, পরবর্তী দীর্ঘ ষাট বছরের অবার অজস্র শব্দের জীবনময় যাত্রায় তিনি সেই অবিশ্বাস্য প্রাপ্তির ঋণ শুধেছিলেন।

১৯৬৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধূর্ত কবিতা

আমাদের সমকালের কোনো সহৃদয় পাঠক, যিনি উৎসাহী চোখ মেলে তাকিয়েছেন একালের কবিতার ভিড়ের ভেতর, হেঁটে গেছেন পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি, তারপর সেইসব শব্দের সার-সার অবাক শোভাযাত্রার ভেতর আশ্চর্য রূপকথার দেশে পৌঁছে একসময় দেখেছেন পথের পাশে রহস্যেরা নিশ্চুপ হয়ে জেগে আছে, তাঁরাও এইসব কবিতায় কৌশল ও চাতুর্যের বিস্ময়োজ্জ্বল ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতার দ্বারা ক্লান্ত হয়ে একসময় অনুভব না করে পারবেন না যে, সাম্প্রতিক কবিতা দিনের পর দিন হৃদয়ের দিক থেকে শুকিয়ে এসে একধরনের নিরুত্তাপ ও প্রাণহীন শীতলতার কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

মনে হচ্ছে, খুব বেশি ধূর্ত হয়ে উঠছে আমাদের একালের কবিতা। অনায়াসে নিজেকে মেলে ধরার—স্বচ্ছন্দে, সহজে, অক্লেশে, ঘাসের মতো বা পাতার মতো ওপরের দিকে বেড়ে ওঠার কোনো গভীর সাধ, কোনো ঋত-আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে না খুব একটা। যেন 'হয়ে-ওঠা' নয় এসব, যে 'হয়ে-ওঠা'র পাতায় পাতায় নীলিমার অপার আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ঝরে। মনে হয় কোলাহল হিল্লোলিত হয়ে ওঠে না এদের পরতে-পরতে, অস্থির হয় না স্নায়ু, গোপন সুস্বাদ স্বর্গীয় শিহরণ এসে এদের শরীরকে অপরূপ করে দিয়ে যায় না সোনালি জোছনায়। কোনো লোভাতুর সঞ্জীবচন্দ্র এদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন না, 'যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল।'

মোটকথা, দিনের পর দিন নিদারুণভাবে 'যৌবনহীন' হয়ে উঠছে আমাদের কবিতা। যৌবনহীন বলতে আমি এ-কথা বোঝাতে চাচ্ছি না যে যৌবনের সজীব বর্ণনায় কিছুমাত্র বৈরাগ্য বা ঔৎসুক্যহীনতা দেখাচ্ছেন আমাদের কবিরা। বরং হয়তো উল্টোটাই হচ্ছে। যৌবনময় বিষয়ই উপজীব্য হচ্ছে তাঁদের কবিতার ; তবু অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে সেই প্রসিদ্ধ আবেগ, সেই লোকোত্তর উত্তাপ, যার আঁচে কবিতা আমাদের জাগিয়ে রাখে নীরক্ত শীতের রাতে, নিশাহত, আমরা ঘুরে বেড়াতে থাকি রহস্যময় স্বপ্নের বাসস্টপ থেকে বাসস্টপে। ফলে কবিতার লোকশ্রুত শরীর তার যৌবনময় রক্তিমতা নিয়ে একটা মূর্তিমান বিপদের মতো, বিপ্লবের মতো আমাদের আন্দোলিত বিস্রস্ত করছে না। এই কবিতার নিরুদ্বেগ শরীরে হাত রেখে কেউ এমন কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবে না যে আমরা এমন একটা দেহের ওপর হাত রেখেছি যা 'রক্তমাংসময়'। মনে হচ্ছে, ব্যর্থ হচ্ছে 'কবিতা' ; অলৌকিক দেশলাইয়ের খোঁচায় আমাদের শরীরে অতিপ্রাকৃতিক আগুন জ্বেলে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ কবিতাই তো সেই স্বর্গীয় চুল্লি যার চারপাশে দাঁড়িয়ে আমরা জীবনের হাত সেঁকে নিতে চাই, সেঁকে নিতে চাই আমাদের পুরোনো হৃদয়। মনে হচ্ছে, 'নির্মাণ' করা হচ্ছে এসব কবিতা, তৈরি করা হচ্ছে। যেন একজন নিপুণ কারিগর ব্যবহারদক্ষ চতুর হাতে দীর্ঘদিনের শ্রমে ও যত্নে পাথর কুঁদে বার করছে একজন সুচারু মানবীর দেহাবয়ব, যার শরীরের প্রতিটি ভঙ্গি প্রতিটি ভাঁজ নিখুঁত ও গাণিতিকভাবে নির্ভুল ; যার অঙ্গসজ্জা, অলংকরণ এমনকি পরিচ্ছদরচনা এমন আশ্চর্য সাফল্যে উজ্জ্বল যে সেই শিল্পীর জ্যামিতিচাতুর্যের ওপর সামান্যতম সন্দেহ করা চলে না ; তবু যাঁর শিল্পকর্মের প্রতি দৃষ্টিমাত্রেই অনুভব করা যায় : অনুপস্থিত সেই জাদু, সেই রহস্যময় আলো যার সংক্রামে পাথরের দেহে জীবন কেঁপে উঠতে পারে উদ্বেল সংগীতে, একটি মেয়ের সাধারণ হাসি মুহূর্তের ঝলকে লোকোত্তর মোনালিসা হয়ে যায়।

আমাদের সমকালের কবিতা পড়ে বার-বার এই কথাটা ভাবতে হচ্ছে যে এইসব কবিতায় চালাকি আছে, কৌশল আছে, একটা পরিচিত আবেগকে শাণিত উজ্জ্বল শব্দে তুলে নেবার ধূর্ত উপকরণের অভাব হচ্ছে না কোথাও, তবু কবিতার হৃদয়বান স্বর ধ্বনিত হচ্ছে না যেন কোনো ঘরে। এখানে ছন্দ নির্ভুল, বুদ্ধির কসরতে উপমা শাণিত, শব্দের উজ্জ্বল চতুর বৈদ্যুতিক ব্যবহারও যে-কোনো সৎ কবিতাকে লজ্জিত করতে পারে ; তবু অনুক্ত রয়ে যাচ্ছে কবিতার সেই জন্মান্ধ প্রবৃত্তি, সেই নির্বোধ উদ্যম। কবিতাগুলো যেন হিমেল হাওয়ায় অসহায় কেঁপে যাওয়া এক-একটা বিশীর্ণ পাতা, যার ওপর গভীর আকাশের অবাক আলোয় ঈশ্বর শিউরে উঠবে না। আমাদের কবিরা সবাই শুধু সক্ষম ও সপারগ কবিতা লিখতে চাচ্ছেন, কোথাও ত্রুটি দুর্বলতা রাখতে চাচ্ছেন না, এটাই দুঃখজনক। কবিতাকে মেজে ঘষে পালিশ করে মসৃণ আর নির্ভুল করার শ্রমিক প্রয়াসে নামছেন সবাই, শিথিল ছলনার অবলীলায় কোথাও মহৎ ভুলের বিন্দুমাত্র সাক্ষ্য রাখতে তাঁরা নারাজ। তাঁরা কেবলি কবিতার বহিরঙ্গের ওপর অধিকারের মুষ্টিকে অধিকতর শক্ত করেছেন ; এমন কঠিন, চতুর, অনমনীয় চরিত্র দান করছেন তাঁরা কবিতাকে যা বিস্মিত করে। আগামী যুগে, যখন আমাদের সময়ের এইসব চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ ও খরস্রোত নিস্তব্ধ হয়ে আসবে, কাব্যরসিকদের হাতে পৌঁছবে কেবল আমাদের সময়কার এইসব সাহিত্যকীর্তিগুলো, তখন তাঁরা এসবের ভেতরে আশ্চর্য শিল্পসংযম দেখে হয়তো বিস্মিত হবেন ; তবু একটা বিষয়ে শেষপর্যন্ত হয়তো আমাদের সঙ্গে একমত হয়েই তাঁরা স্বীকার করবেন যে, আমাদের সময়কার কবিতার এই চাতুর্য, অনুশীলনের এই শুদ্ধতা, এইসব বিস্ময়কর কৌশল ও নৈপুণ্যের আয়োজন শেষপর্যন্ত একটা 'স্থূল হৃদয়ে'র অভাবে দুঃখজনকভাবে নিষ্ফল হয়ে গিয়েছিল ; যে 'হৃদয়' একটা সাধারণ গ্রাম্য অর্ধশিক্ষিতেরও অবহেলার সামগ্রী। বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার ভাগ্যে এমন মর্মান্তিক পরিহাস এর আগে হয়তো এমন করুণ পরিণাম নিয়ে আর কখনো দেখা যায়নি যখন এক হাজার একশ কবির দিনব্যাপী রাত্রিব্যাপী নির্বার প্রয়াস ও প্রযত্ন শেষপর্যন্ত এই সাহিত্যে ন্যূনতম কবিতার 'কামরাঙা'ও উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

আমাদের কবিরা দিনের পর দিন কবিতার প্রকরণের ওপর অভাবিত কুশলতা ও দক্ষতা অর্জন করছেন তথাপি ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে যে তাঁদের সাফল্য এমন অনেক নগণ্য সাধারণ অক্ষম রচনার পাশেও নিষ্প্রভ যে–রচনার একমাত্র ঐশ্বর্য একটি রক্তমাংসময় নির্বোধ 'হৃদয়'। বোঝা যাচ্ছে আমাদের কবিতা ধীরে–ধীরে প্রকরণসাফল্যের একটা বহুল–ব্যবহার–জীর্ণ পরিচিত প্রাণহীন গতানুগতিকতার মধ্যে নিজেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে খুইয়ে ফেলছে এবং ওইসব কবিতার অচল অবসিত বিষয়বস্তুগুলোকেই শেষবারের মতো ধারালো করে তুলে কাব্যরচনার কারিগরি চেষ্টায় মেতে উঠেছে। এইসব কবিতায় শব্দেরা জীবনের কামনায় উদ্বেল হয়ে পঙক্তিগুলোকে ঐশ্বর্যময় করে তুলছে না, রঙিন অপরিচিত উপমারা দেয়ালে–দেয়ালে সৌকর্যমণ্ডিত হয়ে কোনো সম্পন্ন চিত্রশালায় পরিণত করছে না এগুলোকে। এমনকি ছন্দের ক্ষেত্রে যে দুর্বার সৃজনশীলতা গত এক শতাব্দী ধরে গণনাহীন ঐশ্বর্যে নিজেকে শতসহস্র করে তোলায় ক্লান্তিহীন ছিল তাও সম্প্রতি অক্ষরবৃত্তের একঘেয়ে ক্লান্তিকর প্রাণহীনতার মধ্যে নিশ্চল হয়ে মুখ থুবড়ে মরছে।

এর জন্য কোনো এক কবিগোষ্ঠী কিংবা কাব্যধারাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, হয়তো ইতিহাসেরই এটা অনিবার্য পরিণতি। নতুবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক মৃত্যুবহুল অনুর্বরতা কেন? কী গভীর দুরারোগ্য ক্ষয় সাহিত্যের মেরুদণ্ডকে অধিকার করল যার ফলে কবিতা নিষ্ফলা, নাটক বন্ধ্যা, উপন্যাস রক্তহীন? কী কারণে এ–যুগের সাহিত্যের সৃজনশীলতার শেষ দুর্গ তরুণ ছোটগল্পও অনবরত লোকক্ষয় ও নিত্যনতুন যুদ্ধপদ্ধতির বিরতিহীন আক্রমণে শত্রুকবলিত? কেন হল এসব? গত একশ বছরে আমাদের সাহিত্যের অজস্র ও বিস্ময়োজ্জ্বল উৎপাদনের তুলনায় কি বেদনাদায়করকমে শূন্য এই হতভাগ্য সময়, কী খেদজনকভাবে নিষ্প্রভ। আমরা যারা আমাদের সাহিত্যের ঐশ্বর্যময় কালে জীবন ধারণ করিনি, শুধু শুনে এসেছি সেসবের কথা—পৃথিবীতে নিশ্বাস নেবার সঙ্গে–সঙ্গে কেবল পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ, কেবল নিরুত্তাপ শৈত্যের জনবসতিহীন রাজ্যে বাস করে যাচ্ছি—তাদের পক্ষে এই ব্যাপক অজন্মার হাত থেকে, এই সর্বগ্রাসী ঊষরতার হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ কোন সিঁড়িতে? শুধু মৃত্যু, শুধু প্রেরণাহীন, উত্তাপহীন, নিঃস্ব নিঃসঙ্গ মৃত্যু, আমাদের রক্তের ভেতর স্নায়ুর ভেতর উৎসাহের মজ্জাকে কুরে খেয়ে আমাদের বিস্রস্ত করে যাচ্ছে।

বাংলাসাহিত্যের গত এক শতকের উচ্ছল পৃষ্ঠারাশির ভেতর যাঁরা দেশ ও কালকে প্রতিভাময় ভাষায় উচ্চকিত হয়ে উঠতে দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের অনাবাদী ভূমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী অবিশ্বাস্য ফসল দিয়েছে। 'অবিশ্বাস্য' বলছি এজন্য যে, এক শতকেরও কম সময়দৈর্ঘ্যের মধ্যে একটি সাহিত্যের পক্ষে এত অভাবনীয় উৎপাদনের অপর্যাপ্ততা, এত বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য, সংখ্যাহীন আঙ্গিকের, প্রেরণার এমন অজস্র বিস্ময়কর উৎসার যে-কোনো সাহিত্যের পক্ষেই গৌরবজনক। যেন একটা উপপ্লব ঘটে গেল কয়েকটা বছরের সময়দৈর্ঘ্যের মধ্যে। একটা ইতিহাসহীন পরিচয়হীন ভাষা একটা উন্নত সাহিত্যের মর্যাদায় চিহ্নিত হয়ে গেল। বাংলাসাহিত্যের বিগত শতাব্দীগুলোর করুণাবহ দারিদ্র্য ও ঊষরতার ভূমিতে হঠাৎ-ফসলের এই অভাবিত মৌসুম, এই অপার অজস্র অভাবিত উৎসারণ শুধু অবিশ্বাস্য নয়, চিন্তাতীতও। তবু, ধরে নিতে বাধা নেই যে প্রকৃতির নিয়মে এই ব্যাপ্ত বর্ষণের পর একসময় রুক্ষ কঠিন শীত নিঃশব্দ পদপাতে সাহিত্যের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য যার যৌবনের অনটন এই প্রাচুর্যের মাঠকে একসময় শুকিয়ে তুলবেই।

তিরিশের যুগ থেকে স্পষ্ট অনুভব করা গেল যে আমাদের সাহিত্যের সচ্ছল ভাঁড়ারে মৃত্যুর হাত পড়েছে। যে উদ্যোগ, স্পৃহা ও প্রবহমানতার কল্লোল বাংলাসাহিত্যের অনুর্বর ভূখণ্ডে সম্পন্ন ফসল ফলিয়েছিল, তিরিশের যুগের পদপাতের সঙ্গে-সঙ্গে সেই বলিষ্ঠ জীবনোল্লাস নিস্তাপ মৃত্যুর অধিকারে চলে যেতে শুরু করল। স্বভাবচারী কবিতা আদিমশক্তির আরণ্যক আশ্রয় হারিয়ে—বুদ্ধিশাসিত, চতুর পাণ্ডিত্যপ্রবণ কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভার করতলগত হয়ে গেল। বিশালতর হৃদয়ের গাঢ় প্রশ্রয় ছেড়ে কবিতা উত্তাপহীন, অনুভূতিহীন, কৌশলময় ও ধূর্ত শব্দের শাণিত সংকলন হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। যে উদ্বেল জীবনময়তা কবিতার প্রত্যঙ্গে-প্রত্যঙ্গে দৌড়ে বেড়িয়ে কবিতাকে সংগীতময় করে রেখেছিল, তার অভাবে কবিতার সজীব গতি মন্থর ক্লান্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে নিঃশেষের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। অক্ষরবৃত্তের বিলম্বিত, ক্লান্ত মন্থরতার ভেতর ছন্দের শতাব্দীবাহী উদ্দীপ্তযাত্রা অর্থহীনতার প্রান্তে পৌঁছল ; ব্যবহৃত, পরিচিত, অবধারিত শব্দের পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তিতে ঘেয়ো ও বিস্বাদ হয়ে উঠল একালের কবিতার ভেদাভেদরহিত অবয়ব—মোটকথা কবিতার উদার আকাশ, বিস্তারের নক্ষত্র-সম্ভাবনাকে হারিয়ে, প্রাণহীন অচল গতানুগতিকতার মৃত আবর্তে করুণ আশ্রয় খুঁজে নিল।

এক কথায় মধুসূদনের সঙ্গে বাংলা কবিতার ভূমিতে ফসলের যে নিদ্রাহীন মৌসুম জেগেছিল, তিরিশের পদপাতের সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর দুরারোগ্য শীতের রিক্ততা নেমে এসেছে। হৃদয়াবেগ ও উর্বর কল্পনাশক্তির পরিবর্তে কবিতা শীতল বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের চারণক্ষেত্র হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মধুসূদনের মতো দুর্দান্ত পণ্ডিতের পক্ষে শব্দকে কৌশল ও চাতুর্যের যান্ত্রিক প্রয়োগের অন্তর্গত রেখেও যে সেগুলোকে মহৎ কবিতায় উত্তীর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ তাঁর কবিতার ভেতর ছিল সেই অপ্রতিহত হৃদয়াবেগ, ভূয়িষ্ঠ কল্পনাশক্তির সেই প্রাচুর্য, সেই প্রবুদ্ধ অনুপ্রেরণা, যার দুঃখজনক অভাবে তিরিশের কবিতার একটা প্রধান অংশ রক্তহীন ও ফ্যাকাশে, বুদ্ধি ও তথ্যবহুলতার অবার ব্যবহারক্ষেত্র। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিরিশের যুগই সেই সময় যখন পাণ্ডিত্যপ্রবণতা অপরাপর আর সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে মাথা তুলে সৃজনশীলতাকে রক্তচক্ষুতে শাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। এটা সেই সময় যখন 'স্বভাবকবিত্ব' অন্তর্গত জ্ঞানের দুর্দৈব অনটনে সবচেয়ে বেশি লজ্জিত, উপহাস্য ও অপমানিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কবিতাকে শুধু জ্ঞান ও অধ্যয়নের চারণভূমি বলে রটনা করবার দুঃখজনক স্পর্ধা এ-যুগের লেখকরাই দেখিয়েছেন; শুধু ঘর্মাক্ত অনুশীলন ও কায়িক শ্রমের ফলদ সন্তান বলে কবিতাকে অভিহিত করতে তাঁদের অনেকে দ্বিধা করেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, 'কল্লোলে'র প্রধান-প্রধান কবিদের যে কীর্তিমান পরিচয় আমাদের সামনে লোকোত্তর মর্যাদায় তুলে ধরা হয়েছে তার একটা বড় কথা এই যে তাঁরা সবাই কমবেশি সাহিত্যের দুর্ধর্ষ পণ্ডিত। আমাদের সমকালীন সাহিত্যের এই ক্ষয়িষ্ণু যুগ, হৃদয়াবেগ অবসিত এই অনটনগ্রস্ত কাল, মৃত্যু আক্রান্ত তিরিশের এই দরিদ্র সন্তান কী কবিতা উপহার দেবে আমাদের হাতে? কোন্ মহাপ্রাণ স্বর উচ্চারিত হবে এইসব উপবাস-আতুর শব্দরাজির নিষ্ফল অরণ্যে।

মানতেই হবে, তিরিশের কবিতার উৎকট বুদ্ধিসর্বস্বতা সাধারণ পাঠককে ভয় দেখিয়েছিল। এটা সেই যুগ যখন কবিতার সাফল্যের অনটনকে মহিমান্বিত করা হয়েছিল পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের রক্তচক্ষু দ্বারা, কবিতার অন্তর্গত দুর্বলতাকে দুর্বোধ্যতার অন্তরালে পাচার করার অপচেষ্টা চলেছিল। কবিতার ক্ষেত্রে হৃদয়হীনতার ব্যাপক স্বাধিকার এই সময় এমন সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা নিয়েছিল (এবং শুধু শ্রম, বুদ্ধি ও অনুশীলনকে কবিতার নামে বেনামি করার এমন গভীর ষড়যন্ত্র চলেছিল) যে সেই কবিকুলের জনৈক দিকপাল এমন অর্ধশিক্ষিত উক্তি করেও জনশ্রদ্ধা কুড়িয়েছিলেন যে, কবিতা বিষয়টি প্রেরণাসাপেক্ষ নয়। এবং সেই উদ্ভট প্রতিভা তাঁর ভয়াবহ পাণ্ডিত্যের কাল্পনিক যষ্ঠির সামনে সমস্ত বাংলাদেশকে এমনভাবে ভীতিগ্রস্ত করে রেখেছিলেন (ও এখনো রেখেছেন) যে সেই উক্তি উচ্চারিত হবার তিন দশক পর অব্দি এ ব্যাপারে কোনো লিখিত প্রতিবাদ করার সাহসও কোথাও দেখা যায় নি।

চল্লিশ বছর আগে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে অজন্মা নামতে শুরু করেছিল, প্রতিদিনের বর্ধিত অনটনে তা এখন দীনতার করুণতম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিরিশের সম্পদের মধ্যেও যা-কিছু সজীবতা ও কমনীয়তা ছিল ক্রমাগত ব্যবহারে ও কর্ষণে তার সব দ্যুতি ও ঔজ্জ্বল্য বর্তমানে নিঃশেষিতপ্রায়। ঋদ্ধিমান প্রেরণা ও অজস্রমুখ কল্পনা এ কবিতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, ঘেয়ো অচল ও বহুলব্যবহারজীর্ণ শব্দ-ছন্দ-রূপকল্পের ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতায় কবিতা এখন জীবনহীন ও যান্ত্রিক। মহৎ কবিতা সুদূর, সত্যিকার ভালো কবিতার জন্মও খুব একটা ঘটতে দেখছি না আমরা আমাদের চারপাশে। দুঃখ লাগে এজন্য যে আমাদের সময়কার এইসব শিল্পদম্ভকে উৎরিয়ে যখন যুগ অবসিত হবে, আমাদের সময়ের সমস্ত অহংকারী আত্মস্তুতিগুলো যখন ধীরে ধীরে নিঃশব্দ হয়ে যেতে থাকবে, পরের যুগে পৌঁছাবে শুধু আমাদের সাফল্য আর কীর্তির ফসলগুলো, তখন সে-যুগের মানুষেরা আমাদের সময়ের দিকে তাকিয়ে অনুর্বর রোদনময় একটা মরুভূমি ছাড়া আর কী দেখতে পাবে? দুঃখ হয় এ ভেবে যে আমাদের কালের নিদ্রাহীন অক্লান্ত কাব্যপ্রচেষ্টার একটা খণ্ডিত অংশকেও আমরা হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালান্তরের হাতে পৌঁছে দিতে পারব না। সন্তানহীনতার দুরপনেয় অপবাদে যে সব সময়কে সাহিত্যের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে লজ্জিত অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে হয়, আমাদের ব্যাপক নিঃস্বতা ও অজন্মা দেখে ভয় হচ্ছে, একদিন কালের চক্রান্তে আমাদের গায়ে সেই অপবাদের কলঙ্ক হয়তো পাকা হয়ে যাবে।

কবিতাকে প্রাণহীনতার নামে বেনামি করার যে ব্যাপক প্রবণতা চারধারে চলছে, অর্থহীন হলেও, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চাই! যত অনবদ্যভাবেই প্রমাণ করা হোক না কেন, অন্তঃসারশূন্যতার নাম, বুদ্ধিসর্বস্বতার নাম, শুধুমাত্র নৈপুণ্য ও চাতুর্যের উদ্ভাসের নাম কবিতা হতে পারে না। কবিতাকে রক্তের ভাষায় রক্তের কাছে কথা বলতে হবে, স্নায়ুর রোদন নিয়ে স্নায়ুর অসংখ্যতার জানালায় কামনাকে রোদনময় করে তুলতে হবে। যে কবিতা সৎ, হৃদয়বান, সাধারণ মানুষকে কবিতার অনায়াস আস্বাদনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষা করে কেবল কিছুসংখ্যক বুদ্ধিমান মগজের জন্য নিজের কাঁচুলি খুলে দেয়; যে কবিতা তার রক্তিম প্রাণময়তা নিয়ে মানুষের রক্তে-রক্তে নেচে বেড়িয়ে উষ্ণতায় উত্তাপে শরীরকে পরিণত করতে পারে না, তাকে কবিতা বলা অসমীচীন হবে। মানুষের কাছে কথা বলতে হবে কবিতাকে—সহৃদয় সব মানুষের কাছে—যারা ঔৎসুক্য নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে, উদগ্রীব চোখ নিয়ে কবিতার চারপাশে এসে ভিড় করবে, কবিকে কথা বলতে হবে তাদের জগতের পরিচিত ছন্দে, ব্যাকরণে; তাদের অনুভবগম্য, বোধগম্য, প্রত্যঙ্গগম্য শব্দের আবেগে। কবিতা চিরদিন মানুষের কাছে কথা বলেছে, বিশ্বাস রাখি, কবিতার এই ভূমিকা অন্ধকারের দোসর হতে পারে না। কবিতার কাছে তার লোকশ্রুত উত্তাপ ফিরে চাই আমরা, তার আদিম উর্বরতাকে ফিরে চাই। উষ্ণতায়, আবেগে, আঁচে কবিতা উচ্চকিত হয়ে উঠুক জীবনের মতো। কবিতাকে এগিয়ে আসতে হবে অনায়াসে, সহজে—'হয়ে উঠতে হবে'—হয়ে উঠতে হবে 'যৌবনময়'—কবিতার 'কামরাঙা' — কবিতা। কবিতাকে হতে হবে আলোর মতো, রোদের মতো আপেলের মতো, চাই কি প্রেমের মতো, লাল গালের মতো—রক্তময়, কামনাময় উৎসুক। কবিতাকে হবে হতে 'রক্তমাংসময়'—যার শরীরের অলৌকিক আঁচে শরীর তাতিয়ে বয়স্ক শীতে রক্তিম যৌবনকে আমরা ফিরে পাব। সেই লোকোত্তর 'বন্যা' কবি কবে আসবেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করে যেতে হবে, যিনি তাঁর আদিম উল্লাস দিয়ে, তাঁর ত্বকহীন, সভ্যতাহীন জন্মান্ধ আক্রমণ দিয়ে আমাদের সাহিত্যের এইসব চাতুর্য ও কৌশলের অন্তঃসারহীন 'রূপময়' প্রাসাদের প্রসিদ্ধ কীর্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এই সাহিত্যের নীরক্ত মাঠে বইয়ে দেবেন কবিতার কীর্তিনাশা।

১৯৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা ও অন্ত্যমিল

১

কবিতার সঙ্গে ছন্দ ও মিলের সম্পর্ক কবিতার জন্মদিনের মতোই পুরোনো। অবশ্য ছন্দ ও মিলের সঙ্গে কবিতার এই সজীব আত্মীয়তা, সব যুগে ও কালে একই রকম প্রীতিমধুর ছিল, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। অনিশ্চিত, অনুভূতি-কাঁপা, বিরাগ ও ভালোবাসায় বিপন্ন মানবিক সম্পর্কের মতোই, বিভিন্ন সময়ে এই সম্পর্কের তীব্রতায়ও কমবেশি তারতম্য ঘটেছে। কখনো-কখনো ছন্দ, বৈরী যুগ-পরিবেশের ঊষর মরুভূমিতে রুগ্ণ কর্কশ ও চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং কবিতার সজীব উজ্জ্বল চলমানতা থেকে মিল তার অভিমানী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবু সাধারণভাবে কবিতা, ছন্দ ও মিলের সঙ্গে তার আদি ও একান্ত রক্ত-সম্পর্ক থেকে আজ অব্দি বিচ্যুত হয় নি এবং আমার বিশ্বাস, বিরুদ্ধবাদীদের প্রবলতম যুক্তিকে নির্বিঘ্নে উপেক্ষা করেই, পৃথিবীর ঋদ্ধিমান কবিতা, উত্তুঙ্গকে স্পর্শের মহান প্রয়োজনে, ছন্দ ও মিলের বর্ণিল সাম্রাজ্যের দিকে উদগ্রীব হাত, অতীতের মতো আগামীতেও প্রসারিত করবে।

সূচনার প্রথম পর্যায়ে কবিতার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার ছিল আজকের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। কবিতা তখন উজ্জ্বলতম মানবস্বপ্নের ভাষারূপ ছিল না শুধু, কবিতা তখন অসংখ্য সামাজিক তথ্য ও দরকারি খবরের ছন্দময় অনুপম দলিল, জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত সমাজ-মানসের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উপলব্ধির সংগীতাশ্রিত স্থায়ী আধার। লেখন-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার যুগে চৈতন্যবান মানুষেরা তাঁদের ও তাঁদের সমাজ-মানসের মূল্যবান আবিষ্কার ও উদ্ঘাটিত সত্যগুলোকে বহুল-প্রচলন ও দীর্ঘায়ু দেবার দরকারে ছন্দ ও মিলের অনির্বচনীয়তায় গেঁথে দিতেন, যাতে সেই সংগীতস্নিগ্ধ তথ্য ধ্বনিব্যঞ্জনার অনির্বচনীয়তার গুণে মানব-শ্রুতির ঘরে স্থায়ী আসন পায় এবং ছন্দ-মিলের স্বাদুতার কারণে মানুষের রসনায় আবৃত্ত ও উচ্চারিত হয়ে বহুল প্রচারের সৌভাগ্যে অভিষিক্ত হতে পারে। এক কথায়, মুদ্রণযন্ত্রের সহযোগিতায় একালে যেসব সামাজিক তথ্য ও আবিষ্কার গদ্যাকারে গ্রন্থভুক্ত হয়ে মানুষের হাতে-হাতে পৌঁছোচ্ছে, সে সময়, প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক অপর্যাপ্ততার যুগে, সেসব তথ্যকেই মানুষের দরোজায় পৌঁছে দেবার অসংগত ও অপ্রস্তুত দায়িত্ব নিতে হয়েছিল কবিতাকে—ছন্দ ও মিলের সোনার শাম্পানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে দিয়ে। এ-বিষয়ে, মানব-স্মৃতিকে আক্রান্ত করবার ব্যাপারে ছন্দ ও মিলের উজ্জ্বল ও লোকশ্রুত সপারগতার ওপরেই, সে-যুগের মনীষাবানেরা প্রধানভাবে নির্ভর করেছিলেন। এজন্যই, বিষয়ের দিক থেকে কবিতা, প্রাথমিক পর্যায়ে, এমন ব্যাপক, বহুগামী ও বিচিত্র। চাষাবাদ সংক্রান্ত বাস্তব আলোচনা, ধর্মোপদেশ, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জরুরি পরামর্শ, গাণিতিক সূত্র বা সাহিত্য সমালোচনার মতো সুদূর-সম্পর্কিত বিষয়ও, প্রথম অবস্থায়, কবিতায় অনায়াস চারণক্ষেত্র হয়েছে। আমাদের দেশের খনার বচন কিংবা মেয়েলি ব্রতকথা, হেসিয়াদের কবিতার নৈতিক উপদেশাবলি ও ওভিদের প্রণয়কৌশল সম্পর্কিত রচনা, ভার্জিলের কৃষিকর্ম সংক্রান্ত কাব্য, তুলসীদাস কিংবা সাদীর ধর্মীয় ও নীতিমূলক পদাবলি অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক আলেকজান্ডার পোপের কাব্য-সমালোচনা-গ্রন্থ—এসবের বিভিন্ন উদাহরণ। একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প-আঙ্গিক হিসেবে কবিতা তখনো সাহিত্যাঙ্গনে পরিপূর্ণ পদার্পণ করেনি। কবিতা তখনো মূল্যবান সামাজিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে মানব-স্মরণে দীর্ঘকাল লালিত রাখার এবং বহুল প্রচার দেবার অসাধারণ উপযোগী একধরনের প্রতিভাবান সংগীতময় উপায়। কবিতা তখনো ছন্দ-মিল-মধুর একধরনের সুন্দর সুললিত রচনারই নাম, সমাজচৈতন্যের যাবতীয় বাস্তব প্রশ্ন ও সমাধান যার প্রধান বিষয় এবং সেসব বিষয়কে ছন্দ-মিলের অনুপম সৌন্দর্যে দুলিয়ে দিয়ে মানুষের চেতনায় অমর আসন দেবার চেষ্টাই যার মূল লক্ষ্য।

আধুনিক অর্থে সার্বভৌম শিল্পাঙ্গিক হিসেবে কবিতার জন্ম ঘটে এর অনেক পরে—লেখন-ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নততর ও বিকশিত পর্বে—প্রয়োজনীয় সামাজিক আবিষ্কারগুলোকে লিখিত আকারে ধরে রাখবার উপযোগী স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্ভব ও বহুল প্রচারের সমকালে। এর ফলে সমাজ-মানসের বহুকালবাহী ভাবনা ও অর্জিত জ্ঞানকে স্থায়িত্ব দেবার অনর্থক ও অসংগত দায় ছন্দ-মিলের কাছ থেকে প্রথমে লেখন-ব্যবস্থার ও পরে মুদ্রণব্যবস্থার হাতে অর্পিত হয়ে যায় এবং সমাজের বিস্তারিত তথ্য ও জ্ঞান, ছন্দ-মিলের শ্রমবহুল কৃত্রিম ও অস্বস্তিকর নিগড় ফেলে অপেক্ষাকৃত সহজতর মাধ্যম গদ্যকে আশ্রয় করে। কবিতার বিষয়, এই অভাবিত সুযোগে, অর্থহীন তথ্যবহুলতার ব্যাপক ভিড় ফেলে বাইরে বেরোবার পথ পেয়ে যায় এবং চৈতন্যের অনুভূতিময় রাজ্যে নিজের হৃদয়ললিত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে দ্বীপের মতো জেগে উঠতে থাকে।

লেখন ও মুদ্রণ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে কবিতা, সুতরাং, আজন্মকালের অধিকার-এলাকার একটা বিরাট অংশ হারিয়ে ফেলে। সমাজ-চৈতন্যের তথ্যমূলক অংশটি ছন্দ-মিলের সপ্রেম সখ্য ভুলে অভাবিত দ্রুতগতিতে গদ্য-মাধ্যমের কাছে বেহাত হয়ে যায় এবং কবিতার বিশুদ্ধ রূপটি নিটোল মুক্তোর মতো জেগে ওঠার পথ পেয়ে যায়। কবিতা থেকে ছন্দ ও মিলের এই প্রধান প্রয়োজনটি অর্থহীন হয়ে পড়ায় কবিতা-শরীর থেকে এদের বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবত ঘটেছে ঠিক উল্টো। কবিতার সঙ্গে ছন্দ ও মিলের আদিম আত্মিক সম্পর্ক, দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের পৌনঃপুনিক অঙ্গীকারে, বরাবরের মতো আজও অব্যাহত গতিতে বহমান রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলতে চাই যে, কবিতার সঙ্গে ছন্দ ও মিলের এমন একটা নিগূঢ় রক্ত-সম্পর্ক রয়েছে যা অত্যন্ত মৌলিক ও অনিবার্য। নইলে এই নবোদ্ভূত পরিস্থিতিতে কবিতা থেকে এদের বর্জন অবধারিত হয়ে উঠত। আমার বিশ্বাস ছন্দের মতো অন্ত্যমিলও প্রাথমিকভাবে সংগীতপ্রতিভার এবং সেই অর্থে কাব্যপ্রতিভারই অংশ, যেহেতু সাংগীতিকতা মূলত কাব্যপ্রতিভার অন্যতম জীবন-লক্ষণ। কেবলমাত্র ছন্দ-সাফল্যের মধ্যে কবিতার পূর্ণতাকে খুঁজে পাওয়া নিশ্চয়ই অরণ্যে রোদন, তবু এমন দৃষ্টান্তও তো কাব্যক্ষেত্রে বিরল নয়, যেখানে ছন্দপ্রতিভার উজ্জ্বল উদ্ভাসকে প্রায় কাব্য-সাফল্যের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে এর একটি দৃষ্টান্ত অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁর ছন্দপ্রতিভার লোকশ্রুত অসাধারণত্ব, কবিত্বের নানান অনটন সত্ত্বেও তাঁকে উল্লেখযোগ্য 'কবিখ্যাতি' দিয়েছে।

[বললে হয়তো ভুল হব না যে, কাব্যপ্রতিভার যে-কোনো সাফল্যের জন্য ন্যূনতম সংগীতপ্রতিভা অপরিহার্য—অবশ্য তা কাব্যিক অর্থেই। এই সংগীতপ্রতিভা কবিতার পরতে পরতে অবচেতনভাবে প্রবাহিত হয়ে কবিতাকে পরিণত করে তোলে এক জীবন্ত প্রাণসত্তায় যা কাব্যকে চারপাশের সাধারণ অনুজ্জ্বল গতানুগতিকতার ভিড় থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এক নিটোল লাবণ্যে দীপান্বিত করে তোলে। এই সংগীতময়তা কবিতা-শরীরে জাগিয়ে তোলে সুস্মিত ও অপরূপ এক রহস্য, ধ্বনির এক অভাবিত অপরিচিত জীবনময় আবেগ—যার মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর আলাদা স্বকীয় জীবনানুভূতিকে কবিতায় মেলে ধরতে পারেন সজীব পরিপূর্ণতায়। সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্বনিবাদীরা কবিতার সাংগীতিক শক্তির ওপর যে এতটা জোর দিয়েছিলেন তা হয়তো এ কারণেই।]

কবিতার সঙ্গে ছন্দ ও মিলের সম্পর্ক এমন গভীর ও অচ্ছেদ্য যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের কবিতায় তো বটেই, বিশ শতকের এই কাব্যিক নৈরাজ্যের দিনেও এরা কবিতার নিত্যসঙ্গী হাত সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে যায় নি, যদিও প্রভাবের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং এ-যুগের তথাকথিত গদ্যকবিতা, প্রচলিত ছন্দ-মিলের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে দর্পিত বিদ্রোহ রটালেও শেষপর্যন্ত একটা নতুন ছন্দ-ধারণারই জন্ম দিয়েছে।

এযাবৎ আলোচনায় আমি ছন্দ ও মিল শব্দদুটিকে এভাবে একসঙ্গে উচ্চারণ করেছি যা থেকে যে কেউই হয়তো ধরে নেবেন যে, ঐ দুটি শব্দের দ্বারা আমি কোনো একটিমাত্র গুণকে বোঝাচ্ছি। কথাটা সত্যিও তাই। আমার বিশ্বাস, ছন্দ এবং মিল শব্দদুটি নামে আলাদা হলেও এবং কাব্য-প্রেরণার আলোকে কখনো-কখনো এদের আলাদা উল্লেখ অনিবার্য হলেও, মূলত একটিমাত্র সাংগীতিক এককেরই নাম। কবিতায় একটি চরণের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে যে সাংগীতিক তরঙ্গ উদ্দীপিত হয়ে এগিয়ে চলে তার সামঞ্জস্যমধুর, পরিণত ও পরিপূর্ণতম পরিসমাপ্তির নামই তো মিল। এই পরিপূর্ণতা দুটি, তিনটি, চারটি বা আরো বেশিসংখ্যক চরণের মিলের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাঙ্ক্ষিত শম খুঁজে পেতে পারে—কখনোবা দাবি করতে পারে একটি পরিপূর্ণ স্তবকের এবং (ছোট হলে) পূর্ণাঙ্গ কবিতার পরিসর। সুতরাং বলা যায়, ছন্দের সাংগীতিক সম্ভাবনার পরিণততম, স্নিগ্ধতম ও সমাপ্তিমূলক অন্ত্যমিল, যা একটি ছন্দ্য পরিকল্পনার সবচেয়ে সৌকর্যময়, সুস্মিত ও মধুরতম অংশ—যা ঐ বিশেষ ছন্দ-উদ্যোগটিকে পরিপূর্ণ ও ঐশ্বর্যময় সংগীতে উত্তীর্ণ করে তোলে।

সুতরাং অন্ত্যমিল সাংগীতিক পরিপূর্ণতার দিক থেকে ছন্দেরই সহজ, সাধারণ ও যুক্তিসম্মত পরিণতি ; এবং সেই অর্থে অংশ। না, অংশ নয় কেবল, বরং একটি মৌলিক উপাদান। কেননা, সমিল কবিতায় অন্ত্যমিল ঐ কবিতার ছন্দ-পরিকল্পনার প্রত্যঙ্গ-বিশেষ শুধু নয়, পূর্ণাঙ্গ জীবন। কেননা, অন্ত্যমিল—চরণের প্রত্যন্ত পর্বের এই সংগীত-মধুর কমণীয় কণিকাটি, সাংগীতিক সাযুজ্যের ঐ অনিন্দ্য মাধুরীটি, সমস্ত ছন্দ পরিকল্পাটির শরীরে, নীলিমায়, গাছ আকাশ পৃথিবীর রূপের ওপর সন্ধ্যার (দিনের স্বপ্নিল বিদায় মুহূর্তটির) মতোই সংগীতের এমন অনির্বচনীয় স্বর্ণাঞ্জন মাখিয়ে দেয় যে সেই অন্তিম সৌন্দর্যের অনুপম কমনীয়তার স্পর্শে সেই ছন্দ-পরিকল্পনাটি হলুদ-ছোপানো রূপসীর মতোই সুস্মিত সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে ওঠে। এখানেই শেষ নয়। অন্ত্যমিলের সংযোগ কবিতার ছন্দ-পরিকল্পনাকে ভারসাম্যময় করতেও সহায়তা করে। দেখা যাবে, সমিল কবিতায় অন্ত্যমিল চরণ ও স্তবককে সুস্পষ্ট ও নিটোল পরিসমাপ্তিতে নিয়ে আসে বলেই ঐসব চরণ বা স্তবকের অন্তর্গত ছন্দপ্রবাহ সুঠাম সুডৌল ও পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ফলে উঠতে পারে। এটা আরো বেশি করে ঘটে ছন্দের উদ্দেশ্যহীন ও অর্ধমনস্ক গতিকে অন্ত্যমিল সুনিয়মিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে বলেই। অন্ত্যমিলহীন মুক্তকের কবিতায় যে ছন্দের লক্ষ্যহীন উদাস গতি নিষ্ক্রিয় সংগীতহীনতার ভেতর বিস্রস্ত হয়ে আসে, সমিল কবিতার সুনিয়মিত নিয়ন্ত্রণের ভেতর সেই ছন্দই সজীব, স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়ে প্রকাশ পায়। বাংলা গৈরীশ ছন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দকে পাশাপাশি রাখলেই এই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

ছন্দের সম্পন্নতম বিকাশের জন্য অন্ত্যমিল শুধু প্রয়োজনীয় নয়, প্রায় অপরিহার্য। এর জন্য উদাহরণ-চয়ন নিষ্প্রয়োজন ; ছন্দ-সম্ভাবনার মহত্তম দৃষ্টান্ত মাত্রই এর উদাহরণ। ছন্দের অন্তর্নিহিত সংগীতকে শক্তি ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণতম বিকাশে উত্তীর্ণ করা ছন্দের সঙ্গে অন্ত্যমিলের পরিপূর্ণতম সহযোগের ফলেই সম্ভব। একটি সার্বিক ছন্দ-পরিকল্পনায় অন্ত্যমিল হল সেই আকাঙ্ক্ষিত যতি, সেই ঈপ্সিত সমাপ্তি, সংগীতের সেই বিরতিপরায়ণ সুস্মিত পূর্ণতা যা সেই ছন্দ-পরিকল্পনাটিকে পর্বপরম্পরায় এগিয়ে দিয়ে তাকে একটি সামগ্রিক সাংগীতিক নিটোলতায় উত্তীর্ণ করে। অন্ত্যমিলের সহযোগ ছন্দকে সাংগীতিক সম্ভাবনার উত্তুঙ্গকে স্পর্শের ব্যাপারে যে সাহায্য করে তার অন্যতম কারণ : যত অল্প পরিমাণেই হোক, অন্ত্যমিল ছন্দ-শরীরে সাংগীতিক মূল্য যোগ করে। কবিতাকে যদি আখ্যায়িত করা যায় 'সাংগীতিক উক্তি' বলে, তবে অন্ত্যমিল কবিতা-দেহে সাংগীতিক মূল্য জুড়ে দিয়ে কবিতার সেই কাব্য-মূল্যকেই বাড়িয়ে তোলে। অন্ত্যমিল যে ছন্দশরীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমবেশি সাংগীতিক মূল্য যোগ করে, তার প্রমাণ কবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার সাঙ্গীতিক মূল্যের অনিবার্য হ্রাস। অবশ্য ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই বক্তব্যের দোর্দণ্ড প্রতিপক্ষ মধুসূদনের মহান অমিত্রাক্ষর। জীবনানন্দের মতো অনেকের গদ্যছন্দেও (উদাহরণত রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতার 'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী / মেঘলোকে উধাও পৃথিবী / গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী / নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কমলন্দ্রমুখরা পৃথিবী' কিংবা জীবনানন্দ দাশের 'অন্ধকার' কবিতার 'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত / আমাকে কেন জাগাতে চাও? / হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া/ আমাকে জাগাতে চাও কেন'—এ সবে এর বিপরীত প্রমাণ দুর্লক্ষ্য নয়। কাব্য বা ছন্দ-শিরায় প্রচণ্ড প্রবহমানতা সঞ্চারিত করে কিংবা শব্দের সাংগীতিক সম্ভাবনাকে অসাধারণ পর্যায়ে উদ্ঘাটন করে এই সাফল্য সম্ভব। অন্যথায় কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের নির্বাসন, সাধারণভাবে, ছন্দের সাংগীতিক মানকে অনটন কবলিত করে দিতে বাধ্য।

সাধারণ মানুষের কাছে 'ছন্দ' ও 'মিল' শব্দদুটি প্রায় সমার্থক, অন্তত এ দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁরা খুব একটা সচেতন নন। ছন্দ শব্দটিকে মিলের প্রতিশব্দ হিসেবে ধরে নেয়ায় তাঁরা প্রায়শই কবিতায় মিলের অনুপস্থিতিকে ছন্দের অনুপস্থিতি বলে ধরে নেন। অন্তত এরকমটাই করেছিলেন তাঁরা তিরিশের যুগে—কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের বর্জনকে ছন্দ-বর্জন বলেই ধরে নিয়েছিলেন, অন্ত্যমিলহীন কবিতাকে বলতে শুরু করেছিলেন 'ছন্দহীন কবিতা'। এই বিভ্রান্তির ফলে (যার উৎস ছন্দ ও মিলের মৌলিক অভিন্নতার মধ্যে নিহিত বলেই আমি মনে করি) রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার সময় পর্যন্ত কাব্যরুচিতে পরিশীলিত ও বিদগ্ধ বহু পাঠকও ঐ শব্দদুটিকে সমার্থক ভাবতেন। [কেবল ভাবতেন নয়, ছন্দ ও মিল—এ দুয়ের অভিন্নতার ব্যাপারে তাঁদের ধারণা যে কতখানি গভীর ছিল তা একটি ঘটনা থেকে টের পাওয়া যায়। অন্ত্যমিল ও 'পদ্য ছন্দ' বর্জন করতে গিয়ে ঐ বর্জন যে কাব্যবিরোধী নয় তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সে-সময় যে অসাধারণ উজ্জ্বল ও মেধাবী কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেসবের পরেও এই বিষয়টি সে-সময়কার রীতিমতো অগ্রসর পাঠকের কাছে এমন উদ্ভট ও সৃষ্টিছাড়া মনে হয়েছিল যে তাঁরা ঐ অদৃষ্টপূর্ব কাব্যাঙ্গিকটির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য স্বয়ং কবিগুরুর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পাঠকদের এই দাবি শেষপর্যন্ত এমন জোরালো হয়ে উঠেছিল যে প্রতিকারে রবীন্দ্রনাথকে, প্রকাশ্য সভার আয়োজন করে, একালের পক্ষে হাস্যকর এমন সব তুচ্ছ ও অর্থহীন বিষয়ও ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল যে অন্ত্যমিল, ছন্দের মতো, কবিতার কোনো অপরিহার্য উপাদান নয় এবং কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের বর্জনকে ছন্দ-বর্জনের নামান্তর ভাবা একটি কাব্যিক বিভ্রান্তি। এইসঙ্গে তাঁকে আরো বোঝাতে হয়েছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ও অতিনিরূপিত ঝংকারের বাইরে গিয়েও স্বাভাবিক গদ্যছন্দে কবিতা-রচনা একটা আলাদা ব্যাপার এবং এই নতুন রীতির আবৃত্তিধারাও পূর্বতন অভ্যস্ত পঠনপদ্ধতি থেকে আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকের মধুসূদন যদিও এই অভ্যস্ত ধারণাটির বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তবু কবিতায় অন্ত্যমিলের অনুপস্থিতিজনিত সাংগীতিক ঘাটতি তিনি পূরণ করেছিলেন ছন্দ-শরীরে ধ্বনিব্যঞ্জনার এমন উদ্দাম প্রবহমানতা সঞ্চার করে এবং শব্দের সংগীত-সম্ভাবনাকে এমন অবিশ্বাস্য পর্যায়ে বাড়িয়ে তুলে যে তাঁর সেই সাংগীতিক বিদ্যুতোদ্ভাসের আড়ালে অন্ত্যমিলের প্রতিভাবান অব্যবহার সবার দৃষ্টি এড়িয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে ছন্দমিলের মধুর নিক্বণে লালিত ও অভ্যস্ত কাব্যপাঠকের চেতনা কিন্তু মধুসূদনের আকস্মিক ও সৃষ্টিছাড়া নিয়মভঙ্গের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রতিবাদ তোলেনি, তুলেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, তিরিশের যুগে—কাব্য ও সংগীত-প্রেরণার দিকে থেকে অপেক্ষাকৃত নিষ্পত্র ও নীরক্ত এক কালে। অন্ত্যমিলের নির্বিচার বর্জনের মধ্যে এই সময়কার পাঠকেরা কবিতার সম্পন্ন সম্ভাবনার স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন অধঃপতনকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর কারণ, আমার বিশ্বাস, কবিতার অন্ত্যমিল-বর্জনঘটিত সাংগীতিক শূন্যতাকে মধুসূদন যে প্রচণ্ড ও বেগবান সংগীতৈশ্বর্য দিয়ে পূরণ করেছিলেন, তিরিশের কবিতা, বিক্ষিপ্ত সাফল্য বাদে, তা করতে সাধারণভাবে সমর্থ হয়নি, এমনকি বৃদ্ধ বয়সের রবীন্দ্রনাথও (যাঁর কবিতার অসাধারণ সাংগীতিক-শক্তি ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান শৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করেছিল) সর্বত্র নন। এই পত্রহীন ঊষর সময়ে, কবিতায় অন্ত্যমিলের অব্যবহারঘটিত সাংগীতিক অনটনকে বৈভবশালী সংগীতস্পন্দনে প্রাণবন্ত করে সমিল কবিতার সমকক্ষতায় ধারণ করতে পারতেন যে লোকশ্রুত বংশীবাদক—নতুনের কেতন-ওড়ানো বাংলা কবিতাঙ্গনের সেই ধৃষ্ট ঝোড়ো তরুণ, নজরুল ইসলাম, সংগীতের অমিত সম্ভাবনার উচ্চতম শিখরকে স্পর্শের প্রয়োজনেই হয়তো, অন্ত্যমিল বর্জনের অসাংগীতিক ও অবক্ষয়ী পথ প্রথম থেকেই বর্জন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত, (বাংলা সাহিত্যের মতো উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের কথা মনে রেখেও) ছন্দ ও মিলকে কবিতার একটি অভিন্ন ও অবধারিত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই দেখেছেন এবং কবিতাকে প্রধানভাবে ছন্দ-মিলবদ্ধ একটি সংগীতমধুর বক্তব্য বলে মনে করেছেন।

আগেই বলেছি, সাংগীতিক অর্থে ছন্দ ও অন্ত্যমিল বিষয়দুটি আমার কাছে সমার্থক এবং কবিতাকে উচ্চতম পর্যায়ে স্পর্শ করতে হলে ছন্দের মতো অন্ত্যমিলকেও আমি অপরিহার্য বলেই মনে করি (যদিও কবিতার ভেতরের ও বাইরের দরকারে, কাব্য-শরীর থেকে অন্ত্যমিলকে নির্বাসন দেয়া, কখনো-কখনো অভিপ্রেত ও অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে পারে।) অন্ত্যমিলের এই পরস্পরবিরোধী ও অনিশ্চিত আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া অবশ্য সম্ভব। সংগীতের উত্তুঙ্গতম শিখরকে স্পর্শ করা ও অবিমিশ্র সংগীতের নিরঙ্কুশ উৎসারই যদি কবিতার একমাত্র লক্ষ্য হতো, তবে ছন্দ ও অন্ত্যমিল অবশ্যই কবিতায় অচ্ছেদ্য ও মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখা দিত। কিন্তু সংগীত কবিতার একমাত্র নিয়ামক নয় বলে ক্ষেত্র-বিশেষে, কবিতার অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে পূর্ণতর বিকাশে উত্তীর্ণ করার দরকারে, এক সীমিত ও অক্ষতিকর পরিমাণে একে বিসর্জন দেয়া চলতে পারে। অন্ত্যমিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাবাহুল্য, কবিতার ছন্দ পরিকল্পনার সবচেয়ে সহজ ও বর্জন-সাপেক্ষ উপাদান বলে সহজেই তা এ এধরনের উদ্যোগের সর্বপ্রথম শিকার হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং, বলা যায়, অন্ত্যমিল হচ্ছে ছন্দের সেই অংশ, কবিতাকে ফলবান করার প্রয়োজনে সময়-বিশেষে, ছন্দ থেকে যার বিচ্যুতি ঘটান যায় ; এবং কবিতার মহত্তম শীর্ষকে স্পর্শের লক্ষ্যে এই বিচ্যুতি তখনই মূল্যবান বিবেচিত হয় যখন এই বিচ্যুতিঘটিত সাংগীতিক শূন্যতার ক্ষতিপূরণ, ভিন্নতর কোনো সাংগীতিক উপায়ে নিশ্চিত করা যায়। (সংস্কৃত কবিতা সাধারণভাবে এর একটি উদাহরণ, যেখানে ছন্দের কৃত্রিম ধ্বনিতরঙ্গের সৌন্দর্য ও শব্দবন্ধের রাজসিক মহিমা অন্ত্যমিলের সাংগীতিক দরকারকে গৌণতর করে দিয়েছিল)। অন্ত্যমিল ছন্দকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়ে কবিতার সংগীত-সম্ভাবনাকেই পরিপূর্ণতায় ফলিয়ে তোলে ; এবং সেই অর্থে সামগ্রিক কবিতার ঋদ্ধিকেই।

৩

আগেই বলেছি, কবিতার সঙ্গে ছন্দের মতো অন্ত্যমিলের সম্পর্কও, দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত ডিঙিয়ে এমন অভিন্ন ও স্থায়ী রূপ পেয়ে গেছে যে এই আত্মীয়তাকে রক্তসম্পর্ক বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। বহুযুগপরীক্ষিত এই অপরাজিত বিরল সখ্য অন্তত একটা বিষয় স্পষ্ট করে তোলে যে কবিতার সঙ্গে অন্ত্যমিলের কোনো-না-কোনো জায়গায় গভীর আন্তরিক ও রহস্যময় যোগাযোগ রয়েছেই এবং কবিতার কাছে অন্ত্যমিল, ছন্দের মতোই, মানবচৈতন্যের একটি রহস্যময় মৌলিক দাবি। তবু বিভিন্ন যুগে, ছন্দ না হলেও অন্ত্যমিল, ক্ষেত্রবিশেষে কবিতা থেকে বর্জিত হয়ছে। কেন হয়েছে, তার কারণ খানিক আগে উল্লেখ করেছি। কবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনের প্রথম জরুরি প্রয়োজন অনুভূত হয় আখ্যানকাব্যে, সমিল কাহিনী বর্ণনার দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য বিষয়টিকে কবির পক্ষে সুসহ ও সাবলীল করার দরকারে। অবশ্য আখ্যানকাব্যে অন্ত্যমিল বর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয় আরো দুটি কারণে : এক, ছোট আয়তনের গীতিকবিতায় আবেগ ও কাব্যপ্রেরণার উদ্বেল তীব্রতার মুখে যে অন্ত্যমিল অবলীলায় কবির হাতে ধরা দেয়, কাহিনীকাব্যের দীর্ঘ ও বিবৃতি-প্রধান ঊষরতার মধ্যে, কাব্যপ্রেরণার অধঃপতিত স্তরে, প্রায়শ তা প্রাণহীন ও সশ্রম আঙ্গিক-চর্চায় অধঃবসিত হয়ে যায়। দুই, মানবজীবনের সংগ্রাম ও অস্তিত্বের বিচিত্রমুখ আলেখ্য রচনাই যেহেতু আখ্যানকাব্যের প্রধান লক্ষ্য, মানবচৈতন্যের সংগীতময় স্রোতময় উৎসার নয় (এডগার এ্যালান পো অবশ্যি এর উল্টো বিশ্বাস ধারণ করতেন। যেহেতু তাঁর মতো ছিল যে আখ্যানকাব্য এমনকি মহাকাব্যও সত্যিকার কবিতার বিচারে আসলে কতকগুলো উজ্জ্বল, খণ্ডিত ও দীপান্বিত গীতিকবিতারই সমষ্টি এবং এসবের মধ্যবর্তী দীর্ঘ, বিবৃতিমূলক, ঊষর অংশগুলো অকাব্যের নামান্তর, সুতরাং মহাকাব্যকেও গীতি-চৈতন্যের সজীব ও স্বাস্থ্যময় প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়), সুতরাং গীতিকবিতার কাছে যে পরিমাণ সংগীতৈশ্বর্য প্রত্যাশিত, আখ্যানকাব্যের কাছে ততটা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখ্যানকাব্যের একটি ধারা অন্ত্যমিল বর্জন করলেও আশ্চর্যভাবেই, অন্য একটি অংশ অন্ত্যমিলের সঙ্গে সুদূরকালীন মিত্রতা কিন্তু অটুট রেখেছে। বর্তমান শতাব্দীতে আখ্যানকাব্য সংখ্যাল্পতায় পাণ্ডুর কিন্তু সুদূর হোমার, ভার্জিল, ফেরদৌসী থেকে প্রবাহিত হয়ে দান্তে বা চসারের মতো মহৎ কবি এমনকি বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের আখ্যান কবিতা এর পরিচিত উদাহরণ। সুতরাং, আখ্যানকাব্যের পক্ষে অন্ত্যমিল বর্জনের ব্যাপারটি বহুজায়গায় প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিলেও, সার্বিক কাব্যরীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য হয়েছে। তাছাড়া, উদ্ভবের প্রথম পর্ব থেকে, গীতিকবিতা অন্ত্যমিল বর্জনের উদ্যোগ থেকে অনিচ্ছুক মুখ সবসময় ফিরিয়েই রেখেছিল।

ইউরোপীয় গীতিকবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনের প্রথম ও ব্যাপক প্রবণতা দেখি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের দিকে, ফরাশি প্রতীকবাদী আন্দোলনের শেষপর্বে। অবশ্য উনিশ শতকের শেষদিকের ফরাশি, আমেরিকান ও ইংরেজি কবিতায় এই প্রবণতার খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত প্রয়াস দুর্লভ নয়, যদিও ক্যাব্যাঙ্গিকের সাধারণ নিয়ম হিসেবে এর দাবি তখনো ব্যাপক হয়নি। মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেই এই প্রবণতা ব্যাপ্ত ও সর্বগ্রাসী রূপ নেয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন, সে সময়কার অবক্ষয়দষ্ট নৈরাজ্যের দুরপনেয় প্রশ্রয়ে, উন্মত্ত দাবানলের মতো সমগ্র পশ্চিমি কাব্যাঙ্গনকে অশুভ আক্রমণে অধিকার করে ফেলে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিকাশোন্মুখ নন্দন-চৈতন্যকে ক্ষতিকর বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়ে সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর দিকেও হাত বাড়িয়ে দেয়। পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অনুন্নত দেশগুলোতে মূল্যবোধের অরাজকতা কাব্যাঙ্গিকের এই সুলভ সহজীকরণটিকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে। পশ্চিমা দেশগুলোর বিপর্যস্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে এই কাব্যাঙ্গিক ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং অন্ত্যমিল বর্জনের মধ্যে ক্যাব্যাঙ্গিকের নতুন দিগন্তের উন্মোচন এবং প্রকৃত কাব্যানুভূতির দুঃখময় অসহায়তাকে প্রত্যক্ষ করে। অনুন্নত দেশগুলোয় কাব্যের সুস্পষ্ট ও ঐশ্বর্যবান ঐতিহ্যের অনুপস্থিতিতে বহু ক্ষেত্রেই, অন্ত্যমিলের এই সহজ বর্জন দায়িত্বহীন তরুণ-কবিদের সামনে সুলভ কবিখ্যাতির এক অভাবিত দরোজা উন্মুক্ত করে এবং অন্ত্যমিলহীনতার এই অবাধ সুযোগ বিভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মহলের দ্বারা এমন বিচিত্র ও অকাব্যিক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে যে প্রকৃত কবিতার ভবিষ্যৎ, শৈল্পিক অর্থে, প্রদোষাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

অন্ত্যমিল বর্জনের দুই সেকালীয় প্রধান নায়ক—এজরা পাউন্ড ও টি.এস. এলিয়ট—কবিতা থেকে অন্ত্যমিল নির্বাসনের ব্যাপারে যতখানি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ তার চেয়ে বেশি ছিলেন নিজেদের কবিতাকে ঐ মতবাদের বাহন করে তোলার ব্যাপারে তৎপর। অবশ্য তাঁদের সময়কার পৃথিবীর প্রায় কোনো ভাষার কবিতাতেই, ঐ আন্দোলনের উদ্যোগী হোতারা, অন্ত্যমিল উৎখাতের জেহাদি অভিযানে মোটেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। কিন্তু অন্ত্যমিল এযাবৎকালের পাঠকচিত্তের অন্যতম শক্তিশালী প্রবণতা বলে তাঁদের এই প্রতিবাদী অভিযান অচিরেই এক বিপুল সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় এবং এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমুল দ্বৈরথে আত্মপক্ষকে সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে তাঁরা অন্ত্যমিলের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাটুকুকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসেন। তাঁরা অন্ত্যমিলকে কাব্যমুক্তির পরিপন্থী, কৃত্রিম, আধুনিক যুগের পক্ষে অগ্রহণযোগ্য ও কাব্যের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি শিশুতোষ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেন। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য* গ্রন্থে এই দলের জনৈক উৎসাহী কবির গর্বিত উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। কবিতাটি গুজরাটি ভাষার :

ছন্দ বন্ধ বস্তু লম্নী
ছট ফট্ ফট্ মনি ব্রেচি
ড্যামনিট এ্যামিট্রা ইদংটে
প্রে ইট ইজ পেয়েট্রি অদাং।

আগেই বলেছি, সাধারণ পাঠকের কাছে সেকালে ছন্দ ও মিল শব্দদুটি প্রায় সমার্থক ছিল বলে এবং অন্ত্যমিল বর্জনের কারণে কবিতায় গদ্যছন্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়েছিল বলে সমাকালীন বিহ্বল পাঠকসমাজ অন্ত্যমিলের বর্জনকে সাধারণভাবে ছন্দ বর্জন বলেই মনে করেছিলেন। এই মতবাদের উদ্যোক্তারা অবশ্যি প্রথমেই ছন্দ ও অন্ত্যমিলের অভিন্নতাঘটিত দীর্ঘকাল লালিত ধারণাটির দ্রুত অপনোদনে সক্রিয় হন এবং বোঝাতে থাকেন যে বাহ্যত অবিভাজ্য মনে হলেও আসলে ছন্দ ও অন্ত্যমিল দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা এবং ছন্দের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য ও অনিবার্য হলেও অন্ত্যমিল কবিতার একটি অপ্রয়োজনীয় ও আরোপিত বিষয়।

কবিতায় অন্ত্যমিল বর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় অমোঘ হয়ে দেখা দিলেও সমস্ত যুগেই প্রচলিত কাব্যাঙ্গিকের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য হয়েছে। হয়তো এই কারণেই, এই প্রয়াসের উদ্দীপ্ত উদ্যোক্তারা, নিজেদের মতবাদটিকে কবিতার সাধারণ নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এমনিভাবে অন্ধ হয়ে উঠেছেন—বর্তমানের মতে অতীত যুগেও ; এবং অন্ত্যমিলকে কবিতার অসংগত, অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপাদান বলে প্রমাণ করার জন্য হয়েছেন ক্ষান্তিহীন। প্রাচীন ও একালীয় যেসব লেখকের হাতে অন্ত্যমিল সবচেয়ে নির্মম আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে—মিল্টন, আমার বিশ্বাস, তাঁদের অন্যতম। *প্যারাডাইস লস্ট* কাব্যের ভূমিকায় অন্ত্যমিল বর্জনের যুক্তি হিসেবে তাঁর বক্তব্য অনেকাংশে একপেশে ও দুঃখজনক :

> The measure in English heroic verse without rime, as that of Homer in Greek and of Virgil in Latin—rime being no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse, in longer poems especially, but the invention of a barbarous age, to set off wretched matter and lame metre; graced indeed since by the use of some famous modern poets, carried away by custom, but much to their own vexation, hindrance and constrained to express many things otherwise, and for the most part worse, than else they would have expressed them. Not without cause therefore some both Italian and Spanish poets of prime note have rejected rime both in longer and shorter works, as have also long since our best English

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

tragedies, as a thing of itself, to all judicious ears, trivial and of no true musical delight ; which consists only in apt numbers, fit quantity of syllables, and the sense variously drawn out from one verse into another, not in the jingling sound of like endings—a fault avoided by the learned ancients both in poetry and all good oratory. This neglect then of rime so little is to be taken to a defect, though it may seem so to vulgar readers, that it rather is to be esteemed an example set, the first in English, of ancient liberty recovered to heroic poem from the troublesome and modern bondage of riming.

অন্ত্যমিলের বিরুদ্ধে এমন সংক্ষিপ্ত, দীপ্র ও ক্ষমাহীন আক্রমণ বিরল, অন্ত্যত অন্ত্যমিলের সপক্ষে এর অর্ধেক প্রতিভাসম্পন্ন যুক্তিও এযাবৎ আমার চোখে পড়েনি। এ–কথা সত্যি যে প্রথম জীবনের অন্ত্যমিলবহুল কবিতার মৌসুম পেরিয়ে জীবনের ঊষর নিঃসঙ্গতায় কাহিনীকাব্যে হাত দিয়ে মিল্টন নিশ্চিত উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পরিকল্পিত ঐ লোকশ্রুত মহাকাব্যটিকে কাহিনীর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের দরকারে অন্ত্যমিল বর্জন তাঁর জন্য জরুরি। কিন্তু এই দরকারটিকে বৈধ প্রমাণ করার প্রয়োজনে কবিতার দীর্ঘকাললালিত ও প্রায়–অচ্ছেদ্য এই বৈশিষ্ট্যটিকে এমন অবলীলায় 'নো নেসেসারি এ্যাডজাংক্ট আর টু অরনামেন্ট অফ পোয়েম অর গুড ভার্স' অথবা 'ইনভেনশন অফ এ বার্‌বারাস এজ টু সেট অফ রেচেড ম্যাটার এন্ড লেম মিটার' বলে প্রত্যাখ্যানের দৃপ্ত রটনাকে শেষ অব্দি প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াই বলতে হবে। কেননা অন্ত্যমিলে সাংগীতিক আনন্দের প্রশ্রয় নেই—আজীবন ছন্দমিলমধুর এতগুলো অনবদ্য কবিতা লেখার পরে একজন কবির পক্ষে এ–কথার আবৃত্তিকে আমার কাছে সত্যের অপলাপ বলেই মনে হয়। তাছাড়া অন্ত্যমিল বর্জনকে একটা ছোট্ট দুর্বলতা হিসেবে কবুল করার পরপরই ঐ দুর্বলতার শনাক্তকারীকে 'ভালগার রিডার'–এর শিরোপা পরাবার মতো বিপত্তিকর সিদ্ধান্তটি আশা করি খুব অভিনন্দনযোগ্য নয় ; এবং আমার বিশ্বাস, এসব মন্তব্য কবির নিজস্ব চিন্তার স্ববিরোধিতা ও মৌলিক দুর্বলতারই প্রতীক। আমার মনে হয় তথ্যগত অসম্পূর্ণতা ও বিভ্রান্তি মিল্টনের যুগকে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারার স্বচ্ছ ও নির্ভুল অনুধাবনের পাটাতন দেয়নি, না হলে এ–যুগের প্রাগ্রসর পাঠকদের মতো তিনিও উপলব্ধি করতেন যে তাঁর উল্লিখিত 'এনসিয়েন্ট' কাব্যচিন্তা কবিতায় অন্ত্যমিলের অপরিহার্যতা অনুভব করেছিল যতটা, অন্ত্যমিল থেকে মুক্তি সে পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা করেনি এবং অন্ত্যমিল 'ট্রাবলসাম' হলেও মোটেই আধুনিককালের উদ্ভাবন নয়।

একালের সমালোচকদের অনেকে রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন। এঁদের আলোচনায় অপ্রত্যাশিত চমক দেবার অসাহিত্যিক প্রবণতা যে সম্পূর্ণ অসুলভ, এমন কথা বলা যাবে না, কিন্তু অনেকের উক্তি নিশ্চিত ও প্রবুদ্ধ অন্তরোপলব্ধির ফল। এই ধারণার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা নিঃসন্দেহে আবু সয়ীদ আইয়ুব, যিনি বিশ্বাস করেন যে, 'রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠতর ফসল ফলেছিল তাঁর শেষ দশকের কর্ষণে'। বাংলাদেশে এই ধারার তরুণ সমালোচকদের একজন হচ্ছেন সনৎকুমার সাহা, যিনি 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে' শীর্ষক আলোচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কিছু কবিতাকে 'ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে' কবি হিসেবে তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয় বলে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে : 'পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য গবেষকের প্রয়োজনের বাইরে রবীন্দ্রনাথ যদি তখন [আগামী যুগের বাংলাদেশে] আদৌ কোনো বিরাট প্রভাব হিসেবে বেঁচে থাকেন তবে তা হবে তাঁর অন্যতর সৃষ্টি, অন্যতর রচনার (সম্ভবত তাঁর আঁকা ছবি, স্বদেশ-সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধ, অল্পসংখ্যক গান ও শেষের দিকের কিছু কবিতার) জন্য, এই মুহূর্তে যদিও বাংলাদেশে তাদের নিয়ে উৎসাহ নিতান্ত বিরল। তবে সেই প্রভাবই থাকতে পারে কেবলমাত্র খণ্ডিত শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে, জীবনে সর্বব্যাপ্ত হয়ে নয়।'

এই ধরনের খণ্ডিত, অগভীর ও সংকীর্ণ বক্তব্যকে আমার পক্ষে মেনে নেয়া দুরূহ, অন্তত উদ্ধৃত উক্তির কাব্যসংক্রান্ত বক্তব্যটুকুকে। আমার মনে হয়, শিল্পমূল্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু বিষয়বস্তুকে কবিতা ভাববার প্রসিদ্ধ বিভ্রান্তি থেকেই এ-ধরনের একপেশে কাব্যবিশ্বাসের জন্ম। সত্য যে রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতায় জীবনোপলব্ধির গভীরতা আগের তুলনায় সংহততর ও ঋদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রবুদ্ধ জীবনোপলব্ধিকে ধারণ করার উপযোগী কবিত্বশক্তি তখন তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে কাব্যক্ষেত্রে *মানসী* থেকে *বলাকা* পর্বেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতর ফসল উপহার দিয়েছেন ; এর পর তাঁর পতনের যুগ। এর পর তাঁর জীবনবোধ মহত্তর পরিণতি প্রত্যক্ষ করলেও কবিকল্পনা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়, চিত্রকল্প উদ্ভাবনহীন ও আত্ম-অনুকৃতিময়, হৃদয়াবেগ স্তিমিততর (অন্তত তাঁর কবিতার মহত্তম সম্পদ—তাঁর বিস্ময়কর সংগীতৈশ্বর্য—যা তাঁর কবিতাকে সাফল্যের সৌকর্যময় তাজমহলের বাসিন্দা করেছিল—তাও এক ক্ষতিকর ও পরিত্রাণহীন ক্রমাবনতির শিকার। একটা কথা যেন না ভুলি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধানতম ঐশ্বর্য সংগীত, জীবনবোধ বা চিত্রকল্পনা নয়।) ঋদ্ধিমান জীবনানুভূতি তাঁর কবিতাকে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাঁর কবিতাকে সাফল্যের উন্নততম শিখরে উত্তীর্ণ করেছিল তাঁর অনন্যসাধারণ সংগীতৈশ্বর্য। আমার তো মনে হয় জীবনবোধের মূল্যে তিনি যদি হন পৃথিবীর উঁচুদরের মাঝারি কবি, তবে সংগীত-কল্পনার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠতমদের প্রতিযোগী। অন্তত এরকম একটা অনুভূতিই ব্যক্ত করেছিলেন এজরা পাউন্ড যখন রবীন্দ্রনাথকে 'আমাদের সবার চেয়ে মহান' বলে আখ্যায়িত করার সময়ে তাঁর কবিতার অসামান্য সংগীতসম্পন্নতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

পাঠকের হয়তো স্মরণ থাকতে পারে যে, *গীতাঞ্জলি-বলাকা* পর্বে রবীন্দ্রনাথ, হুইটম্যানের কাব্যালোচনা উপলক্ষে, কবিতা থেকে অন্ত্যমিল-বর্জন-প্রবণতার বিরুদ্ধেই তাঁর বক্তব্য দাঁড় করিয়েছিলেন এবং ঐ আলোচনায় কবিতা থেকে প্রচলিত পদ্যছন্দের পরিহারের ও গদ্যছন্দের প্রশ্রয়ের ব্যাপারটিকে ছন্দের সামগ্রিক অস্বীকার বলেই ধরে নিয়েছিলেন এবং এ-ধরনের উদ্দেশ্যহীন পরিহারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবিতার অনির্বচনীয়তার বেদনাদায়ক অপমৃত্যু। বিষয়টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতূহলোদ্দীপক। কেননা, কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের নির্বিচার বর্জন এবং কবিতায় গদ্যছন্দের অপ্রতিহত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলি–বলাকা* পর্বে—তাঁর জীবনব্যাপী ছন্দকল্পনার সবচেয়ে সম্পন্ন ও ঐশ্বর্যময় পর্যায়ে—সেই একই রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ ও অন্ত্যমিল–সম্পর্কিত তাঁর আজীবনের ঐ অবিচল বিশ্বাসটিকে আকস্মিকভাবে বদলে ফেললেন *পুনশ্চ* পর্বে এসে। ফলে কবিতায় ছন্দের অনিবার্যতাকে প্রশ্রয় দিলেও অন্ত্যমিলের অপরিহার্যতাকে ব্যাপকভাবে অস্বীকার করলেন যাতে তাঁর কাব্য–বক্তব্য শেষপর্যন্ত এমনটা দাঁড়াল যে রসবস্তুই যেহেতু কাব্যের মৌলিক আত্মা, সুতরাং পাঠকহৃদয় জয়ই কবিতার প্রধান ব্যাপার, তা সে গদ্যের পদাতিক দিয়েই হোক আর পদ্যের অশ্বারোহী দিয়েই হোক।

কেন হল এমনটা? যে রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলি–বলাকার* ঐশ্বর্যময় পর্বে অন্ত্যমিলের সাংগীতিক সৌন্দর্যে ও ছন্দের সুস্মিত ধ্বনিমাধুর্যের ভেতর অনির্বাচনীয়তার লোকাতীত স্পর্শ দেখেছিলেন, *পুনশ্চ* পর্বে তিনি কবিতার ঐ দুটি মৌলিক উপাদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ ও উপেক্ষাময় হয়ে উঠলেন কেন? কেন হলেন উদ্বেলিত নব্যযুবকদের মতো উৎসাহতাড়িত? একি তাঁর শক্তি? নাকি শক্তির মহান শীর্ষ থেকে নিঃশব্দে ঝরে যাবার বেদনার্ত বিধিলিপির বর্ণিল উৎসাহমুখর মুখচ্ছদ? শক্তি তো নিঃসন্দেহে, কেননা অনায়াসেই বোঝা যায় যে *পুনশ্চ* পর্বের পরীক্ষানিরীক্ষা ছন্দ–ক্ষেত্রে তাঁর জীবনব্যাপী নিদ্রাহীন নতুনত্ব সন্ধানেরই ফসল। উপরন্তু, এই পরীক্ষার সমকালে, ছন্দবিষয়ে রচিত বহুসংখ্যক প্রবন্ধে তিনি ঐ নতুন ছন্দপ্রয়াসের প্রশ্রয়ে কাব্যমুক্তির যে বিপুল সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয় যে, গদ্যছন্দ প্রবণতা বা অন্ত্যমিল বর্জন (যাকে বলা যায় গদ্যছন্দের অঙ্গনে প্রবেশ–দরোজা) তাঁর কবিতায় উদ্দেশ্যহীন, জড় ও নিশ্চল প্রকরণ মাত্র নয়, কিংবা নয় সমকালীন ইয়োরোপীয় ছন্দ–ভাবনার মৃত ও উদ্দেশ্যবর্জিত অনুকৃতি ; বরং কাব্যের নতুন দিগন্ত–সন্ধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি নতুন ছন্দোদ্যোগ, যা তাঁর হিসেবে কাব্যবিষয়ের পরিবর্তিত পদপাতের অনুকূল এবং প্রচলিত ছন্দরীতিকে প্রত্যাখান করলেও নতুন ছন্দপদ্ধতি আবিষ্কারের সৎ ও নিশ্চিত পদক্ষেপ।

তবু, প্রশ্ন জাগে : অমিল গদ্যছন্দের দিকে কবির উৎসাহী দৃষ্টি কেন জাগ্রত হল *পুনশ্চের* অপেক্ষাকৃত ঊষর ও অনুর্বর পর্বে এসে—কেন নয় *বলাকা, গীতাঞ্জলি, কল্পনা, চিত্রা* বা *মানসীর* উদ্বুদ্ধ যুগে—যখন সংগীত–কল্পনার মঞ্জরিত ও সোনালি উৎসারে উচ্চকিত হয়েছে তাঁর কাব্যাঙ্গন? কেন *মানসীর* 'নিষ্ফল কামনা'য় অমিল ছন্দের অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে ঐ নতুন ছন্দ–সম্ভাবনাটির ভবিষ্যৎ–অন্বেষণে এমন নিস্পৃহ ও উদাসীন হয়ে রইলেন যে প্রায় চল্লিশ বছর পরে রচিত *লিপিকার* যুগ পর্যন্ত ঐ আঙ্গিক–প্রয়াসটির অন্য একটি দৃষ্টান্তও সুলক্ষ্য হল না।

এ–প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসে। 'নিষ্ফল কামনা'য় অমিল ছন্দের ব্যবহারের এই আকস্মিক উদাহরণটির ওপর ম্যাথু আর্নল্ডের 'ফিলোমেলা' কবিতার ছন্দ–নিরীক্ষার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাব আছে কি? দুটি কারণে এই সম্ভাবনাকে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এক, রচনাকালের দিক থেকে 'নিষ্ফল কামনা' 'ফিলোমেলা'র পরবর্তী। পরবর্তী—তবু খুব বেশি পরবর্তী নয়—একে বরং পরবর্তী-সমকালীন বলাই বেশি সংগত কেননা, আধুনিক শক্তিমান কবি হিসেবে ম্যাথু আর্নল্ডের প্রতিষ্ঠা ইংল্যান্ডে বেশকিছু আগে ঘটলেও, এদেশে তার বহুল পরিচিতি ঘটে *মানসী* প্রকাশের কিছুকাল আগে। সুতরাং এ-সময়ের রাবীন্দ্রিক কাব্যভাবনায় ম্যাথু আর্নল্ডের বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। দুই, আর্নল্ডের সামগ্রিক কাব্যের প্রেক্ষাপটে ফিলোমেলার মতো প্রাক-*লিপিকা* পর্বের রবীন্দ্রকাব্যে 'নিষ্ফল কামনা' ও আঙ্গিক-নিরীক্ষার দিক থেকে একটি বিক্ষিপ্ত, নিঃসঙ্গ ও একক প্রয়াস—পূর্বাপরহীন ও ক্ষণিক একটি ছন্দ-চেষ্টা—প্রচলিত ছন্দ-অভ্যাসের বাইরে একটি আনন্দময় রুচিবদল।

কবিকল্পনার উদ্দীপ্ত ও ঐশ্বর্যময় পর্যায়ে কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের পরিহার বা ছন্দে গদ্যধর্ম সংযোজনে যিনি ছিলেন ক্ষান্তিহীন, কবিতার সংগীতৈশ্বর্যের সেই বিশ্রুত সম্রাট, *পুনশ্চ* পর্বে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতেই ছন্দ-কল্পনার নিক্বণ-মধুর প্রাসাদ থেকে নেমে অন্ত্যমিল-বর্জিত গদ্যছন্দের নীরক্ত, ঊষর সংগীতহীনতার হাতে কেন এমন সহজ ও শর্তহীন আত্মসমর্পণ খুঁজে নিলেন, বিষয়টি ভেবে দেখবার মতো। আমার বিশ্বাস, সংগীত-সম্ভাবনার উচ্চতম শিখর থেকে এই পর্বে তাঁর প্রতিভার সুনিশ্চিত ও অবধারিত পতনই এর কারণ। অবশ্য মনে রাখতে হবে : এ পতন কোনো সাধারণ ও বিত্তহীন সম্ভাবনার নামহীন পরিচয়হীন ক্রমাবনতি নয়, এ পতন রবীন্দ্রপ্রতিভার মতো একটি ঐশ্বর্যবান সমৃদ্ধিময়তারই পতন—নিজেরই উচ্চতর স্তর থেকে নিম্নতর গ্রামে—যে-পর্যায়ে স্বপ্রতিভার মহত্তম সাফল্যের প্রেক্ষিতে তিনি ফ্যাকাশে কিন্তু সমকালীন কাব্যার্থীদের পক্ষে বিস্ময়কর ও অঘটনঘটনক্ষমপ্রজ্ঞা। অপরিমিত সংগীতপ্রতিভার পরাক্রান্ত অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ সাংগীতিক ক্ষমতার এক দীর্ণ, অনটনগ্রস্ত মুহূর্তে, অমিল গদ্যছন্দের তুলনামূলক সংগীতহীনতাকে হয়তো তাঁর কাব্যপ্রতিভার সহজ ও স্বাভাবিক আশ্রয় বলেই অনুভব করেছিলেন এই সময়ে এবং সেইসঙ্গে এ-কথাও হয়তো টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয় হিসেবে সংগীতের দীর্ঘকালীন সম্পন্ন ভূমিকা এবার সত্যি সত্যি তার বনেদি স্বত্ব হারাতে বসেছে। এই দুঃখজনক বাস্তব পরিস্থিতির সময়োচিত উপলব্ধি নিজের অজান্তে যে তার এই পর্বের কবিতাকে অনিবার্য অপমৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে, তা নিঃসন্দেহ। *পুনশ্চ* কাব্যের অন্ত্যমিল-বর্জন ও গদ্যছন্দ প্রবণতা যে এই পর্বে তাঁর সংগীত প্রতিভার নিশ্চিত অনটনের ফল এবং কাব্যবুদ্ধির অসামান্য উদাহরণ তার অন্য একটি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ এই কাব্যগ্রন্থের বহুল আলোচিত ভূমিকা :

> 'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*গীতাঞ্জলি*র অনুবাদ কাব্য হিসেবে বিপুল অভ্যর্থনা পাওয়ায় কবিচিত্তে এমন সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম হওয়া স্বাভাবিক যে, ইংরেজির মতোই, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও, 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে...গদ্যে কবিতার রস' সঞ্চারের অবকাশ রয়েছে। তবুও এ-কথা আমি মেনে নিতে পারি না যে *পুনশ্চ* কাব্যের অন্ত্যমিল বর্জিত কবিতা উপরি-উক্ত ছন্দভাবনার সুচিন্তিত ও সচেতন ক্রমবিকাশের ফল। তা যদি হত তাহলে কবিচিত্তের ঐ নতুন ছন্দচিন্তা, পরবর্তী দুই দশকের কাব্যযাত্রায়, নিজের অজ্ঞাতে হলেও, অস্ফুট স্বাক্ষর রেখে যেত নিঃসন্দেহে—দীর্ঘ দু-দুটি দশক নিষ্ক্রিয় নিশ্চুপ থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জেগে উঠত না। আমার ধারণা, *পুনশ্চ*-পর্বের ঐ ছন্দ-নিরীক্ষা *গীতাঞ্জলি*র অনুবাদপর্বের ঐ ভাবনার সঙ্গে প্রেরণাগতভাবে সম্পর্কহীন এবং মূলত সমকালীন ইয়োরোপীয় কাব্যের ছন্দমুক্তি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অবদান। *গীতাঞ্জলি*র ইংরেজি অনুবাদের সরল, সাবলীল ও চলমান গদ্যের সঙ্গে *লিপিকা* খানিকটা সগোত্র হলেও, *গীতাঞ্জলি*র সঙ্গে *পুনশ্চ* ও *পুনশ্চ*-পরবর্তী অমিল ছন্দের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস, স্তবক নির্মাণ ও অন্যান্য আঙ্গিকগত পার্থক্য আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে অন্যতম সাক্ষ্য।

প্রসঙ্গত আবার আগের কথা এসে পড়ে। *গীতাঞ্জলি*র অনুবাদ-পর্বে সেই ছন্দ-ভাবনার মধ্যে জেগে উঠলেন কেন তিনি হঠাৎ? আমার পূর্বতন বক্তব্যের পুনরুক্তি করে বলি : ঐ দশকদ্বয়ে ঐ ছন্দ-আকাঙ্ক্ষা হয়তো বিভিন্ন সময় তাঁর কবিকল্পনাকে আক্রান্ত ও বিস্রস্তও করে থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংগীতকল্পনার দিক থেকে ঐ সময় তাঁর জীবনের অন্যতম ঋদ্ধ ও ফলবান ঋতু। কাজেই অমিল গদ্যের নিরাভরণ সৌন্দর্য এ সময় নানাভাবে তাঁকে প্রলুব্ধ করে থাকলেও সংগীতপ্রেরণার সেই ঐশ্বর্যময় শীর্ষ থেকে নেমে আসা তাঁর কাছে, সাংগীতিক অর্থে (এবং সেই অর্থে কাব্যিক অর্থে) আত্মহত্যার নামান্তর মনে হয়েছে।

এই শতকের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল-বর্জনের পথিকৃৎ যদিও রবীন্দ্রনাথ, তবু অন্ত্যমিলহীনতা ও গদ্যছন্দের অবারিত ব্যবহারের মধ্যে কবিতার পরিচিত দিগন্তের সম্ভাব্য প্রসারই তিনি অন্বেষণ করেছিলেন, একে কবিতার সাধারণ নিয়ম হিসেবে দাঁড় করাতে চান নি। এ-প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য : 'কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি।' তাঁর উক্তি যে অযথার্থ ছিল না, তাঁর শেষপর্বের কবিতায় অমিল গদ্যছন্দের পাশাপাশি সমিল পদ্যছন্দের বহু ব্যবহারে তার প্রমাণ রয়েছে।

সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথম থেকেই এই নতুন ছন্দপ্রবর্তনাটির নির্বিচার অপব্যবহারের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই সুচিন্তিত ভীতি, বলা বাহুল্য, মিথ্যা হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভাহীন কবিযশপ্রার্থীরা গদ্যছন্দের অবাধ ও নির্বিচার সুযোগকে কাব্যসিদ্ধির সহজ ও নিষ্কণ্টক পথ ভেবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন ও এই অমিল ছন্দটিকে কবিতার সাধারণ নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছন্দমুক্তির নব্য-উদ্যোক্তাদের হাতে অমিল-ছন্দের অবারিত অপব্যবহার যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল তার কারণ, দুঃখের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এইসব উচ্ছৃঙ্খল তরুণ অমিল ছন্দকে কাব্যের দিগন্ত উন্মোচনের অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহার না করে কাব্যসিদ্ধির সুলভ ও যথেচ্ছ হাতিয়ার করে তুলছে। ছন্দমুক্তি আন্দোলনের এই নকল উদ্যোক্তাদের অনেকেই উৎসাহের আতিশয্যে এই সময় কবিতার সাধারণ প্রকরণ হিসেবে অন্ত্যমিলের প্রয়োজনীয়তাকেই পুরোপুরি অস্বীকার করে। এই দাম্ভিক উপেক্ষা, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাপক আনুকূল্যে অল্পদিনের মধ্যেই কবিতার অন্যতম অপ্রতিরোধ প্রকরণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কাব্যাঙ্গিকের এই অনিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্য উল্লিখিত কবিদের দুঃশীল স্বাধিকারচর্চার অবাধ চারণক্ষেত্র হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এই নিরীশ্বর নৈরাজ্যের ঝাপটা সে-সময়কার স্বস্থ কাব্যবিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং এই সর্বজনীন বিভ্রান্তির মধ্যে কাব্যের ভণ্ড অনুকারীদের সঙ্গে অনেক বিশ্বাসঋদ্ধ কণ্ঠস্বরও ব্যর্থ হয়ে যায়। এই দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের বেদনাহত কণ্ঠস্বর স্বকালীয় কাব্যঙ্গনকে ব্যথিত করে ধ্বনিত হয় : 'ওরা ফুলের বাগানের ওপাশের বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়েছে। ওদের ঠেকিয়ে রাখবার কেউ নেই।'

এর ফলে, কবিতার সঙ্গে অন্ত্যমিলের বহুকালবাহী সম্পর্ক এক ব্যাপক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। আগেই বলেছি : এর আগে, কবিতার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, কবিতা অন্ত্যমিলকে বর্জন করলেও কাব্যাঙ্গিকের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এবারের অনিয়ন্ত্রিত ছন্দমুক্তির ব্যাপক নৈরাজ্য এই ব্যতিক্রমটিকে কবিতার সাধারণ প্রাণধর্ম বলে রটাতে চেষ্টা করায় অন্ত্যমিলের সামনে তা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। কবিতার সঙ্গে অন্ত্যমিলের সম্পর্ক যদি এমন ঠুন্‌কো ও ভঙ্গুর হত এবং কবিতার ঐকান্তিক আকুতির সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি কৃত্রিম উপচার মাত্র হত, তবে কল্পনা করা যায়, কবিতাশরীর থেকে অন্ত্যমিল বহু আগেই বর্জিত হয়ে যেত। আমার বিশ্বাস, কবিতার মৌলিক প্রেরণার সঙ্গে অন্ত্যমিলের সম্পর্ক এমন অভিন্ন ও ওতপ্রোত যে, বর্তমান যুগের কাব্যনৈরাজ্যের সমস্ত মূঢ় ভ্রূকুটিকে নির্বিঘ্নে ব্যর্থ করে অন্ত্যমিল, কবিতার অন্তর্প্রয়োজনেই, কাব্যশরীরের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আকাঙ্ক্ষিত হবে। কবিতাশরীরের সাংগীতিক পরিপূর্ণতার জন্য শুধু নয়, কবিকল্পনার সামগ্রিক পূর্ণতার জন্যও, অন্ত্যমিল সাধারণভাবে কবিতার জন্য জরুরি। কবিকল্পনার উত্তুঙ্গ পর্যায়ে, এ কারণেই, ঋদ্ধিপিপাসু কবিচিত্ত অমিল ছন্দের মোহিনী আকর্ষণ অনুভব করেও অন্ত্যমিল বর্জনের ব্যাপারে সাধারণভাবে নির্বিকার।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি যে সংগীতকল্পনার সম্পন্নতম পর্বে অমিল গদ্যছন্দের কাব্যিক সম্ভাবনা চোখে ধরা পড়ার পরেও তিনি তার প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়েই রেখেছিলেন ; আর পাশাপাশি অন্ত্যমিলময় পদ্যছন্দের বিচিত্র ও বহুমুখী সম্ভাবনা সন্ধানে ছিলেন নিদ্রাহীন। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে কবিকল্পনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সংগীতকল্পনার শীর্ষে অবস্থানকালে কোনো কবির পক্ষে অমিল ছন্দের উষর সংগীতহীনতায় উৎসাহী হওয়া সম্ভব (যদি নিজস্ব কাব্যপ্রতিভার প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র মমত্বশীলও হন)। রবীন্দ্রনাথও তা হননি বরং ঐ তুলনামূলকভাবে অসাংগীতিক প্রয়াসকে কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনায় একপর্যায়ে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

কেবল কি রবীন্দ্রনাথ? সত্যেন্দ্রনাথই কি উৎসাহী হয়েছিলেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুরোধের পরেও? কথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা শ্রদ্ধেয় গুরুর অলংঘ্য নির্দেশের জবাবে অনিচ্ছুক শিষ্যের নিরুপায় সম্মতি। কিন্তু চেষ্টা তিনি করেননি। আমার ধারণা সেই পর্বে এই চেষ্টা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কেননা, ছন্দপ্রতিভার যে সৃষ্টিমুখর ও ফলবান পর্যায়ে তিনি সেই সময় অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে নেমে এসে ঐ মন্থর নিষ্প্রাণ গদ্যছন্দের চর্চা তাঁর লোকশ্রুত ছন্দপ্রতিভার পক্ষে আত্মহত্যার নামান্তর হত। কে উৎসাহী হয়েছেন আর—একালীয় কবিতায়? গত পাঁচ দশকের প্রধান কবিদের কয়জন? বিস্ময়কর ছন্দৈশ্বর্যের অনিন্দ্য বরপুত্র নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালের ঐ অত্যাধুনিক ও চটকদার প্রবণতাটিকে সংগীতের উদ্দাম শক্তিতে কি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যই করে যাননি? বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশের কতখানি অন্ত্যমিল বর্জিত? আমার ধারণা : খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ কবি (কাব্যপ্রেরণার পরিপূর্ণতাকে ধারণ করা যাঁদের পক্ষে অসাধ্য) কিংবা অকবিদের রচনাতেই অমিল ছন্দ, সাধারণ নিয়ম হিসেবে, প্রধান বা একক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, শক্তিমান ও সম্পূর্ণতর কবিদের রচনায় সাধারণত নয়।

এ-যুগের কাব্যচিন্তায় অন্ত্যমিলকে কবিতার পক্ষে যতখানি অপ্রয়োজনীয়, তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় মনে করা হচ্ছে, কবিতার ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা তার চেয়ে অনেকখানি বেশি বলেই আমার ধারণা। এ-কথা তো আগেই বলেছি যে কবিতার মৌলিক রক্তে ঐ জিনিসটির জন্মান্ধ আগ্রহ না থাকলে পতন-অভ্যুদয় আকীর্ণ ইতিহাসের এত মৃত্যুবহুল চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে আজ অবধি অন্ত্যমিল কবিতার এমন অম্লান বৈশিষ্ট্য হিসেবে টিকে থাকতে পারত না। আমি মনে করি কবিতার অন্য সব আদিম ও চিরকেলে উপাদানের মতো অন্ত্যমিলও কবিতার জৈবসত্তার অংশ এবং কবিতার অন্যান্য উপাদানের মতোই, কাব্যপ্রেরণার বিচিত্রমুখ প্রয়োজনে, ক্ষেত্রবিশেষে কবিতায় এর ব্যবহারের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। প্রসঙ্গত 'হ্রাস' শব্দটির উপর আমি জোর দিতে চাই। কেননা কবিতার কোনো মৌলিক উপাদানকেই—প্রয়োজন ও প্রেরণার কারণে কবিতা থেকে সময়বিশেষে হ্রাস করা সম্ভব হলেও, সম্পূর্ণ বর্জন সম্ভব নয়। মিল জিনিসটি গুণগতভাবে সংগীতের মতো কবিতারও সনাতন উপকরণ এবং এই কারণেই কবিতা থেকে এর আংশিক বর্জন সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান অবান্তর। এক অন্ত্যমিল পরিত্যক্ত হলেও চলে আসবে অন্ত্যর্মিল, অন্তর্মিল না থাকলে থাকবে অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি। কাব্যপ্রেরণার উচ্চকিত মুহূর্তে, সুকবির হাতে, অচেতনভাবে হলেও, এর ব্যবহার অবধারিত—নিপুণ, কোমল, সুস্মিততর প্রয়োগে। এমনকি গদ্যছন্দই কি 'ছন্দে'র নিকৃষ্টতম একটি রূপ নয়? আমার তো এক-একবার সন্দেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, গদ্যছন্দ বলে সাড়ম্বরে উচ্চারিত ঐ 'অভিনব' ও 'উপযোগী' বস্তুটি আদপেই কবিতার কোনো মৌলিক সম্পত্তি কি না—নাকি কবিতার একটি বিক্ষিপ্ত ও বহিরাগত উপাদান। যদিও গদ্যছন্দের কাব্যোপযোগিতা সম্পর্কে এর উৎসাহী প্রবক্তাদের প্রত্যয় সুদৃঢ়, তবু মনে হয়, উপস্থিত ও ক্ষণিক প্রয়োজনে কবিতাশরীরে গদ্যছন্দের ব্যবহার কখনো-কখনো গ্রহণযোগ্য হলেও কবিতাক্ষেত্রে এর সুনিয়মিত, উজ্জ্বল ও স্থায়ী ভবিষ্যৎ অসম্ভব। সন্দেহ নেই, গদ্যছন্দের প্রবক্তাদের মেধাবী ও অখণ্ডনীয় যুক্তি কবিতায় গদ্যছন্দের নান্দনিক মূল্যমানকে পদ্যছন্দের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বহুতর কাব্যিক সাফল্যকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তাঁরা এ-কথা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে কবিতার উচ্চতম শিখরকে স্পর্শের ব্যাপারে গদ্যছন্দের কার্যকারিতা পদ্যছন্দের তুলনায় মোটেই কম নয়। তবু মনে রাখতে হবে গদ্যছন্দ প্রধানত গদ্যেরই গুণ, যেমন পদ্যছন্দ প্রধানত কবিতার। গদ্যছন্দ—যা গদ্যশরীরের হৃদয়াবেগস্পন্দিত সাংগীতিক প্রবহমানতার নাম—কবিতায় খণ্ডিত ও সাময়িক সাফল্য দেখালেও কোনোকালে পদ্যছন্দের পরিবর্তে কবিতার প্রধান নির্ভর হয়ে উঠবে, এমন ধারণা হাস্যকর। গদ্যছন্দের সাবলীল প্রবহমানতা কবিতার সূক্ষ্ম-সৌকর্য ও কারুকার্যখচিত সুনিবিড় প্রকৃতির অনুকূল আদৌ নয় যা পদ্যছন্দের সুসংযত ও সুনিয়মিত গণ্ডিতে সংহত। তা নইলে, কবিতা, ধরে নেয়া যায়, পদ্যছন্দের দুরূহ, সশ্রম ও প্রতিভাসাপেক্ষ ঐ দুর্মূল্য অপচেষ্টাটি থেকে নিজেকে গুটিয়ে, ঢের আগে, গদ্যছন্দের সহজ ও অনায়াস প্রবহমানতার গড্ডল প্রবাহের দিকে প্রলুব্ধ হাত প্রসারিত করত।

মৌলিক কাব্যপ্রেরণার সঙ্গে অন্ত্যমিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে এর উন্নত প্রয়োগ যেমন কাব্যপ্রতিভাসাপেক্ষ, তেমনি এর উজ্জ্বল ব্যবহারও প্রতিভার স্পর্শ দাবি করে। আমার ধারণা, মিল দেবার ক্ষমতা থেকে একজন 'কবি'কে কমবেশি চিনে নেয়া যায়। (অবশ্য এ থেকে কেউ যেন অন্ত্যমিলকে কবিত্বের একমাত্র মানদণ্ড মনে না করে বসেন। কেননা তাহলে মধুসূদনের চেয়ে ভারতচন্দ্রের বড় কবি হিসেবে আদৃত হবার সম্ভাবনা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যেতে পারে।) আমার বক্তব্য, একজন মৌলিক কবির অন্যান্য সব উপাদানের মতো তাঁর অন্ত্যমিলও সবার থেকে আলাদা। আলাদা, কেননা, অন্ত্যমিল শুধু কবিতার সংগীতকল্পনার অংশ নয়; কবিতার কয়েকটি প্রধান উপাদানের সঙ্গেও অন্ত্যমিল ওতেপ্রোত। অন্ত্যমিল, সংগীতকল্পনার মতো, কবির শব্দ-চেতনারও তথা ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যেরও অংশ। লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে, শব্দচেতনায় তীব্র ও সপ্রতিভ কবিদের অন্ত্যমিলও অসাধারণ সপারগ ও উজ্জ্বল। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এর উদাহরণ অনেক, বিশেষ করে ভারতচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, সুকান্ত এবং ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিরা। এঁদের অন্ত্যমিলের যে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর দ্যুতি আমাদের চোখ ধাঁধায়, যে ক্ষিপ্র বৈদ্যুতিকতা আমাদের হতচকিত করে, তা তাঁদের সংগীতপ্রতিভার কাজ নয় শুধু, তাঁদের তীক্ষ্ণ জাগ্রত শব্দ-বৈশিষ্ট্যেরও অবদান। যদিও অন্ত্যমিলের বিরুদ্ধে মিল্টনের অন্যতম অভিযোগ ছিল যে অন্ত্যমিলের অন্যায় দাবি কবির বক্তব্যবিষয়কে লক্ষ্যচ্যুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বিপথগামী করে, তবু এ-কথাও তো সমভাবেই সত্য যে অন্ত্যমিল কাব্যবক্তব্যের অবাধ বেওয়ারিশ বয়ে চলার ওপর মনোরম নিষেধ পেতে দিয়ে কবির বিষয়ব্যক্ততাকে আনন্দময় ও লাভজনক সংগ্রামে মাতিয়ে দেয়; এবং কাব্যবক্তব্যকে সামান্য বিপথগামী করলেও পরিণামে তা বক্তব্যের সম্ভাবনাময় ঐশ্বর্যকেই উপহার দেয়—কবিতার বক্তব্যের ওপর মৌলিক আঘাত না করে।

৫

উপাদানের দিক থেকে অনেক মিল থাকলেও গদ্যের সঙ্গে কবিতার প্রধান পার্থক্য, আমার মনে হয় সংহতিতে। মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম সারাৎসারকে ধারণ করতে হয় বলে কবিতায়, গদ্যের তুলনায়, অপ্রয়োজনীয়ের জায়গা নির্মমভাবে সংকুচিত। এ কারণেই কবিতাকে গদ্যের তুলনায় অনেক বেশি সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনিবিড় হতে হয়,—অনেক বেশি নিটোল ও ঘনীভূত। গদ্যের অবাধ স্বাধীনতার রাজ্য এই সংহতিচর্চার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রতিকূল বলে, গদ্যের ক্ষেত্রে এই সাফল্য অসম্ভব না হলেও তুলনামূলকভাবে দুর্লভ। আবার বলি, চৈতন্যের সামগ্রিকতাকে শব্দের ন্যূনতম এবং সুন্দরতম প্রয়োগের মধ্যে রোজগার করতে হয় বলে কবিতায় গদ্যের ওই প্রবহমানতা অচল। পক্ষান্তরে এক কঠিন নিয়ন্ত্রণ, এক নির্মম শৃঙ্খলা কবিতার অবধারিত ও নিষ্কৃতিহীন বিধিলিপি। স্বেচ্ছাবিহারের ন্যূনতম প্রশ্রয়-বঞ্চিত কবিতা তাই অজস্র শাসনের দুরপনেয় শৃঙ্খলে বাঁধা। তার পায়ে-পায়ে ছন্দ মিলের নিগড়, অলংকার-প্রকরণের বেড়ি। মোটকথা, সংহতির নিটোল কঠিন দরকারে কবিতাকে বেছে নিতে হয়েছে এক স্বারোপিত আত্মশৃঙ্খলার দুরূহ ও নিগ্রহক্লিষ্ট পথ, কঠিনতম তপশ্চর্যার দুঃখময় ও রক্তবহুল সরণি, যাতে সহজ অসতর্কতার দায়িত্বহীন প্রলোভন এড়িয়ে কবিতা জীবনের শুদ্ধতম ও অবিমিশ্র নির্যাসকে উপহার দিতে পারে। হৃদয়াবেগ প্রকাশের সংগ্রাম, এ কারণেই, গদ্যের তুলনায় কবিতায় তীব্রতর। এবং তীব্রতর বলেই, কবির জীবনানুভূতি, চৈতন্যের উজ্জ্বলতর দীপ্তিকে অপেক্ষাকৃত সংযততর রূপে কবিতা ধারণ করতে সমর্থ।

আগেই বলেছি, গদ্যের অবাধ স্বাধীনতা কবিতায় সম্ভব নয় এবং সম্ভব যে নয়, এটাই বোধহয় গদ্যের ওপর কবিতার জিত। কবিতার মৌলিক শক্তিও এটাই। অবশ্য কবিতার এই শ্রমবহুল নির্মম কৃচ্ছ্রতা ও ক্ষমাহীন শৃঙ্খলাকে অনেকের কাছে নিগড়বহুল, অকারণ ও অনাবশ্যক মনে হতে পারে, কিন্তু সে অকবির কাছে। একজন প্রকৃত কবি নিশ্চয়িই জানেন, তাঁর সামগ্রিক চৈতন্যকে নিটোল সংহতিতে ফলবান করার দরকারে ঐ দুশ্চর তপশ্চর্যা কী সরল-অনুকূল, কী অভাবিত ফলদায়ক। কবিতাচর্যায় অকবির মতো সত্যিকারের কবিকেও নামতে হয় দুঃসাধ্য শ্রমে, দুরূহ প্রাণান্ত সংগ্রামের স্বেদবহুল রাস্তায়, অনেক নিয়ম-নির্দেশ-প্রচলের বন্ধুর ও দুর্লংঘ পাহাড় কেটে তিলে-তিলে অগ্রসর হতে হয়। অকবির পক্ষে এর সবকিছুই শেষপর্যন্ত অর্থহীন পণ্ডশ্রম—সাফল্যহীন, সম্ভাবনাহীন এক বিড়ম্বনা। কেননা ঐ প্রাণান্তকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়াসের বিপুল আয়োজন থেকে শেষ অবধি কিছুই লাভ করতে পারেন না তিনি। ফলে কবিতার এই সশ্রম নিয়ন্ত্রণ তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় এক অর্থহীন নির্যাতন ; অবাঞ্ছিত, প্রয়োজনাতিরিক্ত এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট বন্দিশিবির। কিন্তু যিনি প্রকৃত কবি, যিনি ঐ সুকঠোর কৃচ্ছ্রতার ভেতর ক্ষান্তিহীন শ্রমের প্রান্তে এসে একসময় সাফল্যের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে খুঁজে পান—শ্রমের ঐ তিক্ত, কঠিন ও দুঃখময় স্মৃতিকে অনায়াসে ভুলে যান তিনি। তৃপ্তির অপার্থিব প্রশান্তিতে কবিতার ঐ দুরূহ কঠোর তপশ্চর্যাকে তাঁর চোখে প্রতিভাত হয় স্বর্গের দুর্লভ আশীর্বাদের মতো—অসতর্ক পতন থেকে তাঁর প্রতিভাকে বাঁচিয়ে তোলা এক 'উজ্জ্বল উদ্ধার' হিসেবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে : অনুপ্রাণিত মুহূর্তে একজন কবিকে কাব্যসিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ শ্রম স্বীকার করতে হয় তা একজন অকবির প্রাণহীন অনুভূতিহীন বিশুষ্ক কাব্যপ্রচেষ্টার শ্রমের সমপর্যায়ের কিনা? আমার মনে হয় : না। একজন অকবির পক্ষে কবিতার প্রয়াস হচ্ছে একটি হৃদয়বর্জিত কৃত্রিম নির্মাণ, পরিচিত কাব্য-উপকরণের দুরূহ, শ্রমক্লিষ্ট ও যান্ত্রিক সংকলন মাত্র। কবিতা রচনা তাঁর পক্ষে তাই অর্থহীন অপচেষ্টার এক নির্যাতনশালা, দুঃস্বপ্নের বাস্তিল। কিন্তু অনুপ্রাণিত মুহূর্তে একজন কবির কাছে কাব্যের ঐসব উপকরণ গুটিকয় মৃত নিশ্চল বা প্রাণহীন জিনিসের সমাহার নয়—জীবন্ত, প্রাণিত ও আবেগময় কতকগুলো ব্যাপার। কবিতা রচনার অবাক ও অভাবিত মুহূর্তে অপার্থিবভাবে তিনি অনুভব করেন : এক অবিশ্বাস্য জাদুবলে কবিতার দুর্লভ সম্পদগুলো কী অবলীলায় তার করতলগত হচ্ছে—যেন স্বর্গ থেকে। কাব্যপ্রকরণের দুরূহ জটিল শৃঙ্খলাগুলো তাঁর সামনে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে নেই আর, বরং তাঁরই অকৃত্রিম সুহৃদ সহযাত্রী হয়ে তাঁকে অভাবিতভাবে সাহায্য করে চলেছে—আত্মপ্রকাশের আকুতিদীপ্ত দুরূহ পথযাত্রায়। মিল্টন যদিও অন্ত্যমিলকে 'ট্রাবলসাম' অভিযোগে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ, 'পুরস্কার' কবিতায় ঘরে খিল দিয়ে স্বর্গেমর্তে মিল খোঁজার শ্রমসাধ্য প্রয়াসের ইঙ্গিত করেছেন, তবু সৎ কবিমাত্রেই জানেন কাব্যপ্রেরণার উদ্দীপ্ত মুহূর্তে কবিতার অন্যান্য সব উপকরণের মতো, অন্ত্যমিলও কী অনায়াসে কবির হাতে ধরা দিতে থাকে—যেন আগে থেকেই, কবির অজান্তে তাঁর চেতনার গভীরে রচিত হয়েছিল সেসব, ঐ বিশেষ মুহূর্তটির নির্ধারিত প্রয়োজনে জেগে ওঠার জন্য।

যেসব উপাদান কবিতাকে সুডৌল ও সংহতিময় করে তোলে, অন্ত্যমিল তাদের একটি। কবিতার চরণে-চরণে সামঞ্জস্যমধুর ঐক্য ঘটিয়ে, সুনিয়মিত ও পরিপূর্ণ স্তবক রচনা করে, কবিতাকে সুশৃঙ্খল সাংগীতিক পূর্ণতায় দুলিয়ে দিয়ে অন্ত্যমিল কবিতাকে নিটোল ভারসাম্যময়তায় তুলে নেয়। অন্ত্যমিলবর্জিত হলে কবিতার সংহতি যে কী অসহায় ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে তার প্রমাণ আছে তিরিশের ও তিরিশ-পরবর্তী এযাবৎ কালের কবিতার একটা বড় অংশে। কে এ-কথা অস্বীকার করবে যে ঐ সময়কার কাব্যিক-নৈরাজ্য অন্ত্যমিলহীনতাকে আশ্রয় করে যতখানি লক্ষ্যহীন ও বিভ্রান্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছিল, অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা হয়নি এবং এই কালের সামগ্রিক কাব্যপ্রয়াস, অন্ত্যমিলহীনতার ক্ষেত্রে, কাব্যঋদ্ধিকে স্পর্শ করতে যতখানি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, অন্য কোথাও তা দেয়নি। আমার এক-একবার সন্দেহ হয়, গত চল্লিশ বছরের সময়পরিধিতে আমাদের কাব্যক্ষেত্রের সংখ্যাহীন পরিচিত ও বিস্মৃত কবির হাত যেসব অসংখ্য অন্ত্যমিলবর্জিত কবিতা উপহার দিয়েছে, তার প্রায় সমস্তটাই একটা বেদনাদায়ক বিশাল হয়ে রইল না তো? আগামীকালের ভ্রূক্ষেপহীন পাঠক, কাব্যগ্রহের নিষ্কৃতিহীন প্রয়োজনে, আমাদের কালের অমিল ছন্দের এই বিপুল আয়োজনের কতটুকুকে শেষপর্যন্ত ঋদ্ধির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে?

অন্ত্যমিলহীনতার স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাব্যপ্রতিভার দায়িত্বহীন সর্বনাশা আশঙ্কা করে এলিয়ট পূর্বাহ্নেই এই আপাত সুবিধেটির বিপজ্জনক দিক সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে অন্ত্যমিলের বর্জন ও গদ্যছন্দের প্রসার কবিতায় কবির কঠিনতর আত্মশৃঙ্খলার প্রয়োজনকেই জরুরি করে তোলে, যেহেতু, তাঁর ভাষায়, 'কবির পক্ষে সহজলভ্য কিছু নেই।' তাঁর এই বক্তব্য থেকে একটা কথা অন্তত স্পষ্ট যে, তিনি পদ্যছন্দের মতো অন্ত্যমিলকেও কাব্যসংহতির পক্ষে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করেছিলেন, কেননা, এর বর্জনের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবির অতিরিক্ত ও কঠিনতর আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। আমারও ধারণা, অন্ত্যমিলবর্জনের উদ্যোগী প্রবক্তাদের সমস্ত উজ্জ্বল আহ্বানকে উপেক্ষা করেই শ্রেয়পিপাসু কবিচিত্ত, কবিতার অন্তর্গত সম্পন্নতার দরকারেই অন্ত্যমিলময়তাকে চিরকাল অন্বেষণ করবে। এ-কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি যে তিরিশ ও তিরিশ-পরবর্তী কয়েক দশকের প্রায় সব কবি যখন কবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনকে প্রায় ধর্মীয় উন্মাদনার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তখন সেকালের প্রধান কবিরা ঐ অবাধ সুবিধাটির দায়িত্বহীন চর্চা থেকে নিজেদের মুক্তই রেখেছিলেন। তিরিশ এবং তিরিশ-পরবর্তী কালের যেসব কবিতা এই সময়কার বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ অবদান তার ভেতর অন্ত্যমিলবর্জিত কবিতার সংখ্যা কয়টি?

অন্ত্যমিলবর্জন-প্রবণতা গত চার দশকের বাংলা কবিতায় যখন সর্বগ্রাসী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই এই সময়কার প্রধান কবিদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পাতা উল্টিয়ে, কিন্তু এই প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আশঙ্কিত, এক-একবার মনে হয়, অন্ত্যমিলহীনতার যে দুর্বার বিস্তার, ব্যাপক ও প্রবল আধিপত্যে একদিন এই কাব্যাঙ্গনের প্রতিটি ঘর, প্রান্তর, চৌহদ্দীকে আক্রান্ত ও অধিকার করে নিয়েছিল, তাঁদের রচনার কতটুকু পরিচয় শেষপর্যন্ত আগামী যুগের হাতে পৌঁছোবে। কেননা যে-সব সংখ্যাহীন অকবির হাত, কাব্যসিদ্ধির সুলভ হাতিয়ার ভেবে অন্ত্যমিলহীনতার দর্পিত স্বেচ্ছাচারে একদিন কাব্যজগৎকে বিস্রস্ত করেছিল, তাঁদের রচিত সেই সব অসংখ্য উদ্ধত, অন্তঃসারহীন ও নীরক্ত রচনার সঙ্গে তাঁদের নামও আজ নিঃশব্দে এই সাহিত্য থেকে হারিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাই বাহুল্য যে অন্ত্যমিলবর্জনের এই দুরপনেয় প্রবণতা, কাব্যাঙ্গিকের সামগ্রিক নৈরাজ্যের মতোই, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে জড়িত। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিশ শতকীয় অবক্ষয়, এর প্রতিটি প্রাচীন প্রাসাদের মতোই, কবিতার দীর্ঘকাল-লালিত সংহতির সুদৃঢ় ইমারতটিকেও বিস্রস্ত করে দিয়েছে। সবাই জানেন, একই কারণ থেকে উদ্ভূত না হলেও, প্রায় সমসময়েই, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে, বাংলার সমাজজীবন, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, এক সার্বিক অবক্ষয়ের কবলে পড়তে শুরু করে। এই ব্যাপক পত্রহীনতা, পূর্ববর্তী কয়েক শতকের শ্রম, সাধনা ও আত্মোৎসর্গে অর্জিত মহান বাঙালি মূল্যবোধগুলোকে নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন করে দিয়ে এই সংস্কৃতির প্রবুদ্ধ ধারকদের দৃষ্টিকেও মহত্ত্বের উজ্জীবিত পিপাসা থেকে সরিয়ে অর্থহীন আপাতরম্যের দুঃশীল বন্দনার মধ্যে ব্যর্থ করে দিতে শুরু করে। এই আকাশব্যাপী নিঃস্বতার কঠিন শীতল হাত, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, কবিতার উজ্জ্বল ও আলোকিত জগতের ওপর মৃত্যুময় ও অশুভ ছায়া বিস্তার করতে থাকে এবং সমকালীন ইয়োরোপীয় অবক্ষয়ের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্যের মধ্যে বাংলা কবিতার সৃষ্টিপ্রেরণাকে সম্ভাবনার শেষ প্রান্তে এনে দাঁড় করায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমসময়ে বাঙালি মূল্যবোধের ঐশ্বর্যময় প্রাসাদে যে কালো অবক্ষয় নিঃশব্দ পদপাতে এসে ভিড় করছিল, এক উদ্ধাররহিত যুগসন্ধির মুখহীন প্রশ্রয়ে, সেই সার্বিক অন্ধকার, সমাজজীবনের ক্রমবর্ধমান পচন ও বিশৃঙ্খলার ভেতর, বাঙালি সংস্কৃতির শেষতম শক্তিটুকুকেও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কাব্যাঙ্গনে, এই অধঃবসিত অপচয়, সবচেয়ে দুঃখজনক ও করুণ রূপ প্রত্যক্ষ করে ষাটের দশকে। অশিক্ষিত বর্বর নৈরাজ্যে, মূঢ়তার দম্ভে, অন্তঃসারহীনতায়, নির্জীবতায়, দৈন্যে ও হতাশায় এই দশক আমাদের সাংস্কৃতিক অধঃপতনের স্মরণীয় দৃষ্টান্তস্থল। যতদূর অনুমান করি, পশ্চিমবঙ্গে এই পরিস্থিতি এখনো অপরিবর্তিত। বাংলাদেশে অবশ্যি এই অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ষাটের দশকের শেষের দিকে সংগ্রাম-বিস্রস্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হতে শুরু করলে এখানকার তরুণ কবিতা পশ্চিমবঙ্গের কবিতার সমধর্মী-নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নিয়েও, এক আবেগময় প্রেরণার সংক্রামে রক্তিম ও প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করে।

একথা অবিসংবাদিত যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এখানকার কাব্যপ্রয়াসের সামনে সম্ভাবনার দরোজা মেলে ধরেছে। এই শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি থেকে যে অসংখ্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক হতাশাজনিত পরিস্থিতি মহান বাঙালি মূল্যবোধসমূহকে আলো-উদ্ধারহীন অবক্ষয়ের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল, বাংলাদেশের উদ্ভব সেই বাস্তব পরিস্থিতির প্রথম ও সুস্পষ্ট অতিক্রমণ। বর্তমান পরিস্থিতিকে যত নৈরাজ্যাধিকৃত মনে হোক একথা অবধারিত যে বাংলাদেশের উদ্ভবের সঙ্গে একালীয় বাঙালি সংস্কৃতির বহুকথিত ক্রান্তিযুগটি তার দীর্ঘ ও সর্বাগ্রাসী রাজত্ব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈর্ঘ্যের প্রথম পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী পরর্যায়ে পা দিয়েছে। মানবেতিহাসের সব প্রলম্বিত ও ঊষর ক্রান্তিযুগের পরবর্তী পর্বের মতো, আমাদের বর্তমান অধ্যায়কেও (প্রাক্তন যুগের মূল্যবোধসমূহ থেকে বিপুলভাবে বিচ্যুত হওয়ার ফলে) ক্রান্তির প্রথম পর্বের তুলনায় যদিও এ মুহূর্তে অধিকতর অব্যবস্থা ও অন্ধকারাশ্রিত মনে হচ্ছে, তবু, আমরা, নিকটতরেরা, সহজাত অন্তরোপলব্ধি থেকে বুঝতে পারছি, আমাদের বর্তমান কাল সৃজনগ্রাহে ও সম্ভাবনায় গত চল্লিশ বছরের তুলনায় কী বিপুল স্পন্দমান ও ভূয়িষ্ঠ। গত চল্লিশ বছর যে আলোহীন উদ্ভাসহীন যুগসন্ধি বাঙালি সংস্কৃতির বুকের ওপর গুরুভার অচলায়তনের মতো চেপে ছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয় সেই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে, প্রথম সৃজনের বেগ বইয়ে দিয়েছে। আজ যে জাতীয় শক্তি প্রতিটি বাংলাদেশবাসীর স্নায়ু-শিরাকে উজ্জীবিত করছে, যে ক্ষান্তিহীন গঠনাগ্রহ ও জীবন-পিপাসা জাতীয় চিত্তকে অস্বস্ত আলোড়িত করে তুলেছে, তা, আশা করা যায়, চড়াই-উৎরাই-বহুল জাতীয় উত্থানের সংহতিদৃঢ় স্তরে-স্তরে, আমাদের সমাজ-জীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধগুলোকে কালে মর্যাদাবান উচ্চাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি উদ্দীপ্ত ক্ষেত্রের মতো কাব্যাঙ্গনকেও বিস্রস্ত ও মুখহীন নৈরাজ্য থেকে বাঁচিয়ে সুসংহত গঠনাকাঙ্ক্ষায় ফিরিয়ে আনবে।

আমাদের কাব্যাঙ্গিক, কবিতার সংহতিমান ঋদ্ধিকে ফিরে পাবার ফলন্ত আকাঙ্ক্ষায়, অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে অন্ত্যমিলকে কবিতার সাধারণ রীতি হিসেবে ফিরে পেতে কবে উদগ্রীব হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। অনিশ্চিত, তবু অতিসুদূর নয় বলেই মনে করি। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন নিষ্ফলা মাঠের বিমূঢ় কৃষক আমরা, নৈরাজ্যের সন্তান, সম্ভাবনাহীন যুগসন্ধিতে পরিত্রাণরহিত শৈত্যের শিকার।

১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিক্রমণের গান : রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

এ তথ্য অনেকেরই জানা যে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান, আকাশে উড্ডয়নের ক্ষিপ্রতর পর্যায়ে, যখন শব্দের গতিজালকে ছিন্ন করে, তখন প্রচণ্ড শব্দে অন্তরীক্ষকে থরথর করে কাঁপিয়ে, জনপদকে চমকে দিয়ে সেই অভাবিত অতিক্রমণের ইতিহাসকে দিগন্তরেখায় স্বাক্ষরিত করে রেখে যায়। বলা বাহুল্য, সব বিমানের বেলায় উত্তরণের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় প্রযোজ্য নয়। যেসব বিমানের গতি শব্দের গতির চেয়ে কম, সেসবের এ বালাই নেই।

মানুষের বেলাতেও ব্যাপারটা একই রকম। পৃথিবীর দশটা সাধারণ মানুষের জীবন প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মে বিকশিত এবং ঐ পরিচিত গতানুগতিক ধারাতেই অবসিত। এই একঘেয়ে জীবনের ভেতর অসম্ভবের উঁকি, জানালার পাশের মাধবীলতার মতো মৃদু মাথা মাঝে-মাঝে নাড়িয়ে গেলেও, কোনো অপ্রাপণীয়ের রক্তাক্ত পথে পা বাড়াবার আত্মঘাতী আগ্রহ ঝলকে ওঠে কমই। তবু এমন কিছু মানুষ পৃথিবীতে সব সময়েই বেঁচে থাকেন, যাঁদের প্রতিটি প্রাণকোষে প্রতিভার নিদ্রাহীন আগুন অসম্ভবের দুঃসাধ্য রাস্তায় পা ফেলার জন্য তাঁদেরকে অহোরাত্র প্ররোচিত করে। এই নিষ্কৃতিহীন তাড়নার পথেই তাঁরা একসময়, প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ভেতর দিয়ে বেড়ে-ওঠা তাঁদের জৈবিক অস্তিত্বের প্রাথমিক পর্যায়কে পিছে ফেলে এগিয়ে যান উন্নততর বিকাশের দিকে—যা অস্তিত্বের ঋদ্ধতর ভুবন।

অস্তিত্বের সরল ও প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে সত্তার ঐ রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়, বহুতলজটিল ও উন্নত বিকাশের অধ্যায়ে জেগে ওঠাই তাঁর সেই বহুকথিত 'দ্বিজত্ব' কিংবা 'বোধিত্ব' বা তাঁর 'নবুয়ত', তাঁর ভেতরকার ব্যতিক্রমী, মৌলিক, চিন্ময় ও উচ্চায়ত অস্তিত্বের দুর্লভ জন্মমুহূর্ত।

একজন প্রতিভাবান মানুষের জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে অস্তিত্বের এই প্রাথমিক স্তর থেকে চৈতন্যের উচ্চতর ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণের এই পর্ব, এজন্যই, অনিবার্য। আর অনিবার্য বলেই অতিক্রমণ-মুহূর্তে তাঁর অস্তিত্বের শিউরে-ওঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপার্থিব পুলকানুভূতিকে সচেতনভাবে বা নিজের অগোচরে সময়ের দেয়ালের গায়ে তিনি কোনো-না-কোনোভাবে মুদ্রিত করেই যান।

রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অস্তিত্বের এই প্রাথমিক স্তর থেকে শক্তি ও চৈতন্যের উচ্চায়ত ভুবনে উত্তরণের সঙ্গীত—যেমন 'বিদ্রোহী' নজরুল ইসলামের।[১]

দুটি কবিতাই শক্তিমান, লক্ষ্যভেদী এবং অনুভূতিস্পন্দিত। লোকাতীত স্পর্শাতীত প্রবল অন্তরোপলব্ধির প্রায় দুটি সমজাতীয় উন্মাদ উত্থান—অসহ্য ও স্পন্দনশীল—বাংলা কাব্যযাত্রার ইতিহাসে স্মরণীয়। আত্মজাগৃতির অলৌকিক বিশৃঙ্খল ঝঞ্ঝাকে এমন অনিন্দ্য রক্তগোলাপে অনুপম করে তোলা খুব কম কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

কবিতাদুটি দুই কবির প্রায় একই বয়সের রচনা। রবীন্দ্রনাথেরটি বাইশ বছরে, নজরুলেরটি বিশ বছরে। দৈর্ঘ্যের দিক থেকেও কবিতাদুটি ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র প্রথম লেখন ধরলে) প্রায় সমান। সংগীতের যে অত্যাচারী অসামান্যতায় কবিতাদুটি বহ্নিমান তার চেয়ে রূপময় অসাধারণত্ব বাংলা কবিতা আর কিই-বা কবে প্রত্যক্ষ করেছে! আবেগের এমন গীতিরূপময় চিত্রশালা কোথায়ই বা? তবু, বহুদিক থেকে

---

[১] মধুসূদন, আমার ধারণা, এই উত্তরণ-মুহূর্ত স্পর্শ করেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যাত্রাপর্বেই—কাব্যলক্ষ্মীকে আবাহনের প্রত্যয়দীপ্ত শব্দাবলির ভেতর—যখন তিলোত্তমাসম্ভাবের আড়ষ্টতা কাটিয়ে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যযাত্রা খানিকটা অভাবিতভাবেই, উচ্চায়ত বিষয়ৈশ্বর্যের ভেতর, বন্যার উচ্ছ্বত আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল :

"তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" [*মেঘনাদবধ কাব্য : প্রথম সর্গ*]

জীবনানন্দের এই উচ্চারণ সচেতন ও নিশ্চিত শব্দাবলিতেই ঘোষিত :

"কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতোন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ—আর সব হারানো-পুরোনো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজাতের হলেও, কবিতাদুটোর মৌলিক চাউনির মধ্যেই এমন একটা পার্থক্য রয়েছে যা থেকে কবিতাদুটোর ভিন্নতা শুধু নয়, ওই দুই কবির প্রকৃতি এবং প্রকরণের পার্থক্য জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখা ভালো যে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বলতে এখানে সঞ্চয়িতার অন্তর্ভুক্ত কবিতাটিকেই আমি বুঝিয়েছি। কবিতাটি রচিত হয়েছে দু-বারে। প্রথমবারে, কবিতাটির বিশৃঙ্খল আদিম আকরিক রূপটি রচিত হয়েছিল ১২৮৯ (?) সালে, তরুণ রবীন্দ্রনাথের হাতে। এর চূড়ান্ত রূপটি রচিত হয়েছে পরিণত রবীন্দ্রনাথের হাতে। চূড়ান্ত রূপটি কোনো নতুন রচনা নয়, পুনর্লিখন। তবু পুনর্লিখন—অন্য কথায় সম্পাদনা—যে কতখানি নির্মোহ, প্রতিভাবান ও অসামান্য হতে পারে এটি তার প্রমাণ। মার্জনার এমন বিরল সাফল্য বাংলা কবিতায় আর কখনো ঘটেছে কিনা সন্দেহ। প্রথম লেখনের অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খল আকরিক আবর্জনা থেকে ছেঁকে তুলে যেন উদ্ধার করা হয়েছে পরিপূর্ণ একতাল অনাবিল খাঁটি সোনা। সাফল্যের এমন অনবদ্য মানের মার্জনা মৌলিক রচনার চেয়ে কিসে কম? যে নির্মম নিখাদ সংহতির মধ্যে কবিতাটিকে ঝিকিয়ে তোলা হয়েছে তা থেকে সেই বহুকথিত উক্তিটি ফিরে ফিরে মনে আসতে চায় যে-একজন প্রকৃত কবিই শুধু দেখাতে পারেন নিজের কবিতা সম্বন্ধে কতখানি নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব'। এই কবিতার পরিমার্জনায় রবীন্দ্ররুচি শুধু নিষ্ঠুর নয়—নিষ্ঠুরতমভাবে অসামান্য।

'বিদ্রোহী'র বিশুদ্ধতম শিল্পরূপটি রচিত হয়েছিল তরুণ নজরুলের হাতে—প্রথম লেখনের মুহূর্তেই। এও এক বিস্ময়। আবেগের এই সহিংসতাকে ধারণের পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও অপরিণত হাতিয়ার নিয়ে 'বিদ্রোহী'র বহ্নিমান শব্দাবলি, অপ্রত্যাশিত মৌলিকতার ভেতর, শিল্প-সাফল্যের উত্তুঙ্গ শীর্ষকে বিস্ময়কর সংযমে স্পর্শ করে গেল। কোন্ অমেয় প্রতিভায় রাতারাতি শিল্পের মতো এমন রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় ও অলীক বিষয়ের ওপর তখন সার্বভৌম অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আগামীকালের শিল্পরসিকদের বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে থাকবে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র প্রথম লেখনের তুলনায় 'বিদ্রোহী' শিল্প হিসেবে অনেক পরিণত। শুধু প্রথম লেখনের চেয়ে নয়, সম্ভবত *সঞ্চয়িতায়* এর পরিণত রূপটির চেয়েও। এই কথা প্রসঙ্গে কবিতার শৈল্পিক সাফল্য ঠিক কোথায় সে ব্যাপারটাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে যাওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের অন্তরোপলব্ধি আমাদের কাজে আসতে পারে। মৃত্যুচিহ্নিত বিপুল মানবতার ভিড়ে একজন কবির অবস্থানটি ঠিক কোথায় তা শনাক্ত করতে গিয়ে কবি তাঁর ভেতরকার অনুভবের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছিলেন এভাবে :

> "না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে
> মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে—
> কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
> মাগিছে তেমনি সুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।"

উদ্ধৃতিটির ভেতর থেকে একটিই কথা শেষপর্যন্ত বেরিয়ে আসে : হৃদয়ের অব্যক্ত কথাকে স্মরণীয় শব্দে গেঁথে যাওয়াই কবির দায়িত্ব। কবি তিনি, যিনি (মানবজাতির পক্ষ থেকে) তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবকে সেই শক্তিশালী প্রকাশে ঝিকিয়ে তুলতে সক্ষম; যার হিরণস্পর্শে ক্ষণজীবী চিরজীবিতের আসন পায়, বরণীয় স্মরণীয় হয়ে ওঠে। এই বিচারে 'কবিত্ব' কথাটির হয়তো একটিই অর্থ পাই আমরা : 'প্রকাশক্ষমতা'। এটা সেই প্রতিভা যা বাক্যহীন বিমূঢ় মানবজাতির মধ্যে কবিকে—ঐ বিশেষ প্রতিভার অধিকারী মানুষটিকে—একটা স্বতন্ত্র অবস্থানে চিহ্নিত করে তার উন্নত অস্তিত্বের দাবিকে বৈধতা দেয়।

প্রকাশক্ষমতাকে যদি কবিত্বের প্রাথমিক শর্ত বলে মানতে হয় তবে 'বিদ্রোহী'কে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র তুলনায় শিল্প-সফল না বলে উপায় থাকে না—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র অসামান্য তীব্রতা, সংহতি এবং পরিপূর্ণতার কথা স্মরণে রেখেও। বৈচিত্র্য, বর্ণাঢ্যতা, আত্মবীক্ষণের বিস্মিত বৈভব, ক্যানভাসের বিশালতা, সাঙ্গীতিক বহুমাত্রিকতা, চিত্রকল্পের অপার্থিব সাফল্য, স্ববিরোধিতার সুন্দর সামঞ্জস্য, বলীয়ান জীবনাগ্রহ—এসব নিয়ে 'বিদ্রোহী' বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অনতিক্রান্ত।

প্রকরণের উজ্জ্বলতায় 'বিদ্রোহী' এসব কারণেই স্মরণীয়। তবু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পাশে 'বিদ্রোহী', এক জায়গায় হেরে যাবে—সেটা প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে। দুটো কবিতাই অস্তিত্বের জাগরণের গান, তবু জাগরণস্বভাবে এরা আলাদা। 'বিদ্রোহী' জাগ্রত আত্মসত্তার বিস্মিত বিশাল বিবরণ ; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যাত্রার গতিময়তার কল্লোল। চরিত্রের কারণেই 'বিদ্রোহী' ব্যাপক বর্ণনাময়—আত্মপরিচিতির দীপ্র এক সুবিশাল চিত্রশালা ; (পুরো কবিতায় 'আমি' শব্দটির ব্যবহারই রয়েছে একশ ছেচল্লিশ বার।) বহুমাত্রিকতায়, স্ববিরোধে, দ্বন্দ্বে, বৈপরীত্যে, একাত্মতায়, শত বিচিত্র অবস্থান থেকে সত্তার ওপর আলো ফেলে ফেলে নিজেকে সুপরিসরভাবে দেখা—এই হল 'বিদ্রোহী'। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' গতির উচ্ছ্বত আবেগে গৃহহীন ও হিংস্র ; নির্ঝর প্রতীকের আড়ালে চিরযাযাবর রবীন্দ্র-চৈতন্যের বাসা ছাড়বার প্রথম খর-সংগীত। এই যাত্রা তীব্র, নিষ্ঠুর, আত্মদ্বৈরথে রক্তিম ও মহান। এজন্য 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বিবরণমূলক হতে পারেনি। সুদূরাভিসারের অশ্রান্ত পদপাতে মুখর ও প্রতিধ্বনিময় হয়েছে। 'বিদ্রোহী'তে যাত্রা নেই তা নয়, কিন্তু সেই যাত্রায় ভূলোক-দ্যুলোক-গোলক পরিব্যাপ্ত কবির বিশাল মহাবৈশ্বিক সত্তা, সম্ভাবনার মহত্তম পর্যায় পার হয়ে, এক সময়, হঠাৎ করেই সীমিত সামাজিক সংগ্রামের সংকীর্ণ ধারায় ক্ষীণতোয়া হয়ে গেছে। বিষয়টা বেদনাদায়ক ঠেকতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে নজরুলের কবিজীবনের জন্য এরচেয়ে বড় সত্য আর ছিল না। দুঃখময় সামাজিক বৈষম্য নিরসনের আকুতিতে তিনি আজীবন নিদ্রাহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। 'আমার কৈফিয়ত'-এর শেষপর্বে এই সীমিত সামাজিক উদ্দেশ্যের কাছে তাঁর এই সচেতন আনুগত্যকে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। 'বিদ্রোহী'তে তাঁর অন্তরীক্ষস্পর্ধী বিশাল অবস্থান থেকে সাধারণ সামাজিক প্রয়োজনের সংকীর্ণ ভূমিতে নজরুল নেমে এসেছিলেন, এইজন্য এই কবিতাকে বিত্তহীন ভাবলে অবিচার হবে। বরং বিদ্রোহীর সাফল্য এখানে যে, এটি নজরুলের সমস্ত জীবনের একমাত্র রচনা যার প্রায় সবটা জু'ড়ে খণ্ডিত সামাজিক অস্তিত্বকে ডিঙিয়ে শক্তি ও সম্ভাবনার রৌদ্রালোকিত রাজ্যে আত্মসত্তার বিপুল অপার সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অপরিমেয় পিপাসার গান। কোনো নির্দিষ্ট ছক বা গতের সীমিত ধারার ভেতর এই যাত্রা কবিকে সংকীর্ণ করতে পারেনি ; এই কবিতার পদযাত্রা সুদূরচারী ও দীর্ঘ—যার শেষে দাঁড়িয়ে আছে মহাসাগরের বিশালতা। বোঝা যায়, এমন এক অপরিমেয় কবি জাগ্রত হচ্ছেন এই কবিতার মধ্য থেকে যিনি মহৎ থেকে মহত্তরের ক্ষান্তিহীন পিপাসায় অপ্রতিহত ও বিকাশমান এবং অস্তিত্বের উচ্চতমকে স্পর্শের লক্ষ্যে প্রজ্বলন্ত, দুর্জয়।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এখানেই বিজয়ী—আধারে নয়, আধেয়তে ; প্রকরণে নয়, প্রসঙ্গে; ঋদ্ধতর জীবনের মহৎ প্রতিশ্রুতিতে। 'কাব্য সাফল্যে' নয়, 'কবি সাফল্যে'।

১৯৮৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফররুখ আহমদ

১

আমাদের যুগে আমরা যেসব ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে বেঁচেছিলাম তার সঙ্গে ফররুখ আহমদের পার্থক্য ছিল দুস্তর। এই ব্যবধানকে দুস্তর না বলে প্রায় বিপরীত বলাই ভালো। ফররুখ আহমদ তাঁর আবেগধারার ভেতর, জাতি বলতে মোটামুটিভাবে তাঁর নিজস্ব ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকেই বুঝতেন—আমরা ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে বাংলার আবহমান সংস্কৃতির সকল উত্তরাধিকারীকে। তাঁর নিজের জাতির উৎসের সন্ধান করেছিলেন তিনি ইসলামের অতীত গৌরবের স্বপ্নিল বর্ণচ্ছটার জগতে, আমরা এই দেশের তামাটে আদিম একটি জনগোষ্ঠীর ভেতর। এই জাতির ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখতেন তিনি এক পরিত্যক্ত মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থার ভেতর, আমরা একালের প্রগতিশীল শ্রেণী-সংগ্রামের পথে।[১] এসব পার্থক্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই যে কেবল আমাদের মাঝখানে বিচ্ছিন্নতা ও অপরিচিতির দেয়াল উঠিয়ে দিয়েছিল তা নয়, আমাদের ব্যক্তিগত নৈকট্যকেও খানিকটা ব্যাহত করেছিল। কিন্তু এতসবের পরেও এই নিরাপোষ, নিঃসঙ্গ মানুষটি[২] যে তাঁর জীবিত দিনগুলোর মতো আজও একইভাবে তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছেন তার কারণ

---

১. কেন ফররুখ আহমদ জাতির একটা খণ্ডিত পরিচয়কে এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় করে তুলেছিলেন কিংবা কেন তাঁর মতন একজন উদার মানুষের জাতিগত চেতনায় তাঁর নিজস্ব ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়া আর সবাই কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন নয়। তাঁর অধঃপতিত দুঃখী জাতিকে উদ্ধারের নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা তাঁর অস্থি-মজ্জা-মনন-চেতনাকে এমন নিষ্কৃতিহীনভাবে অধিকার করে রেখেছিল যে ঐ বিশেষ জাতির অস্তিত্বের প্রসঙ্গ ছাড়া আর সবকিছুই তাঁর চোখের সামনে থেকে বিপুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ঠিক যেভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমের সামনে থেকে তাঁর নিজস্ব ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়া আর সবার প্রসঙ্গ কিংবা একালের সুকান্তের কাছে নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-বেদনা ছাড়া জীবনের আর সব বিবেচনা।

২. যে চেতনার ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, কবিতার জগতে তিনি ছিলেন তার প্রতীক। ইচ্ছা করলে তাঁর অবদানের বিনিময়ে চারপাশের আর সবার মতো তাঁর জাতির কাছ থেকে যে-কোনো জাগতিক সুবিধা আদায় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে মানবিক দুর্বলতা আমার কালের প্রায় প্রতিটি মানুষকে পরাজিত করেছে তিনি ছিলেন তার উর্ধ্বে। নিজের জন্য তিনি কারো দিকে প্রত্যাশার খিন্ন হাত বাড়িয়ে দেননি। জীবনে একজন সত্যিকার 'মোমিন' হিসেবে বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি, সত্যিকার মোমিনের মৃত্যুও তিনি পেয়েছিলেন। হয়তো রক্তের গভীরে এমনি একটি মৃত্যুই খুঁজেছিলেন তিনি আজীবন। শুনেছি মৃত্যুর সময় তাঁর সৎকারের অর্থও তিনি রেখে যেতে পারেননি। এমনি মৃত্যুই একজন সত্যিকার বিশ্বাসীর মৃত্যু। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে হাজার হাজার পার্থিব কুকুরের বৈভবদীপ্ত মৃত্যু দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ফররুখ আহমদের মৃত্যুর এই নিঃস্ব নিঃসঙ্গ দীপ্তিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর দীপান্বিত কবিত্ব। কেবল কবিত্ব নয়, সৎকবি হতে গেলে যে গুটিকয় অযোগ্যতাকে পুঁজি করে একজনকে এগোতেই হয় তারই একটা দুর্লভ জিনিস ছিল তাঁর অধিকারে। সেটা হল : হৃদয়ের সঙ্গে মিথ্যাচারের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা। সততা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল এবং আলোময়। এই সততা তাঁর মধ্যে যে-পরিমাণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সে-পরিমাণেই তিনি ছিলেন কবি। যদি তিনি তাঁর সততার সঙ্গে খানিকটা ভুলের মিশেল দিতে পারতেন, তাঁর সহজাত স্বভাবের সঙ্গে যোগ করতে পারতেন নিজেরই বিরুদ্ধ-প্রবৃত্তির হত্যাকারী উপাদানগুলোকে, জীবনের হাতে পর্যুদস্ত ও বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের শোকগাঁথাকে; তাহলে তিনি হয়তো আরও বড়কবি হতেন। সততার অনমনীয় আলো তাঁকে 'কবি' করে তুলে 'বড়কবির' শিরোপা থেকে বঞ্চিত করেছিল।[৩]

---

৩. নিজের অধঃপতিত জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি তাঁর কবিতায়। পাকিস্তান আন্দোলনের মূল স্বপ্নও ছিল তাই। এজন্যেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেকালীয় পাকিস্তান আন্দোলনের অনিবার্য প্রতিভূ—'সিন্দাবাদ'। যতদিন পাকিস্তান আন্দোলন সক্রিয় ছিল ততদিন তাঁর এই ভূমিকা ছিল অপ্রতিহত ও সজীব। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তাঁর এই ধারার কাব্যপ্রেরণার ওপর হঠাৎ করেই মৃত্যুর স্তব্ধতা ঢেলে দিয়ে যায়। তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে যে বলীয়ান জাগরণের দিকে এতকাল তিনি আহ্বান করে চলেছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে সেই ঈপ্সিত জাগরণ শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁর ঐ ধারার কবিতা রাতারাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাঁর দেশকাল তাঁর চোখের সামনে দিয়ে নতুন পথে পা বাড়ায়। ফলে পরবর্তীকালের কাব্যযাত্রা ঐ নতুন পদপাতের রেখা ধরে নতুন উত্তরণের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এই নতুন পালাবদলের পথে ফররুখ আহমদ আর এগিয়ে এলেন না। তাঁর জাতির একালীয় সিন্দাবাদ নোনা দরিয়ার নতুন আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন সফরে কিশতি ভাসাবার প্রস্তুতি নিল ঠিকই কিন্তু কবি তাঁর প্রাক্তন অবস্থানে অটল হয়ে রইলেন। তাঁর সিন্দাবাদের এই নবতম একালীয় সফরের নতুন অপরিচিতি চরিত্রটিকে তিনি যেন ঠিক চিনে উঠতে বা বিশ্বাস করতে পারলেন না—যেমন বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর নায়কের আগের অভিযানগুলোর মধ্যযুগীয় চরিত্রটিকে। ফররুখ আহমদ তাঁর কালের বেদনাকে টের পেয়েছিলেন, সেই দুঃখের উত্তরণকে চিনতে পারেননি। আর এখানেই নতুন দরিয়া-হাওয়ার সমর্থনপুষ্ট পরবর্তী অভিযাত্রীদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সিন্দাবাদের মতোই শক্ত অপরাজেয় হাতে প্রাচীন কিশতির হাল অটুটভাবে ধরে রইলেন তিনি। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে অন্ধ ও আপোষহীন আমাদের কালের এই সবচেয়ে শক্তিমান ও করুণাবহ চরিত্রটি, তাঁর অভিমানী ও আহত চরিত্র নিয়ে, দীর্ঘকালের প্রিয় ও পরিচিত সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধ-শিবিরের দিকে হেঁটে যেতে দেখেও, ভাঙা মাস্তুল আর ছেঁড়া পাল নিয়ে প্রতিকূল সমুদ্র-হাওয়ার বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ যাত্রায় শেষপর্যন্ত একা দাঁড়িয়ে রইলেন—নড়লেন না, সরলেন না, তলিয়ে দেখলেন না যে, সিন্দাবাদের প্রত্যেকটি নতুন সফরই জন্ম নিয়েছিল পূর্ববর্তী সমুদ্র-যাত্রাগুলোকে প্রতিবাদ করেই এবং তাঁর এই আধুনিক ও একালীয় অভিযাত্রাটি তাঁর আগের অভিযানগুলোর পরিচিত পথকে প্রত্যাখ্যান করেই নতুন দিগন্ত-সন্ধানে এগিয়ে আসতে পারে কেবল।

নিজেকে বা নিজের যুগকে প্রশ্ন করে তাঁর এই ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতার কারণ অন্বেষণের ব্যাপারেও তিনি থেকে গেলেন সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন। উজ্জ্বল কিন্তু সীমিত ও একমাত্রিক চৈতন্যের মানুষ ছিলেন তিনি। নিজেকে প্রশ্ন করে ক্ষতবিক্ষত করে আত্ম-অতিক্রমণের বিষয়টি এই তীব্র ও একগুঁয়ে মানুষটির কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। (অথবা হয়তো নতুন কোনো ভুবনের জন্ম দেবার মতো সজীব উপাদান আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর মধ্যে।) এইভাবে আমাদের কালের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং সীমিত মানুষটি, সমসাময়িক দেশ ও কালের ভাবনা-বলয় থেকে ক্রমাগতভাবে দূরে সরে গিয়ে, সকলের বিরক্তি এবং তিক্ততার ভেতর, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে নিঃশব্দে একসময় হারিয়ে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু ছোট হলেও 'কবি' ছিলেন তিনি। জীবনানন্দ দাশ উক্ত সেই 'কেউ কেউ কবি'দের একজন। ছোট কিন্তু ন্যূনতম নিটোল একজন কবির সম্পূর্ণতা ছিল তাঁর মধ্যে। আমার ধারণা ফররুখ আহমদ কবিতা–অঙ্গনে আজপর্যন্ত আমাদের সর্বশেষ 'কবি'। ফররুখ আহমদের পর ছোট বা বড় কোনো অর্থে আর কোনো 'সম্পূর্ণ কবি' পাইনি আমরা আমাদের সাহিত্যে।

২

ফররুখ আহমদকে দেখার প্রথম দিনটি আজও আমার চোখের সামনে সজীব হয়ে আছে। নাজিমউদ্দিন রোডের পুরোনো রেডিও অফিসের উল্টোদিকে একটা ছাপড়া–ওয়ালা সস্তা রেস্তোরাঁয় অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশে তিনি জমে ছিলেন। ছুরির মতো ঝকঝকে চোখের এই মানুষটিকে সেদিন আমার মনে হয়েছিল সবল প্রাণশক্তিপূর্ণ একজন নিঃসঙ্গ পুরুষ বলে, প্রখর উজ্জ্বলতার মধ্যেও যিনি রহস্যময়। সবার ভেতর একজন হয়েই তিনি বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরই যেন তাঁকে চিনিয়ে দিয়ে বলে দিচ্ছিল : এই মানুষটি আলাদা। থেকে–থেকে তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্দাম বেপরোয়া হাসিতে চারধার কাঁপিয়ে হেসে উঠছিলেন তিনি—যেন একটি মানুষের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠছিল একটি বিরাট জনতা।

প্রতিভায় তিনি ছিলেন কবি, হৃদয়ের ভেতর অপরিমেয় মানুষ। এইজন্যে একজন সৎকবি হয়ে–ওঠার পথে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। ব্যক্তিগত মতবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি উৎরে তাঁর ভেতরকার তপ্ত মানবিক ছোঁয়া অবলীলায় টের পাওয়া যেত। এই নিঃসঙ্গ মানুষটি অন্যদের এতটুকু আহত না করে তাঁর নিজের স্বজাতির বেদনানুভূতির ভেতর এমন মানবিকভাবে বেঁচে ছিলেন এবং নিজের ধর্মানুভূতির জগতে এমন সৎ ও গভীরভাবে উপ্ত ছিলেন যে নিজের ধর্ম এবং জাতির জন্য যিনিই এতটুকু মমত্ব অনুভব করেন তাঁর পক্ষে তাঁর কবিতাকে নিজের কবিতা বলে ভাবার পথে কোনো বাধা থাকে না। এটি সেই কারণ যার ফলে তঁর মত বা আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হয়েও আমরা তাঁকে ভালোবাসতাম। এইটিই একজন সৎকবির ক্ষমতা। বিশ্বাসের পৃথিবীতে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ, তাঁদেরকেও তিনি, তাঁর সমর্থকদের মতো, একই সুধায় আপ্লুত করেন।

৩

ফররুখ আহমদের পর ছোট বা বড় কোনো 'সম্পূর্ণ কবি'কে আমরা আজো পাইনি—কথাটার খানিকটা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গত আমি দিয়ে নিতে চাই। একজন 'সম্পূর্ণ কবি' কে? আমার ধারণা, জীবনানন্দ দাশের 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'—উক্তিটির ভেতরে এই প্রশ্নের একটা প্রচ্ছন্ন উত্তর অলক্ষ্যে লুকিয়ে আছে। 'সকলেই কবি নয়' কথাটার মধ্যে এমন একটা বক্তব্য অনুক্ত রয়ে গেছে যার অর্থ উদ্ধার করলে মোদ্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে দাঁড়াবে এরকম : সকলকেই (যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের) কবি বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে (তাঁদের) 'সকলেই কবি নয়।' এইখানটায় আমার একটা প্রশ্ন। উল্লেখিত বাক্যের 'সকলে' সত্যিসত্যিই যদি কবি না হন তবে (আপাতভাবে হলেও) তাঁদের কবি বলে মনে হয় কেন? অ-কবিদের নিয়ে তো এ-ধরনের বিভ্রান্তি হবার কথা নয়। তাহলে কি বুঝতে হবে যাঁরাই কবিতা লেখেন তাঁদের রচনায়, যত সামান্যভাবেই হোক, কবিতার এমন কিছু দীপ্ত উপাদান থেকেই যায় যা কমবেশি কবিতার রক্তিমতায় রাঙা—যে কারণে তা চকিতের জন্যে হলেও পাঠকের মনে কবিতার বিভ্রম জাগিয়ে তুলতে পারে? আমার বিশ্বাস যিনি কবিতা লেখেন, কাব্যপ্রয়াসের নির্দয়-আবেগ যার স্নায়ুশিরাকে জীবনের কিছুকিছু মুহূর্তে নিষ্কৃতিহীনভাবে অধিকার করে নেয় কিংবা পারে তাঁর জাগ্রত চেতনাদ্যুতির ভেতর থেকে শব্দ-পঙ্‌ক্তি-স্তবকের অবলীল উৎসার ঘটাতে—তাঁর লেখায় কিছু-না-কিছু কবিতার লাবণ্যের স্পর্শ থেকে যেতে বাধ্য। সম্পূর্ণ কাব্যপ্রতিভাবর্জিত মানুষের পক্ষে কাব্যপ্রয়াসের এই নিদ্রাহীন শ্রম বা দুর্মর কষ্ট এমনিতেও বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। প্রতিভার অল্পাধিক প্রজ্বলনই কেবল পারে একজন মানুষকে কাব্যপ্রয়াসের শ্রমবহুল যন্ত্রণার ভেতর প্রদীপের মতো জ্বালিয়ে রাখতে। এককথায় একজন মানুষের মধ্যে কবিতার জ্বলন্ত উৎসার থাকে বলেই তিনি কবিতা লেখেন। শিল্পের বহুকথিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—আত্মপ্রকাশের নিষ্কৃতিহীন অত্যাচার—তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখতে বাধ্য করে বলেই তিনি কবিতা লেখেন। নইলে বস্তুবিশ্বের নিরন্তর ডামাডোলে নিনাদিত এই নশ্বর পৃথিবীতে কবিতা লেখার মতো ধন্যবাদহীন ও প্রায়-অকারণ চেষ্টায় সময়ের অপচয় ঘটাতে কেইবা উৎসাহী হতেন। কাজেই যিনি কবিতা লেখেন তাঁর মধ্যে কবিতার কমবেশি অগ্নিচ্ছটা আছে বলেই তিনি কবিতা লেখেন। এবং কবিতা লেখেন বলেই তাঁর কবিতায় কাব্যের ছিটেফোঁটা লাবণ্য থাকা বা তাঁকে খানিকটা কবির মতো মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

আরেকটু গভীরে গিয়ে ব্যাপারটাকে দেখা যেতে পারে। একজন মানুষ কখন কবিতার আবেগে জেগে ওঠেন? ওঠেন তখনই যখন তাঁর রক্তধারার ভেতর কবিতার অলীক আকুতি সবুজ ভূদৃশ্যের মতো পাতা মেলতে চায়, নিজের ভেতর নিজের চেয়ে বড়কিছুর উপস্থিতিকে অনুভব করে তিনি শিহরিত হন, জীবন জেগে উঠতে চায় নিজেকে ছাপিয়ে—বসন্তরাতের হত্যাকারীর মতো। যাদের ভেতর জীবনের এই উপচে-পড়া ঐশ্বর্য নেই, কবিতা লেখার অনর্থক বিড়ম্বনার দায় থেকেও তারা প্রাকৃতিক নিয়মেই মুক্ত। কিন্তু যাঁদের জীবনে এইসব রক্তাক্ত মুহূর্ত ঘাতকের মতো ফিরে ফিরে হানা দেয়, তাঁরা তাঁদের ভেতরকার ঐ জেগে-ওঠা জীবনকে শব্দে-ছন্দে-উপমায় স্মরণীয় করে রাখার এক অসহায় আবেগে বিস্রস্ত হতে থাকেন। ফলে জীবনের এই উছলে-ওঠা মুহূর্তগুলোর বলীয়ান বিস্ময় তাঁদের জীবনের মতো কবিতাতেও এলোমেলোভাবে জ্বলে জ্বলে বেড়ায়। হয়তো এ কারণেই তাঁদের রচনায় কবিতার কিছু-না-কিছু দীপ্তি, কবিতাগণ্ডের কিছু না কিছু রক্তিমতা শেষপর্যন্ত পেয়েই যাই আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব তথ্য থেকে দুটো সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছোতে পারি। যিনি অল্পবেশি কবিতা লিখতে চেষ্টা করবেন দুটো জিনিস থাকতেই হবে তাঁর রক্তে। এক : প্রাত্যহিক জীবনের ভেতর 'জীবনের অধিক জীবনের' অপার্থিব আবির্ভাবে শিউরে ওঠার মতো একটা হৃদয়। দুই : সেই ছাপিয়ে-ওঠা হৃদয়কে কবিতার কমনীয়তায় ফুটিয়ে তোলার উপযোগী কাব্যপ্রতিভার কমবেশি লাবণ্য। এজন্যে যাঁরাই পৃথিবীতে কবিতা লেখেন তাঁদের রচনাতেই কবিতার কিছু-না-কিছু উপাদান—দামী বা সাধারণ—খুঁজে পাওয়া যায়ই শেষপর্যন্ত। কারো উপমা আমাদের মুগ্ধ করে, কারো শব্দের শক্তি বিস্ময় জাগায়, কারো ছন্দ বা ধ্বনিব্যঞ্জনা লাবণ্যময় আঙুলের মতো আদর বুলিয়ে যায় শরীরে, কারো চৈতন্যের জাগ্রত দীপ্তি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—কারো কবিতায় অনেকগুলো দামি মালমশলা একখানে হয়ে জীবনকে উজ্জ্বল দুতিতে ঝিকিয়ে তোলে।

এখন প্রশ্ন হল : যিনি কবিতার সুস্মিত উপাদানের দ্বারা আমাদের চেতনার ওপর কমবেশি স্নিগ্ধ সৌগন্ধ ছড়িয়ে দিতে পারেন তিনিই কি কবি? যা আমাদের মনকে বর্ণিল স্পর্শে রঞ্জিত করে তোলে তাই কি কবিতা? মনে আছে, তরুণ বয়সে একজন সতীর্থ কবির একটি কবিতার বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে শব্দ-ছন্দ-উপমা বা কবিতার এক বা একাধিক উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে কবিতা নয় তা সে যত দ্যুতিময়ই হোক না কেন। এরা কবিতার উপাদান মাত্র। কবিতা এদের অবাক যোগফলের নাম। একটি কবিতায় কবিতার ঐসব উপাদানগুলো যখন অনবদ্য সমবায়ে বিবাহিত হয়ে কবিতার অনুভূতিটিকে একটি নিটোল পূর্ণতায় ফলিয়ে তোলে তখনই তা কেবল কবিতা—মাইকেলের ভাষায় 'যম-দমী'—কালোত্তীর্ণ ছোট্ট অপার একটি মুক্তো।

এমনটা যখন ঘটে তখনই আমরা টের পেয়ে যাই আমাদের চারপাশে ছিটিয়ে-থাকা রাশিরাশি আটপৌরে শব্দ-উপমা-অলঙ্কার আর চেতনার সম্পদ হঠাৎ এক অলীক লীলায় জোড়া লেগে এমন একট ছোট্ট সুন্দর পৃথিবী রচনা করে বসল, নশ্বর সময়ের হাত কোনোদিন যার নাগাল পাবে না। কবিতা এইটিই। কবিতা হচ্ছে তার নিজেরই অনিবার্য উপাদানসমূহের উজ্জ্বলতম সন্নিবেশের নাম। হ্যাঁ, উজ্জ্বল-'তম' : কবিতার মধ্যে এমনি একটা 'তম'-র ভূমিকা ভারি জরুরি। 'সম্পূর্ণ কবিতা' এই 'তম'-রই অবদান, 'তর'-র কোনো ভূমিকা সেখানে নেই।

এমনি অলীক সামগ্রিকতায় নিজেকে লতিয়ে তুলতে পারলেই কবিতা কবিতা—একটি রমণীয় স্বর্গীয় ফুল—অনির্বচনীয়তার ডালে ফুটে-ওঠা একমুঠো রক্তপ্রবাল। যতক্ষণ না শিল্পের এই পরিপূর্ণতায় কবিতা নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারছে ততক্ষণ আদৌ তা কবিতা নয়—বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল কিছু কাব্য-উপচারের অপ্রস্তুত সংকলন মাত্র—বিক্ষিপ্ত কিছু উপাদানের অসম্পূর্ণ আনন্দ—মৃত্যুচিহ্নিত এই পৃথিবীতে যারা প্রতিনিয়ত সংখ্যাহীনভাবে জন্মে আবার প্রতিনিয়তই লোকচক্ষুর আড়ালে নিঃশব্দে ঝরে যাচ্ছে। এই শৈল্পিক সম্পূর্ণতা আছে বলেই কবিতা প্রদীপের মতো এমনভাবে জ্বলে জ্বলে আলো দিতে পারে—যেন সে আর আমাদের চারপাশের অসম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসন্তোষজনক পৃথিবীর ছেঁড়াখোঁড়া অচরিতার্থ সামগ্রী নয় তখন, সে একটি নিটোলতম পৃথিবীর প্রতীক—যার ভেতর দিয়ে বাস্তবের ছেঁড়া-ভাঙা জগৎটাকে আমরা একটা টলটলে আয়নার ভেতর দেখতে পাই। কোনোভাবে ঐ নিটোলতা থেকে স্খলিত হয়ে গেলে তা বিস্রস্ত ও অসংগঠিত হয়ে অর্থহীন মেঝেতে ছড়িয়ে যায়। তখন তা পৃথিবীর কোটি কোটি অবাঞ্ছিত জিনিসেরই মতো আরেকটা নিরর্থক ব্যাপার।

এমনি শৈল্পিক পূর্ণতায় ফলে ওঠার আগে পর্যন্ত কবিতা একটা সম্ভাবনার নাম—নানান মূল্যবান আশবাব উপকরণে সমৃদ্ধ একটা উজ্জ্বল কাব্যিক 'প্রতিশ্রুতি'। যে কবিতায় কাব্যের বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলো অবাক সমবায়ে নিটোলতমভাবে রচিত হয় না, তা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন আনন্দে আমাদের রসনাকে স্নিগ্ধ ও হৃদয়কে বর্ণিল করে তুলতে পারলেও আমাদের রক্তে কবিতার অলৌকিক শিখাটি জ্বালাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শিল্পের এই নিটোলতাকে স্পষ্ট করার জন্য শেষবারের মতো একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। ধরা যাক, একটা নতুন নির্মীয়মান বিলাসবহুল বাড়িতে অঢেল ব্যয়ে এবং বিপুল সমারোহে বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলছে। নকশামাফিক সারা বাড়ির দেয়াল কেটে লুকনো তার বসাটি হয়েছে প্রতিটি প্রয়োজনীয় রেখায়, প্রতিটি বাল্বের জন্য মনোমুগ্ধকর ঢাকনা সাজিয়ে ঝলমলিয়ে তোলা হয়েছে সমস্ত বাড়ির বৈভবস্নিগ্ধ অবয়ব; দামি সুইচবোর্ডগুলো মনোরম আলো ছড়াচ্ছে চারধারে। এককথায় সবকিছু নিখুঁত, পরিপাটি এবং সুদৃশ্য—কেবল ত্রুটি রয়ে গেছে একটা অবাঞ্ছিত জায়গায়। সারাবাড়ির একটামাত্র ঘরের নেহাতই একটা তুচ্ছ অ-দরকারি অংশের দেয়ালের ভেতরকার একটা তার সামান্য একটু কাটা। ব্যস, সব নিষ্ফল হয়ে গেল। দেয়াল কেটে তার বসাবার ব্যয়বহুল সব আয়োজন থেকে শুরু করে আলোর ঢাকনা, ঝালরের আভিজাত্য, নরম আলো ছড়ানো মনোহর সুইচবোর্ডের সৌকর্য সবই সম্পন্ন হল কেবল বিস্মিত রাতের সেই অলৌকিক আলোটাই জ্বলল না। একজন কবির সঙ্গে অ-কবির পার্থক্য এখানেই। একজন অ-কবি তাঁর সব জমকালো দামি উপাদান আসবাব নিয়েও সামগ্রিকতার ছোট্ট জায়গায় ব্যর্থতার কারণে কবিতার আলো জ্বালাতে ব্যর্থ হয়ে যান। ফররুখ আহমদের মধ্যে এই আলো জ্বলেছিল। তাঁর পরবর্তীকালের বাংলাদেশের কবিতায় এই আলো বিচ্ছিন্ন এবং আকস্মিক কিছু সাফল্য দেখালেও পরিপূর্ণভাবে আর দেখা যায়নি।

ফররুখ আহমদ তাঁর অন্তত একটি ধারার বেশকিছু লেখায় কবিতার উপাদানগুলোকে এমন একটি শক্তিমান নিটোলতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন যার সমকক্ষ কিছু আমাদের কবিতাজগৎ তাঁর পরবর্তীতে আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। অথচ ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় ঐ নিটোলতাকে স্পর্শ করেছেন—খুব ব্যাপক ক্ষেত্রে নয়, ছোট একটু এত্তটুকুন জায়গায়। তবু ঐটুকু পেরেছিলেন বলেই তিনি কবি। ফররুখ আহমদের কবিত্বে এই ছোট্ট জায়গাটুকু হল সামুদ্রিক অভিযানভিত্তিক তাঁর ইসলামি ধারার কবিতাগুলো—সেই নোনা নীল দরিয়ার সৌকর্যময় জগৎ—সেইসঙ্গে একই প্রবণতার আরও কিছু দু-চারটি টলটলে কবিতা—যেখানে আরবি ফারসি শব্দের সমবায়ে এক নিটোল অলীক রক্তিম পৃথিবী তিনি রচনা করেছেন। শিল্পের এই নিটোলতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিসটি গত পঞ্চাশ বছরে যেসব বাংলা কবিতায় ফুটে উঠেছে, তার একটি অবশ্যই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতাটি যা বারবার পড়ে ও অন্যকে পড়ে শুনিয়েও পাঠকের মন তৃপ্ত হয় না। এখানে এই পরিচিত কবিতাটির উদাহরণ আমি টানলাম শৈল্পিক জিনিসটি কী তা সহজভাবে দেখিয়ে দেবার জন্যে যে শীর্ষ ফররুখ আহমদ তাঁর ঐ ধারার অন্তত আট-নটি কবিতার সুডৌল পরিপূর্ণতার ভেতর স্পর্শ করেছেন। এই কবিতাগুলোর শৈল্পিক সাফল্যের জন্যেই ফররুখ আহমদ কবি—বড় নন, সাধারণ—কিন্তু কবি। ছোট, কেননা তাঁর কাব্যসাফল্যের সমানুপাতে মানব-অস্তিত্বের বিশাল গহন ও রহস্যময় পরিচয়কে তিনি তাঁর কবিতায় মূর্ত করে তুলতে পারেননি। জীবনবোধের তলদেশগামিতায় তিনি বিত্তহীন ছিলেন।

শৈল্পিক সাফল্যের শিখরকে ছুঁতে না পারলেও নান্দনিক সাফল্যের দিক থেকে অভিনন্দনযোগ্য বেশকিছু কবিতা লিখেছেন ফররুখ। 'ডাহুক', 'লাশ'-এর মতো আংশিক সাফল্যে উজ্জ্বল অর্ধসম্পন্ন ও কাব্য-উপাদানে সমৃদ্ধ বেশকিছু কবিতা বা তাঁর অনন্য সনেটগুচ্ছ এই কবিতাগুলোর দলে পড়বে। ফররুখ আহমদের কবিতাসংগ্রহ থেকে এই কবিতাগুলোকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলেও আমার ধারণা কবি হিসেবে তাঁর মর্যাদা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হবে না, যদিও তাঁর চেতনাজগতের বিশদ পরিচয় খণ্ডিত হবে। ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতার একটি সীমিত জায়গায় কবিতার শীর্ষকে ছুঁতে পেরেছিলেন বলেই আজ তাঁর এইসব কাব্যগুণসম্পন্ন অসম্পূর্ণ কবিতাগুলোও সবার আলোচ্য হয়েছে, যা অন্যথায় অনেকখানিই উপেক্ষিত হত। কবিতার এই নিটোলতা বা শৈল্পিক পূর্ণতা—যা কবিতার সবচেয়ে মৌল সম্পদ—একজন কাব্যার্থীকে করে তোলে 'কবি'—মরণীয়কে স্মরণীয়—কবি চলে গেলেও কবিতাকে যা হারিয়ে যেতে দেয় না এই মৃত্যুব্যথিত পৃথিবী থেকে।

এজন্যেই যেসব কাব্যপ্রয়াসী কবিতার বিচ্ছিন্ন দামি উপকরণ একখানে করে কাব্যের বিচিত্র স্নিগ্ধ আস্বাদে আমাদের চিত্তকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন আনন্দে প্রজ্বলিত করে যাচ্ছেন তাঁদের সবাই সবসময় কবি নন—অধিকাংশই কাব্যের 'শোভাবাজারের' বাসিন্দা, শিল্পজগতের বিনোদনকারী। যে শৈল্পিক সম্পূর্ণতাকে আমি কবিতা বা কবির ন্যূনতম সম্পত্তি বলে ভাবতে চেয়েছি, সেই নিরিখে, অল্পকিছু সফল উদাহরণ বাদ দিলে, বাংলাদেশের গত আধ-শতাব্দীর কবিতা একধরনের উচ্চতর বিনোদন ছাড়া আর কী?

৪

একজন সৎকবি'কে বুঝতে পারার আরও একটা বহুলপ্রচলিত উপায় আছে। পৃথিবীর প্রতিটি কবিই আসলে একেকটি আলাদা জগৎ। শব্দে, চিত্রে, রূপকল্পে সজীবতায় তিনি পাঠকের সামনে একটি আলাদা পৃথিবীর ছবি দাঁড় করিয়ে দেন। যিনি সত্যিকার কবি তাঁকে এমনি একটা আলাদা জগতের ছবি উপহার দিতেই হবে পাঠককে। স্বকীয়তা, উজ্জ্বলতা এবং সজীবতায় এই জগৎ অন্যদের থেকে এমনি পৃথক এবং আলাদা যে তাঁর আগের বা পরের কোনো কবির রচিত জগতের সঙ্গে তাকে একাকার করে গুলিয়ে ফেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে পঠিত, আস্বাদিত ও আলোচিত হতে হতে তাঁর রচিত এই জগতের সঙ্গে কবি নিজেও পাঠকের চোখে এতটা অভিন্ন হয়ে পড়েন যে ঐ কবির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃজিত জগৎটি এক পলকে পাঠকের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। মাইকেলের নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে একটা শক্তিশালী বলিষ্ঠ ও বৈভবময় জগতের চিত্র আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যায়, যেমন সত্যেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে একটি চপল, রহস্যময়, নিক্বণচটুল পৃথিবী। জসীমউদ্‌দীনের কথা উঠলেই পইল্লবাংলার অকৃত্রিম সরলতাময় একটা নিটল জগৎকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই, যেমন জীবনানন্দের প্রসঙ্গ মনে হলেই একটা ধূসর নির্জন পৃথিবীকে। কোনো কবির পুঁজি যদি খুব সামান্যও হয় তবু এমনি একটা জগতের ছবি অন্তত তাঁকে উপহার দিতেই হবে তাঁর কবিতায়—এমনি একটি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট সজীব পৃথিবীকে—যা কেউ কোনোকালে আগামীতেও ধরবেন না। পাঠকের সামনে তুলে ধরেননি। একজন ন্যূনতম কবি হবার জন্যে এটুকু করতেই হবে তাঁকে। কবি যদি আরও পরাক্রান্ত হন তবে এমনি একের বেশি পৃথিবী—এমনকি অনেকগুলো পৃথিবীকে—তিনি রেখে যাবেন তাঁর কবিতায়। সত্যিকার বড় কবিদের কবিতায় তাই আমরা এমনি অনেকগুলো আলাদা ভুবনকে দেখতে পাই—এমনি অনেকগুলো আলাদা উজ্জ্বল শক্তিমন্ত জগৎকে। কোনো 'বড়'কবির কবিতায় এই ভুবনের সংখ্যা যদি একের বেশি নাও হয়, শুধু যদি একটি জগৎকেও রচনা করে যান তিনি, তবু ঐ একটি ভুবনের মধ্যেই অনেকগুলো পৃথিবীর মিলিত বিশালতা, রহস্যময়তা এবং গভীরতাকে আমরা দেখতে পাব।

আগেই বলেছি, বড়কবি ছিলেন না ফররুখ কিন্তু 'কবি' ছিলেন ; তাই এমনি একটি স্পষ্ট উজ্জ্বল জগতের ছবি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়— 'নতুন সফর', 'কিশতি', 'নোনা দরিয়া'র একটি উজ্জ্বল একক পৃথিবী। তাই সকলেই কবি না হতে পারলেও তিনি কবি হয়েছিলেন। বড়কবি ছিলেন না বলে হয়তো জীবনের দ্বন্দ্ব-রক্তিম প্রগাঢ়তাকে স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর কাব্য, জীবনের উপরিতলের ওপর দিয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছে তা। তবুও একজন সৎকবির ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পেরেছিলেন তিনি ; দ্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা হতে পেরেছিলেন। ফররুখ আহমদ ছাড়া আমাদের আর একজন মাত্র কবি গত পঞ্চাশ বছরে এমনি নিটোল ও আলাদা ভুবন উপহার দিতে পেরেছিলেন, তিনি জসীমউদ্‌দীন। মানতেই হবে এই সময়কালের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকের কাছ থেকেই বেশকিছু পরিপূর্ণ কবিতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু আবারও বলি শুধু বিচ্ছিন্ন শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার রচয়িতাকে কবি বলা হয় না। কবি তিনিই, যিনি নিজের শৈল্পিক নিটোলতার ভেতর মানুষের জন্য অন্তত একটি একক উজ্জ্বল জগৎ রেখে যেতে পারেন। এলিয়ট লিখেছিলেন : 'কবি না হয়েও একজন ব্যক্তি ভালো কবিতা রেখে যেতে পারেন।' তাঁর এই উক্তিটি আমরা যেন এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভুলে না যাই।

১৯৮০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের কবিতা*

১

কোনো কারণ ছিল না, প্রতিবন্ধকতাও ছিল না তেমন কিছু, তবু তা-ই ঘটল শেষপর্যন্ত—নির্ধারিত সময় থেকে অনেক দেরিতে প্রকাশিত হল 'এক দশকের কবিতা'। পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছিল বছর দুই আগে; প্রেসেও গিয়েছিল যথারীতি। কিন্তু তার পরেই এক দীর্ঘ, দুর্বহ নিস্পৃহতা। এর মধ্যে সময় এগিয়ে গেছে। উৎসাহী শুভানুধ্যায়ীদের উদগ্রীব আগ্রহ পৌনঃপুনিক তাড়নার পরে একসময় স্বভাবিকভাবেই ঝিমিয়ে এসেছে—এমনকি এই সংকলন প্রকাশের যে জরুরি প্রয়োজন একসময় অবধারিত হয়ে উঠে আমাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্যত করে তুলেছিল, তার মূল তাৎপর্য এবং দরকারই এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। এমন অবস্থায়, প্রায় নিরর্থক জেনেও যে এই বিলম্বিত সংকলনটির প্রকাশকে প্রয়োজনীয় ভাবছি এবং আরো দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও যে তা ভাবতাম, তার কারণ : যে দশবছরের কবিতা এই সংকলনের উপজীব্য, সে দশক, কবিতার পালাবদলের দিক থেকে, আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

এই সংকলনের প্রায় সবকটি কবিতা, কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে, রচিত হয়েছে উনিশ-শ তেষট্টি থেকে উনিশ-শ বাহাত্তুর সালের মধ্যবর্তী সময়ে—মোটামুটিভাবে একটি পুরো দশক কিংবা তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি সময় ধরে; এবং সেসব কবির কবিতাই শুধু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই সংকলনে যাঁরা বয়সে রক্তিম তারুণ্য এবং চেতনায় উজ্জীবিত সম্পদ নিয়ে এই দশকের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিলেন আমাদের কবিতার অঙ্গনে।

২

"উনিশ-শ বাষট্টির গোড়ার দিকে এখানকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা পালাবদল, পাতার নতুন বর্ণে ও ব্যবহারে, জনচক্ষুর প্রায় অলক্ষ্যে ঘটতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠিতদের অমনোযোগী ও অনুদার চোখ এই তুচ্ছ ও নিশ্চিত ব্যাপারটি এড়িয়ে

---

* 'এক দশকের কবিতা'র (১৯৭৫) ভূমিকা

গেলেও উৎসাহী ও সজাগ শরীরমাত্রেই এই পরিবর্তনের উষ্ণ আঁচ অনুভব করে ও উৎকর্ণ হয়। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সাহিত্যের প্রকৃতিতে একটা নতুন ঋতু, অচেনা আগন্তুকের মতো নিঃশব্দে, সবার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং চারধারের ঝরাপাতার আর্তনাদ ও হাহাকারের মধ্যে তার অবধারিত বিজয়ী পদপাত আসন্ন। এবং কিছুসংখ্যক নতুন গাছ, নতুন ঋতুর সমর্থপুষ্ট হাওয়ায় এই সময় জন্মের উদ্যোগী সম্ভাবনা রটায়। আশা করা গিয়েছিল, এরা ফল দেবে।"

খানিকটা আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল ঘটনাটা—কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই—কারও প্রস্তুতি বা অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে। এই ধারার অন্যতম কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় :

'১৯৬০-এর লগ্ন প্রাথমিকে যথারীতি আলো জ্বলেছিল, দীপের সন্তানেরা গিয়েছিল দাঁড়িয়ে সার বেঁধে, ধনুকে লেগেছিল টংকার, আর এক তীব্র রণনঝননে প্রবীণেরা নড়েচড়ে বসেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে একটা নবীন হৈ হৈ দল যেন খানিকটা জোর করেই পর্বেশ করেছিল রঙ্গভূমিতে।'

এই নতুন ঋতু আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে উপহার দিয়েছিল কিছু নতুন ফসল—চেহারায়, চরিত্রে যা গতানুগতিকতার প্রচল থেকে আলাদা—এতদিন পরে এ-কথা সবচেয়ে বিরুদ্ধবাদীকেও স্বীকার করতে হবে। ফলে কিছু নতুন ও অজানিত কিছু চেতনার সম্পদ ইতিমধ্যে লভ্য হয়েছে আমাদের, পেয়েছি কিছু নতুন স্বতন্ত্র জীবনানুভূতি, শব্দ উপমা চিত্রকল্পের গণ্ডে কিছু নবীন রক্তিমতা, ভাষাশৈলীর উজ্জ্বল দীপ্তিমান কিছু অনুশীলন—এবং সবার ওপরে একটা নতুন চাউনি—কি গদ্যে কি কবিতায়। সাহিত্য সাফল্যের এই নতুন সংযোজন, সন্দেহ নেই, আমাদের কবিতাকে নতুন সম্ভাবনাময় বসতির দিকে বইয়ে দিয়েছে।

৩

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এই নতুন চেতনার প্রথম পদপাত ঘটে কয়েকটি অনিয়মিত ক্ষণজীবী পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করেই—আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করতে হবে। এই দশকের সাহিত্যস্বভাবের মতো এ সময়ের পত্রপত্রিকার চরিত্রও ছিল স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী। ভুললে চলবে না এই দশক প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনের যুগ—ছোট, বড়, নিয়মিত ও অনিয়মিত, স্বল্পায়ু বা দীর্ঘস্থায়ী। এই দশকের প্রায় সমস্ত তরুণ লেখক প্রধানত আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এইসব ক্ষুদ্র, ক্ষণজীবী, ব্যতিক্রমী, আপোষহীন ও স্বেচ্ছাচারী পত্রপত্রিকার নিরীক্ষাধর্মী পৃষ্ঠা থেকেই। 'কণ্ঠস্বর'-এর বিস্তৃত পরিসর এই দশকী প্রবণতাকে প্রধানভাবে ধারণ করলেও এই ধারার প্রাথমিক সংক্রাম লক্ষণীয় হয়েছিল যেসব ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল, উদ্বুদ্ধ পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করে—'স্বাক্ষর', 'সাম্প্রতিক', প্রতিধ্বনি', 'বক্তব্য' 'স্যাড জেনারেশন', 'যুগপৎ' তাদের অন্যতম। উল্লিখিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'স্বাক্ষর'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয় এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে যে এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এই আগন্তুক সাহিত্যকালের নবীন প্রতিনিধিদের প্রথম একত্রিত হতে দেখা গিয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে যেসব পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করে এই দশকের কবিতা সৃজনশীলতার রক্তিম প্রাচুর্যের দিকে এগিয়েছিল তাদের মধ্যে 'অধোরেখ', 'ভেলা', 'না', 'বহুবচন', 'হে নক্ষত্রবীথি', 'নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ', 'বিপ্রতীক', 'স্বরগ্রাম" 'সুনিকেত মল্লার,' শ্রাবস্তী' বা 'অচিরা'র মতো পত্রপত্রিকার ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। সময়ের বিবর্তনে কালের করিডোর থেকে সেইসব পত্রপত্রিকা যদিও আজ পাঠকের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে, তবু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে একদিন এইসব স্বল্পায়ু ও অনিয়মিত পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় যে নতুনত্বের দুঃসাহস, সততা ও অপরিমেয় তারুণ্য ঝিকিয়ে উঠে আমাদের অভ্যস্ত রুচি ও সাহিত্যবোধকে আচমকা নাড়া দিয়েছিল, তার মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের একটা পালাবদলের ইতিহাস রচিত হয়ে আছে।

৪

যে-দশকের কবিতা বর্তমান কাব্য-সংকলনের উপজীব্য, নানা কারণে সেই দশক আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। যে-কোনো ঐশ্বর্যবান সময়খণ্ডের মতো, এই কালপরিসরও উর্বর স্ববিরোধিতায় রক্তিম। সীমাহীন নৈরাশ্য ও অপরিমেয় সম্ভাবনা এই দশকের হৃদয়কে অস্বস্ত করেছে। পাপ এবং পবিত্রতা, প্রতিভা এবং অপচয় এই দশকে একসঙ্গে আমরা দেখেছি। এই স্ববিরোধ যেমন এই সময়-খণ্ডের গভীর অন্তঃচরিত্রের, তেমনি ঐ সময়ের প্রথম পর্বের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের। প্রথম পর্বের চেহারা মূলত অবক্ষয়ী। এর যে চরিত্র তা পচনে ও বিকারে, আপাতরম্যের উজ্জ্বল বন্দনায় ও আত্মক্লেদের গ্লানিতে, বন্ধ্যাত্বে ও রুগ্ণতায়, অবসাদে ও অপচয়ে বিনষ্ট। এই পর্ব, এককথায়, নৈরাশ্যের ও নিশাচরের, লোভের ও প্রমত্ততার এবং শব্দতাড়িতের ও যন্ত্রণাকাতরের। দ্বিতীয় পর্ব এই আলোহীন অচলায়তন থেকে ছাড়া পাবার উজ্জ্বল পাখা-ঝাপটানিতে সরব এবং সেইসাথে বেশকিছুটা বেহিশেবি। প্রথম খণ্ডের মতো এই পর্বও অন্তর্গত স্ববিরোধের দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত ও ঋদ্ধিমান। বালখিল্যতা এবং বিশ্বাস, সংশয় এবং সম্ভাবনা, পরিকল্পনাহীন উদ্যম ও উদ্যোগদৃপ্ত বিশৃঙ্খলতা এই পর্যায়কে একই সঙ্গে দুর্বল ও শক্তিশালী করেছে। তবু, এককথায় বলা যায়, শপথে ও সংকল্পে, প্রেরণায় ও প্রত্যয়ে এই পর্বও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল সন্তান।

৫

প্রসঙ্গত বলে রাখতে চাই যে আমাদের সময়ের উজ্জ্বল নন্দনবাদীদের মতো আমি 'বিশুদ্ধ কবিতা'র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। মনে করি না যে অবধারিত সমকালীন বাস্তবতার স্থূল হাত এড়িয়ে সম্পূর্ণ যোগাযোগরহিত কোনো স্বপ্নের ভুবন রচনা করা, কেবলমাত্র শব্দের অনুপম কুহক রচনা করে যাওয়া কোনো 'সৎ'কবির পক্ষে সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনটা হয়তো ঘটতে পারত কারো পক্ষে পুরোপুরি সমাজজীবনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলে (যেমনটা অনেক সময় ঘটে থাকে মানবেতর জীবের বেলায়), কিন্তু সেখানেও অনিবার্য পরিপার্শ্বের অন্যরকম অভিঘাত অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চারপাশের অজস্র মানুষ আর মানুষী সংগঠনের অদৃশ্য হাত আমাদের অস্তিত্বের ভেতর সরাসরি বা অলক্ষ্যভাবে প্রবেশ করে আছে বলে ঐসবের প্রত্যক্ষ বা সুদূর অভিঘাত আমাদের চেতনাকে কমবেশি আলোড়িত করবে, এটা ধরে নিতেই হবে। আমি বিশ্বাস করি একজন কবি তাঁর বক্তব্যকে কত অসাধারণ বা অসামান্যভাবে প্রকাশ করতে পারবেন তা প্রধানত নির্ভর করবে তাঁর কবিপ্রতিভা কতখানি অনন্যসাধারণ তার ওপর। কিন্তু কী নিয়ে তিনি কবিতা লিখবেন, কী হবে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু কিংবা কোন্ ধরনের বিশ্বাস বা ঘৃণাকে তিনি কবিতায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হবেন, তা কতখানি আবেগদীপ্র বা গভীর হবে তার অনেকটাই তিনি তাঁর কাল ও পরিপার্শ্বের কাছ থেকেই পেয়ে থাকেন। এইজন্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন পারিপার্শ্বিকের জগতে পালাবদল শুরু হয়, তখনই কেবল নতুন ঋতুর চেতনায় আক্রান্ত নতুন কবিতা সে– সময়ের কবিরা আমাদের উপহার দিতে পারেন। পারিপার্শ্বিকের জগতে কোনো সুস্পষ্ট পরিবর্তন আসেনি অথচ কবিতাশরীরে নতুন রং লেগেছে, এমন ঘটনা কবিতার ইতিহাসে বিরল।

সুতরাং যখন আমি বলছি যে ষাটের প্রথম পর্বে আমাদের কবিতা–অঙ্গনে একটা নতুন পালাবদল দেখা দিয়েছিল তখন পরোক্ষভাবে এ–কথাটাই কবুল করে নিতে হচ্ছে যে, ঐ সময় আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এমন কোনো সুস্পষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে কাব্যাঙ্গনে ঐ পালাবদল সংঘটিত হয়েছিল। কী পরিবর্তন এসেছিল ঐ সময়ে আমাদের সামাজিক পরিপার্শ্বে, কোন্ নতুন বাস্তবতার আকস্মিক সংক্রামে সমাজদেহ হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল, নড়েচড়ে বসেছিলেন সনাতন মূল্যবোধের প্রবীণ ঈশ্বর—সে প্রসঙ্গে যাবার আগে ঐ সময়ের অব্যবহিত আগের সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে খানিকটা মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পরপরই সরকারিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ ঘটলেও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৃটিশ আমলের সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকারের ধারাটি মানসিকভাবে বর্তমান ছিল। বৈভব এবং প্রাচুর্যের অমিত সম্ভাবনা নাগরিক লালসাকে তখনো দিগ্বিদিকহীন করে তোলেনি, সুস্থিত সফলতার ভেতর শহর–জীবন তখনো নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়ে। দূরে, তালবনের গা–ঘেঁষে গ্রামীণ জীবন তখনও শান্ত ও নিরুদ্বেগ—নির্জন সন্ধ্যাতারার মতোই নিঃসঙ্গ ও করুণ। অবশ্যি লোকচক্ষুর আড়ালে এরই মধ্যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ধর্মান্ধ জাতীয়তার পাশব কবলে গণজীবন খানিকটা হতাশ ও অবক্ষয়ী হয়ে উঠতে শুরু করেছে এবং মধ্যবিত্ত বিকাশের ধীর, সুস্থ ও আত্মপ্রত্যয়ী ধারা বায়ান্ন ও চুয়ান্নর উত্তাল ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে নিজের সরব জানানি রটালেও পরবর্তীকালের সামরিক শাসনের জাঁতাকলে, উদ্ধারহীন অচলায়তনের ভেতর, ধীরে–ধীরে নিষ্ক্রিয় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে। আর এরই ফলে বায়ান্নর গণ-আন্দোলনের বিপুল জোয়ার পঞ্চাশের প্রথম পর্বে সাহিত্যসম্ভাবনার যে দিগন্ত মেলে ধরেছিল, তা স্বল্পকালীন বিকিরণের পরেই, পঞ্চাশের শেষের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় এবং উদ্ভাবনহীন অর্থহীনতার ভেতর রুগ্ণ, নিষ্ক্রিয়, আত্ম-অনুকৃতিময় ও একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গনে এরপর হঠাৎ কী ঘটল— যার ফলে এই নিষ্ক্রিয় রুগ্ণ সময় হঠাৎ নড়ে দুলে জেগে উঠল, নতুনের অপ্রত্যাশিত মাতাল-হাওয়া খ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে সমস্ত সমাজজীবনকে উদগ্রীব অস্বস্ত করে তুলল। পাঠকদের হয়তো মনে আছে, এই সময়ে—ষাট দশকের এই সূচনাপর্বেই বিদেশাগত বিপুল পরিমাণ অবাধ ও সুলভ মুদ্রা আমাদের সমাজ-জীবনের বন্দরে এসে ভেড়ে। অনর্জিত অর্থের এমন বিপুল অভাবিত আগমন আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গনে এই প্রথম। আর এরই ফলে বিত্তের অমিত সম্ভাবনায় স্পন্দিত উচ্চকিত হয়ে ওঠে আমাদের সামাজিক অঙ্গন, রাজধানীর মন্থর মফস্বলীয় জীবনযাত্রা উদ্দাম রজত-জৌলুষে ঝলমল করে ওঠে হঠাৎ। আর এরই মধ্যে এতদিনকার রুদ্ধ সৃজনশীলতা মুক্তি পেয়ে হঠাৎ হয়ে ওঠে কামান্ধ। এরই পাশাপাশি, নতুন অর্জিত মুদ্রার সঙ্গে নতুন অর্জিত পাপ এসে প্রবেশ করে সমাজ-জীবনে; পাপ—নির্লজ্জ এবং প্রতিকারহীন—নির্বার রজতলিপ্সা, আপাতরম্যের ক্লেদাক্ত বন্দনা, স্থূলতা, যৌনতা, পচন ও বিকার—এক কথায় 'অধঃপতন'—বিত্ত এবং অধঃপতন—এই সময়ের সর্বস্বতাকে অধিকার করে। বাইরের রঙিন উজ্জ্বল উদ্দামতার নিচে গাঢ় হয়ে থাকে আত্মগ্লানির মূক অশ্রু। প্রবল সামাজিক পরিবর্তনের এই অভিঘাত গতানুগতিক ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের শেষ দেয়ালটিকেও ভেঙে চুরমার করে দেয় আর সেই সার্বিক নৈরাজ্যের সামনে সনাতন শ্রেয়োবোধের মহান ঐতিহ্য হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এই ঋতু, সুতরাং, নৈরাজ্যের এবং অবক্ষয়ের, আবিলতার এবং অশ্রুর। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের যে মহান প্রাসাদ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সামাজিক চৈতন্যকে লালন করে আসছিল, এই দুশ্চরিত্র সময় দুঃশীল ধর্ষণে, তার পেলব শুভ্রতাকে বিস্রস্ত করে ফেলে।

বিত্তের নতুন আবির্ভাব আমাদের সামাজিক জীবনে যে অভাবিত পুলক ও চাঞ্চল্য বয়ে এনেছিল তারই পাশাপাশি কালের এই অবক্ষয় ও নিঃস্বতাকে একই সঙ্গে ধারণ করেছিল এই সময়ের নতুন কবিরা। এই রুগ্ণতা ও অস্বাস্থ্যের রাজ্যে, নতুন সময়ের কবিতার হতাশা-আক্রান্ত কণ্ঠস্বরটি, তাই সহজেই অনুধাবনযোগ্য :

এ গ্রহের কেউ হায় প্রকৃত আনন্দকে জানল না
শুভ্রতা ও মৃত্যুকে জানল না
অন্বেষণকে না, হৃদয়কে না, মেধাকে না,
ভালোবাসাকে না।

[রফিক আজাদ]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুস্থ নীরোগ জীবনের গভীর অনটন এই সময়ের কবিতাকে সুস্থতা পরিপূর্ণতাহীন তিনটি আলাদা পথে ঠেলে দেয়। প্রথম ধারার হাতে চিহ্নিত হয়েছিল প্রধানত এই অধঃপতিত যুগের বিস্রস্ত মুখাবয়ব—অন্তঃসারহীন আপাতরম্যের ফেনিল বন্দনার পাশাপাশি এই সময়ের ক্লেদ ও কদর্যতার ছবি। সুস্থতা-ভালোবাসা-হারানো এই কালের আত্মগ্লানি ও ক্রন্দন শব্দরূপ পেয়েছিল এই কবিতায়। সমকালীন পাঠকসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও এবং গতানুগতিক মূল্যবোধে অভ্যস্ত সাধারণ পাঠক-সম্প্রদায়ের দ্বারা বিপুলভাবে নিন্দিত, বিতর্কিত ও প্রত্যাখাত হলেও আজ এ-কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এই অবক্ষয়ী ধারাটিই ষাটের কবিতার প্রধান প্রবণতা। এই দশকের প্রায় সব তরুণকবিই যুগের এই পচনের দ্বারা কমবেশি আক্রান্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁর কবিতাশরীরের 'আমুণ্ডুপদনখ' এই অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল—তিনি রফিক আজাদ। মোটামুটিভাবে তিনিই এই অধঃপতনের প্রধান কবি—যেমন গল্পের ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর অনবদ্য গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মতো বদমাশ'-এ। দ্বিতীয় ধারার হাতে কবিতা হয়ে ওঠে সশ্রম সপারগ নির্মাণকৌশলের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। এই ধারার সূচনা ও পরিচর্যা বহুলাংশে যাঁর হাতে ঘটেছিল তিনি আবদুল মান্নান সৈয়দ— এই ধারার নিঃসঙ্গ ও প্রায়-একক প্রতিনিধি। খুব বেশিসংখ্যক কবিতা এই ধারা আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে উপহার দেয়নি, কিন্তু ষাটের সামগ্রিক কাব্যযাত্রাকে সযত্ন ও নান্দনিক অনুশীলনের দীপ্র প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করে রেখেছিল—যার প্রতিফলন ঐ দশকের আত্মসচেতন কাব্যরুচিতে সুস্পষ্ট। ষাটের কবিতা যে রুগ্ণ, অবক্ষয়ী, যৌনতাক্রান্ত এবং কলাকৈবল্যবাদী বলে আখ্যায়িত হয়েছিল, তা প্রধানত এই দু-ধারার কবিতার জন্যই। তৃতীয় ধারার কবিতা এই অধঃপতিত কালের বিক্ষত মুখাবয়বকে সহ্য করতে পারার স্নায়বিক অক্ষমতার কারণেই হয়তো, মরমী চেতনার সুস্থিত আনন্দলোকে—বস্তু-ইন্দ্রিয়হীনতার নিভৃত সুদূর ভুবনে—শান্তিপ্রত্যাশী ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের পরিতৃপ্তি অন্বেষণ করেছে। এই দশকের উল্লেখযোগ্য তরুণ-কবিদের একটা প্রধান অংশ (আফজাল চৌধুরীর মতো সুসংহত প্রত্যয়দীপ্র কবি, স্পর্শকাতর ও নিসর্গপরায়ণ মোহাম্মদ রফিক, সুস্থিত আলতাফ হোসেন বা প্রথম পর্বের হুমায়ূন কবির) এই ধারার সঙ্গে লগ্ন থাকলেও এই ধারা ঐ সময়কার কবিতাকে শেষপর্যন্ত কোনো অর্থময় দরোজায় উত্তীর্ণ করেছে বলে মনে হয় না। এর কারণ সম্ভবত সমকালীন বাস্তবতার প্রতি এই ধারার সচেতন ও সুচিন্তিত উপেক্ষা।

স্পষ্টত কোনো ধারায় চিহ্নিত করা যাবে না, অথচ যাঁদের উচ্চকিত শব্দাবলি এই সময়ের কবিতাকে মূল্যবান করেছিল তাঁদের মধ্যে মনজুরে মওলা, আসাদ চৌধুরী এবং আবু কায়সারের নাম প্রথমেই এসে পড়বে। ষাটের মতো সত্তুরের মাঝামাঝিতেও তাঁদের লেখনী একই রকম সুপ্রজ। অন্য যেসব কবি ব্যক্তিগতভাবে উল্লেখযোগ্য কবিতা উপহার দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সিকদার আমিনুল হক, ইমরুল চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(নান্দনিক ধারার সগোত্রতা লক্ষণীয় এঁদের কবিতায়), শহীদুর রহমান, রণজিৎ পাল চৌধুরী, ফারুক আলমগীর, জিনাত রফিক, রুবি রহমান, সুব্রত বড়ুয়া, শেখ আতাউর রহমান—নিশ্চিত উল্লেখের দাবি রাখেন।

ষাটের দশকের দ্বিতীয় পর্বে এসে আমাদের সামাজিক অঙ্গন আর একবার নতুন প্রাণস্পন্দনে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। উনিশ-শ ছেষট্টির দিকে, বাঙালি মানসের দীর্ঘকালসুপ্ত জাতীয় মুক্তির চেতনা, বহু ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে জেগে উঠে, অস্ফুট চঞ্চল হাওয়ার মতো আমাদের সামাজিক চৌহদ্দিকে মাতিয়ে তুলতে শুরু করে এবং পরবর্তী কয়েক বছরের বিরতিহীন সংগ্রাম-স্লোগানের উদ্দীপ্ত পথ ধরে সার্বিক জাতীয় উজ্জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রঙিন স্বপ্নচারিতা স্বাদেশিকতার জ্বলন্ত উজ্জীবনের সাথে মিশে, জাতীয় চৈতন্যের সামনে শক্তি ও সম্ভাবনার হিরণ-দরোজা মেলে ধরে। দেশ এবং কালের এই উদ্বেলিত প্রাণস্পন্দনকে স্নায়ুচেতনায় বহন করে একদল তরুণ-কবি, ষাটের প্রথম পর্বের কবিদের মতোই, এই সময় আমাদের কবিতাঙ্গনে একে একে সমবেত হতে থাকেন। ষাটের প্রথম পর্বের কবিকুলের মতো তাঁদের আগমন উজ্জ্বল গোষ্ঠী-প্রেরণায় উচ্চকিত হয়নি, সাহিত্যক্ষেত্রে এঁরা এসেছিলেন অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে। পরবর্তী সময়ে অবশ্যি এঁদের সবার মিলিত প্রয়াসের ভেতর থেকে একটি স্বতন্ত্র ধারার উদ্বোধন লক্ষ করা গিয়েছিল যা এই সামাজিক উজ্জীবনের হাত ধরে, বিস্তৃততর মোহনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। ষাটের অধঃপতনেরই সন্তান এঁরা অন্তত এঁদের প্রথম আগন্তুকেরা—ষাটের প্রথম পর্বের লেখকদের সগোত্রও—অথচ একই সঙ্গে জাগ্রত দেশকালের উদ্দীপ্ত সম্ভাবনায় রক্তিম । তাই এঁদের এক হাতে অবক্ষয়, অন্য হাতে সম্ভাবনা। সময়ের এই স্ববিরোধ তাঁদের কবিতার আঙ্গিকের মতো বক্তব্য-বিষয়কেও এক জটিল, বিপদাপন্ন ও দ্বন্দ্ববিস্রস্ত রূপ দিয়েছে যা এই ধারার কয়েকজন প্রধান কবির এই সময়ে রচিত কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও ('না প্রেমিক না বিপ্লবী', 'খোকন ও তার প্রতিপুরুষ', 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', 'কুসুমিত ইস্পাত') স্বাক্ষরিত। শক্তি ও অনিয়ন্ত্রণ, উদ্যোগ ও অপরিকল্পনা, সম্ভাবনা ও সংশয়—এই সময়-খণ্ডের মতো এই পর্বের কবিতাকেও করে তুলেছে আত্মখণ্ডিত এবং ফলবান।

সময়ের এই দ্বিধাগ্রস্ত সত্তা যাঁদের কবিতায় সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে নির্মলেন্দু গুণ তাঁদের অন্যতম। তাঁর এই পর্বের নায়ক ('হুলিয়া') প্রোজ্জ্বল রাজনৈতিক তৎপরতা এবং ব্যক্তিগত মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মাঝখানে দোলায়িত ও অন্তর্বিভক্ত। ফরহাদ মজহারের মননদীপ্ত শব্দাবলিও, অপেক্ষাকৃত অবচেতন পর্যায়ে, ব্যক্তিগত স্বৈরাচার ও ব্যষ্টিগত বিপুল প্রয়োজনের টানাপড়েনে অনিশ্চিত। যুগের এই স্ববিরোধী বাস্তবতা যাঁর অন্তঃসত্তাকে সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্ববিস্রস্ত করেছিল এবং যিনি সবচেয়ে সচেতনভাবে এই স্ববিরোধের স্বরূপটিকে অনুভব করেছিলেন তিনি অকালপ্রয়াত হুমায়ুন কবির। এই বৈপরীত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সজাগ ছিলেন বলেই তিনি অমন অস্বস্তভাবে ইস্পাত ও কুসুমের সুস্থিত সমন্বয় অন্বেষণ করেছিলেন। অনেকখানি অস্ফুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সুদূরভাবে হলেও মহাদেব সাহার কবিতাও ঐ একই রকম আত্মঘাতে রক্তিম—অবশ্যি খানিকটা আত্মিক পর্যায়ে। এক কথায়, উল্লেখিত কবিদের কবিতায় এই স্ববিরোধ যুগের দ্বিধাখণ্ডিত হৃদয়টিকে অত্যন্ত বাস্তব ও রক্তাক্তরূপে উপহার দিয়েছে।

সময়ের এই বিশিষ্ট ধারার বাইরে থেকেও যাঁরা একই রকম সুনীল কবিতা উপহার দিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম আবুল হাসান। নিবিড় অনুভূতির সুস্মিত গভীরতাকে ছুঁতে চেয়েছেন তিনি। সমকালীনতার স্ববিরোধকে পুরোপুরি কাটিয়ে গিয়ে যাঁরা চেতনা ও রূপকুশলতার সুস্থিত ও সামঞ্জস্যময় কবিতা-জগৎ রচনা করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ নূরুল হুদা ও সেলিম সারওয়ারের নাম সবচেয়ে আগে আসবে। হুদার সুস্নিগ্ধ সংহতি ও সেলিমের শৈল্পিক নিটোলতা সময়ের এই বিশৃঙ্খল পটভূমিতে মূল্যবান। এই পর্বের অন্যান্যদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুস্থিত শাহনূর খান, সপ্রতিভ দাউদ হায়দার, সজীবতাস্নিগ্ধ মাহবুব-উল-করিম, বিশ্বাস ও দীপ্তিতে উচ্চকিত খান মোহাম্মদ ফারাবী সাধারণভাবে ব্যতিক্রমী। এছাড়াও যাঁদের কবিতা এই পর্বে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট আলো জ্বেলেছে তাঁদের মধ্যে হাবীবুল্লাহ সিরাজী, শিহাব সরকার, সানাউল হক খান, মাশুকুর রহমান চৌধুরী, মিলন মাহমুদ, সুমন সরকার (আবিদ আজাদ), মহসিন রেজা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য হবে ।

সবশেষে, এই পর্বের কবিদের একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের উল্লেখ করতে চাই। এই কবিরা, তাঁদের কবিতায়, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, এমন একটা বিরল সফলতা অর্জন করেছেন—যা কেবল এই দশকের নয়, ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার পটভূমিতেই মূল্যবান। একালের কবিতাকে তাঁরা, দীর্ঘ ও বিচ্ছিন্ন পথপরিক্রমার জনহীনতা থেকে বাঁচিয়ে, আবার সাধারণ পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। ত্রিশের এবং ত্রিশোত্তর কবিতায় দুরূহের প্রতি প্রবণতা, ইঙ্গিতধর্মিতা, অস্পষ্টতা কবিতাকে স্বল্পসংখ্যক পাঠকের যে আত্মজটিলতাময় খণ্ডিত জগতে নির্বাসন দিয়েছিল; এই পর্বে কবিদের রক্তিম জীবনানুভূতি, ঋজু বক্তব্য, উদ্বেলিত স্বদেশানুভূতি রূপকল্প-উপমা-শব্দের প্রাঞ্জল স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল গতিময়তা কবিতাকে সেখান থেকে আপামর পাঠকের অঙ্গনে ফেরত দিয়েছে। কারণ হিসেবে হয়তো বলা যাবে এই উদ্দীপ্ত যুগের গণমুখী প্রেরণা, একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থেকে উজ্জীবিত সামাজিক বিষয়ের দিকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, একটি সাধারণ ও অখণ্ড চেতনায় সমগ্র জাতীয় মানসের উজ্জীবন—এ সবই হয়তো কবিতাকে বিস্তৃততর পাঠকের জন্য আকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল। অবশ্য যদিও এই স্বচ্ছতা ও জনপ্রিয়তা অর্জনের অতিপ্রবণতা তাঁদের কবিতাকে উপকারের মতো অপকারও করেছে একইভাবে এবং কবিতার এই সহজগতির ভেতরে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে কবিতার সত্যমূল্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন—তবু গত কয়েক দশকের কবিতার আড়ষ্ট শরীরে তাঁরা যে গতিময়তার আলো, যে প্রাঞ্জলতার স্ফূর্ততা ছড়িয়ে দিয়েছেন—তার প্রকৃতি পরবর্তী কবিতাপ্রয়াসের ধারাকে অনেককাল আক্রান্ত রাখবে বলেই মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক পালাবদলের হাত ধরে একটা নতুন কাল এসে দাঁড়িয়েছিল এই দশকের অঙ্গনে, আমাদের চারপাশে, এই সময়ে। পরিবর্তিত সমাজ-জীবনের মতো এর শিরার ভেতরেও প্রবাহিত হয়েছিল এক ভিন্ন, স্বতন্ত্র, স্ব-স্বভাবী রক্তধারা—এর আগের যে-কোনো সময় থেকে যা সুস্পষ্টভাবে আলাদা। নতুন চেতনায় আক্রান্ত নতুন কাল এই সময়ের কবিতার কাছে তার মুখাবয়বের বিশ্বস্ত চিত্রায়ণ প্রার্থনা করেছিল সজীব প্রতিভাবান শব্দে। সমকালীন তরুণ-কবিরা ঐ দশকের মুখাবয়বের রূপায়ণে কতদূর সফল হয়েছিলেন—কতখানি মহত্ত্বকে স্পর্শ করেছিল সে রূপায়ণ অথবা আদৌ করেছিল কিনা কিছু—সে বিচারের দায়িত্ব আগামী কালের। আমরা কেবল এটুকু বলতে পারি, এই সময়ের কবিরা এই দশকের নতুন বাস্তবতা ও আবেগকে তাঁদের অনিবার্য উপযোগী শব্দে ও প্রতিভায় অন্তত এমন এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে ঝিকিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, আগামী দিনের বাংলা কবিতার সংরাগময় অগ্রযাত্রা, শৈল্পিক অনুশীলনের উদাহরণ হিসেবে যার প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নিতেই হবে যে, আলোচিত কবিদের যে যৎসামান্য পরিচয় এই ভূমিকায় তুলে ধরা হল তা তাঁদের জীবনের প্রাথমিক পূর্বের পরিচয় শুধু—তাঁদের কোনো সার্বিক প্রতিকৃতি রচনার চেষ্টা নয়। এই আলোচনায় কবিদের কাব্যমূল্য নিরূপণের কোনো চেষ্টা হয়নি—এই সময়ের কবিতার বিভিন্ন ধারা ও গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সগোত্রতা দেখাবার চেষ্টাই করা হয়েছে কেবল। তাছাড়া আমি ভুলিনি যে এই দশকের প্রধান অপ্রধান প্রায় সমস্ত কবির কবিতাই ইতিমধ্যে কমবেশি এগিয়েছে। সুতরাং এই ভূমিকায় তাঁদের কবিতার যে পরিচয় দেওয়া হল, তাঁদের অধিকাংশের কবিতার সামগ্রিক পরিচয় থেকে তা আলাদা এবং একান্তই সীমিত। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিরা ছাড়াও অনেক প্রতিভাবান হাত এই দশকে আমাদের সাহিত্যে ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। তাঁদের কবিতা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শুধু সেসব কবিই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হলেন যাঁরা এই দশকের (১৯৬২—'৭২) বিভিন্ন পর্যয়ে প্রথমবারের মতো আমাদের কবিতাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন।

সবশেষে বলে নিতে চাই যে, বর্তমান সংকলন এই দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন নয়। এই দশকের কবিতার দুঃসাহস যেসব অগতানুগতিক, অপরিচিত, ব্যতিক্রমী রাস্তায় পা ফেলেছে—উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেসব আলাদা, অনন্য ও স্ব-স্বভাবী বৈশিষ্ট্যে—এই কাব্যসংগ্রহ সেইসব বিচিত্র প্রবণতার প্রতিনিধিত্বকারী কিছুসংখ্যক ভালো কবিতার একটি বিনীত সংকলন মাত্র।

১৯৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের গদ্য*

১

কিছুদিন আগে একটি ফরাসি কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছিল—ইংরেজি অনুবাদে। কবিতাটির শুরু অনেকটা এরকম :

> 'পিকাসো একটি আপেলের ছবি আঁকার চেষ্টা করছেন। আপেলটি রয়েছে একটি টেবিলের ওপর, পিকাসো তুলির টানে আপেলটিকে ক্যানভাসের ওপর নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপেলটি তার রক্তিম অনিন্দ্য অবয়ব নিয়ে টেবিলের ওপর এমন অনুপম হয়ে ফুটে রয়েছে যে কিছুতেই তিনি তুলির টানে আপেলটির সেই অনুপম রক্তিমতাকে সেখান থেকে ক্যানভাসের বুকে তুলে আনতে পারছেন না। অনিশ্চিত, দ্বিধান্বিত ও অস্বস্ত তুলির আঁচড়ে তিনি ক্ষন্তিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই বলা যায়, পিকাসো আপেলটির সঙ্গে নিয়োজিত রয়েছেন এক অসম উদ্ধাররহিত যুদ্ধে।

বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধ শুধু পিকাসোর সঙ্গে তাঁর আপেলের নয়, প্রতিটি শিল্পীর সঙ্গে তাঁর আরাধ্য ঈপ্সিতের। একজন প্রকৃত শিল্পীর প্রধান বিপত্তিই এখানে যে, যে বিষয়কে তিনি শিল্পে প্রকাশ করেন তা তাঁর চেতনায় ধরা পড়ে পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো। প্রথম অনুভবের মুহূর্তে বিষয়টি তাঁর কাছে এমন অপরিচিত, নতুন ও বিস্ময়কর ঠেকে যে তিনি অনুভব করেন শিল্পরচনার কোনো পরিচিত বা গতানুগতিক পথেই ঐ বিষয়টিকে তাঁর পক্ষে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তিনি টের পান ঐ সম্পূর্ণ অজানা ও অভাবিত বিষয়টিকে শিল্পে ফোটাতে হলে তাঁকে এগোতে হবে শিল্পের এক সম্পূর্ণ পদচিহ্নহীন রাস্তায়—এমন অপরিজ্ঞাত রেখায় সুরে শব্দে রঙে ঐ বিষয়টিকে রূপায়িত করতে হবে যা তাঁর চারপাশের সবার কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজানা। কাজেই একজন প্রকৃত শিল্পীর পথ হয়ে দাঁড়ায় রীতিমতো সংগ্রামবহুল, তাঁর চারপাশের অসংখ্য সাধারণ ও ভেদাভেদরহিত শিল্পীর সহজ পরিচিত গতানুগতিক পথ থেকে আলাদা; সাফল্যের মসৃণ-সম্ভাবনা-প্রত্যাখ্যাত, স্বেদবহুল ও সশ্রম—চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে স্রস্ত ও কণ্টকাকীর্ণ। আর তাই তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মের শরীরেই প্রয়াস ও পরিশ্রমের এই নিশ্চিত স্বেদচিহ্ন, সংগ্রাম ও রক্তক্ষরণের এই ক্লিষ্টতা কমবেশি থেকে যায়ই। প্রতিভার পরিণতির সাথে সাথে তাঁর

---

* ভূমিকা : *সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ*, ১৯৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্প–অবয়ব তুলনামূলকভাবে নিটোল, মসৃণ ও কমনীয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। তবু বাইরের ঐ আপাত–পরিতৃপ্তি ও নির্লিপ্ততার ভেতর থেকে অন্তরের প্রচণ্ড অশান্তি ও রক্তক্ষরণ কারও চোখ এড়াবে না। বিশেষ করে একজন শিল্পী যখন থাকেন তাঁর শিল্পপ্রয়াসের সূচনাপর্বে, শিল্পীসত্তার গঠনের প্রাথমিক যুগে, যখন তাঁর চারপাশের গতানুগতিক ও প্রথাগত শিল্পের ভ্যাপসা ভিড়ের ভেতর থেকে নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নিয়ে জেগে উঠতে থাকেন চেষ্টা ও শ্রমের কঠিন ও নিরাপোষ অগ্রযাত্রার ভেতর দিয়ে, কিংবা এগিয়ে যান নিজেরই পুরোনো পরিচিত ধারা থেকে নবতর কোনো শিহরিত উত্তরণে, সেসব ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পশরীরে ঐ সময়ের সংগ্রাম ও প্রয়াসের চিহ্ন কমবেশি ধরা পড়বেই। একজন বিত্তহীন শিল্পীকে এরকম কোনো অনিশ্চিত সমুদ্রের দুঃসাধ্য বিপদসংকুলতায় ভেলা ভাসাতে হয় না। কোনো অভাবিত দুর্লঙ্ঘতার দ্বারা বিস্রস্ত হবার বেদনা বা সৌভাগ্য তাই তাঁর নেই। ফলে তাঁর শিল্পপ্রয়াসের ভেতরে সংগ্রামের এই প্রচণ্ডতা, বহুমুখিতা ও তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে। আর ঐসব ব্যর্থতা প্রয়াস ও যন্ত্রণা থেকে অনায়াসে বেঁচে যান বলে তিনি শেষপর্যন্ত যে শিল্পের জন্ম দেন তা আলোহীন, প্রতিভাহীন একধরনের জোলো নিরাপদ ও গৃহপালিত জিনিশ।

হয়তো এজন্যই একজন অ–শিল্পী যত তাড়াতাড়ি শিল্পের ঈপ্সিত নিটোলতা খুঁজে পান (অথবা আরো সঠিকভাবে বললে : খুঁজে পান বলে আপাতভাবে মনে হয়), একজন প্রকৃত শিল্পী তা পান না। রুক্ষ, বন্ধুর ও অনিশ্চিত পদযাত্রায় তাঁর শিল্পশরীর হয়ে পড়ে অনেকবেশি প্রয়াস–কঠিন ও ক্ষতবিক্ষত। একজন প্রতিভাহীন সমালোচক––যিনি শিল্পের এই অনিবার্য সংগ্রাম সম্বন্ধে অজ্ঞান—নিশ্চিতভাবেই একজন জাতশিল্পীর এই আপাত–বন্ধুরতাকে বুঝে উঠতে পারবেন না, বরং তাঁর কাছে ব্যাপারটাকে শিল্পের স্বাভাবিকতার ওপর দুঃশীল বলাৎকারই মনে হবে। শিল্পের এই বন্ধুরতাকে তার কাছে মনে হবে অর্থহীন, অকারণ, প্রতিভাবিরোধী, উদ্ভট ও অস্বাভাবিক। অন্তত অমনটাই মনে হয়েছে বশীর আল হেলালের কাছে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও ষাটের দশকের অমসৃণ গদ্যযাত্রাকে, যখন 'ছায়ানট' সংকলিত 'মুক্ত করো হে বন্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থের আলোচনায় ঐ 'কন্টকিত' গদ্য–প্রবণতাকে সার্বিকভাবে আক্রমণ করে তিনি ঐ গদ্যের পরিবর্তে 'স্বাভাবিক' ও সহজ গদ্য রচনার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ আহ্বান আন্তরিক। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা যায় ঐ 'স্বাভাবিক' শব্দটির দ্বারা তিনি অস্থিমজ্জাহীন একধরনের প্রতিভাবর্জিত গদ্যকেই বোঝেন। কথাটা স্পষ্ট হয় যখন ঐ গ্রন্থের মধ্যে স্বাভাবিক গদ্যের উদাহরণ হিসেবে তিনি শুধু সন্তোষ গুপ্তের নাম উল্লেখ করেন। বশীর আল হেলালের ভাষায় :

> ১৯৪৭–এর পরে বাংলাদেশে এক বিচিত্র গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই গদ্যের নমুনা, আমার মনে হয়, আলোচ্য গ্রন্থের এক সন্তোষ গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধটি ছাড়া আর সব প্রবন্ধে কমবেশি বর্তমান। সন্তোষ গুপ্ত বাংলাসাহিত্যের প্রচলিত গদ্যই মোটামুটি ব্যবহার করে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষ গুপ্তের ব্যক্তিত্বের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা রেখেই এ-কথা বলতে অসুবিধে নেই যে, তাঁর গদ্যকে যাঁর কাছে আমাদের সময়ের বাংলা গদ্যের অনুসরণীয় আদর্শ বলে মনে হয় তিনি নিঃসন্দেহে গদ্যের এক অতিসহজ ও প্রচলিত আদর্শে বিশ্বাসী এবং এমন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে সমকালীন গদ্য প্রয়াসের অপ্রত্যাশিত নতুনত্ব ও দীপ্তশক্তিকে অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব কি না। শিল্প-প্রক্রিয়ায় পরীক্ষানিরীক্ষা যাঁর কাছে রুচিহীন বিদ্রূপের বিষয়, মেধা যাঁর দৃষ্টির অগোচর, তাঁর কাছে একজন নতুনত্ব-সন্ধানী, উদ্ভাবনক্ষম, তীব্র ও অগতানুগতিক লেখক কোন্ সহৃদয় লালন প্রত্যাশা করতে পারে? অথবা কী পাবার কথা আশা করতে পারেন নতুন জীবনানুভূতিতে অস্বস্ত সেই তরুণ-লেখক যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর নিজের ও পরিপার্শ্বের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জটিল নতুন নাম-সংজ্ঞাহীন উপলব্ধির মুখোমুখি এবং সেই অস্পষ্ট অস্ফুট অপ্রত্যাশিত বিষয়কে শব্দের অনিশ্চিত বিশৃঙ্খল আঁচড়ে প্রাণপণে ফুটিয়ে তোলার জন্য অসহায়ভাবে যুঝছেন?

২

গত বছর আমার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর'-এর দশম বর্ষে পদার্পণের দিন কয়েক পরে একজন কলেজি তরুণ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন : 'গত দশ বছরে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রধান অবদান কী? কোনো বিশেষ লেখক অথবা লেখকগোষ্ঠী, কবিতার কোনো নতুন ধারা বা চেতনা অথবা অন্যকিছু?' আমি জবাবে জানিয়েছিলাম : 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রধান অবদান, আমার ধারণায়, এর নতুন ও স্বতন্ত্র গদ্য। আমি বিশ্বাস করি—তাঁকে জানিয়েছিলাম আমি—গত দশ বছরে 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠায় রচিত হয়েছে এমন এক বিশিষ্ট গদ্যরীতি আজকের তরুণ-লেখকদের যা অনিবার্য বিধিলিপি। বলাবাহুল্য 'কণ্ঠস্বর'-এর গদ্য বলতে আমি ষাটের দশকের গদ্যকেই বুঝিয়েছি। এর কারণ 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করেই এই গদ্য প্রথম ও সর্বাঙ্গীণ স্পষ্টতা পেয়েছিল।

এ-কথা আশা করি সবাই মানবেন যে, আমাদের সাহিত্যে ষাটের দশকই সম্ভবত সেই সময় যখন গদ্যকে প্রথম শিল্পের মর্যাদা দিয়ে চর্চা করা হয়েছে। অবশ্য এর আগে-যে গদ্যকে কেউ শিল্পের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেননি এমন নয়। আবদুল হকের মতো লেখকের সমস্ত রচনাই সুন্দর শৈল্পিক গদ্যের উদাহরণ। উন্নত ও পরিশীলিত গদ্য উপহার পেয়েছি মোতাহের হোসেন চৌধুরী-সহ কয়েকজন অনন্য প্রবন্ধকারের হাত থেকে। তবু তাঁদের অধিকাংশের গদ্য প্রধানত বক্তব্যপ্রকাশের বাহন, শিল্পচর্চার মাধ্যম নয়। ষাটের দশকেই প্রথম একটি পরিপূর্ণ লেখকগোষ্ঠী শৈল্পিক গদ্যের চর্চায় সমবেতভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ঐ গদ্যে, তাই, স্বাভাবিক কারণেই, শিল্পের উল্লেখিত সংগ্রাম তুলনামূলকভাবে বেশি। এই গদ্য প্রতিভাবান, শাণিত, নিরীক্ষাপ্রয়াসী, কবিতাক্রান্ত ও বন্ধুর; সূক্ষ্ম, কুটিল, বৈপরীত্যময় ও দ্বন্দ্বজটিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো উজ্জ্বল সুতীব্র মননোদ্ভাসে আশ্চর্যরকম দীপ্র ও দ্যুতিময়, কখনো মগ্ন চৈতন্যের আলোছায়ায় রহস্যময়, প্রতীকী ও জটিল। স্পষ্ট বোঝা যায় : আমাদের সাহিত্যে একটা স্বতন্ত্র ও সাবলীল গদ্যভাষার জন্ম আসন্ন, যার সূচনায় অনেক লেখকের অংশগ্রহণে সংঘটিত এ এক বিশাল নিরীক্ষা-পর্যায়।

৩

প্রশ্ন উঠতে পারে : ১৯৪৭-এর ভারতবিভাগের পর ষাটের দশকে এসে আমাদের গদ্যের ক্ষেত্রে হঠাৎ এ নিরীক্ষা-পর্যায় কেন? কেন গদ্যরচনার ক্ষেত্রে এই সচেতনতা—হঠাৎ?—যা বশীর আল হেলালের ভাষায় 'অস্বাভাবিক' কিংবা 'মৃগীরোগীর নান্দীপাঠ'? এ কি শুধু ঐ লেখকদের শৈল্পিক গদ্যপ্রয়াসের ফলশ্রুতি, নাকি এর পেছনে রয়েছে আরো গূঢ় গভীর কোনো কারণ—এমন কিছু যা ভাষাদেহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে প্রতিকারহীনভাবে সম্পৃক্ত।

এই প্রশ্নের জবাবে অন্য একটি কথা এসে পড়ে। বশীর আল হেলাল কথিত ঐ চিত্তবিকারময় গদ্যভাষা সৃষ্টির জন্য কি শুধু ষাটের গদ্যকাররাই এককভাবে দায়ী? নাকি এর সূচনা ঘটেছিল আরো আগে—আরও আগের লেখকদের হাতে—ষাটের দশকে এসে তা প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল মাত্র? সে যাই হোক, এ গদ্যের সূচনা যে ষাটের দশকে নয় বরং তার অনেক আগে, তা বশীর আল হেলাল, বিশ্লেষণসহ অনুধাবন না করলেও, অস্ফুটভাবে টের পান। তাঁর মতে ১৯৪৭-এর পরে বাংলাদেশে এক বিচিত্র গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যা, তাঁর ধারণায় বাংলাসাহিত্যের প্রচলিত গদ্য থেকে আলাদা। (এখানে 'বিচিত্র' শব্দটির বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার লক্ষণীয়)। কিন্তু কী কারণে হঠাৎ ১৯৪৭-এর পরে আমাদের সাহিত্যে ঐ 'বিচিত্র' গদ্যের আবির্ভাব হল তার কারণ নির্ণয়ে তিনি বিরত, অনীহ এবং সম্ভবত বিভ্রান্তও। অথচ উক্তিটিতে বশীর আল হেলাল 'বিচিত্র' শব্দটির দ্বারা যে-গদ্যকে স্বাভাবিকতাবর্জিত, কিম্ভূত এবং অগ্রহণযোগ্য বলে তাচ্ছিল্য করেছেন; আমার বিশ্বাস, সাতচল্লিশ-পরবর্তী সেই জটিল ও বন্ধুর গদ্যই, বাংলাদেশের আগামী দিনের মার্জিত, পরিণত ও অন্তরঙ্গ গদ্যভাষার প্রাথমিক, অপরিণত, উত্তরণ-প্রত্যাশী, নিরীক্ষাপর্ব মাত্র।

এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে ১৯৪৭ সালের পর আমাদের এখানে একটা 'স্বতন্ত্র' সাহিত্য জন্ম নিতে শুরু করে যা আবহমান বাংলাসাহিত্যের পটভূমি থেকে উদ্ভূত হলেও আমাদের নতুন ভৌগোলিক রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার কারণে আলাদা চেহারা নিয়ে দেখা দিতে থাকে সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নতুন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতায়, একটি জাতির অঘোষিত জন্মের ভেতর এই সাহিত্যের ভিত্তি সূচিত হয়ে, বিকাশের পূর্ণতর ও অগ্রবর্তী স্তরে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে, আজ বাংলাদেশের সাহিত্য হিশেবে চিহ্নিত হয়েছে। 'কণ্ঠস্বর'-এর একাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুহম্মদ নূরুল হুদা তাঁর অনবদ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ 'আমাদের কবিতা প্রসঙ্গে–তে অত্যন্ত নায়সঙ্গতভাবেই ১৯৪৭–এর ভারতবিভাগের মুহূর্ত বা ১৯৭১–এর বাংলাদেশের রাষ্ট্রগত অভ্যুদয়ের সময়কে চিহ্নিত না করে ১৯৫২ সালকে এই সাহিত্যের জন্মলগ্ন বলে শনাক্ত করেছেন। তাঁর মতে (আমার বিশ্বাস আমার মতো অনেকের কাছেই মতটি গ্রহণযোগ্য হবে) ১৯৪৭–এর ভারতবিভক্তির সময় ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আমাদের জাতির অলিখিত জন্ম ঘটলেও ১৯৫২ সালই সেই সময় যখন আমাদের সাহিত্য দীর্ঘকালবাহী সাম্প্রদায়িক চেতনা (থিসিস) ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার (এন্টিথিসিস) দ্বন্দ্বের শেষে পরোপুরি সিনথেসিসে উত্তীর্ণ হয় (যাতে এন্টিথিসিসের বিজয় সূচিত হয় শতকরা নিরানব্বই ভাগ) এবং বাংলাদেশের সাহিত্য তার মৌলরূপ—অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী—নিয়ে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

নতুন–জন্ম–নেওয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক পরিবেশের ভেতর এই নবীন সাহিত্য অল্পদিনের মধ্যেই সমস্যা, সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক উত্থান–পতনের ভেতর স্বতন্ত্র চরিত্র, পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বিপুল আবেগৈশ্বর্য নিয়ে জেগে ওঠে। স্বভাবতই, এই নতুন সাহিত্য, তার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, নতুন দেশকাল চেতনার উপযোগী তার বিশিষ্ট সাহিত্য ভাষাটিও গড়ে নিতে সচেষ্ট হয়, যার ফলে তা এতদিনের অখণ্ড বাংলারসাহিত্য ভাষা থেকে আলাদা চেহারা নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে। এই সাহিত্যের কাব্যভাষা সম্বন্ধে মুহম্মদ নূরুল হুদার মন্তব্য :

> '৫২সালের ভাষা আন্দোলন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে যে বাংলাভাষার স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, সে বাংলাভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনো অখণ্ড বাংলার রাজধানী বা তার আশেপাশের ললিত–মধুর ভাষা নয়; সে ভাষা বরকত সালামদের মুখের ভাষা, সে ভাষা আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট, সে ভাষা প্রতীক্ষারতা বয়সিনী মায়ের মুখের মতো সৌন্দর্যহীন স্মারক। আজ ক্রমে ক্রমে সেই ভাষাই হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের কাব্যভাষা।"

'বরকত সালামদের মুখের ভাষা' বলে যে আলাদা ভাষাকে চিহ্নিত করা হল, 'প্রতীক্ষারতা বয়সিনী মায়ের মতো' সে ভাষার সৌন্দর্যহীন সৌন্দর্য 'স্বাভাবিক' ভাষার তথাকথিত প্রবক্তাদের কাছে কিছুটা অযৌক্তিক লাগবে সন্দেহ কী।

যে–কোনো সমাজমানসের মৃদুতম পরিবর্তন সর্বপ্রথম স্ফুট হয় কবিতাশরীরে—এর সজীব, সচেতন, স্পর্শকাতর শব্দরাশির ভেতর। গদ্যের বিস্তৃততর পরিসরে তার ঢেউ পৌছোতে কিছুটা বেশি সময় লেগে যায়। হয়তো এই কারণেই আমাদের সাহিত্যের স্বতন্ত্র কাব্যভাষা পরিণতির দিকে যত দ্রুত এগিয়েছে, গদ্যভাষা ততটা নয়। গদ্যকে এখানে পেরোতে হয়েছে (এবং হচ্ছে) প্রয়াস, শ্রম এবং চেষ্টার এক বিস্তৃত বন্ধুর অধ্যায়—সংগ্রাম ও নিরীক্ষায় বিস্রস্ত এক দীর্ঘ রক্তকণ্টকিত সরণি। দুরূহ ক্লেশ, সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষতবিক্ষত পথে এই গদ্যযাত্রাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের নিজেস্ব গদ্যের মসৃণ, নিটোল পরিপূর্ণ রূপটি খুঁজে পাবার জন্য, পার হতে হচ্ছে এক দীর্ঘ ও অতিস্থায়ী নিরীক্ষাপর্যায়। কাজেই, আবারও বলি, এই গদ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের আগামীদিনের পরিপূর্ণতর গদ্যরূপের প্রস্তুতিপর্বের গদ্য মাত্র। এ–কথা ভুলে গেলে এই গদ্যের চক্ষুচেতনাহীন সমালোচকদের মতো উগ্র অন্ধ আক্রোশে অকারণে উৎক্ষিপ্ত হতে হবে শুধু।

আমাদের গদ্যের এই অস্বাভাবিক চরিত্রটি একসময় বুদ্ধদেব বসুকেও কৌতূহলী করেছিল। ১৯৭৩ সালে একবার তাঁর দর্শনপ্রার্থী হলে তিনি এ বিষয়ে আমার ধারণা জানতে চান এবং কথাপ্রসঙ্গে জানান যে তাঁরা (পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা) যখন সংস্কৃতভাষা ভালোভাবে জেনেও তাঁদের গদ্যে সংস্কৃতপ্রবণতা থেকে দূরে থাকছেন, তখন বাংলাদেশের লেখকেরা সংস্কৃতভাষা না–জেনেও যেভাবে গদ্যকে সংস্কৃত কণ্টকাকীর্ণ করে তুলছেন, তা তাঁর কাছে খানিকটা অস্বাভাবিক লাগে।

আমি উত্তরে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে বাংলাসাহিত্যের গত শতকের মাঝামাঝির লেখকেরা (রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, প্রথম পর্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্র, শেষ পর্যায়ের প্যারীচাঁদ প্রমুখ) আজকের পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মতোই কমবেশি সংস্কৃত ভাষা জানতেন। (অনেকে আবার যথেষ্ট জানতেনও না।) কিন্তু কার্যত তাঁরা করেছিলেন আজকের পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঠিক উল্টো ব্যাপার। তাঁরা তাঁদের ভাষায় হয়ে উঠেছিলেন দুরূহরকম সংস্কৃতঘেঁষা। এ ছাড়াও তাঁদের ভাষা–আচরণে অসংখ্য অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক, এমনকি অসুস্থ উপাদানও সুলক্ষ্য। এর কারণ : তাঁরা সবাই ছিলেন আধুনিক বাংলাগদ্যের গঠনযুগের লেখক। এই গদ্য গড়ে তুলতে হয়েছিল তাঁদের অনেক সাধনায়, পেরোতে হয়েছিল প্রয়াস, শ্রম ও নিরীক্ষার এক দীর্ঘ দুরূহ স্বেদবহুল পথ যা আজকের লেখকদের আর পেরোবার দরকার নেই। মনে রাখতে হবে তাঁদের সংস্কৃত–প্রবণতার মতো ভাষার অন্যান্য অস্বাভাবিক স্বভাবগুলোও আরাধ্য গদ্য সম্বন্ধে তাঁদের অনিশ্চিত, অস্বস্ত, সিদ্ধান্তহীনতারই ফল। পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যের নিটোল, অন্তরঙ্গ ও সুকুমার গদ্য—বশীর আল হেলালের ভাষার বাংলাসাহিত্যের 'স্বাভাবিক গদ্য'—এই নিরন্তর প্রয়াস–নিরীক্ষারই সহজ সাবলীল ফল।

আমার ধারণা, আমরাও রয়েছি আজ বাংলাদেশের আগামীদিনের সম্পন্ন, উন্নত, পেলব ও সুষম গদ্যভাষার গঠন পর্বে; আর তাই এই গদ্য–শরীর প্রয়াসে, প্রচেষ্টায়, নিরীক্ষায় এবং স্বেদে এমন অমসৃণ ও বন্ধুর। ষাটের দশকে যে এই নিরীক্ষাধর্মী গদ্যরূপটি এমন উজ্জ্বল স্পষ্টতায় ঝিকিয়ে উঠেছিল তার কারণ ষাটের দশকই সেই সময় যখন একদল সত্যিকার প্রতিভাসম্পন্ন গদ্যলেখক প্রথমবারের মতো সমবেতভাবে এই সশ্রম নিরীক্ষাপ্রয়াসে হাত বাড়িয়েছিলেন।

১৯৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তুর দশক

অল্প একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় যে আমাদের দেশে সাহিত্যপত্রিকা জিনিশটি আসলে এদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক বা ঐসব গোত্রের রাজনৈতিক বা রম্যধরনের পত্রিকার থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে সম্পূর্ণ আলাদা একটি প্রজাতি। শুধু সাহিত্যপত্রিকা নয়, যে-কোনো উন্নত রচনা-সমৃদ্ধ পত্রপত্রিকা সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য। দৈনিক, সাপ্তাহিক বা ঐ জাতের পত্রিকাগুলোর দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য যে জিনিসটি ঐকান্তিকরকমে প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে একটি সুষ্ঠু এবং নির্ভরযোগ্য সংগঠন। এটা সম্ভব হলে এসব পত্রিকার অর্থের সাশ্রয়, ব্যবস্থাপনা, মুদ্রণ, বণ্টন, সংবাদ সংগ্রহ বা মতামতের ব্যাপারস্যাপারগুলো নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নিজ-নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এদেশের সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে এসব পত্রিকার পার্থক্য এখানেই। আমাদের দেশে বর্তমানে কোনো সাহিত্যপত্রিকার পক্ষে এমন কোনো সংগঠন গড়ে তোলা যেমন দুরূহ, এর উদাহরণও তেমনি বিরল। কেন বিরল সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। আমাদের সাহিত্যপত্রিকার সংগঠনের ভিত মোটামুটি একটিই—তার নাম 'সম্পাদক'। পত্রিকার শরীরে প্রকাশকের হয়তো একটা নাম থাকে—হয়তো বেশ বড় করেই থাকে. কিন্তু দৈনিক-সাপ্তাহিকের মতো সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক আলাদা ব্যক্তি নন, কার্যত প্রায় একই মানুষ। অবস্থাটা মনে পড়লেই আমার একেক সময় খানিকটা জোর দিয়েই ভাবতে ইচ্ছে করে যে, যতরকম পত্রপত্রিকা আমাদের দেশে আজ প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে তাদের তুলনায় একটি নিয়মিত ও ভালো সাহিত্য পত্রিকা বের করে যাওয়া দুরূহ কিনা। আমাদের দেশের প্রথমশ্রেণীর জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর সুবৃহৎ কর্মকাণ্ড দেখে যাঁরা অভিভূত, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তাঁদের কাছে হাস্যকর মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার প্রায় সুনিশ্চিত বিশ্বাস, আমাদের দেশে একটি উন্নমানের সাহিত্যপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ আজ আমাদের বড়-বড় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের চেয়ে যে কঠিন তার অন্তত একটা প্রমাণ : এদেশে অন্তত পনেরোটি বহুলপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে, কিন্তু সম্পন্ন মনের একটিও সাহিত্য পত্রিকা নেই। কী করে এমনটা ঘটতে পারল? ধরে নেয়া কি যেতে পারে না যে একটি দৈনিক বা সাপ্তহিক পত্রিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশের চেয়ে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের পক্ষে আমাদের বাস্তব পরিপার্শ্ব নিশ্চয়ই বৈরী যা দৃশ্যত না হলেও কার্যত সত্য? আমাদের দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী বিদেশীরা যখন আমাদেরকে সাহিত্যের উন্নতমানের পত্রিকাগুলোর নাম জিজ্ঞেস করেন তখন আমরা কেন একটি পত্রিকার নামও বলতে পারি না?

আসলে, কলেবর ও কর্মকাণ্ডে যতই বিশাল হোক, আমাদের দেশে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের তুলনায় দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের তুলনামূলক সুবিধা অনেক। প্রথমত, ঐসব পত্রিকার থাকে একটা সুনিশ্চিত ব্যবসায়িক ভিত্তি। অধিকাংশ সময়ে আবার এই ব্যবসায়িক ভিত্তির সঙ্গে এসে যোগ দেয় পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর ব্যাপক সামাজিক প্রভাব ও তাঁর রাজনৈতিক উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা—যা চক্রাকারে স্ফীততর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডেরই ভিত্তিভূমি রচনা করে। এরই ফলে ঐসব পত্রিকার সচল থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির সচ্ছল সরবরাহের যেমন কখনো ভাটা পড়ে না, তেমনি এদের দীর্ঘায়ুও হয়ে যায় সুনিশ্চিত। মূলধনের সরবরাহ পর্যাপ্ত না থাকলেও থাকে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় আশীর্বাদ—যা একই সঙ্গে আবার অর্থনৈতিক সচ্ছলতারও উৎস। তাছাড়া বৈদেশিক সূত্রের গোপন পুঁজির আনুকূল্যও বিরল নয়। এসব পুঁজি বা রাজনৈতিক শক্তির সহযোগে এই পত্রিকাগুলোর সবচেয়ে যে প্রয়োজনীয় জিনিশটি গড়ে ওঠে তা হল সেই মৌলিক ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে একটি পত্রিকা তার দীর্ঘস্থায়ী যাত্রায় এগিয়ে যেতে পারে।

সাহিত্যপত্রিকার এসব কিছুই নেই। লিটল ম্যাগাজিনের তো আরও নেই। এদের নেই কোনো ব্যবসায়িক ভিত্তি; নেই কোনো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো শক্তির আনুকূল্য যার ওপর দাঁড়িয়ে এদের অস্তিত্ব দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এসব থাকার কোনো কারণও নেই। এর একটি প্রধান কারণ : একটি ঋদ্ধিধর্মী সাহিত্যপত্রিকা বা একটি লিটল ম্যাগাজিনের মূল্য যাই হোক, এর গুণগত মানের কারণে পাঠকসম্প্রদায় একে সশ্রদ্ধ নমস্কারে দূরে সরিয়ে রাখে। ব্যাপক পাঠকজগতের কাছে প্রায় অজ্ঞাত, পাঠকের সংখ্যাস্বল্পতায় উপেক্ষিত, প্রভাবহীন, ভবিষ্যৎ-বর্জিত ও করুণাবহ এইসব পত্রিকাতে কাকেই বা উৎসাহী করে তোলা যাবে নিরর্থক মূলধন বিনিয়োগে—আর কেইবা তাঁর মূল্যবান বিজ্ঞাপনের টাকার মূঢ় অপচয়ে আগ্রহী হবেন।

সুতরাং ব্যবসা (যা একটি পত্রিকার প্রকাশক্ষম থাকার প্রধান ভিত্তি) না-থাকায় সাহিত্যপত্রিকার, বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনের কোনো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বা সংগঠন গড়ে ওঠে না। তবু মূলধন-আশ্রয় থেকে বঞ্চিত এই নিঃস্ব সামাজিক উচ্ছিষ্টটি আজও-যে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বিরামহীন অতিপ্রজতায় আত্মপ্রকাশ করে যাচ্ছে তার কারণ একটিই : 'সাহিত্যপ্রেম' ।

এসব পত্রিকার কার্যত কোনো প্রকাশক নেই। সম্পাদকই এর প্রকাশক। শুধু প্রকাশক নন, একই সঙ্গে তিনি প্রকাশক, স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর, বিক্রয়কর্মী ও টিবয়। সাহিত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য এক জন্মান্ধ ও দুর্দম ভালোবাসাকে সম্বল করে একটা শূন্য, নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ এবং এককথায় ভয়ঙ্কর পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁকে একক সংগ্রাম চলিয়ে যেতে হয়। প্রায়শ তিনি একজন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের সভ্য বলে পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য আয়োজনের যে-সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়, তা অপরিমেয় হলেও হৃদয়ের জ্বলন্ত সাহিত্যপ্রেম দিয়ে কোনোমতে হয়তো তিনি তা পার হয়ে যান। কিন্তু তার পরেই যখন নিজের যৎসামান্য সঞ্চয়, বন্ধুদের ঋণ, সাহায্য এবং অমানুষিক শ্রম—সব মিলে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের অভাবনীয় মুহূর্তটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় ততক্ষণে ধরা পড়ে গেছে যে এই নবাগত সম্পাদকটির, (ব্যক্তিগত রক্তে যিনি আসলে একজন উজ্জীবিত সৃজনশীল লেখক কিংবা সাহিত্য প্রেরণায় উদ্দীপ্ত একজন চাঁদে-পাওয়া মানুষ) পক্ষে তাঁর কমনীয় স্নিগ্ধ জীবনানুভূতিগুলো নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের মতো একটি রূঢ় বাস্তব ও বৈষয়িক বিষয়ের মুখোমুখি হওয়া কী অকথ্যরকমে স্থূল ও স্নায়ুক্ষয়কারী ব্যাপার। প্রথমত, নগণ্য পরিমাণ অর্থের অভাবে একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত পত্রিকা-অফিস ভাড়া নেয়া তাঁর সাধ্যে কোনোদিন কুলোয় না। নিজের বা বন্ধুবান্ধবদের বাসা বা অফিসের কিছুটা জায়গা ব্যবহারের জন্য চেয়ে নিয়ে তাঁকে অফিসের কাজ চালিয়ে নিতে হয়। প্রায় কোনো পর্যায়েই পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার জন্য একজন ন্যূনতম কর্মচারী নিয়োগ করার সংগতি আমাদের এই শক্তিমান সাহিত্য-সংগঠকটির নিষ্পত্র নিয়তিতে জুটে ওঠে না। ফলে তথাকথিত বড় বড় পত্রিকার সম্পাদকেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে যখন পত্রিকার নীতিসংক্রান্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত নেয়ায় ব্যস্ত, সেই সময় আমাদের ঐ সুযোগ্য কিন্তু নামহীন পত্রিকার অখ্যাত সম্পাদকটিকে শুধু 'সাহিত্যপ্রেম' নামক এক অলীক মরীচিকার আততায়ী আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের মতো সাহিত্য সংস্পর্শশূন্য একটি স্থূল প্রয়োজনের পেছনে, রাস্তায় রাস্তায়, যৌবনের লালিত্য, রঙ ও সজীবতা নিঃশেষ করে ছুটে বেড়তে হয়। এর পরেও আছে লেখার জন্য নামী-দামী লেখকদের দুয়ারে-দুয়ারে প্রাণপাতের এক সকরুণ অধ্যায়; আছে প্রুফ সংশোধনের ক্লিষ্টতা, টাকার জন্য বিড়ম্বিত হওয়ার কাহিনী, প্রেস ও সার্কুলেশন পর্বের হয়রানি ও হঠকারিতা এবং সবশেষে পত্রিকার ব্যর্থতা ও সাফল্যের সার্বিক দায়দায়িত্ব ও বিড়ম্বনা। এভাবে অমানুষিক শ্রমে ও হতাশায় নিঃশেষিত হতে হতে এই উদ্দীপ্ত সম্পাদকের জীবনীশক্তি ও স্বপ্নক্ষমতা একসময় প্রকৃতির নিয়মেই ফুরিয়ে আসতে থাকে। অসহায়ভাবে তিনি টের পেতে থাকেন তাঁর চারপাশের বাড়িঘর পৃথিবী সবই যেন অবধারিতভাবে শুধু তাঁর ওপরেই ভেঙে আসতে চাইছে। তাঁর ক্লিষ্ট চেহারা মলিন হয়ে আসে দুরপনেয় কালিমায়, বন্ধু ও আত্মীয়েরা তাঁকে নিয়ে ক্রমাগত আশঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকেন। এমনি এক সময়ে তাঁর দীর্ঘকালের স্বপ্ন ও সাহিত্যপ্রেমের সামগ্রিক অর্থহীনতাকে সর্বত্মাক শক্তিতে প্রতিবাদ করে-অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর পত্রিকার সবচেয়ে সুন্দর উজ্জ্বল স্মরণীয় সংখ্যাটি বের করে এই উদ্দীপ্ত সম্পাদকটি কখন যে একসময় সাহিত্য-অঙ্গন থেকে নিঃশব্দে বিদায় নেন, আমাদের জাতিগত চরিত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুবিখ্যাত অকৃতজ্ঞতা তার কোনো খবর রাখে না। প্রসঙ্গত একটি রুচিশীল ও বিত্তহীন-তরুণ সম্পাদকের খেদোক্তি উল্লেখযোগ্য :

> 'সাহিত্যপত্রের' কাজ হাতে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে যেন নির্বাসিত হয়েছি; এও কি আত্মক্ষয়ের বৈনাশিক আচরণ?
>
> কাজের নামে এক নিকটজনের স্বর্ণাঙ্গুরি বিক্রি করেছি। চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছি, আর নিজের হর-মাহিনার উপার্জন এ-কাজে নিয়োজিত করে প্রায় মানবেতর জীবনের স্বাদ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছি।
>
> লেখা সংগ্রহ করতে গিয়ে পলাশীর কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে কাটিয়েছি। মুখমণ্ডলে সদ্যকৃত 'স্টিচ' নিয়ে আবারো নেমেছি সে পথে। এ যেন এক অলিখিত বাধ্যবাধকতা।
>
> লেখা সংগ্রহের যে অভিজ্ঞতা তাও বিচিত্র ; লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো কোনো শ্রদ্ধেয় লেখক আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু ইত্যাদি করে শেষপর্যন্ত বলেছেন, সম্ভব নয়। একজন প্রতিষ্ঠিত কবি যাঁর কবিতা আমি সাগ্রহে পড়ে থাকি, কিছু আগাম সম্মানী দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আনি, আর তিনি ক'দিন না পেরোতেই সেই একই রচনা-একটি সাপ্তাহিকে বেশ চালিয়ে দিলেন। কিন্তু তার আগেই সাহিত্যপত্রের কবিতার ফর্মাটি মুদ্রিত হয়ে গেছে। কবির এ আচরণ কি প্রশংসনীয়?"

মোটামুটিভাবে এদেশে আজ একটি সনিষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা তথা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস অনেকটা এরকমই। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়; বেশকিছু উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমই হয়তো দেখানো যাবে যেখানে সম্পাদকের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠা থাকায় তাঁর পত্রিকা দীর্ঘায়ু হতে পেরেছে এবং অনেক সময় আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যযাত্রার ওপর সুগভীর প্রভাবও রাখতে সমর্থ হয়েছে।

উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকার ঐতিহ্য বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক পঞ্চাশের দশকে গড়ে ওঠেনি—এর সত্যিকার সূচনা ষাটের দশকে, *সমকাল* প্রকাশের মাধ্যমে। *সমকাল* যদিও পঞ্চাশের দশকেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ দশকের প্রগতিশীল সাহিত্যযাত্রাকে ধারণ করেছিল, তবু এটিকে মূল প্রস্তাবে ষাটের দশকের পত্রিকাই বলব, যেহেতু ষাটের দশক-পরিসরের ভেতরেই ঘটেছিল এই পত্রিকার পূর্ণায়ত বিকাশ ও পরিণতি।

ষাটের দশক প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনের যুগ—ছোট্ট, স্বল্পায়ু, অনিয়মিত, সম্ভাবনাময় পত্রপত্রিকার এ এক প্রাণোদ্দীপ্ত কাল। ষাটের দশকে কোনো পত্রিকাই যে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি—এমনকি ঐ দশকের প্রধান লিটল ম্যাগাজিন *কণ্ঠস্বর*ও কিংবা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত *পূর্বমেঘ*ও না; তার অন্যতম প্রধান কারণ, ঐ দশকে বিজ্ঞাপনের দুঃখজনক অপ্রতুলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের দশকে ব্যবসা–বাণিজ্য ও শিল্পের মালিকানার প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব অবাঙালিদের হাতে থাকায় বাণিজ্য ও শিল্পপণ্যের বিজ্ঞাপন এখানকার গুটিকয় দৈনিকসহ ইংরেজিতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ও অপরাপর কিছু পত্রিকায় মূলত ছাপা হত, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকার ভাগ্যে কখনোই সেসব জুটত না। ষাটের মাঝামাঝিতে একটি সাহিত্যপত্রিকার গোটা তিনেক জায়গা থেকে বিজ্ঞাপন পাবার সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। সাধনা ঔষধালয়ের যোগেশবাবু প্রায় বিনা প্রার্থনাতেই একটি তিরিশ টাকা মূল্যের বিজ্ঞাপন মঞ্জুর করতেন, কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপনটি ছাপার এবং পরবর্তীতে ঐ বিজ্ঞাপনের টাকা পাবার জন্য যে যাতায়াত খরচ হত তার হিসেব নেবার পর আমাদের কাছে ঠিক বোধগম্য হত না যে বিজ্ঞাপনটি আমরা ঠিক কেন ছাপালাম। আরেকটি জায়গা থেকে প্রায়ই আশাব্যঞ্জক খবর আসার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকত—সেটা হল বাংলা একাডেমী। বিজ্ঞাপনের এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে, আর্থিক অনটনের এই নির্মম পরিবেশে একটি সাহিত্যপত্রিকার পক্ষে নিয়মিত হওয়া কিংবা বিলুপ্ত না হয়ে যাওয়া, সত্যি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সাহিত্যপত্রিকার দুর্বল ও শক্তিশালী প্রায় প্রতিটি উদ্যোগই যে ঐ দশকে স্বল্পায়ু ক্ষুদ্রায়তন এক–একটি অনিশ্চিত ছোট্ট লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষণকালীন জীবনপরিসরে জেগে উঠেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ এ–ই। তবু 'সমকাল' ঐ বিজ্ঞাপনের মন্বন্তরের ভেতরেও যে অমন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছিল, তার কারণ : সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের ব্যক্তিগত সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পরিণত বয়স এবং পত্রিকা বের করার মতো নিজস্ব মুদ্রণালয়।

স্বাধীনতার পর এদেশের ব্যবসা–বাণিজ্য এবং শিল্প–কারখানার মালিকানা সরকার এবং বাংলাভাষী জনসাধারণের হাতে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপত্রিকার পক্ষে বিজ্ঞাপন পাওয়ার দিগন্ত বেশ প্রসারিত হয়েছে। এখন আর প্রকাশক–সম্পাদককে বাংলায় সাহিত্যপত্রিকা বের করার অপরাধে বিজ্ঞাপনদাতার সামনে অবনত মাথা নিয়ে দাঁড়াতে হয় না। মোটামুটি ব্যক্তিগত পরিচয় ও যোগাযোগ থাকলে এখন একজন উদ্যমশীল লেখক বা সাহিত্যকর্মী একটি চলনসই পত্রিকা বের করে যেতে পারেন। অবশ্যি কেউ যদি এ–পথে সন্তর্পণে ধৈর্যের সঙ্গে বা ধীরগতিতে না এগোন এবং সম্পাদনার প্রথমদিনেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম পত্রিকাটি বের করার জন্য জীবনীশক্তি ও শ্রমক্ষমতার ওপর অমানুষিক জুলুম করে বসেন, তবে কিছুদিনের মধ্যেই ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের বিপুল ভারের নিচে ভেঙে পড়া তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। এমন অবস্থায় পত্রিকার বেদনাদায়ক অপমৃত্যু ঘটে যাওয়া সম্ভব—এবং সবসময়েই এমন কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। গত এক দশকে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রণব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি ও অন্যান্য ক্রমবর্ধমান প্রকাশনাব্যয় সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশকে সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করলেও সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশনাকে পুরোপুরি বিপদগ্রস্ত করতে পারেনি। এর বড় কারণ, সাহিত্যপত্রিকার বিজ্ঞাপন–নির্ভর অস্তিত্ব।

স্বাধীনতার পর আমাদের উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকাগুলোর সামনে যে সমস্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটা আমার মতে, ততটা আর্থিক নয়, যতটা সাহিত্যগত। ভালো লেখা, উন্নত লেখা, উল্লেখযোগ্য লেখা ক্রমাগতভাবে আমাদের সাহিত্যে বিরল হয়ে উঠছে। এর কারণ নেই তা নয়। স্বাধীনতার পর দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে। গত এক দশকে অবিশ্বাস্য মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক সংকটের তীব্রতা, নির্মমতম জীবন প্রহার আমাদের এককালের সুস্থিত ও সৃষ্টিমুখী মধ্যবিত্ত সমাজকে, জীবনের মহত্তর পিপাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে, ন্যূনতম আত্মরক্ষার এক নিঃশেষিত নিঃস্ব জগতে এনে দাঁড় করিয়েছে। জীবনসংগ্রামের প্রচণ্ডতার মুখে বিস্রস্ত ও দিশাহারা আমাদের লেখক সম্প্রদায়, নিমগ্ন সাহিত্য-সাধনা থেকে নির্বাসিত হয়ে, নিরুপায়ভাবে আজ রজত-প্রয়োজনের দুঃশীল দরোজায় বেদনাদায়ক উঞ্ছবৃত্তিতে নিয়োজিত।

আমাদের জাতির সাহিত্যধারার ঐতিহ্যকে সোল্লাস ও প্রাণবন্ত রাখার প্রয়োজনে আজ আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে ন্যূনপক্ষে পাঁচ-ছটি উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকার প্রয়োজন ছিল না কি? অন্তত তাদের একটিকেও আমরা কেন খুঁজে পাচ্ছি না আমাদের পরিপার্শ্বে দুঃখভারাক্রান্ত মনে ভাবতে ইচ্ছে করে, আজকের আমাদের এই নিঃস্বতা-আক্রান্ত জাতির সামগ্রিক সৃজনশীল শক্তি একটিমাত্র 'ভালো' সাহিত্যপত্রিকার চাহিদা পূরণ করার পক্ষেও আর সক্ষম কিনা?

১৯৮৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কণ্ঠস্বরের সম্পাদকীয়

১

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে একই সঙ্গে আমরা গভীর শোক ও প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা অনুভব করছি। শোক অনুভব করছি, কেননা, এ মৃত্যু আমাদের সবার স্নায়ুকে আঘাত করেছে ব্যক্তিগতভাবে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের একালের প্রতিটি মানুষের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা, বক্তৃতা, বই ও ব্যক্তিগত সাহচর্যের হাত আমাদের সময়কার প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে নিকট বা দূরাগতভাবে স্পর্শ করেছিল।

তিনি এ-যুগের শিক্ষকদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অধীত জ্ঞান ও সংস্কৃতিচিন্তা পুরুষানুক্রমিক শিক্ষকতার সিঁড়ি বেয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছিল। তাঁর মৃত্যুতে, সুতরাং, আমাদের সমাজ অনেকজন শিক্ষকের সমবেত বিয়োগের শোক পেয়েছে।

উৎকণ্ঠা অনুভব করছি এই জন্য যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মৃত্যু বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একক ব্যক্তির মৃত্যু নয়, তাঁর মৃত্যু একটি মহান বৈভবোজ্জ্বল যুগের মৃত্যু, সে-যুগের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু। নানা কারণে আমাদের বর্তমান কাল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈনাশিকভাবে অনটনগ্রস্ত। এক দুর্বহ বার্ধক্য গভীর ও ক্ষমাহীনভাবে চেপে বসেছে একালের সৃষ্টিশীল প্রয়াসের বুকের ওপর। নৈরাজ্য ও চরিত্রহীনতা এ-যুগের শ্রেষ্ঠতম হাতকেও গুঁড়িয়ে বিকল করে দিয়েছে। বুদ্ধির আলস্যে, চিন্তার বিকারে ও মিথ্যাচারে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত ও অকেজো আমাদের করুণাবহ পরিপার্শ্ব। উদ্দেশ্যহীনতা, হতাশা, ক্ষয় এবং অক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছে এ-যুগের সবচেয়ে শক্তিমান স্নায়ু।

আমাদের সংস্কৃতির এই আবাদহীন ফসলহীন নীরক্ত মাঠে; এই শূন্য, অন্ধকার ও ভবিষ্যৎহীন মুহূর্তে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো একজন সনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকের মৃত্যু সত্যিকার অর্থে ভীতিকর। সমস্ত দেশ যখন দুরপনেয় অন্ধকারের শিকার, প্রতিটি মানুষ আলোহীন, আলোর উত্তরাধিকারীদের আশান্বিত পদশব্দও বিরল হয়ে আসছে দিনের পর দিন, সেই উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তে আলোজ্বলা যুগের একটি প্রবুদ্ধ চিত্তের অন্তর্ধান ভীতিকর নয়তো কি? কারা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উজ্জ্বল উদ্ধারের ভূমিকায় অবতীর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবেন আজ—এই অন্ধকার-নিপিষ্ট সমকালে? চারপাশের এই ব্যাপ্ত নৈরাজ্য ও হতাশা থেকে বাঁচিয়ে কারা আমাদের সাংস্কৃতিক সম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন মহত্তর সম্ভাবনায়— তাঁদের চরিত্র্য, জ্ঞান ও প্রবুদ্ধ আলোকের উদ্ভাস দিয়ে? বিষয়টি আজ প্রকৃত অর্থেই ভেবে দেখবার মতো। কেননা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো একজন প্রগাঢ় জ্ঞানতাপসের মৃত্যুঘটিত বিরাট সাংস্কৃতিক ক্ষতিকে কাঁধে তুলে নেবার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন পর্যাপ্তসংখ্যক জ্ঞানার্থীর ভিড় এই বাংলাদেশে একদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু আজ ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতো একজন জ্ঞানবৃদ্ধের মৃত্যুর ক্ষতিকে পূরণের ভার আজ তিনি কি পণ্ডিত-নামধারী একদল অর্ধশিক্ষিত রজতলোভী বৈশ্যের হাতে রেখে গেলেন?

২

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও কণ্ঠস্বর

বর্তমান সংখ্যা থেকে 'কণ্ঠস্বর' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হল। কয়েক বছর মাসিক হিশেবে প্রকাশিত হবার পর বর্তমানে ত্রৈমাসিকে রূপান্তরের এই আপাত-হতাশ পদক্ষেপটি, বলে রাখা ভালো, কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়, অনেকদিনেরই ভাবনার ফল। এই পরিবর্তনের প্রধান লক্ষ্য : পত্রিকার প্রকাশকে অধিকতর অনিয়মিত অবস্থা থেকে কম অনিয়মিত অবস্থায় নিয়ে আসা এবং সম্ভব হলে সম্পূর্ণ নিয়মিত করে তোলা। তাছাড়া, তিন মাস ধরে একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশ করার নানা বাস্তব সুবিধা, বৃহত্তর কলেবরে পত্রিকাটিকে প্রকাশ করতে পারার সম্ভাবনা এবং রচনা ও প্রকাশমানের উন্নতির দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি দৃষ্টি দেবার সুযোগ পত্রিকাটির ত্রৈমাসিক করার প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তুলেছে।

তবু মনে হচ্ছে, 'কণ্ঠস্বর'-এর এই পরিবর্তন কেবলমাত্র কলেবরগত স্ফীতি বা ত্রৈমাসিকে রূপান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান সংখ্যা থেকে 'কণ্ঠস্বর'-এর এতকালের চরিত্রেরও কিছু লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে, এই সংখ্যার সঙ্গে 'কণ্ঠস্বর' তার অস্তিত্বের প্রথম পর্যায় ছেড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পা দিচ্ছে। খুব স্পষ্টভাবে অনুভবগম্য না হলেও, আমরা নিকটতরেরা অনুভব করছি, আমাদের সাহিত্য গত একদশকের বিক্ষিপ্ত, অস্থির ও লক্ষ্যহীন মানসিকতার পর্যায় ছেড়ে—অন্ধকার-বন্দনার ক্লেদাক্ত পাপ, পচন, আকাশব্যাপী নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তির আবর্ত থেকে মুক্তি নিয়ে সুস্থ সংহত এক অম্লান জীবনাগ্রহে জেগে উঠছে। আমাদের জাতীয় জীবন, বিগত পঁচিশ বছর ধরে নানান সচেতন ও অবচেতন সংগ্রাম, অরাজকতা এবং নৈরাজ্যের ভেতর লক্ষ্যহীন পথ হেঁটে, সমস্ত জাতীয় চৈতন্যকে যে সম্ভাবনাপিপাসায় জাগিয়ে তুলেছে, দেশের আপামর জনসাধারণের সংগঠিত ও অসংগঠিত অসংখ্য প্রয়াস, ক্ষান্তিহীন গঠনাগ্রহ এবং জন্মান্ধ সংগ্রাম-প্রবণতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জীবনের অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো এই প্রবল ফসলাকাঙ্ক্ষা সাহিত্যকেও স্পর্শ করবে, এমন ধারণা বিচিত্র নয়। 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠাতেও, খুব অপরিস্ফুট আকারে, তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের অভ্যুদয় জাতিগতভাবে আমাদের ওপর এক বিপুল ও অপরিসীম দায়িত্ব অর্পণ করেছে। পৃথিবীর মানচিত্রে নবজাগ্রত এই জাতির আগামীকালের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস এবং নিরাপোষ চেষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেন না ভুলে যাই যে আমরাই এই নতুন জাতির প্রথম প্রজন্মের মানুষ। সুতরাং, কিছুটা আকস্মিকভাবে হলেও, আমাদের কাঁধে আজ যে সাহিত্য-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তার গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে পরিচিত, প্রসারিত ও সম্মানিত মর্যাদায় উত্তীর্ণ করবার জাতিগত দায়িত্ব আমাদের ওপরেই আজ ন্যস্ত। তাছাড়া আমাদের সাহিত্যের অনাগত উত্তরসূরিদের সামনে নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও সাহিত্য-সততার উচ্চতর আদর্শ আমাদেরই প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে, রেখে যেতে হবে সাহিত্য-মূল্যবোধের উন্নততর মানদণ্ড। এসব করে যেতেই হবে আমাদের, কেননা, আজ এই নবজাগ্রত জাতির লোকশ্রুত জন্মলগ্নে, এই জাতির আদিমতম পুরুষ হিশেবে—এক অপ্রস্তুত পিতৃত্বের ভূমিকায়—এইটেই হয়তো আমাদের ঐতিহাসিক বিধিলিপি। গত দশকের তরুণ-সাহিত্য যে বিক্ষিপ্ত, অস্থির, লক্ষ্যহীনতার নৈরাজ্যে পরিত্রাণ খুঁজেছিল, বর্তমানের পিপাসা-উন্মুখ বাংলাদেশে স্বাভাবিক কারণে তার পরিধি সংকুচিত।

জাতীয় চৈতন্যের এই সার্বিক উজ্জীবনের মাঝখানে 'কণ্ঠস্বর'-এর এযাবৎকালের চরিত্রের যে কিছু পরিবর্তন ঘটবে, এমন আশা অসঙ্গত নয়। গত এক দশকের তরুণ-সাহিত্য 'অর্থহীন আপাতরম্যে'র যে বর্ণিল ও অন্তঃসারহীন আরাধনায় মুখর ছিল, 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠা তার একটা প্রধান অংশকে ধারণ করেছে। আজ, 'কণ্ঠস্বর' তার সেই প্রাথমিক ও পরিচিত ধারা থেকে প্রথমবারের মতো সরে দাঁড়াতে চলেছে। যে তারুণ্য, নতুনত্ব, প্রতিভা ও আপোষহীন সত্যপ্রীতি গত দশকের তরুণ-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিশেবে দেখা দিয়েছিল, আজ তার সঙ্গে সংহত চারিত্র্যশক্তি এবং দুরূহের পিপাসা এসে যোগ দিচ্ছে মনে হয়। এর সোনালি শস্য 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠায় দুর্লভ হবার কথা নয়। কেবলমাত্র কমনীয় ত্বক আর নয়, সুদৃঢ় অস্থির কঠিন চারিত্র্যশক্তি চাই আজ; চাই সুস্থ, কর্মঠ, শক্তিশালী পেশীর উদ্যোগী সহযোগ। ভুললে চলবে না যে, যুগ-চরিত্রের দিক থেকে আমাদের কালের অবস্থান বিংশ শতাব্দীর নয়, উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণোন্মুখ বাংলাদেশের কাছাকাছি। এমন আশা হয়তো অন্যায় নয় যে, এই বিক্ষুব্ধ বঙ্গভূমিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আদিম প্রবল যুগপুরুষদের আবির্ভাব অচিরে ঘটবে, যাঁরা প্রতিভার সঙ্গে দার্ঢ্য, শিল্পের সঙ্গে প্রজ্ঞা, নতুনত্বের সঙ্গে উদ্দেশ্য এবং মৌলিকতার সঙ্গে জীবনোন্মুখতাকে গ্রথিত করে দুর্বার ফসলাগ্রহ নিয়ে এসে দাঁড়াবেন সৃষ্টিশীলতার রক্তিম উর্বর মাঠের ওপর।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

হুমায়ুন কবির

রং-বেরঙের ফুলে সাজানো শবাধারে হুমায়ুন শুয়ে ছিল—প্রত্যুত্তরহীন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ফুল এনে সাজিয়ে দিয়েছিল শবাধারটি—নিহত তরুণ-বন্ধুর জন্য তাদের সাধ্যমতো একান্ত উপহার। দেখে হঠাৎ বিশ্বাস হওয়া কঠিন, শুধু একটি নিষ্প্রাণ অনুভূতিহীন বুলেট তার দুর্বার রক্তিম যৌবনকে—তার ক্ষিপ্র উদ্যত চৈতন্য ও জাগ্রত প্রাণশক্তিকে—এমন অসহায়ভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

সে শুয়ে ছিল তার বহুপরিচিত ও অনেক স্মৃতির প্রাণকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির কিনারা ছুঁয়ে—একটা ঘন পাতাওয়ালা প্রশাখাময় গাছের ছায়ায়। একসময় তার প্রয়াত আত্মার প্রতি গম্ভীর কণ্ঠের উচ্চারিত প্রার্থনা শেষ হলে তার প্রিয় বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী ও ব্যথিত আত্মীয় স্বজনের চোখের সামনে দিয়ে হুমায়ুন—আমাদের একান্ত সহযাত্রী-সুহৃদ—তার পরিচিত মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে কবরের দিকে প্রতিবাদহীন এগিয়ে গেল।

বেশিদিনের কথা নয়, খুব জোর পাঁচ-ছয় বছর আগে হুমায়ুন আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেছিল তরুণতমদের একজন হিশেবে। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই তার প্রতিভার প্রখর উত্তাপ আমরা অনুভব করেছিলাম—তরুণ লেখকসম্প্রদায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল একজন শক্তিশালী সতীর্থের আশান্বিত পদপাতে। গত পাঁচ বছর ধরে তার অবিশ্রান্ত লেখনী ক্ষান্তিহীন গদ্য পদ্য রচনায় এখানকার পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাকে উজ্জীবিত রেখেছে। তার জীবনকালের তুলনায় তার রচনার বিপুলতা সত্যি সত্যি বিস্ময়কর। তাকে দেখলে মনে হত, যেন সমস্ত জীবনের করণীয় কর্তব্যকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে, অত্যন্ত দ্রুততার সাথে, শেষ করার উন্মুখ দায়িত্বে অস্বস্ত হয়ে রয়েছে সে। অথচ কে জানত সেই হুমায়ুন কবিরকেই—তীব্র, নমনীয়, কৈশোরিক অনুভূতির সেই সোনালি যুবককেই—জীবনের সবুজ স্বপ্নদের বিদায় নেবার এত আগে—তার প্রতিভাবান বুদ্ধিবৃত্তি, অপরিমিত প্রতিশ্রুতি ও প্রোজ্জ্বল দেশপ্রেম নিয়ে এমন দুঃখজনকভাবে নামহীন পরিচয়হীন কবরের অন্ধকার খুঁজে নিতে হবে।

জীবনের উত্তুঙ্গ শাখাকে স্পর্শ করার অনেক আগেই মৃত্যুর হিমশীতল হাত তাকে স্পর্শ করেছে। তার বন্ধুরা তার এই অভাবিত অসঙ্গত মৃত্যুকে—দুর্দম তারুণ্যের এই অন্যায় পতনকে—অশ্রুপাতহীন যেতে দেয়নি। অনেক স্নিগ্ধ সংরাগমধুর কবিতা তার কবরের ওপর নিঃশব্দে ঝরে পড়ে তার মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করেছে। তাকে নিয়ে তার বন্ধুদের রচিত অজস্র স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ ও সাধারণ রচনা—তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত তার বন্ধুদের বিপুলসংখ্যক পত্রপত্রিকা, সংকলন,—তার মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত প্রচুর আলোচনাসভা ও প্রতিবাদ মিছিলের সোচ্চার আওয়াজ তার মৃত্যুকে খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরও আকাঙ্ক্ষার বিষয় করে তুলেছে। দেরিতে হলেও, 'কণ্ঠস্বর'-এর বর্তমান সংখ্যাটিকে তার উদ্দেশে উৎসর্গ করে আমরা তার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরঙ্গতার ঋণশোধের কিছুটা চেষ্টা করলাম।

হুমায়ুন কবির ছিল 'কণ্ঠস্বর'-এর ঘনিষ্ঠতম লেখকদের একজন। লেখক হিশেবে এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই তার রচনার উপহারে সম্পন্ন হয়েছে। তার স্বল্পস্থায়ী লেখকজীবনের বেশক'টি উজ্জ্বল রচনাও প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। 'কণ্ঠস্বর'-এর বিভিন্নমুখী প্রয়োজন ও প্রয়াসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল সে। তার মৃত্যু এখানকার তরুণ-সাহিত্যের মতো এই পত্রিকার ভিত্তিকেও সমানভাবে আহত করেছে। একটি দেশের ইতিহাস তার কাল-পরিধির অনেক দীর্ঘ, নির্লিপ্ত ও আত্মসন্তুষ্ট অধ্যায় পার হয়ে এক এক সময় বিপুল রক্তপিপাসায় জেগে ওঠে। সে তখন এসে দাঁড়ায় অসংখ্য মানুষের রক্তের দাবি নিয়ে, অনেক তাজা নতুন প্রাণের রক্তদানের মধ্যদিয়ে আকাঙ্ক্ষিত যুগান্তরকে অন্বেষণ করে। বাংলাদেশ আজ হয়তো সেই ব্যাপক রক্তপিপাসাকেই প্রত্যক্ষ করছে। অগণিত মানুষকে তার বলি হতে হয়েছে ইতিমধ্যে। হয়তো হুমায়ুনকেও হতে হল। তবু বলব, বাঙালি জীবনের এই বিক্ষুব্ধতম ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেম বুকে নিয়ে যারাই বাংলার মাটিকে রঞ্জিত করল—যে পথে এবং যে কারণেই হোক—তারা শহীদ। তাদের রক্ত স্বদেশভূমির উত্তরণের সপক্ষে।

৪

আত্মপক্ষ

'কণ্ঠস্বর' দশম বর্ষে পদার্পণ করল। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতির তুলনায় বড়বেশি দীর্ঘ এই সময়—বড় বেশিরকম অপ্রত্যাশিত ও অস্বস্তিকর। সত্যি কথা বলতে কি, 'কণ্ঠস্বর'-এর এতটা দীর্ঘায়ুর জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তবু 'কণ্ঠস্বর' এখনও বেঁচে আছে। একটা নতুন সাহিত্যযুগের আত্যন্তিক প্রয়োজন, একত্রিত একটি নবীন লেখকদের সমবেত দরকার এই পত্রিকাটিকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুদ্ধদেব বসু একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন যে তাঁদের পরের যুগের তরুণেরা, 'কল্লোল' সম্পর্কে তাঁদের অতি-উৎসাহের ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেয়ে, প্রায়ই তাঁকে নির্দ্বিধায় এমন সব নির্মম কথা শুনিয়ে থাকে যে, 'কল্লোল' সম্বন্ধে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হওয়া ব্যক্তিগত অতি-উৎসাহেরই নামান্তর যেহেতু 'কল্লোল' 'বাজে লেখায় ভর্তি'। আজ, এতদিন পর, 'কণ্ঠস্বর'-এর পুরোনো দিনের পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে গিয়ে এমনি একটা কথাই ফিরে ফিরে মনে জাগছে : সত্যিকারের কটা 'ভালো লেখা' প্রকাশিত হয়েছে 'কণ্ঠস্বর'-এর এযাবৎকালের পৃষ্ঠায়? কোথায় সেইসব প্রবুদ্ধ, মৌলিক, শক্তিমান রচনার অজস্র অপার উৎসার—যাকে সার্বিক পরিপূর্ণতায় ধারণ করতে পারলেই, একটা পত্রিকাকে সত্যি সত্যি 'উচ্চাঙ্গের' বলে অভিহিত করা যায়? কোথায় সেই সাহিত্যরুচির উন্নতমান—কিংবা মহাদেব সাহার ভাষায় সেই 'সংযম ও স্থৈর্য'—যা থাকলেই শুধুমাত্র একটি পত্রিকা প্রগাঢ় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, 'কণ্ঠস্বর'-এ সেসব নেই। 'কণ্ঠস্বর' হাতে নিয়ে কোনো শুদ্ধতাবাদী এমন কথা ভাবতে পারবেন না যে একালের বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনায় সমৃদ্ধ একটি অনন্য পত্রিকা তিনি হাতে নিয়েছেন। না, 'কণ্ঠস্বর' কোনো ঈপ্সিত 'স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন' নয়, 'কণ্ঠস্বর' আজও লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন—এর রচনা এবং প্রকাশনাঘটিত সমস্ত পরিশীলন সত্ত্বেও। 'কণ্ঠস্বর' মূলত লেখক-সৃষ্টির পত্রিকা। এ কারণেই 'কণ্ঠস্বর' 'স্থৈর্য এবং সংযম'-এর নয়—নতুনত্ব এবং প্রতিভার ; গৃহপালিত প্রাতিষ্ঠানিকতার নয়, প্রতিষ্ঠাহীন অনিকেতের ; তারুণ্যের এবং ভুলের, শক্তির এবং অসহায়তার, সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার ও দুঃসাহসী মৌলিকতার—অগতানুগতিকতার, আপোষহীনতার, ব্যতিক্রমের। বিশ্বাস করি 'কণ্ঠস্বর' এখনও তার এই আপোষহীন ব্যতিক্রমী চরিত্র হারায়নি। নান্দনিক পরিশীলনের পাশাপাশি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বেচ্ছাচারকে, 'কণ্ঠস্বর', আজ অব্দি, একইভাবে অন্বেষণ করে।

কী অবদান রেখেছে 'কণ্ঠস্বর' এই দশ বছরে? অথবা আদৌ রেখেছে কি কিছু? এসব প্রশ্ন প্রায়ই বিব্রত অবস্থায় ফেলে আমাদের। কী জবাব দেওয়া যেতে পারে এসব কথার, বিশেষ করে আজ, এই সময়ে, এই স্বল্প-পরিসরের মধ্যে? হয়তো বলা যাবে, ষাটের সাহিত্যের মূল প্রবণতাটিকে তুলে ধরেছিল 'কণ্ঠস্বর' তার পৃষ্ঠায়—সবচেয়ে ব্যাপকভাবে। বলা যাবে, প্রধানত 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করে এই দশকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন ও স্বতন্ত্র গদ্যরীতি, যা আজকে আমাদের তরুণ-সম্প্রদায়ের অনিবার্য ভাষা ; কিংবা এই সময়কার নতুন কবিতার পূর্ণতর মুখাবয়ব প্রধানত উন্মোচিত হয়েছিল এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই—কিংবা এ ধরনের আরও অন্যান্য প্রসঙ্গ। কিন্তু, প্রশ্ন জাগে, আজ, এই উনিশ-শ পঁচাত্তুরে, ষাটের অবক্ষয় এবং প্রথম সত্তুরের সার্বিক উজ্জীবনকে পিছে ফেলে এসে, কী দায়িত্ব অর্পিত আমাদের ওপর—কিংবা সত্তুরের সাহিত্যের মূল প্রবণতাটিই বা কী—আমরা যার প্রতিনিধিত্বে উৎসুক।

আমাদের চারপাশে এক নবজাগ্রত দেশ এবং জাতি উন্মুখভাবে তার মৌলিক ভিত্তি অন্বেষণ করছে। রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা শিক্ষার মতো জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে এই ভিত্তি অন্বেষণের কর্মঠ শ্রম সোচ্চার। এই জাতির আদিমতম পুরুষ হিশেবে আমাদেরকেও আজ আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে—আমাদের সাধনা, প্রতিভা, সততা এবং শ্রমের মূল্যে। আর এই সুদৃঢ় সুশৃঙ্খল চারিত্র্যশক্তির যোগ্যতাই আমাদেরকে আগামী সাহিত্যের নেতৃত্বে নিয়ে যেতে পারে শুধু।

শেষ করার আগে আবার মনে হচ্ছে, 'কণ্ঠস্বর' এত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, প্রথম প্রকাশের সময়, ঘুণাক্ষরেও মনে আসেনি। আজ মনে হচ্ছে যদি এ ভুল না হত, যদি জানতে পারতাম সেদিন যে দীর্ঘ দশটা বছরের ঝঞ্ঝা উৎরে বেঁচে থাকবে আমাদের এই ভালোবাসার সাম্পান, তবে হয়তো আরো একটু সতর্ক হতাম; সতর্ক পরিকল্পনায়, সনিষ্ঠ শ্রমে আরো একটু ফলবান করে তুলতে চেষ্টা করতাম আমাদের প্রয়াসের, আনন্দের এই ফসলটিকে।

১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত

১

আমার বয়স তখন বড়জোর বছর বারো, সবে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। মামার বিয়ে উপলক্ষে পাবনা থেকে ট্রেনে ঢাকা পৌঁছে পরের দিনই আবার বরযাত্রীর দলের সঙ্গে রংপুরের উদ্দেশে যাত্রা করতে হল। ট্রেনের একটা ইয়া বড় থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট পুরো রিজার্ভ করে পঞ্চাশ–ষাট জন বরযাত্রীর সঙ্গে ট্রেনে চেপে বসলাম।

বরযাত্রীদের অধিকাংশই বর্ষীয়ান—প্রায় সবাই মামা–খালু পর্যায়ের। এরই মধ্যে আমরা ভাগনে দলের জনাতিনেক খুদে সদস্য। আমাদের তিনজনের একজন আমার ছোটভাই, আমার এক ক্লাস নিচে, সেভেনে পড়ে। অন্যজন সম্পর্কে মামাতোভাই, এসেছেন দিনাজপুর থেকে, নাম মিন্টু ভাই। সদ্য নাইন থেকে টেন–এ উঠেছেন। ওপরের ঠোঁটের ওপর আসন্ন গোঁফের রেখা খানিকটা খানিকটা বেয়ারা রকমেই স্পষ্ট।

ট্রেন ছাড়ল রাত ন'টায়। ঘণ্টা দুই যেতে–না–যেতেই গালগল্পের সাথে সাথে মুরুব্বিদের মধ্যে ব্যাপক আকারে ঢুলুনির মহামারী দেখা দিতে শুরু করল। কেউ ঝিমোতে লাগলেন বসে–বসেই। তুলনামূলকভাবে বুড়োরা বয়সের সুবিধা নিয়ে কনিষ্ঠদের ঠেলে সরিয়ে খানিকটা বাড়তি জায়গা দখল করে আধশোয়া অবস্থায় গাড়ির সঙ্গে ঢুলতে লাগলেন। স্বয়ং বরকেও কম্পার্টমেন্টের একপাশে ঝিমোতে দেখা গেল। সারা কম্পার্টমেন্ট জুড়ে মানুষজনের জগতে একটা অদ্ভুত অসাড়তা। মাঝেমধ্যে দুই–একজনের পরিতৃপ্ত নাকডাকার শব্দ আর ট্রেনের একঘেয়ে আওয়াজ ছাড়া কেনোকিছুই অনুভবগম্য নয়।

আমাদের তিনজনের বসার জায়গা দেয়া হয়েছিল কম্পার্টমেন্টের এককোণের একটা বেঞ্চিতে, খানিকটা ঠাসাঠাসি অবস্থায়। মিন্টুভাই বসেছিলেন একেবারে জানালার পাশে। হঠাৎ টের পেলাম মিন্টুভাই তাঁর জায়গায় বসেই সাপের মতো ঘাড় উঁচু করে সারা কম্পার্টমেন্টের অবস্থাটা নিবিষ্টভাবে পরখ করে চলেছেন। একসময় আরো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে প্রায় উঠেই দাঁড়ালেন তিনি। মিন্টুভাইয়ের রহস্যজনক তৎপরতা আমাকে উৎকর্ণ করে তুলল। এক সময়, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষ হলে, কম্পার্টমেন্টটার দিকে খানিকটা পিছন ফিরে, শেষবারের মতো সবকিছুর ওপর একটা ট্যারা চাউনি বুলিয়ে নিয়েই খপ করে পকেট থেকে তিনি সিগারেট আর দেশলাই বার করে বসলেন। এরপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি যা করলেন তার বিস্ময় এবং আতঙ্ক আজও আমাকে শিউরে তোলে। প্রথম ঝটকায় প্যাকেট থেকে খুট করে একটা সিগারেট বের করে নিলেন তিনি, তারপর চারধারে শেষবারের মতো সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে দেশলাই জ্বেলে সেটা নির্বিকারে ধরিয়ে বসলেন।

আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। সারা কম্পার্টমেন্ট–ভরা প্রবীণদের কেউই প্রায় তখনো ঘুমোন নি, অধিকাংশই চোখ বুজে ঢুলছেন, দুয়েকজন আধো–তন্দ্রায়। যে–কেউ যে–কোনো মুহূর্তে বড় বড় লাল চোখ মেলে তাকালেই আপাদমস্তক ঘটনাটা ধরা পড়ে যাবে। কী হবে তখন? ভাবতেই আমার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। আমাদের সেই প্রবীণ–শাসিত ছেলেবেলায় এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা ভাবাও অসম্ভব। কিন্তু মিন্টুভাই নির্বিকার। তাকিয়ে দেখলাম ম্যাজিশিয়ানদের মতো চার আঙুলের আড়ালে সিগারেটটা লুকিয়ে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি একেকবার সারা কম্পার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং নিরাপদ বোঝামাত্র মাথা নিচু করে সিগারেটটায় একটা করে টান দিয়ে নিচ্ছেন। মিন্টুভাইয়ের দুঃসাহস দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। যে সিগারেটকে ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও কেবলমাত্র বর্ষীয়ান ব্যবহার্য একধরনের উচ্চতর ভোগ্য হিশেবে সম্ভ্রম জানিয়ে এসেছি, আমার চেয়ে মাত্র দু–ক্লাস ওপরের যে কিশোর এক–পৃথিবী ঝুঁকির ভেতর সেই সিগারেট অবলীলায় টেনে যেতে পারে তাকে দেখে হতবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

আমাদের কৈশোরের এইসব আলোকসামান্য কিশোরেরাই আমাদের জীবনের ইন্দ্রনাথ। আমরা টের পাই তারা আমাদের চেয়ে এত ওপরে এবং আমাদের অকিঞ্চিৎকর শক্তির তুলনায় এমন অসামান্য যে নিজেদের পরাজিত আর অভিভূত অবস্থান থেকে তাদের সেই দুর্জ্ঞেয় আর রহস্যময় অসাধারণত্বে বিস্মিত হয়ে থাকা ছাড়া আমাদের প্রায় কিছুই করার থাকে না।

আমাদের শৈশবে এমনি এক বা একাধিক ইন্দ্রনাথের মুখোমুখি আমরা সবাই কমবেশি হই। আমার জীবনের পরবর্তী ইন্দ্রনাথ খায়রুল—খায়রুল আনাম সিদ্দিকী, পাবনা জিলা স্কুলে ক্লাস টেনে আমাদের ফার্স্ট বয়। ক্লাস ক্যাপ্টেন খায়রুলের স্নিগ্ধ সপরাগ ব্যক্তিত্ব সবার ওপর দিয়ে জ্বলজ্বল করত। সরকারি স্কুলে এসে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়েই টের পেলাম, ক্লাসের এই সেরা ছাত্রটি রহস্যময় সম্মোহনে আমাকে টানছে। সারাদিন স্কুলে খায়রুলের সঙ্গে কথা বলার পরেও ওকে নিয়ে আমার বিস্ময় শেষ হত না। খায়রুলদের বাসা ছিল স্কুলের পাশেই, আমার বাসা স্কুল থেকে পুরো এক মাইল দূরে। প্রতিদিন বিকেলবেলা স্কুল থেকে বাসায় ফিরে হাতের বইগুলো টেবিলে ছুড়ে ফেলে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বা না দিয়েই ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য হাঁটতে হাঁটতে আবার ওদের বাসায় চলে যেতাম। ততক্ষণে বিকেলের রোদ পড়ে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, খায়রুল হারিকেন জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে বসে গেছে। সন্ধ্যার পর ওর বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতি ছিল না। আমি ওর ঘরের জানালার বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে ওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে আবারো একইরকম অপূর্ণতার যন্ত্রণা নিয়ে বাসায় ফিরে আসতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খায়রুলের আগে আরও এক-আধজন ছোট মাপের ইন্দ্রনাথের দেখা পাই নি তা নয়। আমাদের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর বন্ধু মজিদ এদেরই একজন। ফুটবল মাঠে আস্থা আর ভরসার স্থল, সুঠামদেহী মজিদ আমার চোখে ছিল দুর্লভ জগতের বাসিন্দা। ওর স্বাস্থ্য ও শক্তিমত্তার বৈভব ছিল বিস্ময়কর। খেলার মাঠে ওর গর্বিত অবস্থান আমার চোখে ওকে অসামান্য করে তুলত। আমি ওর শ্রেষ্ঠত্বে অভিভূত হতাম।

আমার জীবনের পরবর্তী ইন্দ্রনাথ পেয়েছিলাম অনেকদিন পরে—বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। সে মোশতাক—কাজী মোশতাক হোসেন। আমাদের অসহায় করুণ তারুণ্যের আবেগ-বিস্রস্ত নির্বুদ্ধিতার জগতে মোশতাকের শান্ত নির্বিকার অভ্রভেদী চরিত্র আমার চোখে বিস্ময় জাগাত। অশ্রুবিধ্বস্ত যৌবনে একজন উদ্দাম যুবক কীভাবে এমন নিরাসক্ত থাকতে পারে—আমি কিছুতেই সেই রহস্যের অন্ত পেতাম না। এক ব্যাখ্যাতীত আকর্ষণ আমাকে মোশতাকের দিকে টানত। ওকে আমাদের চেয়ে অনেক বড় মনে হত। আমাদের জীবনে কেবল কৈশোরেই যে এইসব ইন্দ্রনাথের দেখা আমরা পাই তা নয়, যৌবনে, এমনকি প্রবীণ বয়সেও আমরা এমনি ইন্দ্রনাথের দেখা পেতে পারি। মোশতাক ছিল আমার যৌবনের ইন্দ্রনাথ।

আমার জীবনের সর্বশেষ ইন্দ্রনাথের দেখা পাই প্রায় জীবনের পরিণত পর্বে—আমার আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছর বয়সের দিকে। এই ইন্দ্রনাথ ষাটের দশকের ঢাকা বেতারের কর্ণধার এবং সে-যুগের ঢাকা শহরের অন্যতম কিংবদন্তি আশরাফউজ্জামান খান। তাঁর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তাঁর বয়স চৌষট্টি-পঁয়ষট্টির মতো। ওই বয়সেও সব ব্যাপারে কাঠবেরালির মতো তাঁর উৎসুক ক্ষিপ্র ও অশ্রান্ত উৎসাহ আর উচ্ছল চটুল ও নৃত্যশীল প্রকৃতি ছিল পৃথিবীর প্রথমদিনের মতোই তরুণ। ছবি আঁকা, শিকার, সঙ্গীত, লেখালেখি, ভ্রমণ বা ফটোগ্রাফি থেকে সুস্বাদু রান্নাবান্না, নয়নলোভন জুতো তৈরি থেকে ইলেকট্রনিক্সের হাজারো ব্যাপারে অফুরন্ত কৌতূহল—আতিথ্য-মধুর ও চির-তরুণ এই মানুষটিকে আমার চোখে বিস্ময়কর করে তোলে। সে আপ্লুত বিস্ময়কে আজও আমি অতিক্রম করতে পারি নি।

২

শ্রীকান্ত উপন্যাসের সূচনা থেকেই শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্রের এই অসাধারণত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যুগযুগান্তর ধরে আজানুলম্বিত বাহুর ভেতর ভারতীয় সভ্যতা যে অলৌকিকত্বের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছে, প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে ইন্দ্রনাথের সেই আজানুলম্বিত বাহুর উল্লেখ করে ইন্দ্রনাথের চরিত্রের অসাধারণত্বের দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এর পর একের পর এক ঘটনার ভেতর দিয়ে তিনি ইন্দ্রনাথের এই অসামান্যতাকে ক্রমবর্ধমানভাবে জাজ্বল্যমান করেছেন।

প্রথম দৃশ্যেই সে আবির্ভূত হয়েছে বিপদ-মুহূর্তের রহস্যময় ও অপ্রত্যাশিত ত্রাণকর্তা হিশেবে। কোথা থেকে কেন এবং কীভাবে সন্ধ্যার আলো-আঁধারির ভেতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হঠাৎ এসে হাজির হয় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায় এই ধরনের অসহায় ও পথ-হারানো মুহূর্তে দৈব-প্রেরিত ভাবে যে ব্যক্তিটি অবধারিত ত্রাতা হিশেবে উপস্থিত হবার জন্য নির্ধারিত, সে ইন্দ্রনাথ। লেখকের বর্ণনায় ইন্দ্রনাথের অতীত জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেও সে উজ্জ্বল :

> "তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া, ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিং ডিঙ্গাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎকর। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাসের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণ হইত। এমনি একসময়ে সে তাঁহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ পণ্ডিতজী বাড়ি গিয়া তাহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই এবং হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে-ইস্কুল হইতে রেলিং ডিঙ্গাইয়া বাড়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আদৌ ছিল না। এমনকি মাথার উপর দশ-বিশ জন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইলেন না। ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকায় দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙ্গি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দশ পনের দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না।"

একের পর এক ঘটনার ভেতর দিয়ে ক্রমাগতভাবে অসাধারণত্বের দিকে এগিয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ। সমাজ পরিপার্শ্বের কাছে আত্মসমর্পিত কিশোর শ্রীকান্ত যে বয়সে নিজের ভীরু অপারগতার করুণ জগতে অসহায়ভাবে সংকুচিত, সেই বয়সে চারপাশের কঠোর সামাজিক আধিপত্যকে সহজাত শক্তিতে তাচ্ছিল্য করে দুঃসাহসের অভাবনীয় নায়ক হিসেবে তার সামনে ইন্দ্রনাথ আবির্ভূত।

ভয়হীন, ভ্রূক্ষেপহীন, পরোয়া-পরোয়ানাহীন এক সম্পূর্ণ স্বাধীন পৃথিবীর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র অধীশ্বর সে ; নিজের মুক্ত ও আনন্দময় চৈতন্যের একক ভোক্তা ও রসাস্বাদনকারী। তার শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর প্রতি তার নির্বিকার ও সার্বিক ভ্রূক্ষেপহীনতায়। প্রথম দৃশ্যে তার চরিত্রের যে অসামান্যতা আমাদের চোখে বিস্ময়ের রং লাগিয়ে দিয়েছে, পরের প্রতিটা ঘটনার ভেতর দিয়ে সেই বিস্ময় ক্রমাগতভাবে বর্ণিল হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এতবড় অসাধারণত্ব এই জগতের বাস্তব হতে পারে না। এইজন্যে ইন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত জীবনের বাস্তব নয়, স্বপ্ন। স্বপ্ন দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় নয়, রাতের। তাই ইন্দ্রনাথকে আমরা দেখি রাতে, দিনে নয়। গঙ্গার তীব্র হিংস্র মাছধরার মসিকৃষ্ণ জগৎ, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অন্ধকার ঘুটঘুটে পৃথিবী বা নতুনদার অত্যাচারী সাম্রাজ্যের বিমর্ষ কালো জগৎ, সবই রাত। সে রাত নতুনদার অধ্যায়ের মতো কখনো জোছনান্বিত, কখনো মাছধরার নিকষ-কালো রোমশ রাতের মতো জোছনাহীন—কিন্তু রাত। ইন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাবের সন্ধ্যার আলো-আঁধারির পৃথিবী বা জনমানবহীন ঘন জঙ্গলের ভেতর শাহজীর আস্তানার আকীর্ণ অন্ধকার—সেও রাত। দিনের মতো রাত। রাতের বাইরে ইন্দ্রনাথ অচিন্ত্যনীয়। রামায়ণের রাক্ষসদের মতোই রাতে সে শক্তিশালী।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেটা এরকম : রবীন্দ্রনাথকে একবার এক স্বাক্ষর-শিকারি প্রশ্ন করেছিল : আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টি? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন : Nature abhors superlatives. 'অতিরকম বড়কে প্রকৃতি সহ্য করে না।' আমাদের আজকের এই পৃথিবীও একদিন ডাইনোসরাস-ব্রন্টোসরাসের মতো দানবাকৃতির অতিকায় প্রাণীর পদভারে প্রকম্পিত ছিল, তারা পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এমন অবিবেচক সৃষ্টিছাড়া বিকাশ প্রকৃতির অনুমোদন পায় না। আজ প্রযুক্তি, তথ্য, সমরাস্ত্র আর ভোগ্যপণ্যের বিপুল উৎপাদনের যে উৎভূমিক বিশাল বিকাশ দেখা যাচ্ছে, মানবজাতি তাকে শমিত করে আনার সুবিবেচনা না দেখালে একেও কি প্রকৃতি সহ্য করবে? হয়তো মানবজাতিও একদিন তার ঐসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মূঢ় পূর্বসূরীদের মতো একই পরিচয়হীনতার অতলে হারিয়ে যাবে। ডাইনোসরদের বংশ শরীরে বড় হয়েছিল, আধুনিক মানুষ বড় হয়ে উঠেছে মগজে। দুটো একই রকম বিপজ্জনক। ইন্দ্রনাথের অসাধরণত্বের এই অতিজাগতিক বিকাশ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, মানবজাতির স্বাভাবিক সীমা-অতিক্রমী। এইজন্যে তা মনুষ্যত্বের আলো নয়, আলেয়া। এত অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও ইন্দ্রনাথ তাই এমন ক্ষণজীবী। মানবতার রাস্তায় প্রত্যাখ্যাত এবং অবাঞ্ছিত একটা পথচলতি গল্পমাত্র। উপন্যাসের সূচনায় তার আচমকা এবং বিস্ময়কর আবির্ভাবের মতো আচমকা এবং নিরঙ্কুশ তার প্রস্থান।

আগেই বলেছি, *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব সূচনা থেকেই। তার এই অসাধারণত্ব শ্রীকান্তের কাছেও স্পষ্ট। একেকবার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অসম্ভব ভাবনাও শ্রীকান্তের মনে জাগে। কিন্তু তার পরেই তার সঙ্গে নিজের দুস্তর পার্থক্য এবং নিজের অকিঞ্চিৎকরতা তাকে মুষড়ে দেয় : 'কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি। সে যে আমার অনেক উচ্চে।'

হ্যাঁ, অনেক ওপরে ইন্দ্রনাথ, অলীকের কিনারায়। ইন্দ্রনাথের ঐশী ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে সে দেখতে পায় সম্পূর্ণ পরাজিত ও অসহায় অবস্থায়। এমন ব্যবধানকে কী করে অতিক্রম করা সম্ভব!

আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করতে পারি ইন্দ্রনাথের চরিত্রের অসামান্যতার উৎসগুলো কোথায় কোথায়। অন্তত একটা জায়গায় তার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। সেটা হল, তার অবস্থান আমাদের বাস্তব পৃথিবীর সম্পূর্ণ বাইরে। মানুষের সমাজের সে কেউ নয়। পৃথিবীতে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ বহিরাগত, জন্মগত একাকী। সে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন। নিজের অলৌকিক লঘুত্বে সমাজ–পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে চকিতে হারিয়ে–যাওয়া এক পশলা পলায়মান বৃষ্টি। তার বাস্তব পরিচয়ও এ কারণেই এই উপন্যাসে খুব স্পষ্ট নয়। একপর্যায়ে জানা যায় সে 'রায়েদের ইন্দ্র', কিন্তু কোথাকার কোন্ রায়েদের তার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সঙ্গে এই সম্পর্কের মোটামুটি পরিসমাপ্তি।

এরপরই তার উদ্দেশ্যহীন উল্লসিত আনন্দসত্তার নিশিন্ত ও পরপূর্ণ উদ্বোধন। যে বয়সে পৃথিবীব্যাপী অসহায়তার ভেতর আমরা আমাদের চারপাশের সমাজ সংসারের কাছে করুণভাবে সমর্পিত আশ্রিত হয়ে থাকি, সেই বয়সে সহজাত শক্তির দুর্লভ আনুকূল্যে সেই মায়াজাল থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে–কোনো মানুষের পক্ষেই জীবনের প্রতি এই নির্লিপ্ততা বিস্ময়কর। এই নির্লিপ্ততা তাকে চমকপ্রদ আর অতিলৌকিক করে তোলে, তার চরিত্রের গায়ে অনন্যসাধারণত্বের ছোপ লাগায়।

ইন্দ্রনাথের প্রকৃতির এই বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা মূলত দুটি ব্যাপারে। এক, তার চরিত্রে ভয়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে ; দুই, চারপাশের বাস্তব জগতের প্রতি তার নির্বিকার অচেতনতায়। আশ্চর্যভাবে ভয়হীন এই ইন্দ্রনাথ। তার ভীতিশূন্যতা এমন পাশবিক যে তার প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমূহূর্তে সে আমাদের আশঙ্কাগ্রস্ত করে রাখে। নিজেকে ভুল করে ইন্দ্রনাথ ভেবে অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানঘাটের সুগভীর ভীতির ভেতর শ্রীকান্ত টের পেয়েছিল নিজেকে যতই সে ইন্দ্রনাথ ভাবার অপচেষ্টা করুক না কেন, আসলে সে ইন্দ্রনাথ নয়। ইন্দ্রনাথের নিরঙ্কুশ ভীতিশূন্যতা তার শক্তির অতীত। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথের এই নির্ভীকতা তার চরিত্রের কোন্ ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য থেকে জাগ্রত, তা নিয়ে ক্ষণিকের জন্যে ভেবে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি, ইন্দ্রনাথ আশ্চর্যরকম স্বল্পায়ু। উপন্যাসের কাহিনী থেকে তার প্রস্থান এমন আকস্মিক, অগ্রহণযোগ্য এবং বেদনাদায়ক যে বই–এর কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তা আমাদের স্মৃতিভারাতুর করে রাখে। তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপন্যাসের নায়ক–বিয়োগের কষ্ট পাই। এখন প্রশ্ন, এমন অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়েও এমন অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় কেন তাকে শেষ হতে হল? তার ভেতর যে দুর্জয় অতিমানবিক অসামান্যতা, তা কি তবে উজ্জ্বল, ত্বকসর্বস্ব ও তলহীন একটা আপাত বিভ্রম? মানবিক পূর্ণত্বের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জরুরি জায়গায় সে কি অসম্পূর্ণ? অতিলৌকিক শক্তি কি তার মানবিক অস্তিত্বের কোনো অস্বাভাবিক শূন্যতা থেকে জাগ্রত? আমার মনে হয় ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক।

প্রকৃতি–জগতে মানুষের বিকাশ প্রকৃতির মতোই। সে শিশু হয়ে জন্মায়, তারপর শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব–বার্ধক্য হয়ে তার নিঃশব্দ প্রস্থান। সুখে–দুঃখে, শক্তিতে–দুর্বলতায় সে তীব্র–প্রখর একটা একরৈখিক গতি—এই পৃথিবীতে আর দশটা মানুষের সঙ্গে প্রায় পুরোপুরিই ভেদাভেদরহিত। এরই মধ্যে, কারো মানসিক বৃত্তিগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্র যদি আর দশজনের তুলনায় অতিবিকশিত বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিকশিত হয় তবে সে মানুষ, ঐ ব্যতিক্রমের কারণে, আমাদের চোখে দুর্বোধ্য আর বিস্ময়কর বলে প্রতিভাত হয়ে পড়ে।

অনেকেরই হয়তো মনে আছে বছর বিশেক আগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে খলিলউল্লাহ নামে একজন অসুস্থ মানুষকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যে লুকিয়ে লুকিয়ে মৃতমানুষের কলজে খেয়ে পরিতৃপ্তি পেত। খবরটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশ প্রচণ্ড স্নায়বিক আঘাতে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে রাতারাতি খলিলউল্লাহ দেশের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সবার চোখে সে প্রতিভাত হয় মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক এক কদাকার নরখাদক হিসেবে। কিন্তু যতদূর জানা যায়, তার ওপর সে-সময় যে পৈশাচিকতা আরোপ করার চেষ্টা চলেছিল, আসল ব্যাপারটা তেমন কিছুই ছিল না। কোনো হিংস্র বা নারকীয় বৃত্তির তাড়নায় সে অমনটা করত না। মানুষের মস্তিষ্কের যে অংশটা ঘৃণার উৎপত্তির জন্য দায়ী, তার মস্তিষ্কের সেই অংশটা ছিল অবিকশিত। ফলে তার মধ্যে ঘৃণার অনুভূতি না-থাকায় মরা মানুষের কলজে এবং সুস্বাদু রক্তিম আপেলের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না তার কাছে। এই অবিকশিত মানসিক অবস্থার কারণে যকৃত-ভক্ষণের মতো ঘৃণ্য এবং রোমহর্ষক কাজ সে অবলীলায় করে যেতে পারত।

ইন্দ্রনাথ চরিত্রের শারীর-মানসিক ভিত্তি নিয়ে ভাবতে গেলে আমার মনে হয় ইন্দ্রনাথও হয়তো ছিল এমন এক খলিলউল্লাহ, অনুভূতির কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তারই মতো এক অবিকশিত মানুষ। পার্থক্য কেবল একটা ছোট্ট জায়গায়। খলিলুল্লাহ্‌র মস্তিষ্কের ঘৃণার জীবকোষগুলো ছিল অবিকশিত, ইন্দ্রনাথের মস্তিষ্কের ভয়ের জীবকোষগুলো। তাই সে এমন অমানুষিকরকমে দুঃসাহসী। এই নিরঙ্কুশ ভীতিশূন্যতা আতঙ্ককর এবং অত্যাচারী। তার এই ব্যাপারটা আমাদের থেকে এত আলাদা যে আমরা কিছুতেই তার এই বিস্ময়কে অতিক্রম করতে পারি না।

এই অসম্পূর্ণতার কারণেই ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা দিক এমন অসাধারণ। যেভাবে জোছনারাতে বিষাক্ত সাপে ভরা গোসাই-বাগানের ভেতর দিয়ে নিশ্চিন্তমনে বাঁশি বাজাতে বাজাতে সে চলে যায়, ক্লাসে ঘুমন্ত পণ্ডিত মশাইয়ের টিকি কেটে আবার তা তাঁরই পকেটে রেখে দেয়, যেভাবে দিনের পর দিন গঙ্গার প্রমত্ত হিংস্র জলস্রোতের ওপর একলা ডিঙিতে প্রকৃতি-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাটের মতো সে ঘুরে বেড়ায়; ঘুটঘুটে রাতে মাছ চুরির বিপজ্জনক অভিযানে হিংস্র স্রোত, সাপ আর মৃত্যুকে তাচ্ছিল্য করে এগিয়ে চলে বা লণ্ঠন হাতে বাঘ দেখার আত্মঘাতী দুঃসাহসে পা বাড়ায়, তা একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। ভয়ের ব্যাপারে সে শিশুদেরই মতোই অবিকশিত ও অ-মানুষ।

আমার ধারণা এইসব অবিকশিত মানুষেরাই আমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ইন্দ্রনাথ। আমার নিজের জীবনের ইন্দ্রনাথদের দিকে ফিরে তাকালে অনেকটা এরকম প্রমাণই মেলে। যতদূর বুঝতে পারি মিন্টুভাই ছিলেন ভয়ের অনুভূতিহীন, খায়রুল কৈশোরহীন, মোস্তাক যৌবনহীন এবং আশরাফুজ্জামান খান যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যহীন। যে বয়সে যার কাছে যা প্রত্যাশিত ছিল তারা ছিল তার বিপরীত, এইজন্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা ঐসব বয়সে আমার চোখে জাগিয়েছিল বিস্ময়। বিপরীত বয়সে যদি তাদের সঙ্গে আমার দেখা হত, যেমন আশরাফুজ্জামান খানের যদি দেখা পেতাম আমার কিশোর বয়সে—আমারই মতো অনুভূতিময়, চঞ্চল, উচ্ছল একজন উচ্ছ্রিত কিশোর হিশেবে, কিংবা বয়সের তুলনায় পরিণত খায়রুল, মোস্তাক বা মিন্টুভাইয়ের দেখা পেতাম আমার জীবনের পরিণত পর্যায়ে—তবে তারা হয়তো আমার চোখে এত অসামান্য হয়ে দেখা দিত না।

মানস-গঠনে অবিকশিত বলে জীবনের দায়িত্বশীল সংগ্রামের সামনে এদের অনেকেই বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাদের শক্তি ফুরিয়ে যায়। টের পাওয়া যায়, তাদের যেসব বৈশিষ্ট্যকে শক্তি বলে ভুল করা হয়েছিল, আসলে সেগুলো তাদের দুর্বলতা, তাদের ব্যক্তিত্বের অপরিণত ও প্রতিবন্ধী অবস্থা। ফলে উল্কার মতো বিচ্ছুরিত হয়ে আবার উল্কারই মতন তারা হারিয়ে যায়। হারিয়েছিল ইন্দ্রনাথও। ইন্দ্রনাথের অসামান্যতাকে আমাদের চেতনায় ভাস্বর করে রাখার জন্যেই হয়তো তাকে আমাদের সামনে আর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন নি শরৎচন্দ্র। যদি করতেন—তবে হয়তো দেখা যেত আর দশটা আটপৌরে মানুষের মতো পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট হিসেবে নামগোত্রহীনভাবে সে শেষ হয়েছে। ইন্দ্রনাথের জীবনে শেষপর্যন্ত কী ঘটেছিল জানি না, কিন্তু আমার জীবনের ইন্দ্রনাথদের পরিণতি আমি দেখেছি। আমার কৈশোর-যৌবনের সেই অভাবিত ইন্দ্রনাথদের অনেকেই অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যহীনভাবে নিজ নিজ জীবন নিঃশোষিত করেছে।

৩

আমরা লক্ষ করেছি, উপন্যাসের ভেতর থেকে একসময় আচমকা হারিয়ে যায় ইন্দ্রনাথ। হারিয়ে যায়, কিন্তু আগাগোড়া উপন্যাস জুড়ে বাস্তব এবং স্বপ্নের পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে যে-মানুষটি উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকে, সে শ্রীকান্ত। এখন প্রশ্ন : সারভাইবাল অফ দি ফিটেস্ট—যোগ্যতমই টিকে থাকে—প্রকৃতিজগতের এই নিয়ম যদি সত্যি হয় তবে ইন্দ্রনাথ কেন টিকে থাকল না শেষ অব্দি? কেন টিকে থাকল শ্রীকান্ত, এমনকি ঐ দুজনের ভেতরেও যে 'ছোট'? যদি তা না হয় তবে তার আকস্মিক বিলুপ্তির কারণ কী?

ইন্দ্রনাথের মতো শ্রীকান্তও রক্ত-প্রকৃতিতে যাযাবর। দুজনের কারও জীবনই বাস্তব পৃথিবীর ভেতর আবর্তিত নয়। দুজনই সমাজবিচ্যুত, নিঃসঙ্গ, ব্যতিক্রমী। বঙ্কিমের কমলাকান্তের মতো 'অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী'। যুগযুগান্তের গৃহত্যাগী ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরসূরী দুজনেই ; সুদূরাভিসারী এবং পৃথিবী থেকে দুর্নীরিক্ষ্য মহাশূন্যে ছিটকে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্র। তবু দুজনের পার্থক্য দুস্তর। ইন্দ্রনাথ কোনোকিছুর সঙ্গে মমতায় আবদ্ধ নয়। থাকলেও তার জীবনের মমতার আশ্রয়গুলো, অন্নদাদিদির মতো, রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গিয়ে, তাকে নিয়তিনির্ধারিত একাকিত্বের বেলাভূমিতে বারবার ফেরত দিয়ে যায়। শিশুর মতোই সে সহজ, নিষ্ঠুর ও নতুন। তার ভেতর কেবলি তীব্র ক্রূর ছুটে চলার অবিশ্রান্ত আকুতি, পেছনে ফিরে তাকানো নেই। সে কেবল গতির প্রতি নতজানু, বিরতির নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীকান্তের গল্প অনেকটাই অন্যরকম। গরিবের ছেলে শ্রীকান্ত আর দশটা গতানুগতিক মানুষের মতো পড়াশোনা করে সংসারের এককোণে কোনোরকম একটু জায়গা পাবার আশায় গ্রাম ছেড়ে মফস্বল শহরের মামাবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের গৃহ, প্রেম, প্রণয়ের ভেতর গভীর শিকড় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সে একজন অনুভূতিময় মানবীয় বৃক্ষ। আবার একই সঙ্গে তার ভেতর কাজ করে গৃহছাড়া প্রকৃতি। কিন্তু জীবনের সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্কের কারণে তা পরিপূর্ণ সক্রিয়তা পায় না। এইজন্যে দরকার পড়ে ইন্দ্রনাথের। ইন্দ্রনাথ হয়ে দাঁড়ায় তার জীবন-দেবতা, তার উদ্বুদ্ধকারী প্ররোচক। শ্রীকান্তকে সে দ্বিধা-ভীরুতার নিষ্ক্রিয় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিচ্ছিন্ন করে কিন্তু জীবনের একান্ত কামনা থেকে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারে না। ভেতরে ভেতরে সে থেকে যায় জীবনের অশ্রুময় নিঃসঙ্গ আকাঙ্ক্ষী। ঘরের ও পথের পরস্পরবিরোধী সংঘাতের ভেতর থেকে তার মধ্যে জন্ম নেয় একজন দ্বন্দ্ব-রক্তিম মানুষ। 'মানুষের ধর্ম' বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘর ও পথের মিলন সম্বন্ধে লিখেছেন :

> 'পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের কোনো অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে। আরম্ভ হল ভিতরের লালা।'

না, ঘরের এই পরিতৃপ্তিমধুর লীলার জগতে পৌঁছোতে পারে নি শ্রীকান্ত, রাস্তাও তাকে আশ্রয় দেয় নি। একবার মরীচিকা, একবার মরুদ্যানের বিরোধী হাতছানিতে প্রতারিত হতে হতে আত্মবিভক্ত শ্রীকান্ত নিজেরই ভেতরকার দুই বিপরীত সত্তার রক্তাঘাতের ভেতর নিজেকে আবিষ্কার করেছে এক অবসন্ন নিঃসঙ্গ ও রক্তাক্ত মানুষ হিসেবে। সে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'টু বি অর নট টু বি'-এর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হ্যামলেট—ঘর আর পারের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বপ্নে প্রতারিত এবং পতিত :

> 'ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
> পারে যারা যাবার গেছে পারে,
> ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
> সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
> ফুলের বার নেইকো আর ফসল যার ফলল না—
> চোখের জল ফেলতে হাসি পায়—
> দিনের আলো যার ফুরাল সাঁঝের আলো জ্বলল না,
> সেই এসেছে ঘাটের কিনারায়।
> ওরে আয়,
> আমায় নিয়ে যাবি কে রে
> বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।'

না, শ্রীকান্তকে নিয়ে যাবার কেউ নেই, ধরে রাখারও না। দুই বিরোধী আকর্ষণের ভেতর থেকে এখানেই তার ভেতরকার বেদনাবান ও উচ্চায়ত মানুষটির জন্ম। এখানেই সে সত্যিকার বড়, ইন্দ্রনাথের চাইতেও।

ইন্দ্রনাথ তীব্র, প্রখর, একরৈখিক। তার প্রিয় গঙ্গার হিংস্র উচ্ছ্রিত জলধারার মতোই সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষিপ্র এবং খরস্রোতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতার উজ্জ্বল সিন্ধু সারসের মতো তারও 'অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি।' নির্ভার বলেই সে এমন তীব্র এবং ক্ষুরধার হতে পেরেছে। বাইরের বা ভেতরকার কোনো ব্যাঘাত বা বিরোধ অতিক্রমের দায় থেকে সে প্রাকৃতিকভাবে মুক্ত। ঈশ্বরের মতোই সে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ম্ভূ এবং অবলীল। গভীরতাহীন বলেই এমন গতিমান, অসম্পূর্ণতর কারণেই এমন অবিশ্বাস্য। ক্ষুদ্র ও একপেশে শিল্পীদের মতোই সে তীব্র, উজ্জ্বল, মৌলিক ও ব্যতিক্রমী।

শ্রীকান্তের প্রকৃতি এসব জায়গায় ইন্দ্রনাথের থেকে অনেকটাই আলাদা। সে ইন্দ্রনাথের মতো জন্মবন্ধনহীন নয়—নয় বাস্তবের ব্যাপারে অচেতন, বোধহীন। কখনো বাস্তবের, কখনো সুদূরের আকর্ষণের ভেতর প্রোথিত এক বেদনাব্যথিত সত্তা সে। পরস্পরবিরোধী জীবনের মমতায় ও দায়িত্বে দ্বিমাত্রিক। এই দুই মাত্রার পরস্পরবিরোধী অভিঘাতে তার দ্বিমাত্রিকতা একসময় ত্রিমাত্রিক–বহুমাত্রিক হয়ে অজস্রমাত্রিক হয়ে যায়, সে আমাদের চোখে ধীরে ধীরে অতলান্ত হয়ে ওঠে।

আগেই দেখেছি, জন্মগতভাবে ইন্দ্রনাথ ভয় ও বাস্তবের বাইরে। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মানসিক বৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামের দরকার থেকে সে মুক্ত। কিন্তু বাস্তব সংসারের জন্যে আকুতি জন্মান্ধ বলে (বহির্মুখিতার দরকারে), শ্রীকান্তকে ঐসব মোহ অতিক্রম করে এগোতে হয়। আবার অতিক্রম করেও ঐ জান্তব আকুতির হাত থেকে তার নিষ্কৃতি মেলে না। ফিরে এলেও সুদূরচারী হৃদয়ের ক্রন্দন তাকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। জন্মপ্রকৃতির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ঐ প্রকৃতিকে খানিকটা জয় করে খানিকটা পরাজিত অবস্থায় তাকে এগোতে হয়। শ্রীকান্তের জীবন–পরিক্রমণ এজন্যেই হয়ে পড়ে ব্যাপকতর সংগ্রামের ইতিহাস।

এইখানেই সে হয়ে ওঠে আরও মানবিক এবং সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ক্রমবিকশিত হওয়া পূর্ণতর মানুষ। এইখানেই সে আপাত–বিস্ময়কর ও উপরতলসর্বস্ব ইন্দ্রনাথের একরৈখিক অসম্পূর্ণতার ওপরে, তার আপাত অসামান্যতার চাইতে বড়।

অন্নদাদিদির বাড়ির দিকে যাবার পথে শ্রীকান্তের মনে প্রশ্ন জেগেছিল : কে এই ইন্দ্রনাথ। সে কি মানুষ? পশু? না দেবতা? আমার ধারণা ইন্দ্রনাথ ঐ তিনেরই সমাহার। তবে দেবতা আর পশুই সে বেশি পরিমাণে, মানুষ কম অংশে। পশুর মতো দেবতাও একরৈখিক। যার ভেতর প্রকৃতির দ্বিমাত্রিকতা সপরিসরভাবে বিকশিত হয়েছে, আগেই বলেছি, সে শ্রীকান্ত। এইজন্যে শ্রীকান্ত শেষপর্যন্ত মানুষ—দেবতা ও পশু এই দুয়ের চেয়ে আলাদা এবং মিলিতভাবে উভয়ের চেয়ে বড়। বড় এ কারণে সে ইন্দ্রনাথের চাইতেও—তার দেবতা ও পশুর অনিন্দ্য ও আসুরিক শংকর–জন্মের চাইতেও। এইজন্যেই আপাতদৃষ্টিতে নক্ষত্রের মতো তুচ্ছ ও অনুজ্জ্বল কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ে রহস্যময় ও গভীর শ্রীকান্ত জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমাকে উপন্যাসের শেষ অব্দি ধারণ করে রাখে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ—তীব্র উজ্জ্বল ও প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্রকণা—উল্কার মতোই ক্ষণিকের প্রজ্জ্বলনে আকাশ ঝিকিয়ে, অবিমিশ্র অন্ধকারে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। যোগ্যতর নয় বলেই হারিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয় লেখকরা কি অলেখক?

১

বাংলাসাহিত্যে অনেক জনপ্রিয় লেখক এসেছেন, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের সমান জনপ্রিয় কেউ হন নি। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি দাবি করে। তাঁর যে-কোনো বই বেরোবার সাঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার কপি। আমাদের সাহিত্যের হতদরিদ্র প্রেক্ষাপটে এই সংখ্যা সত্যি সত্যি অবিশ্বাস্য। এদেশের একজন সেরা লেখকের একটি ভালো বইয়ের দেড় হাজার কপির সংস্করণ বিক্রি হতে যেখানে তিন থেকে চার বছর পার হয়ে যায় সেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারের এই সংখ্যা তাক লাগিয়ে দেবার মতো। কয়েক বছর আগে বাঙালি লেখকদের জনপ্রিয়তার ওপর পত্রিকায় একটা জরিপ বেরিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে পাঠকপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্র আজও বাঙালি লেখকদের শীর্ষে। বোঝা যায় জরিপটি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটের। যদি হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের বিক্রির খবর তাঁদের জানা থাকত তবে তাঁরা দেখতেন হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তার পাশে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা আজ অনেকখানিই ম্লান।

হুমায়ূন আহমেদের মতো অত জনপ্রিয় না হলেও বাংলাদেশে আরও কয়েকজন লেখক রয়েছেন যাঁদের জনপ্রিয় লেখকদের দলে ফেলে দেওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম আসবে তিনি ইমদাদুল হক মিলন। তাঁর বইয়ের কাটতি হুমায়ূন আহমেদের মতো অতবেশি না হলেও এই সাহিত্যের যে-কোনো খ্যাতিমান লেখকের তুলনায় বহুগুণ বেশি । বেরোতে-না-বেরোতেই তাঁর যে-কোনো বই পাঁচ-সাত হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তসলিমা নাসরিনের বইয়ের কাটতিও ছিল এমনি জমজমাট। হুমায়ুন আজাদ গভীরতাস্পর্শী লেখক, কিন্তু তিনিও জনপ্রিয়তার নেশায় কমবেশি আক্রান্ত (হয়তো সম্প্রতি ব্যাপারটিকে তিনি একজন লেখকের একটি প্রয়োজনীয় দিক বলেই মনে করছেন)।

এই লেখকরাই গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বইমেলাগুলোর যাবতীয় আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ক্রেতারা এঁদের বই কেনার জন্যেই দলে দলে মেলাতে ছুটে গিয়ে স্টলগুলোকে সরগরম করে, মেলা ঘুরে ব্যাগ ভর্তি করে সেসব কিনে স্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে, তারপর আড্ডায় আর গল্পগুজবের আসরে ওইসব বইয়ের মুখর আলোচনায় আসর মাতিয়ে জীবনকে বাসযোগ্য করে তোলে। মেলা বা বইবাজারে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকেরা এলে এঁদের ঘিরে পাঠকদের ভিড় জমে, স্বাক্ষর–শিকারিরা খাতা–কলম উঁচিয়ে এঁদের চারপাশে অশোভনভাবে হুড়োহুড়ি করে, পত্রপত্রিকার সাংবাদিকেরা মেলার নানান দিক সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানতে চান, অনেক পাঠকই এঁদের একবার চোখে দেখার ঘটনাকে জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য মনে করে গর্ববোধ করেন। মোটামুটি সারাদেশের প্রায় সবগুলো বইমেলাই আজ আসলে আয়োজিত হয় এঁদের বই বিক্রির জন্যেই। বাকি আর যেসব বই বিক্রি হয় তা নেহাতই উচ্ছিষ্ট হিসেবে, সাহিত্যবাজারের একধরনের বিরস ও বিরক্তিকর উপজাত হিসেবে, যেগুলোর বিক্রি হওয়া না–হওয়ার সঙ্গে জাতির নিয়তি, উত্থান–পতন বা ভালো–মন্দের কোনো সম্পর্ক নেই।

দেশের বইমেলা বা বইবাজারগুলোর মূল নায়ক আজ এইসব জনপ্রিয় লেখকরাই। এঁরাই আজ এদেশের প্রকাশনাজগতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নিয়ন্তা, এঁদের অঙ্গুলিহেলনেই নির্ধারিত হয় কোন্ প্রকাশক প্রকাশনা ব্যবসার শীর্ষে উঠবেন, কে অসাফল্যের অতলে হারিয়ে যাবেন। প্রকাশনা জগতের এঁরা যে কেবল নিয়ন্তা তাই নন, এঁরা আছেন, লিখছেন এবং তা বিপুল সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে বলেই হয়তো আমাদের দেশের প্রকাশনা এখনও জগৎ টিকে আছে। না হলে হয়তো এটি সত্যি আজ অনপনেয় অন্ধকারের শিকার হয়ে বসত। প্রকাশনা–ব্যবসার সঙ্গে যাঁরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন তাঁরা সবাই জানেন, বাংলাদেশের সৃজনশীল বই প্রকাশনার বিরাট কর্মকাণ্ডটি ব্যবসা হিসেবে আজও কতটা অলাভজনক।*

---

* প্রকাশনা আজও এদেশের গুটিকয় শিল্প–সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষের একটি ব্যয়বহুল শৌখিনতা মাত্র। বড় ধরনের লাভের কথা ভেবে এই ব্যবসায় কেউ আসেন না, এলেও সেই লাভ পান না। যদি এই ব্যবসা থেকে কেউ লাভ পানও সেটা এতই কম যে ওই মূলধনকে তাঁরা ব্যাংকে ফেলে রাখলেও হয়তো ওর কাছাকাছি লাভই পেতেন। যদি কেউ ভাবেন যে বই প্রকাশনা থেকে তাঁরা মোটামুটি লাভ করছেন তবে বুঝতে হবে তাঁরা এমন অনেক কিছুকে লাভ বলে গণনা করছেন ব্যবসার হিসেবে আসলে যেগুলো লোকসান। একটি মোটামুটি ভালো বইয়ের দেড় হাজার কপির একটি সংস্করণ বিক্রি হতে সময় লাগে প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর। বছরে শতকরা সাত–আট ভাগ মুদ্রাস্ফীতি ও মূলধনের বার্ষিক ব্যাংক সুদ (চক্রবৃদ্ধি হিসেবে বছরে অন্তত ২০%) গণায় ধরলে এই পাঁচ বছরে যে পরিমাণ টাকা লাভের অঙ্ক থেকে বাদ দিতে হয় তা দেওয়ার পর কী করে ওই ব্যবসায় লাভ থাকতে পারে তা আমার বোধে আসে না। আজও প্রকাশনা যে আমাদের দেশে ব্যবসা হিসেবে লাভজনক নয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ আমাদের দেশের বৃহত্তম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মুক্তধারা'র ধীর, নিঃশব্দ ও বেদনাদায়ক বিলুপ্তি। 'মুক্তধারা'র প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল আঠার শ। সংখ্যার দিক থেকে 'মুক্তধারা' ছিল এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থা। এর কর্ণধার ছিলেন আমাদের সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মবীর চিত্তরঞ্জন সাহা। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রেরণা থেকে জন্ম নেওয়া এই প্রতিষ্ঠানকে এই দেশপ্রেমিক ও আত্মোৎসর্গিত মানুষটি তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশের সমান করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশাল নোটবইয়ের প্রতিষ্ঠান পুঁথিঘরের সমস্ত টাকা তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। এর পরেও প্রচুর ব্যাংক ঋণ নিয়ে ও একসময় ওই ঋণে জর্জরিত হয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন তিনি, কিন্তু 'মুক্তধারা'কে বাঁচাতে পারেন নি। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের দেশে কী ভবিষ্যৎহীন আর নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে রয়েছে ব্যবসাটি । কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাংলাদেশের টাকায় বই ছেপে ইয়োরোপ বা আমেরিকার বাজারে সেগুলোকে ডলারে বেচতে পারে কিংবা বইয়ের দাম অন্য প্রকাশকদের তুলনায় মাত্রাতিরিক্তরকমে বেশি রেখে কয়েকটি চিহ্নিত ও লাভজনক মহলে বিক্রি করতে পারে তবে অবশ্য তার পক্ষে লাভ করা হয়তো সম্ভব। বস্তুত আমাদের দেশে এমন দু–একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছেও। কিন্তু আমি এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানকে 'বাংলাদেশী প্রকাশনা' বলতে চাইব না। এগুলোর লক্ষ্য বিদেশী ক্রেতা অথবা বাংলাদেশের একধরনের বিশিষ্ট ক্রেতা, দেশের জনগণ নয়। যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র বাংলাদেশের পাঠকদের জন্যে বই বের করে তাদের অবস্থা সত্যি সত্যি শোচনীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটামুটি দু ধরনের মানুষ আজ বাংলাদেশের বইয়ের প্রকাশনায় আসেন। এক, যাঁরা শিল্প-সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করাকে সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে গাঁটের টাকা ঢেলে এই কাজ চালিয়ে যান। দুই, যাঁদের গাঁটে অঢেল কালো বা শাদা পয়সা রয়েছে, ব্যবসাট্যবসা করার কথা ভাবছেন, বইয়ের ব্যবসাকে জাতে ওঠার সিঁড়ি মনে করে তা করার ব্যাপারে উৎসাহী হন তাঁরা। দুই ক্ষেত্রেই বৈধ-অবৈধ উৎস থেকে পাওয়া টাকা ভর্তুকি দিয়েই শেষপর্যন্ত তাঁদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হয়। না হলে ও থেকে যা আসে বা দুর্ভাগ্য আরও বেশি হলে যে নিঃশব্দ ও অলক্ষ্য লোকসান বয়ে বেড়াতে হয় তা উজিয়ে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে এই ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। যাঁরা এই ব্যবসা করেন তাঁরা একধরনের মানসিক পরিতৃপ্তি বা আনন্দের জন্যেই এই ব্যবসা করেন, লাভের জন্যে নয়। যাঁরা ছোট ব্যবসায়ী তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত শ্রমের আর্থিক মূল্যকে ব্যয়ের খাতা থেকে বাদ দেন বলেই এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের সৃজনশীল এবং উন্নতমানের বইয়ের প্রকাশনা হয়তো ধুঁকে ধুঁকে কোনোমতে টিকে থাকত, কিন্তু একে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই জনপ্রিয় লেখকেরা। বই ব্যবসার অঙ্গনে এঁদের বই চাঙাভাব সৃষ্টি করে রাখতে পেরেছে বলেই এটা সম্ভব হতে পারছে। একজন প্রকাশক যদি বছরে হুমায়ূন আহমেদের একটি বা দুটি বই বের করে বসতে পারেন (কেউ কেউ তা করেনও) তবে তা থেকে তিনি যে-পরিমাণ বাড়তি মুনাফা পান তা দিয়ে ফেলে ছড়িয়েও তিনি আট-দশটা ভালো মানের গুরুত্বপূর্ণ বই বের করার ঝুঁকি নিতে পারেন। আমাদের দেশের সৃজনশীল ও উন্নতমানের বইয়ের প্রধান অংশটা সত্যি সত্যি বেরোচ্ছেও এভাবেই, এখানকার জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ের জমজমাট কাটতির উপজাত হিসেবে। আজ বাংলাদেশে যে এত বিপুল সংখ্যায় শিল্প-সাহিত্য, সমাজ বা বিজ্ঞানের বই বের হতে পারছে তার অনেকটাই এইসব লেখকদের বিপুল পাঠকপ্রিয়তার কাছে ঋণী।

২

বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় লেখকদের এই ধারা খুব বেশিদিনের নয়। আজকে আমরা জনপ্রিয় লেখক বলতে যাঁদের বুঝি সে-ধরনের লেখক উনিশ শতকে ছিল না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ—আজকের অর্থে এঁদের কেউই ঠিক জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। উনিশ শতকের মধ্যবিত্তের মতো সেকালের পাঠকসংখ্যাও ছিল সীমিত। তা ছাড়া বইয়ের দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশি ছিল বলে বইয়ের ক্রেতা ছিল হাতে গোনা। তাই লেখক খুব বেশিরকম শক্তিশালী না হলে তাঁর বই প্রকাশিত হওয়া বা হলেও সে বইয়ের ক্রেতা পাওয়া সম্ভব হত না। যাঁরা খুবই জনপ্রিয় হতেন তাঁদের বইয়েরও কাটতির একটা সীমা থাকত। বঙ্কিম বা ডি.এল. রায়ের লেখা সেকালে খুবই পাঠকপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু তাঁদের বইয়ের কাটতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুতেই আজকের জনপ্রিয় লেখকদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সেকালের একজন ভালো লেখকের বইয়ের কাটতি কী পর্যায়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি শোনালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। কোনো একটা বইয়ের (বইটার নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না) প্রকাশের আগে তিনি প্রেসের লোকদের বলেছিলেন : বইটার কাটতি একটু বেশিই হবে হে, শ তিনেক কপির কম ছাপা ঠিক হবে না।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই অবস্থার বড় ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ এই সময়ে যেমন আকারে আয়তনে বড়সড় হয়ে ওঠে, তেমনি মুদ্রণ-প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে বই আর পত্রপত্রিকা সাধারণ পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার ভেতর এসে পড়তে শুরু করে। ফলে বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা হয়ে পড়ে আগের চাইতে অনেক পরিব্যাপ্ত ও বিশাল। উন্নতমানের বইয়ের পাশাপাশি নানা ধরনের হালকা ও মুখরোচক বইয়ের চাহিদা বেড়ে যায়, এবং গুরুগম্ভীর লেখাওয়ালা মাসিক পত্রিকার পাশাপাশি নানা ধরনের বিচিত্র ও রমণীয় লেখায় ভরা একধরনের স্বাদু ও রম্য পত্রিকা বিপুলভাবে পাঠকদের মনকে আকর্ষণ করতে শুরু করে।

বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র জেগে উঠেছিলেন এই পটভূমি থেকেই। জনপ্রিয় লেখক বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে বাংলাসাহিত্যের প্রথম জনপ্রিয় লেখক তিনিই। সাহিত্য পড়াশোনার এই প্রসারিত পরিবেশ যে কেবল শরৎচন্দ্রের মতো একজন বিপুল জনপ্রিয় লেখকেরই জন্ম দিয়েছিল তাই নয়, এই পরিবেশ লেখকদের ভেতর আপামর জনসাধারণের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছোনোর এমন একটা প্রেরণা স্ফুরিত করে তুলেছিল যে সারা বাংলাসাহিত্যের ভেতরেই তা একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। বাংলা গদ্য উনিশ শতকী গুরুগম্ভীর চাল ছেড়ে সহজ প্রাঞ্জল ও জনমুখী চেহারা নিতে শুরু করেছিল। কথাসাহিত্যে সামন্ত ও উচ্চবিত্তদের বদলে আপামর মানুষের—এই কথাসাহিত্যের পাঠকদের—জীবন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল আসল উপজীব্য, জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাস সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছিল । এমনকি সবুজপত্রের যুগে সাধুভাষাকে সরিয়ে চলিত ভাষা চালুর যে অবিরাম জেহাদ প্রমথ চৌধুরী চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তার অন্তঃস্রোতেও হয়তো এই গণমুখিতার চেতনাই ছিল মূল প্রেরণা ও আসল চালিকাশক্তি।

এই সময় থেকেই মোটামুটিভাবে বাংলাভাষার জনপ্রিয় লেখকদের যুগ। জনপ্রিয় লেখক মানে বিপুলসংখ্যক পাঠকনন্দিত লেখকদের যুগ—যে লেখক সাহিত্যজগতের বিদগ্ধ ও রুচিশীল পাঠককে তৃপ্ত করতে পারুন আর নাই পারুন, বিপুল ও সাধারণ পাঠকসম্প্রদায়ের মনকে আনন্দে ও সজীবতায় তৃপ্ত করতে পারেন, তাঁর লেখার আকর্ষণকে তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারেন—তাঁদের যুগ। এককথায় জনপ্রিয় লেখক বলতে বোঝাতে শুরু করে তাঁদেরকেই, যাঁদের প্রতিটি বই বেরোবার খবর হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে হইচই পড়ে যাবে, বই কিনতে পাঠককে দোকানের সামনে কিউতে দাঁড়াতে হবে, তারপর পাগলের মতো একনিশ্বাসে বইটি পড়া শেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের বইয়ে লেখক কী নিয়ে আসছেন তার জন্য উন্মুখ ও প্রতীক্ষাতুর সময় কাটাতে হবে। একসময় এটা ছিল ইয়োরোপ আমেরিকার লেখকদের গল্প, এই সময় থেকে সে গল্প হয়ে উঠতে থাকে আমাদের লেখকদের ।

শরৎচন্দ্রের পর এই শতকে যিনি এই ধরনের জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি সৈয়দ মুজতবা আলী। এক দশক আগে পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি বইয়ের ইনারে ছাপা থাকত এ পর্যন্ত সেটির কতগুলো সংস্করণ বেরিয়েছে এবং প্রতিটি সংস্করণ কত কপি করে ছাপা হয়েছে। এসব তুলে ধরা হত বইটির জনপ্রিয়তার পরিমাণ বোঝানোর জন্যে, যাতে পাঠকেরা তার গুরুত্ব টের পায় ও বইটি কেনার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আজও যে তাঁর এই জনপ্রিয়তা খুব একটা কমেছে তা মনে হয় না। মুজতবা আলীর পাশাপাশি সে সময়ে আর একজন লেখক অসম্ভব জনপ্রিয়তাকে ছুঁয়েছিলেন, তিনি যাযাবর। চল্লিশের দশকে তাঁর লেখা 'দৃষ্টিপাতে' তাঁর ঝরঝরে চৌকশ ও দ্যুতিময় গদ্য সেকালের পাঠকের চোখে অনাস্বাদিত নতুনত্বের বিস্ময় ফুটিয়েছিল।

এঁদের পরের গত পঞ্চাশ বছরের পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য জনপ্রিয় লেখকে কমবেশি ভরা। অবধূত, জরাসন্ধ, বিমল মিত্র, শঙ্কর, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—এঁদের প্রায় সবাইকে কমবেশি জনপ্রিয় লেখকদের দলে ফেলা যায়। একালে লেখক হতে গেলে তাকে কমবেশি জনপ্রিয় হতেই হয়, না হলে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলাসাহিত্যে কালজয়ী লেখকের পদপাত ঘটে নি বললেই চলে। এই সময়ের প্রায় সবটা জুড়েই এইসব জনপ্রিয় লেখকের রাজত্ব। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক এবং খ্যাতিমান অলেখক মোটামুটি এঁরাই।

৩

একজন জনপ্রিয় লেখক, সব সমাজের মতোই, আমাদের সমাজেও একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন মানুষ। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সার্বক্ষণিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি। তাঁর লেখা সবার হাতে হাতে আবর্তিত—পঠিত ও আলোচিত। (দেশের সবার অভিনন্দনের তিনি মধ্যমণি, সবার পরিচিত ও প্রিয়।) তাঁর চেয়ে বহুগুণ শক্তিধর লেখকদের চেয়েও তিনি জনসাধারণের কাছে বেশি পরিচিত এবং তাদের কাছে সাহিত্যজগতের ওইসব ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তায় ঘাবড়ে গিয়ে সাধারণ পাঠকদের অনেকেই তাঁকে তাঁর চেয়ে অসঙ্গত মাপের বড় লেখক ভেবে বসেন, ঠিক যেভাবে বিদেশ থেকে বাংলাদেশ দেখতে আসা কোনো পর্যটক ঢাকার সুবিশাল মানিক মিঞা অ্যাভিনিউ দেখে মানিক মিঞাকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মনে করে বসতে পারেন। তাঁর জনপ্রিয়তার এই বিপুল প্রতিপত্তি শক্তিমান লেখকদেরও অনেকসময় এতদূর বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করে দিতে পারে যে তাঁরাও তাঁকে 'সাহিত্য-শিল্পী' ভাবতে শুরু করতে পারেন এবং দেশের কর্ণধারদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা-সংস্কৃতির মান আমাদের দেশের মতো হলে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার এমনকি একুশে পদকের মতো জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে বসতে পারেন। এর কিছু প্রমাণও আছে আমাদের দেশে। একালে টেলিভিশনের নন্দিত তারকারা জনসাধারণের হৃদয়ে যে ভালোবাসার জায়গায় আসীন, তাঁদের জায়গা, লিখিত মাধ্যমে কাজ করেন বলে, তাঁদের চেয়ে খানিকটা সীমিত হলেও গুরুত্বে এবং প্রভাবের দিক থেকে অনেক বেশি। দেশের সবার কাছে গ্রহণীয়, প্রিয় ও সম্মানিত মানুষ তাঁরা।

পৃথিবীতে ভাষা উদ্ভাবনের ফলে জন্ম হয়েছিল লেখকের, একালের শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির অভাবিত বিকাশের ফলে জন্ম হয়েছে 'জনপ্রিয় লেখকের'। পৃথিবীর সব দেশের মতো আমাদের দেশেও এটা ঘটেছে। ইয়োরোপে এটা শুরু হয়েছে উনিশ শতক থেকে, বাংলাসাহিত্যে এই শতকের শুরু থেকে, বাংলাদেশের সাহিত্যে গত আশির দশক থেকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অপ্রতিহত বিস্তৃতির ফলেই এ ব্যাপারটা ঘটেছে। সবাই জনপ্রিয় লেখক হন না, কেউ কেউ হন। শেষপর্যন্ত সাফল্য আসে কেবল হাতে গোনা দু-একজনেরই। এক বিশেষ ধরনের গুণপনা ছাড়া এ সাফল্য সম্ভব নয়। এই গুণগুলো কী তা নিয়ে কিছুটা কথা বলা যেতে পারে।

এর আগে যে কজন জনপ্রিয় লেখকের নাম আমি উল্লেখ করেছি একটা জায়গায় তাঁদের মধ্যে মিল লক্ষ করার মতো : তাঁরা প্রায় সবাই ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের যতগুলো পরিচিত আঙ্গিক রয়েছে, উপন্যাসই তার মধ্যে সবচেয়ে পাঠকপ্রিয়, রুচিকর ও রমণীয়। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বিচিত্র রগরগে কাহিনীর ভেতর দিয়ে গা-এলিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় উপন্যাস, পাঠকের চিন্তাশক্তির ওপর খুব একটা চাপ না দিয়ে। উৎকণ্ঠা, সাসপেন্স, নাটকীয়তা, ভয়-বিস্ময় বা সুখ-দুঃখের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে খোশগল্পের মেজাজে তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তাই উপন্যাস পড়ার একটা আলাদা আমেজ আছে। উপন্যাসের এই অনায়াস এবং মচমচে স্বাদের কারণেই একালের হালকা মেজাজি ও গড়পড়তা পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কাজেই একজন জনপ্রিয় লেখক যাঁর বই প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কপি বিক্রি হবে তাঁর ঔপন্যাসিক না হয়ে প্রায় কোনো উপায়ই নেই। কবিতার মতো একটি পরিস্রুত শিল্পমাধ্যম, ঘননিবদ্ধ নাটক, মননধর্মী ছোটগল্প বা প্রবন্ধ—এদের কারো পক্ষেই উপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার শক্তি নেই।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে আমাদের দেশের সবখানে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুল ও সুকান্তের নিয়মিত জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। এঁদের সমকক্ষ লেখক--বিশেষ করে নজরুল বা সুকান্তের সমকক্ষ বা তাঁদের চেয়ে বড় বা প্রতিভাধর মানুষ যে এই জাতির মধ্যে নেই তা নয়—যাঁদের জন্মদিন একইরকম বা এঁদের চেয়েও অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হওয়া উচিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, জীবনানন্দ, মানিক, তারাশঙ্কর—এমনি আরও অনেক লেখকই হয়তো রয়েছেন এঁদের দলে। কিন্তু এঁদের জন্মজয়ন্তী তেমন ঘটা করে অয়োজিত হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, অধিকাংশ সময় আদৌ পালিত হয় না! পক্ষান্তরে ঐ তিনজন লেখকের জন্মবার্ষিকী পালিত হয় অবিশ্বাস্য বর্ণাঢ্যভাবে। (কেবল বর্ণাঢ্যভাবেই নয়, জন্মজয়ন্তী উদযাপনের বাজারে তাঁদের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া।) কেন তাঁদর ভাগ্যের শিকে এভাবে ছিঁড়েছে? এর কারণ সোজা। এমন কিছু জননন্দিত কবিতা বা গান এঁরা লিখেছেন যা দিয়ে বিপুলসংখ্যক দর্শককে মনোরঞ্জন করার মতো নাচে-গানে-আবৃত্তিতে সরগরম একটি জমজমাট ও প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব। জন্মজয়ন্তীর বেলায় কবিতা ও গানের যে ভূমিকা, জনপ্রিয় লেখকদের বেলায় উপন্যাসের ভূমিকা তাই। উপন্যাস-রচয়িতা না হয়ে জনপ্রিয় লেখক হওয়া কঠিন।

কাজেই জনপ্রিয় লেখক মানে মোটামুটিভাবে উপন্যাসের লেখক। তবে উপন্যাস ছাড়াও হালকা চালের রম্যরচনাকারেরাও অনেক সময় জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠতে পারেন। গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে মুজতবা আলী বা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এর উদাহরণ।

কিন্তু উপন্যাস বা রম্যরচনা হলেই যে তা জনপ্রিয় হতে পারবে তা নয়। এক বিশেষ ধরনের চরিত্রসম্পন্ন লেখাই কেবল সবধরনের পাঠকসম্প্রদায়ের দ্বারা সর্বজনীনভাবে আদরণীয়। জনপ্রিয় লেখার—তা সে উপন্যাস, রম্যরচনা বা অন্য যে-কোনো সাহিত্য-মাধ্যমের বই হোক না কেন, তার ভেতর সবচেয়ে বড় যে গুণটি থাকতেই হবে তা হল প্রাঞ্জলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। সে লেখাকে হতে হবে তাজা হাওয়ার মতো ফুরফুরে আর স্বাস্থ্যকর। তরতরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাকে। পাঠকের মনের ভেতর পৌঁছোতে হবে অনায়াসে। পড়ার প্রতিটি মুহূর্তে তার মনকে এক রম্য উৎসাহ আর চনচনে অনুভূতিতে সজীব করে রাখতে হবে। প্রাঞ্জলতা এমন এক গুণ যা যে- কোনো লেখাকে সহজেই পাঠকপ্রিয় করে তুলতে পারে এবং সামান্য পুঁজি নিয়েও পাঠকবাজারে তার ভালো ব্যবসার সুবিধা করে দিতে পারে।

লেখা জনপ্রিয় হবার জন্যে প্রাঞ্জলতার পাশাপাশি যে-গুণটি থাকা লেখার জন্যে খুবই জরুরি তা হল বিনোদন বা রম্যতার গুণ। লেখক নানাভাবে লেখার শরীরে এই রম্যতার আমেজ বুলিয়ে যেতে পারেন। যেসব ভাবে তা হতে পারে তার একটি হল বিরতিহীনভাবে কৌতুকরসের যোগান দিয়ে যাওয়া। লাইনে লাইনে পাঠকের মনকে কৌতুকের উষ্ণ তপ্ত রসে উচ্চকিত করে রাখতে পারলে সেই লেখার জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে যায়। মুজতবা আলী, শিবরাম বা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যে এতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছেন তার মূলে আছে কৌতুকরসের এমনি এক অফুরন্ত ও বিরতিহীন প্রস্রবণ। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তার অর্ধেকের বেশি, আমার ধারণা, এই হাস্যরসের কাছে ঋণী। কেবল এঁরা নয়, বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের কয়েকজনের—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের লেখা যে এমন আস্বাদ্য, প্রসাদগুণসম্পন্ন ও সম্পন্নতাময় হতে পেরেছে তার অনেকটাই এই কৌতুকরসের আনুকূল্যেই, যদিও এঁদের কৌতুকরসের গুণগত মান আগের লেখকদের চেয়ে অনেক উঁচুমানের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমের অগভীর ফেনিল আবেগ–উচ্ছ্বাস, বিশেষ করে প্রথম যৌবনের মিষ্টি রঙিন প্রেম, এর অপার্থিব সুখ ও অকথ্য যন্ত্রণা, এর সুনীল স্বপ্নজগৎ ও নরম কোমল আবেশ আপামর পাঠকের খুবই প্রিয় জিনিস। একে পুঁজি করে একজন পাঠকের পক্ষে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব। বড় বা ভালো লেখকদের মধ্যে গ্যেটের 'ভের্টর', এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'তিন বন্ধু', স্টিফেন ৎসোয়াইগের 'প্রিয়তমাসু' এই ধরনের আবেগকে পুঁজি করে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী', ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'চিতা বহ্নিমান' এ ধরনের সাফল্যের উদাহরণ। আরো সাধারণ মাপের লেখকেরাও এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে বইয়ের কাটতির ব্যাপারে বিপুল লাভবান হয়ে যেতে পারেন। ইমদাদুল হক মিলনের বইয়ের কাটতির মূলে বেশ খানিকটাই রয়েছে এই ধরনের প্রেমের পেলব ও শিশিরস্নিগ্ধ আবেশ। কেবল উপন্যাস নয়, কবিতাতেও প্রেমের এই কোমল মেদুর আমেজ একজন কবিকে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে দিতে পারে। সাম্প্রতিক কালে মহাদেব সাহার কবিতা এর সুন্দর উদাহরণ। কবি হয়েও ইদানীংকার বইমেলাগুলোয় তাঁর নাম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের নামের পাশাপাশি উচ্চারিত হচ্ছে।

সমকালীন জীবন ও রাজনীতির তরতাজা উত্তেজনা ও উত্তাপকে তুলে ধরতে পারলে একটা বইয়ের পক্ষে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়ে যাওয়া সম্ভব। রগরগে যৌনতার সহযোগ যে অনেক উপন্যাসকে 'সর্বোচ্চ বিক্রীত' বইয়ের সৌভাগ্য দিতে পারে তার উদাহরণ সারা পৃথিবীতে অবিরল।

৪

কী কী গুণ থাকলে একজন লেখক জনপ্রিয় হন তা ছোট্ট করে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করলাম। এখন প্রশ্ন : এই গুণগুলো আয়ত্ত করতে পারলে একজন লেখক জনপ্রিয়তার শিরোপা পাবেন ঠিকই, কিন্তু 'লেখক' পদবাচ্য হয়ে উঠবেন কি? তাঁকে কি আমরা 'শিল্পী' হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারব—যে শিল্পী সময়ের করাল ঢেউ অতিক্রম করে দীর্ঘায়ু পাবেন। আমি জানি, অনেকেই তা করতে চাইবেন না। কেন চাইবেন না, একটা উদাহরণ দিয়ে তা বলার চেষ্টা করি। হুমায়ূন আহমেদ কেবল বাংলাদেশ নয়, বাংলা সাহিত্যের এযাবৎকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। পাঠকপ্রিয়তা বা বইয়ের কাটতির দিক থেকে তাঁর অবস্থান আজ তুঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে আমি লক্ষ করেছি, এমন বিপুল জননন্দিত লেখক হবার পরও প্রায় কোনো ভালো লেখক বা পাঠকই তাঁকে 'লেখক' মনে করেন না। করলেও খুবই সাধারণ মাপের লেখক মনে করেন। মনে করেন, এমন একজন গড়পড়তা লেখক বলে তিনি নামহীন পরিচয়হীন আর দশটা সাহিত্যকর্মীর মতো কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্যের জগৎ থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাবেন। কেন এমনটা হবে? তা হলে কি জনপ্রিয়তার গুণ আর লেখকের গুণ আলাদা? নাকি জনপ্রিয়তার গুণগুলো এমন একটা জিনিস যা একজন সত্যিকার লেখকের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমবেশি থাকলেও তাঁর মধ্যে থাকতে হয় এর অতিরিক্ত কিছু, শিল্প ও জীবনবোধের কিছু বাড়তি সম্পদ—যা না থাকলে তিনি ঠিক শিল্পী হয়ে ওঠেন না?

হুমায়ূন আহমেদের ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহল হওয়ায় আমি কয়েকজন সাধারণ পাঠককে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁরা হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়েন কেন। তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, ভালো লাগে তাই। কথাটার মানে একটাই : তাঁর লেখা সুখকর, পড়লে আনন্দ পাওয়া যায়। এখানে যে-গুণটির ওপর জোর পড়েছে তা হল এর স্বাদুতা বা রম্যতা, যা এর শরীরময় প্রাণবাণ রয়েছে বলে সাধারণ পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে। ব্যাপারটাকে আরও একটু খতিয়ে দেখার জন্যে আমি কয়েকজন বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ-তরুণীকে এর কাছাকাছি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম, ওই লেখককে তাদের কেন ভালো লাগে। অনেকেই উত্তর দিয়েছিল : পড়ার পরে মনে থাকে না, কিন্তু পড়ার সময় ভালো লাগে। উত্তরটার মধ্যে হুমায়ূনের লেখার একটা সরল মূল্যায়ন আছে। সেটা হল : এই লেখা খুশি করে কিন্তু কিছু দেয় না। এর মানে একটাই : এই লেখা বিনোদন দেয় কিন্তু জীবনকে জোরালোভাবে কামড়ে ধরে না, এমন ভালো বা বড়কিছু উপহার দেয় না যা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনকে দীর্ঘমেয়াদে কৃতজ্ঞ করবে। মূল্যায়নটার মধ্যে জনপ্রিয় লেখকদের একটা মোটামুটি চেহারাও ফুটে ওঠে। তা হল, এঁদের লেখায় বড় বা স্থায়ী কিছু না থাকলেও একধরনের বিনোদন থাকে, যে বিনোদন মচমচে ও স্বাদু, যা অপ্রতিহত আকর্ষণে পাঠককে তার দিকে টেনে নেয় এবং এক ঝাঁজালো সম্মোহনের ভেতর তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বিনোদন একজন 'জনপ্রিয়' লেখকের মূল ও হয়তো একমাত্র সম্পত্তি।

এ থেকে কেউ যেন এমন কথা ভেবে না নেন যে বিনোদন কেবল জনপ্রিয় লেখকদের একলার সম্পত্তি। এই বিনোদন বড় লেখকদেরও একইরকম দরকার। কেবল বড় লেখক নয়, কাউকে লেখক নামের যোগ্য হতে গেলে প্রথম যে উপাদানটি তাঁর ভেতর ন্যূনতমভাবে থাকতেই হয় তার নামও বিনোদন। এ না হলে তা আর যাই হোক লেখা হয়ে ওঠে না। কেবল লেখা নয়; চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য এমনি যে শিল্পের কথাই আমরা ধরি না কেন এদেরও প্রথম ও অব্যাহতিহীন উপাদান হল বিনোদন—শিল্পে যার অন্য নাম লাবণ্য।

পাঠকের বা দর্শকের মনে খুশি বা আনন্দের আবেগ জাগিয়ে তুলতে না পারলে তা শিল্পের পর্যায়ে উঠে আসে না। এটুকু পারতেই হয় একজন শিল্পীকে, পাঠকের মনকে তাঁর কথা গ্রহণ করতে পারার মতো উপযোগী, উন্মুখ ও প্রসন্ন করে তুলতেই হয়। না হলে তাঁর বক্তব্য পাঠকের নিস্পৃহ হৃদয়ে তিনি কিছুতেই সপ্রাণভাবে পৌঁছে দিতে পারেন না। তাই বিনোদন হল শিল্পের সেই সোনালি দরজা যার ভেতর দিয়ে শিল্পের বক্তব্য পাঠকের হৃদয়ে আনন্দমধুর অভ্যর্থনায় অভিষিক্ত হয়, আনন্দোজ্জ্বলতার ভেতর দিয়ে গৃহীত হয়। না হলে তা পাঠকের হৃদয়ের পাশে মাথা কুটে পড়ে থাকে। রামায়ণ, মহাভারত, শাহনামা বা ইলিয়ডের মতো মহাকাব্য;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেক্সপিয়ার, সোফোক্লিস বা ইবসেনের নাটক; বা টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি ও সার্ভেন্টিসের উপন্যাসগুলোতে মানব-উপলব্ধির অনেক উঁচু ও উত্তুঙ্গ শিখরকে স্পর্শ করার পরও যে মানবসম্প্রদায়ের হৃদয়কে আজ পর্যন্ত এমনভাবে নন্দিত ও সম্মোহিত করে রাখতে পেরেছে তার কারণ এদের ভেতরকার অসাধারণ বিনোদনের শক্তি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও বিনোদন বলতে কৌতুকরসের বা কাঁচা প্রেমের জোলো ও চটুল অবতারণা বোঝেন। আসলে বিনোদন এমন কোনো সীমিত জিনিস নয়। সংস্কৃত নন্দনতাত্ত্বিকেরা শিল্পের যে আনন্দময় দেহকান্তির কল্পনা করেছেন এই বিনোদন তার অন্তরের সম্পন্ন ও অনিন্দ্য নাম। যে নটি রসের কথা তাঁরা বলেছেন, কোনো লেখার মধ্যে তার যে-কোনো একটি বা একাধিক রস সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে আমাদের মনে আনন্দময় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারলেই তা শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ। এ রম্যতা কেবল কৌতুকরসের রম্যতা নয়, রসমাত্রেরই রম্যতা। ভয়ের ঘটনা বা আবেগও শিল্পিতভাবে রূপায়িত হলে তা আমাদের মনে পুলকের অনুভূতি বয়ে আনে ; যেহেতু আমরা জানি এ ভয় প্রকৃত ভয় নয়, ঐ ভয় বা বিভীষিকার ত্রাসজাগানো মুখচ্ছদ মনে আতঙ্ক জাগালেও এ আসলে শিল্পের ভয়, জাগতিক ভয়ের সৌন্দর্যায়িত ও রমণীয় অনুকরণ মাত্র। এজন্যে শিল্পের ভয় দেখে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দূরে পালিয়ে যাই না, বরং সেই ভয়কে আরও বেশি করে খুঁজে বেড়াই, সেই ভয়কে ভয় পেতে ভালোবাসি। শিল্পের বিরহের প্রসন্নতার ভেতর থেকে কবি তাই অনায়াসেই বলতে পারেন : 'বিরহ মধুর হল আজি'। বাস্তব জগতের যে ক্রোধ আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে, শিল্পের ভেতর সেই ভয়াবহ ক্রোধের দৃশ্যই আমাদের কাছে প্রিয় ও কাম্য হয়ে ওঠে; সেই ক্রোধ ফিরে ফিরে দেখার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে পড়ি। শিল্পের ভেতর আনন্দের এই অবারিত সরবরাহ থাকে বলেই এমনটা হতে পারে।

আবারো বলি, এই বিনোদন—পাঠকহৃদয়কে আনন্দিত বা বিনোদিত করার এই গুণ—থাকতেই হবে শিল্পের মধ্যে, না হলে তা শিল্প হবে না; পাঠক বা দর্শকের মনে আনন্দের মাধুরীপ্রবাহ জাগিয়ে তার হৃদয়জগতে লেখক তাঁর গভীর উপলব্ধিগুলোকে কিছুতেই রক্তকণিকার অনন্যসম্পদ করে তুলতে পারবেন না। ইডিপাস নাটকটার উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পষ্ট করার চেষ্টা করি। সাধারণ পাঠক বা দর্শককে পুরোপুরি হতাশ ও বিরক্ত করে তোলার মতো রসকষহীন নাটক একটা। শস্তা জনপ্রিয়তার উপাসকেরা একে নিশ্চয়ই সাহিত্য হিসেবে পুরোপুরি খারিজ করেই দিতে চাইবেন। নাটকটায় না আছে একটা হাসির কথা, না আছে সুদর্শন নায়ক বা সুন্দরী নায়িকা, না হৃদয়মাতানো প্রেমের সংলাপ, না অন্যকিছু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল রয়েছে একটা অনিবার্য সর্বনাশের দিকে গম্ভীর ভয়ংকর শ্বাসরুদ্ধকর যাত্রা। তবু ভয়, ক্রোধ, বীরত্ব, দুঃখ এসব আবেগ এখানে এমন মনোরমভাবে চিত্রিত হয়েছে; কাহিনীর জটিল গ্রন্থি এমন অলৌকিক বিস্ময়ময়তায় উদ্ঘাটিত হয়েছে; শ্বাসরুদ্ধকর সাসপেন্সের পথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে কাহিনী আমাদেরকে পুরো ঘটনাটার সঙ্গে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে রেখেছে যে তা থেকে চোখ ফেরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বীরত্ব, শোক, ক্রোধ, ভয় এখানে আনন্দময় পরিণতির ভেতর এগিয়ে গেছে। এই ঊর্ধ্বশ্বাস নাটকীয়তা, সম্মোহন আর সুতীব্র গতিপ্রবাহ—যা আমাদেরকে আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠার তীব্র ঝোড়ো পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলে তা-ই এর বিনোদন। এই আনন্দ আছে বলেই না আমরা বইটার ভেতর অমন আমুণ্ডুপদনখ সেঁধিয়ে থাকি, কাহিনীর প্রতিটি উন্মোচনকে অমন অপলক আর নিরুদ্ধভাবে অনুসরণ করে যাই। না হলে কি নিয়তিপ্রতাপিত এমন একটা গম্ভীর করুণ আর ভয়ংকর কাহিনী আমাদের এমনভাবে মত্ত করে রাখতে পারত?

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় যদি অমন বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্র আর দ্যুতিময় ভাষার ঐশ্বর্য না থাকত; না থাকত হীরের টুকরোর মতো শব্দের আর জীবনোপলব্ধির উজ্জ্বল সম্ভার, অপরূপ কবিত্ব, গল্প রচনার অমন অনবদ্য চাতুর্য বা প্রেমের অপার্থিব তাজমহল; তবে আমরা কি ওই বইয়ের গাঢ় আত্মোপলব্ধির মধ্যে ওভাবে উন্মুখ হতাম। সাহিত্য ছোট-বড় যাই হোক না কেন, তার মধ্যে এই মনকাড়া বিনোদন-মাধুরী, এই অনবদ্য আনন্দ-ঝোরা থাকতে হবেই; না হলে তার প্রাণ আমাদের রক্তে রক্তে নেচে বেড়াবে না। নানান সময় আমি এমন বেশকিছু চিত্রনির্মাতাকে দেখেছি যাঁদের ছবিতে আনন্দ বা মাধুর্যের অভাব এমনই প্রকট যে তা দেখতে গেলে দর্শকের মাথা ধরে ওঠে, কপালের শিরা দপদপ করে, বিরক্তিতে ক্লান্তিতে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে, অথচ শিল্পীর কাছে ব্যাপারটা তুলতে গেলে তিনি চোখ রাঙিয়ে পষ্ট জানিয়ে দেন : 'এসব হল গিয়ে আর্ট ফিল্ম, যার-তার জন্যে এসব নয়।' কিন্তু যে ছবি দর্শকের মনকে ভোলাতে বা খুশিই করতে পারল না, তার ভালোবাসা বা আনন্দের জিনিস হয়ে উঠল না, অমন দিগ্বিজয়ী আর্ট ফিল্ম হয়ে তার যে কী লাভ হল, তা বোঝা সত্যি কঠিন।

৫

সব জনপ্রিয় লেখকের মধ্যে এই বিনোদনের গুণটি বেশ ভালোরকমভাবেই আছে, তা না হলে তাঁরা এত বিপুলভাবে আদৃত হতেন না। গুণ আছে বলেই তাঁরা সবার মনোযোগের ব্যাপার হয়েছেন। তবু মনে রাখতে হবে এ গুণটি একজন লেখকের খুবই প্রাথমিক একটি গুণ মাত্র। ভালো লেখক হবার জন্যে শিল্পের আরও অসংখ্য রহস্যময় ও দুর্লঙ্ঘ্য পুলসিরাত পার হতে হয় তাঁকে। শিল্পসৌকর্যের কুটিল জটিল জগতের ওপর সহজ অধিকার থাকার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে থাকতে হয় গভীর ও ব্যাপ্ত একটি উপলব্ধিজগৎ, যেসব দিয়ে নির্ধারিত হয় তিনি কোন্ মাপের লেখক বা তাঁর শিল্পসিদ্ধি কোন্ মাপের। শিল্পের এই উপলব্ধিজগৎ বা বিষয়গত দিকটি শিল্পের একটি অত্যন্ত জরুরি জিনিস। একজন শিল্পী শিল্পের কারুকার্যময় রহস্যজগতের ওপর কতটা অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে পারলেন তা বলে দেয় তার শিল্পপ্রতিভা কতখানি, কিন্তু তাঁর ভেতরকার উপলব্ধিজগৎটি সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলে দেয় 'শিল্পী' হিসেবে তিনি কোন্ মাপের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন শিল্পীর এই উপলব্ধিজগৎটি কী, এবার তাই নিয়ে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করি।

কোনো একটি পাঠচক্র কার্যক্রমে শিক্ষকতা করতে গিয়ে কলেজের একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বেশকিছু উন্নতমানের বই পড়াতে হয় আমাকে। বইগুলো নিয়ে আমি অনেকবারই তাদের প্রশ্ন করেছি। বলেছি ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত তারা যে–ধরনের বই পড়েছে তা থেকে এই বইগুলো খানিকটা আলাদা কি না। প্রতিবারই আমার কথা কেড়ে নিয়ে তারা বলেছে, 'আলাদা। খুব আলাদা।'

'কী ধরনের আলাদা?' আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি।

'আলাদা, মানে, বইগুলো পড়ে বেশ 'ভাবতে' হয়। অনেককিছু বোঝার আছে এগুলোতে।' (যা আগে–পড়া বইগুলোতে ছিল না)। এমনি অনেক এলোমেলো অগোছালো কথা দিয়ে তারা ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করে।

তাদের ভাঙাচোরা কথার ভেতর থেকে তাদের মনের অনেক কথা বেরিয়ে পড়ে। সেগুলো এরকম : 'বইগুলো ভাবায় আমাদের। আমাদের মনের ভেতর ঘা দেয়। মনের নতুন জানালা খুলে দেয়।' ... 'এমন কিছু দেয় যা আগে আমাদের ভেতর ছিল না।'...'জীবনকে নতুনভাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে। তাকে নতুন করে দেখায় । আমাদের প্রসারিত করে। বড় করে।' ... 'বইটা পড়ার আগে যে মানুষটি আমরা ছিলাম, বইটা পড়ার পর সে মানুষ আমরা থাকি না। আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে যাই।'

তারা বইগুলোর উপকারের দিকটাকে তুলে ধরতে চায়। বইগুলো তাদের যে বড় করে তোলে, ঘুরেফিরে তার ওপর জোর দেয়।

কাদের ভালোবাসি আমরা পৃথিবীতে? কারা এ সংসারে আমাদের ভালোবাসার পাত্র? ব্যাপারটা নিয়ে একটু খতিয়ে দেখলেই আমরা টের পাই এই পৃথিবীতে তাদেরই আমরা ভালোবাসি যারা আমাদের চেয়ে বড়। প্রতি মুহূর্তের বন্দিদশা থেকে যারা আমাদের মুক্তি দেয়, আমাদের নিয়ে ঊর্ধ্বলোকের পথে উধাও হতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতায় রাধা (সখীকে) বলছে : আমার (ভালোবাসার) অনুভূতি কী করে বোঝাব তোমাকে! সেই ভালোবাসার কথা যখনই বলতে যাই তখনই দেখি বলা শেষ করার আগেই তা পুরোপুরি নতুন হয়ে গেছে।

এখানে রাধার অনুভূতিকে প্রতিমুহূর্তে যে–মানুষটি নিত্যনতুন পৃথিবীর অভিসারী করে রেখেছে তার জন্যেই তো তার আমৃত্যু ক্রন্দন। আমাদের ব্যাপারেও তাই। যে–মানুষ আমাদেরই মতো বা আমাদের চেয়েও তুচ্ছতর তার জন্যে আমাদের প্রীতি বা করুণা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু কাতরতা বা আত্মনিবেদন থাকে না। আমাদের সব কাতরতা সব নিবেদন তাদের জন্যেই গচ্ছিত যারা আমাদের বড় জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পারে, জীবনের বিস্ময়কর শিখরে শিখরে আমাদের নিয়ে পাড়ি জমাতে পারে।

একটা ভালো বই রাস্তায় চলার পথে পলকের জন্যে চোখে পড়ে যাওয়া কোনো সুন্দরীর চতুর কটাক্ষ নয়, যা চকিতের জন্যে রক্তে চাঞ্চল্য জাগিয়ে সহজেই মন থেকে মিলিয়ে যাবে। একটা ভালো বই সেই বই যা আমাদেরকে তার প্রেমে পড়তে বাধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, মুহূর্তের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। প্রেমের মতো বা দমকা হাওয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তা আমাদের জীবনকে তছনছ করে, নিদ্রা হরণ করে। কোন্ গুণে একটা বই এভাবে আমাদের বিপর্যস্ত আর এলোমেলো করে? একটা কারণেই। বড় জীবনের সম্পন্ন শিখরকে আমাদের সামনে মেলে ধরে বলেই। প্রেম যেমন আমাদের জীবনের চিরপরিচিত চেনা আঙিনাকে অজানিতের নতুন হাওয়ায় শিউরে দিয়ে যায়, একটা ভালো বইও তেমনি অসম্ভবের পিপাসায় আমাদের মনটাকে শিউরে তোলে। তাই একটা ভালো বই সেই বই যা কেবল আমাদের বিনোদিত করে না, সমৃদ্ধও করে। এইজন্যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে : এ গুড বুক ইজ দ্যাট হুইচ ডিস্টার্বস। একটা ভালো বই সেই বই যা আমাদের বিপর্যস্ত করে, স্বস্তিকে বিশৃঙ্খল করে, শান্তি হরণ করে, আর এভাবে আমাদেরকে ভেঙেচুরে নতুন ও উচ্চতর জন্ম দেয়।

ভালো বইয়ের মধ্যে একটা উঁচু ও গভীর চিন্তাজগৎ থাকে বলেই তা সাধারণ পাঠকের কাছে কখনোই পৌঁছোতে পারে না। বিনোদনের স্বাদ, কৌতুকরসের স্বাদ, হালকা চটুল প্রেম বা রোমান্সের আমেজ–লাগা গালগল্পের স্বাদ সব পাঠকই নিতে পারে। কিন্তু মননের শক্তি সবার সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর খুব অল্প মানুষই এর অধিকারী। এইজন্যে ভালো বই সবার বই হয় না। এদের গভীর ব্যাপক তলদেশময় আবেদন আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছোনোর পথ আজও সম্পূর্ণ অজানা। তার ভেতর যে গভীর উপলব্ধিজগৎ আছে তা–ই তার পাঠকসংখ্যাকে নির্মমভাবে কেটে তাকে একটা ছোট্ট উত্তুঙ্গ কুঠুরির নির্জন বাসিন্দা করে দেয়। এদের সীমিত পাঠকের করুণ নিয়তিই এর প্রমাণ। এদের ভেতরকার সমৃদ্ধিই এদের জনপ্রিয়তার শত্রু। এদের বৈভবময় মননজগৎ, শিল্পোৎকর্ষের অপরিমেয় বিভা এবং বলীয়ান শক্তিমত্তার জন্যেই এরা যেমন আপামর জনসাধারণের জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত ; তেমনি একই সঙ্গে আবার 'স্মরণের' দীপান্বিত ও কারুকার্যময় শিখরের চিরকালীন বাসিন্দা।

আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। মহৎ বিষয়বস্তু আর অনন্যসাধারণ শিল্পসাফল্যের কারণে আজও বইটি সাহিত্যপিপাসু মানুষের চোখে বিস্ময়। কিন্তু কজন পাঠক সত্যি সত্যি পড়ে আজ এ বইটি? কজন পারে এর গম্ভীর সমুন্নত শিল্পরসকে আস্বাদন করতে? হাতে গোনা গুটিকয় মানুষ নয় কি? এমন দিগ্বিজয়ী শিল্প–বৈভবকে কি কোনোদিন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? নাকি তারা এতে উৎসাহী হবে? এই পরাক্রান্ত শিল্পবৈভব তো তাদের ধারণক্ষমতার বাইরে। কী করে এমন লেখকেরা জনপ্রিয় হতে পারেন? জনপ্রিয়তা যদি লেখকের একমাত্র পরিচয় হত তবে আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হত মাইকেলকে? নিশ্চয়ই অলেখকের সারিতে। যে বাংলাসাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ হতেন শ্রেষ্ঠ লেখক, মাইকেল হতেন সেই সাহিত্যের নিকৃষ্টতম লেখক। কাজেই ব্যাপারটা স্পষ্ট যে শ্রেষ্ঠত্ব বা ভালোর সঙ্গে জনপ্রিয়তার কোনো যোগাযোগ নেই। বরং হয়তো বিরোধই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বা বড় কোনো লেখক কোনোকালে জনপ্রিয় ছিলেন না, আজও কেউ হন না। যে রবীন্দ্রনাথ আজ বাঙালি সংস্কৃতিকে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, কতটুকু জনপ্রিয় তিনি? তাঁর ক'টা লেখা আমরা পড়ি? পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তাঁর শেষের কবিতা বা গল্পগুচ্ছের মতো দু-চারটি লেখা ছাড়া ? কতটুকু পড়ি আমরা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের লেখা, বিবেকানন্দ বা আবদুল ওদুদের লেখা, কমলকুমার বা সুধীন দত্তের লেখা? এমনকি বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের লেখাই আমরা কতটা পড়ি এইসব জনপ্রিয় লেখকদের তুলনায়?

সাহিত্যসহ মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ বইগুলো কি জনপ্রিয় বই? দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ বইগুলো কি আপামর জনসাধারণের পড়ার জন্যে লেখা? অ্যারিস্টটল, হেগেল, মার্কস, ফ্রয়েড, ডারউইন কি জনপ্রিয় লেখকদের নাম? না। তাঁদের 'নাম' জনপ্রিয়, তাঁদের 'লেখা' নয়। তাঁদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে ধারণ করার মতো মেধার ক্ষমতা পৃথিবী আবৃত-করে-রাখা এইসব মূঢ়, বিপুল, অকর্ষিত গণনাহীন পাঠকসম্প্রদায়ের নেই। কাজেই পাঠকপ্রিয় হবার কোনো সম্ভাবনাই তাঁদের নেই। তাঁদের শক্তিই এ ব্যাপারে তাদের অন্তরায়। কাজেই শ্রেষ্ঠ বই সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর কথাটাই গ্রহণীয় : এগুলো হচ্ছে মানবজাতির সেইসব 'শ্রদ্ধেয় শব', পাঠক যাদের দূর থেকে প্রণতি জানাতেই ভালোবাসে, কাছে গিয়ে স্পর্শ করতে চায় না। এমন যে আপামর জনসাধারণের সবচেয়ে শ্রদ্ধার জিনিস তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো—এদের ব্যাপারেও কি এ-কথা সত্য নয়?

বাংলাদেশে আজ মুসলমানের সংখ্যা বারো কোটি। কিন্তু তাদের কতজন কোরআন শরিফ ভালো করে পড়ে, বুঝে বা উপলব্ধি করে মুসলমান? খুব কমই তাদের সংখ্যা। এই সংখ্যা কোনোদিনই বেশি হবে না। কোরআন শরিফ পড়া, বোঝা বা আত্মস্থ করা মেধাহীন মানুষের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কাজেই ধর্মকে সাধারণ মানুষের চিরদিন জানতে বা আস্বাদ করে যেতে হবে যাঁরা মূল ধর্মগ্রন্থগুলোকে আত্মস্থ বা আস্বাদ করেছেন তাঁদের মুখ থেকে শুনে, ধর্মপিপাসার স্বাদ মেটাতে হবে পরের মুখের ঝাল খেয়ে খেয়েই।

বড় লেখকরা কেন জনপ্রিয়তাকে স্পর্শ করতে পারেন না, শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা গল্প তা বুঝতে সহায়ক হতে পারে। একদিন শরৎচন্দ্রের এক স্তাবক তাঁকে খুশি করার জন্যে বলছিলেন : 'কী অসাধারণ লেখা আপনার, কী প্রাঞ্জল। কত সহজে, কত অনায়াসে বুকের ভেতর পৌঁছে যায়' ইত্যাদি ইত্যাদি। 'আর দেখুন রবীন্দ্রনাথ, কী দুরূহ আর কঠিন কঠিন সব লেখা, কিছুই ভালো করে বুঝতে পারি না।' ভদ্রলোকের কথাগুলো শান্তভাবে শুনে একসময় শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমাকে কেন বুঝতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথকে কেন বুঝতে পারেন না জানেন? কারণ : রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্যে, আর আমি লিখি আপনাদের জন্যে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয় লেখকরা আদৌ লেখক কি না তা নিয়ে যত সংশয়ই থাকুক একটা ব্যাপারে তাঁরা ভাগ্যবান। একসময়ে বড় লেখকেরা পাঠকসম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে সম্মান আর ভালোবাসা পেতেন তা আজ তাদের কাছে বেহাত হয়ে গেছে। বিপুল বিত্ত, আকাশছোঁয়া খ্যাতি, জলুশপূর্ণ জীবন—সব তাঁদের মুঠোয়। আজকের এই মূঢ় গণতন্ত্রের যুগে যার যত গণসমর্থন সেই তত বড়। এই জনসমর্থন দিয়ে জনপ্রিয় লেখকেরা ভালো লেখকদের হারিয়ে দিয়েছে। তাঁদের সব মহিমা ও বৈভব আজ এঁদের দখলে। প্রায় সব দেশেই গড়পড়তা মানুষ বড় লেখক বলতে আজ জনপ্রিয় লেখকদেরকেই বোঝে। এই পাঠকদের বোধের জগৎ কাঁচা ও অসম্পন্ন বলে এইসব অপরিণত ও মননহীন লেখকদের মধ্যে তারা তাদের তৃপ্তির জগৎ খুঁজে পায়। ভালো লেখকেরা এখন গুটিকয় বিবরবাসী পাঠকের নিভৃত ও একান্ত আস্বাদনের কিছু রচনার জনক মাত্র।

আগেই বলেছি আজকের পৃথিবীর এইসব জনপ্রিয় লেখকদের স্রষ্টা হচ্ছে একালের বিপুল পাঠকসমাজ—সংখ্যায় যারা মাছের মতো, পাখির মতো, মরুভূমির বালুর মতো, আকাশের তারার মতো—অপরিগণিত, সংখ্যাহীন। প্রযুক্তি, শিল্পায়ন এবং বিত্তের অপ্রতিহত বিকাশের হাত ধরে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই বিপুল পাঠকসম্প্রদায়ের যে অবারিত উত্থান শুরু হয়েছে, দেড়শ বছর পার হতে না-হতেই তা আজ সর্বকালের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এদের সিদ্ধান্ত এবং রায়েই আজ সাহিত্যজগতের ভাগ্য নির্ধারিত। কোনোকিছুর ব্যাপারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এদের নেই। অবিকশিত ও অগভীর একধরনের অকর্ষিত মানুষ এই পাঠকেরা—বোধ, রুচি বা শিক্ষার দিক থেকে বেদনাদায়ক রকমে অনগ্রসর। একশ বছর আগেও পাঠক ছিল একধরনের বিদগ্ধ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের নাম। আজ ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ মানেই পাঠক। তার ভালো-মন্দের বোধ আর বিচার-বিবেচনার ওপরেই আজ লেখকসম্প্রদায় অসহায়ভাবে আশ্রিত। তার নির্বাচিত লেখকই আজকের 'শ্রেষ্ঠ' লেখক। কেবল লেখক নন, কে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিবেচিত হবেন, কার গানের কোটি কোটি ডিস্ক বিক্রি হয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিখ্যাত আর বিত্তশালী করে তুলবে, কার টিভি অনুষ্ঠান রেটিঙে সর্বোচ্চ হয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপণনদাতাদের কাছে সবচেয়ে লোভনীয় হয়ে উঠবে, সবই তার সিদ্ধান্তে ঘটে।

এবার দেখা যাক 'এইসব' জনপ্রিয় লেখকরা কোন্ পাঠকদের সৃষ্টি। সন্দেহ নেই ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন বিপুলসংখ্যক মানুষই এদের স্রষ্টা। তবু প্রশ্ন : যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে তারা সবাই কি এইসব অন্তঃসারশূন্য জোলো লেখকদের একচেটিয়া উপাসক? তাদের এইসব বইয়ের ক্রেতা? এদের কিছুসংখ্যক যে এদের বই কেনেন তাতে সন্দেহ নেই। তবু পরিসংখ্যান নিলেই ধরা পড়বে এই দলে পৌঢ়, মাঝবয়সী বা পরিণত পাঠকের সংখ্যা বেশি নয়। পঁচিশের কোঠায় পা দিলে মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি জেগে ওঠে, হুজুগের প্রবণতা কমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে, জীবন শান্ত সুস্থিত ও পরিণতিমুখী হয়ে উঠতে শুরু করে। ফলে রগরগে জৌলুশেও যুক্তিবুদ্ধিহীন উচ্ছ্বাসে বিস্রস্ত হওয়ার প্রবণতা এদের থিতিয়ে আসে। তাহলে আধুনিক পৃথিবীর প্রতিটি দেশের এইসব কোটি কোটি বল্গাহীন প্রমত্ত উচ্ছ্বাসাক্রান্ত পাঠক–শ্রোতারা ঠিক কারা? এই মত্ততা আর উচ্ছ্বাসের প্রায় সবটাই করে প্রধানত টিনএজাররা। কেবল টিনএজাররা নয়, এই বয়সের সীমা আর একটু বেশি। তেরো থেকে পঁচিশ বছরের কিশোর তরুণেরা। এই সময় তাদের হৃদয় থাকে অপরিণত ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ, মন থাকে হালকা, ফুরফুরে; উড়ে–বেড়াতে–চাওয়া, জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি থাকে উপরতলসর্বস্ব ও চপল। এর ফলে শারীরিকতার লালা ঝরানো রগরগে কোনো উপন্যাস, তরুণ–তরুণীর মিষ্টি প্রেমের কোনো রোমান্টিক কাহিনী বা যে–কোনো রকমের মচমচে বা চটকদার বই বেরোনোর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দোকানের দিকে ছুটে যায়।

এইসব তেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী পাঠকদের প্রিয় লেখকরাই আজকের পৃথিবীর জনপ্রিয় লেখক। এই লেখকদের স্রষ্টা আসলে এরাই। জনপ্রিয় লেখকদের বই বের হলে যারা মাতালের মতো, পাগলের মতো, জ্যৈষ্ঠের অন্ধ উন্মাদ মৌমাছির মতো বইয়ের দোকানের দিকে ছুটে যায়, অটোগ্রাফের জন্য তাদের ঘিরে অসুস্থ মাতামাতি করে, তারা মোটামুটি এরাই। এইসব অর্ধচিন্তিত অর্ধ–অনুভূত কিশোর তরুণদের উচ্ছ্বসিত দঙ্গল। পপ গানের অনুষ্ঠানে অসুস্থভাবে নেচে, চিৎকার করে, অজ্ঞান বা বিস্রস্ত হয়ে প্রিয় গায়ককে যারা হৃদয়ের অর্ঘ্য দেবার জন্য আত্মঘাতীভাবে মরিয়া হয়ে ওঠে, তারা এরাই। আর এইসব অপরিণত কাঁচা বয়সের কাঁচা মনের চটুল পিপাসা আর জোলো চাহিদার যোগান দেওয়া লেখকই আজকের 'জনপ্রিয় লেখক'। যে পাঠকের মধ্যে বড়কিছু নেই, গভীর কিছু নেই, তার চাহিদার যিনি অকাতর সরবরাহকারী তাঁর মধ্যেও বড় বা গভীর কিছু থাকার কথা নয়। থাকলে ওই পাঠকের কাছে তাঁর প্রিয় হবার কোনো কারণ থাকত না। আজ থেকে একশ বছর আগেও এই বয়সের কিশোর–তরুণীরা পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু আজকের মতো জনপ্রিয় গায়ক বা লেখকের জন্ম দেবার শক্তি তাদের ছিল না। কিন্তু আজ তাদের হাতে সেই শক্তি রয়েছে। আজ তাদের হাতে দেবতা সৃষ্টিকারী সেই অঘটনঘটনপটীয়সী চাবিকাঠি রয়েছে, যার নাম ক্রয়ক্ষমতা। আজকের এই তরুণরা প্রায় সবাই উপার্জনক্ষম মানুষ বা সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারের ছেলেমেয়ে। তাই আজকের দিনের কনসার্টগুলোয় কোটিতে কোটিতে আছড়ে পড়ে বা কোটি কোটি সিডি কিনে একজন ম্যাডোনা বা মাইকেল জ্যাকসনের মতো দেবতার জন্ম দেওয়া এদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

৭

আমাদের ছেলেবেলায় এমনি জনপ্রিয় লেখক ছিলেন শশধর দত্ত (মোহন সিরিজ), নীহাররঞ্জন গুপ্ত (কিরীটি রায় সিরিজ)—এমনি আরও অনেকে। গরম শিঙাড়ার মতো পাঠকের টেবিলে টেবিলে তারা ধূমায়িত উষ্ণতা ছাড়িয়েছেন। কিন্তু কোথায় সেসব লেখকেরা আজ? কে তাদের আজ চেনে? অনেক আগে পড়া একটা কবিতার আধো–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্মৃত একটা লাইন মনে পড়ছে। লাইনটা অনেকটা এরকম : 'মহিম হালদার স্ট্রীটে গিয়ে 'মহিম' 'মহিম' বলে কত ডাকলাম, উত্তর দিল না কেউ।' সম্ভবত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লাইন। সাহিত্যের রাস্তায় আজ ওই জনপ্রিয় লেখকদের নাম ধরে যত ডাকা হোক, কেউ উত্তর দিতে এগিয়ে আসবে না। রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লেখকদের এই দুঃখময় নিয়তি লক্ষ্য করে বেদনা অনুভব করেছেন। লিখেছেন : এইসব লেখকেরা তাদের জীবদ্দশায় পাঠকের হাতে হাতে বিবর্তিত, মুখে মুখে আলোচিত বিতর্কিত হয়ে কী তুমুল উত্তাপই না জাগায়। কিন্তু সময় একটু পাল্টে গেলেই পাঠকেরা—

" ... ভেবে নাহি পায়
এই লেখা একদিন কোন্ গুণে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।"

তা হলে দাঁড়াল, একজন লেখক 'জনপ্রিয়' হন দুটো কারণে। এক, বড় লেখকদের সমৃদ্ধ উপলব্ধিজগৎ তাঁদের ভেতর থাকে না বলে। (যার ফলে তাঁদের পক্ষে আপামর পাঠকের হৃদয়ে অনুভূত হওয়া সম্ভব হয় যা অন্যথায় সম্ভব হত না।) দুই, তাঁদের মধ্যে অপরিণত ও সীমিতমাত্রার শিল্পক্ষমতা থাকলেও শিল্পের উচ্চতর সম্পন্নতা থাকে না বলে (এজন্যেই সাধারণ পাঠক তাদের আস্বাদ করতে পারে, তাঁদের ভেতরকার সামান্য শিল্পমাধুরী চেটেপুটে নিজেদের বিত্তহীন শিল্পপিপাসার স্বাদ মেটাতে পারে) দুটো জায়গাতে শৈল্পিক অক্ষমতাই তাদের 'জনপ্রিয়' হবার কারণ। কাজেই বলা যায় লেখক হিসেবে ব্যর্থতার কারণেই—শিল্পের যে সম্পন্নতা ও গভীর উপলব্ধিজগতের সহযোগে একজন লেখক সার্থক হন, সেইসব শক্তিমত্তার জায়গায় অনটনকবলিত হবার কারণেই—লক্ষ লক্ষ সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনকারী হয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে পড়ে।

শিল্পের এত কম পুঁজি নিয়ে খ্যাতি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্মরণের পৃথিবীতে জায়গা হয় না।* তাই এই লেখকেরা কিছুদিনের মধ্যেই বিস্মৃত হন। তবু যতদিন ওই লেখক সচল, যতদিন বইমেলায় একটি দুটি বা তিনটি করে বই বেরিয়ে উত্তাপে উত্তেজনায় পাঠকমহলে মৌতাত ছড়াচ্ছে, ততদিন অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তো তাঁরই। সেটাই বা এমন অরুচিকর হতে যাবে কেন?

১৯৯৯

---

* কোনো যুগের কোনো বড় লেখক কখনও আজকের জনপ্রিয় লেখকদের (হ্যারল্ড রবিন্স জাতের) মতো জনপ্রিয় হয়েছেন এমন উদাহরণ পৃথিবীর সাহিত্যে নেই। তবু অনেক সময়ই এমন অনেক লেখককে পাওয়া যায় যাঁরা বিপুলভাবে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বেশকিছু ভালো লেখা রেখে যান। আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এমনি একটি উদাহরণ। একশ বছর ধরে এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক তিনি, কিন্তু তাঁর 'স্মরণীয় গ্রন্থ' রয়েছে বেশ কয়েকটি। আমি তাঁকে বা তাঁর মতো লেখকদেরকে 'জনপ্রিয় লেখক'দের দলে ফেলব না। যদি কোনো লেখক কোনোভাবে স্মরণীয় সাহিত্য উপহার দিয়ে থাকেন তখন তিনি আর 'জনপ্রিয় লেখক' থাকেন না। পাঠকের কাছে তিনি যদি জনপ্রিয়ও হন, তবু নন। তিনি তখন 'লেখক'। শুদ্ধ লেখক। তখন শুধু 'লেখক' হিসেবেই তিনি আলোচ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ কি মৌলিক লেখক ?

দিনকয় আগে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম, ওখানকার একটা গ্রন্থমেলায় বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়ে। যৌথভাবে মেলার আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি ও চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষ। মেলার একপাশে একটা বেশ বড়সড় মঞ্চ, সামনে বেশকিছু চেয়ার, সেই মঞ্চ থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একেকজন লেখক বক্তৃতা করেছেন শ্রোতাদের উদ্দেশে । বারোদিন স্থায়ী মেলায় বক্তৃতা হয়েছে মোট বারোটি। বক্তৃতার ঢংটা কিছুটা অভিনব। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ঢালাও ভাষণ নয়, লেখকে পাঠকে মুখোমুখি। পাঠকেরা লেখকদের প্রশ্ন করেছেন নানান বিষয়ে, লেখকেরা সেসবের উত্তর দিয়ে পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করেছেন।

বারোদিন মেয়াদি মেলায় আমার বক্তৃতা ছিল শেষদিনে। লেখক হিসেবে আমার ডাঁটপাট নেই। থাকার অনুকূলে কোনো কারণও নেই। কাজেই লেখক হিসেবে কথাবলার বিপদে না ফেলে পাঠক হিসেবে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেই উদ্যোক্তারা আমার প্রতি বেশি সুবিচার করতেন। তবু আয়োজকেরা অনুগ্রহ করে আমাকে বক্তৃতা করার সুযোগ দিলেন। কিন্তু বক্তৃতা শুরু করে বুঝতে পারলাম ভয় পাবার তেমন কোনো কারণ নেই। যেসব কথা আমাকে বলতে হচ্ছে তা বলার জন্যে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত থাকার তেমন কোনো দরকার নেই। মোটামুটিভাবে যে-কোনো সজাগ লোককে দিয়েই কাজটা চলতে পারে।

নানান রকম প্রশ্ন আসতে লাগল দর্শকদের কাছ থেকে। আমার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে আলোকিত মানুষ কি এমনিতরো নানান প্রসঙ্গ, কেন আমাদের প্রজন্ম একাত্তরের ঘাতক দালালদের দলেবলে ছেড়ে দিয়েছে (প্রশ্নের ঝাঁজ এমনই যেন আমিই ছেড়ে দিয়েছি), কেন আমি টেলিভিশনে বলেছি সুন্দরী রমণী হিসেবে জন্মাতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম—এমনি নানান ধরনের কথাবার্তা। সব ধরনের প্রশ্নই আছে, কেবল নেই লেখালেখির বিষয়ের জিজ্ঞাসা—লেখকের কাছে জানতে চাওয়ার মতো পাঠকের প্রশ্ন। ওইসব প্রশ্ন একেবারে ছিল না বলব না, বেশকিছু ভালো প্রশ্নও ছিল, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু কম হলেও একটা জায়গায় তারা অনন্য। তাদের ঝাল ধানী-মরিচের চেয়েও কড়া। একটা-দুটো প্রশ্নই মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। অনেক এলোমেলো প্রশ্নের ফাঁকে একজন প্রশ্নকর্তা এমন একটা প্রসঙ্গ

তুললেন যা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে প্রায় নির্বাক করে ফেলল। তিনি বললেন, দিনকয়েক আগে একজন বক্তা (যিনি আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের একজন ঝাঁঝালো লেখক) এই আসরে বলে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ মৌলিক লেখক ছিলেন না। তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে যা-কিছু বলেছেন, ইয়োরোপের লেখকেরা তাঁর অনেক আগেই সেসব কথা বলে গেছেন। কাজেই তাঁকে মৌলিক লেখক বলার সঙ্গত কারণ নেই। এ সম্বন্ধে আপনার মত কী?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে কিছুটা বোকা হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কোনো মাপের, তাঁর শক্তি বা দুর্বলতা কোথায়, তাঁর শিল্পপ্রতিভা কোথায় কোথায় উজ্জ্বলতমভাবে প্রকাশিত—এসব নিয়ে চায়ের পেয়ালায় অনেক ঝড় তুলেছি, কিন্তু তিনি মৌলিক নন, এ ভাবনাটা তো মাথাতেই আসে নি কোনোদিন। প্রজন্মপরম্পরায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রতিভা আর মৌলিকতার সমার্থক বলেই তো জেনে এসেছি। অনেক দিনের ভাবনা, অভ্যাস আর অনুভবের ভেতর দিয়ে এ এখন আমাদের একটা চিরায়ত কুসংস্কারের মতো। মাটির মানুষের মাথার ওপর অফুরন্ত নীল অপরিমেয় আকাশ যেমন, রবীন্দ্রপ্রতিভা তো আমাদের জীবনের ওপর তেমনই—আমাদের সবরকম আশঙ্কা বা সন্দেহের বাইরে।

তবু এমন একটা কথা শুনে চকিতের জন্যে যেন একটু গোলমালেই পড়ে গেলাম। সত্যিও তো হতে পারে কথাটা। এমনও তো হতে পারে দেশ-বিদেশের সারস্বত সমাজ (ইয়েটস বা পাউন্ডের মতো লন্ডনের কবিগোষ্ঠীর সদস্যেরা বা নোবেল কমিটি থেকে শুরু করে এযাবৎকালের বাংলাভাষায় কথা বলা প্রায় প্রতিটি মেধাবী বা শিক্ষিত মানুষ) নিতান্তই ভুলে বা অনবধানে রবীন্দ্রনাথকে এতকাল একজন প্রতিভাবান বা মৌলিক মানুষ ভেবে এসেছেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা আমি নিজেও এতদিন জেনে বুঝে অনুভব করে বা বিশ্বাস করে এসেছি, আসলে তার অনেক কিছুই একটা বড়গোছের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। হয়তো বিরাট রবীন্দ্র-কিংবদন্তিটাই আমাদের এই দরিদ্র বিশাল জাতিটার একটা অতিকায় ও বোকা কুসংস্কারের অন্য নাম, ডুবন্ত মানুষের আঁকড়ে ধরা খড়কুটোর মতো আত্মরক্ষার একটা করুণ আশ্রয় মাত্র।

নিজেকে আরও নিশ্চিত করার জন্যে কথা শুরু করার আগে রবীন্দ্রনাথের যেসব লেখাকে আমার কাছে মৌলিক বলে মনে হয় তাঁর গোটা কয়েকের ওপর দিয়ে মুহূর্তের জন্যে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। চোখের ওপর চকিতের জন্যে ভেসে উঠল গ্রামবাংলার সোঁদা মাটির গন্ধে ভরা তাঁর অনবদ্য ছোটগল্পগুলো; শেষের কবিতা, গোরার মতো উপন্যাস; ডাকঘর, রক্তকরবীর মতো নাটক; শিক্ষা, কালান্তর বা শব্দতত্ত্বের মতো বিচিত্রমুখী প্রবন্ধের বই; ছিন্নপত্র, ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্র বা রাশিয়ার চিঠির মতো তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পত্রগ্রন্থ; আর সবশেষে তাঁর অসাধারণ কবিতা-জগৎ—বলাকার মতো তাঁর উচ্ছল প্রবুদ্ধ আর নিক্বণমুখর কবিতাপ্রবাহ; তাঁর গানের হিরকখচিত কথামালা, যেগুলোর অনবদ্যতা বিচার করে রাদিচি রবীন্দ্রনাথকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকার বলতে চেয়েছেন, তাঁর কথা ও কাহিনী, কণিকা, জুতা আবিষ্কার বা হিং টিং ছট-এর মতো তাঁর অসামান্য হাস্যরসাত্মক কবিতা; বৈশাখ, বর্ষামঙ্গল বা আষাঢ়ের মতো তাঁর প্রকৃতিসজীব কবিতা, তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের বর্ষার অপরূপ ও লীলাময় রূপবৈচিত্র্য, তাঁর অনন্য ও বিস্ময়কর শিশুকবিতা; কিংবা আলাদাভাবে বর্ষার দিনে, সোনার তরী, এমনি আরও অনেক অনন্যসাধারণ কবিতা।

লেখাগুলোর কথা ভাবতেই প্রশ্ন জাগল, এগুলোর কোন্ লেখার কোন্ কথাগুলো ইয়োরোপের লেখকেরা আগে বলে গেছেন? আর যদি বলে গিয়ে থাকেনও তবু তা দিয়ে যদি কেউ নতুন ও অলীক শিল্পপ্রতিমা তৈরি করতে পারেন তবে তাকে কি মৌলিক স্রষ্টার সম্মান থেকে খারিজ করে দেওয়া যাবে? হাজার কয়েক বছর আগে পৃথিবীতে কবে কে একজন একটা প্রেমের কবিতা লিখে ফেলেছিলেন সেইজন্যে আর কেউ কোনোদিন প্রেম নিয়ে কবিতা লিখলে তা আর মৌলিক হবে না—কেমন কথা এ? শিল্পবোধের কী অপরিশীলিত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা?

গ্রিক সভ্যতার মানবতা আর জীবনবাদিতার প্রেরণা থেকে একদিন জেগে উঠেছিল ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ। গ্রিক মনীষীরা এই রেনেসাঁর দু হাজার বছর আগেই তো এর মূল প্রতীতিগুলো—প্রেম, মানবিকতা আর জীবনমুখিতার বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। এজন্যেই কি মোদ্দা দাগে বলে দেওয়া যাবে—গত কয়েক শ বছরের ইয়োরোপীয় রেনেঁসার বিস্ময়কর অবদানগুলো সব সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস? শিল্পের নিজের কি কোনো স্বয়ম্ভর সত্তা নেই? শেক্সপিয়ারের সাঁইত্রিশটা নাটকের মধ্যে এক *টেমপেস্ট* ছাড়া বাকি সবগুলোর কাহিনীই তো অন্যের কাছ থেকে ধার করা। এজন্যে কি তাঁকে কেউ অমৌলিক বলেছে? মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো গ্রিক ল্যাটিন ইংরেজি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে ভারতীয় আর ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সেরা সম্পদগুলো হাজার হাতে আহরণ করেছিলেন। এ জন্যে কি তিনি অমৌলিক? তা হলে তাঁর ঐ অমিতপ্রভ ও ভাস্বর মহাকাব্যটি (গৌড়জন যাহে/ আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি) কী? স্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম, ওয়াল্টার স্কট, শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে গীতা উপনিষদ সংস্কৃত সাহিত্য—কার প্রভাব নেই বঙ্কিমের লেখায়? বিশ শতকের ইংরেজ সাহিত্যের কোন্ ভালো কবির প্রভাব নেই জীবনানন্দের কবিতায় বা চেতনাজগতে? তাই বলে কি ঐদের লেখা সব রদ্দি জিনিস? ডাস্টবিনের খাদ্য?

আমার ধারণা, আমাদের সেই অদমিত ও অতি-আত্মপ্রত্যয়ী লেখকবন্ধুটি মৌলিকতা ব্যাপারটিকে খুবই অগভীর ও সীমিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। হয়তো ব্যাপারটাকে চিরে চিরে আরও একটু ভালো করে দেখা সম্ভব ছিল। অন্তর্দৃষ্টির অনটনের কারণেই তা হয় নি। না হলে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক লেখক নন এমন একটা কথা এমন ঝট্ করে বলে ফেলতে তিনি হয়তো আরও একটু দেরি করতেন। একজন সাধারণ পাঠকও তো রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময় তাঁর মৌলিকতার অনিন্দ্য ও সম্পন্ন বিভাকে টের পায়। আর তিনি নিজে একজন সৃষ্টিশীল লেখক হয়ে সেই অমেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছুরণকে একেবারে বুঝতেই পারবেন না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে কি তিনি শ্রোতাদের নিছক চমকে দেবার জন্যে কথাটা বলেছিলেন? নাকি চিন্তাটা আর কারো ? পাশ্চাত্যের কোনো চিন্তাবিদগোষ্ঠীর—যাঁরা মনে করেন অনুসরণকারী সভ্যতা অগ্রবর্তী সভ্যতাকে কেবল অনুকরণই করতে পারে, নিজে মৌলিক কিছু দিতে পারে না। অনেকেই জানেন পাশ্চাত্যের অনেক মহলেই এমন একটা ধারণা এই শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রচলিত রয়েছে। তিনি কি সেই ধারণাটাকে, কোনোরকম ডান বাঁ ছাড়াই রবীন্দ্রনাথের ওপর চালিয়ে দিলেন?

অন্যের ভাঁড়ার থেকে একজন লেখক কতটা কী নিলেন না নিলেন তার ওপর লেখক হিসেবে তাঁর মৌলিকতা নির্ভর করে না। তিনি ততটুকুই মৌলিক যতটুকু নতুন জিনিস তিনি সাহিত্যের ভাঁড়ারে উপহার দেন। নতুন মানে এমন কিছু যা অপরিচিত ও অনন্য— এমন কিছু যার প্রতিরূপ সাহিত্যের অঙ্গনে আগে কখনো ছিল না, পরে কখনো আসবে না; অতীত ও ভবিষ্যতের মানবজাতির মধ্যে তিনিই কেবল এই প্রতিমা রচনা করতে পেরেছেন, আর কেউ নয়, কোনোভাবেই নয়। খুঁজলে হয়তো বেরোবে মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা জীবনানন্দ তাঁদের লেখায় যেসব কথা বলেছেন তাঁর প্রায় সব কথাই তাঁদের আগের কোনো-না-কোনো লেখক কোনো-না-কোনো সময় বলেছেন। কিন্তু বক্তব্যের এই উত্তরাধিকার মৌলিকতার দাবি থেকে তাঁদেরকে খারিজ করতে পারে নি। কেননা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত প্রসঙ্গের ইতিহাস নয়, প্রকরণের ইতিহাস; আধেয়ের নয়, আধারের ইতিহাস । 'কী বলা হল' তা দিয়ে সাহিত্য-মানের উঁচু-নিচুর পরখ চলতে পারে, কিন্তু আদৌ তা সাহিত্যের তালিকায় নাম ওঠাতে পারল কি না তা নির্ভর করে 'কেমন করে বলা হল' তার ওপরেই। ওই লেখকেরা সবাই মৌলিক, কেননা তাঁদের লেখার শব্দ ছন্দ উপমার অলীক সমাবেশের ভেতর তাঁরা এমন অলীক ও অনন্য কিছু উপহার দিয়েছেন যা কেবল অপরিচিত ও নতুন নয়; সেগুলো তাঁরা উচ্চারণ করেছেন পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো, যা তাঁদের আগের বা পরের কেউ কখনো ঠিক ওভাবে উচ্চারণ করেন নি, করবেনও না। এ যদি না হত তবে সাহিত্যে মৌলিক বলে কিছু থাকত না। জীবনের কয়েকটা মোদ্দা আবেগের বাইরে সাহিত্যের বক্তব্য অংশে আসলে কিছুই থাকে না। (থাকলেও তা দর্শনে থাকে, সাহিত্যে নয়।) সাহিত্যের কাজ হল এইসব একঘেয়ে স্থূল অগ্রহণযোগ্য ও ক্লেদাক্ত আবেগগুলোকে প্রকরণের অবাক সামঞ্জস্য রচনার ভেতর দিয়ে অনির্বচনীয় ও চিরকালীন প্রতিমায় মূর্ত করে তোলা।

২

রবীন্দ্রনাথের মতো বড় লেখকদের মৌলিকতা বুঝতে পারা আরও একটা কারণে কিছুটা কঠিন। সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা বড় লেখকদের মৌলিকতা থেকে কিছুটা আলাদা। সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা ফ্ল্যাশ-বাল্বের আলোকচ্ছটার মতো—তীব্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষিপ্র, চোখ-ধাঁধানো। অনন্যতার প্রখর চাবুকে মুহূর্তের জন্য চোখকে অন্ধ করে দিতে পারাতেই তার সার্থকতা। এজন্যে তার চোখে না পড়ে উপায়ই নেই। জীবনের সমগ্রতা জুড়ে শিল্পের আদিগন্ত ও অফুরন্ত আগুন তাঁদের ভেতর লেলিহানভাবে প্রজ্জ্বলিত নয় বলে আত্মঘাতী দেশলাইয়ে জীবন জ্বালিয়ে শিল্পের প্রতিমা উপহার দিতে হয় তাঁদের। বঞ্চিত উপেক্ষিত মানুষেরা যেমন তাদের পরাজিত জীবনের যাবতীয় আক্রোশকে জিভের ক্ষিপ্ত তীব্র প্রতিবাদের ধারালো ছুরির মুখে কেন্দ্রীভূত করে চিৎকার করে চলে, তেমনি সাধারণ লেখকেরাও অস্তিত্বের সমস্ত শক্তিকে শিল্পের সংকীর্ণ সূচীমুখে কেন্দ্রীভূত করে জ্বলে ওঠেন। এই উজ্জ্বলতা এমনই চাক্ষুষ এবং পরিত্রাণহীন যে তাকে চিনতে আমাদের কোনোরকম ভুল হয় না। লেখকদের প্রথম উজ্জ্বল সাড়াজাগানো লেখাগুলোর মতো তীব্র এরা, প্রথম প্রেমের মতোই জ্বালাময় ও অনির্বচনীয়।

বড় লেখকদের লেখা কিন্তু এত উজ্জ্বল নয়। দূর আকাশের বিশাল নক্ষত্রের মতো এরা, প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ। এঁদের রচনায় চোখ নষ্ট করে দেওয়া তীব্রতা বা নির্মমতা নেই। সাধারণ লেখকদের তুলনায় অনন্ত কোটি গুণ আলো এঁদের মধ্যে, অসীম-বিস্তারী দাউদাউ অগ্নিবিশ্ব, তবু খালিচোখে চাইলে মনে হবে হয়তো ফ্ল্যাশ-বাল্বের চেয়েও কম আলো এখানে। এতই নিরীহ, এতই প্রতারক এঁরা। কেন এই বিভ্রম? কারণ, যতবড় অগ্নিজগৎকেই সে ধারণ করুক, নক্ষত্রদের মতোই সে আছে আমাদের চাইতে অনেক দূরে—এত দূরে যে খালিচোখে আগুনের সেই প্রলয়ঙ্করী লঙ্কাকাণ্ডের স্বরূপ জানা কিছুতেই সম্ভব নয়। তা জানতে হলে আমাদের চাই একটি ভালো মানের টেলিস্কোপ। এই টেলিস্কোপ যে খুঁজে নিতে পারবে না, নক্ষত্রজগৎ তাঁর কাছে ফ্ল্যাশলাইটের চেয়েও মৃদুতর ও অর্থহীন ব্যাপার বলে মনে হবে। বড় লেখকদের অবস্থানও তেমনি—আমাদের প্রাকৃত ও অকর্ষিত সাহিত্যবোধ থেকে অনেক ওপরে। সাহিত্যরুচির উচ্চতর বৈদগ্ধ্য ও পরিশীলন ছাড়া তাঁদের প্রকৃত শক্তিকে শনাক্ত করা সত্যি সত্যি কঠিন। করতে গেলে আমাদের ওই লেখকবন্ধুটির মতো রবীন্দ্রনাথের মতো একজন নাক্ষত্রিক লেখককে অনায়াসে অমৌলিক বলে আখ্যায়িত করার মতো অতিসরলতার আশঙ্কা থেকে যেতে পারে।

এ ধরনের বিভ্রান্তি যে কেবল সাহিত্যশিক্ষার অভাব থেকেই হয় তা নয়, সাহিত্যবোধের জন্মগত প্রতিবন্ধিতার কারণেও এটা ঘটতে পারে। শেক্সপিয়ারের শক্তিমত্তা অনুধাবনে টলস্টয়ের মতো মহান লেখকের অক্ষমতা, মিলটনের কাব্য-প্রতিভা বিচারে টি. এস. এলিয়টের ভ্রান্তি, মাইকেলের বলীয়ান জীবনাবেগ অনুধাবনে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও বর্ষীয়ান বুদ্ধদেবের অপারগতা, জীবনানন্দের কবিত্বের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের অননুমোদন—এমনি সব গোলমালের উদাহরণ।

ছোট লেখকের সঙ্গে বড় লেখকের আর একটা ব্যাপারে পার্থক্য থাকে। সেটা ভালো লেখার অতিপ্রজতায়। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আল মাহমুদ, যার কবিতা বাঙালি পাঠক বেশ কিছুকাল পড়বে বলে আমি মনে করি—একবার, সেই সত্তুরের দশকের প্রথম দিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের আশঙ্কিত মনকে স্বস্তি দেবার জন্যেই হয়তো, একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, 'মানো আর নাই মানো, রবীন্দ্রনাথের মতো অন্তত *একটা ভালো কবিতা* তো লিখেছি।' উত্তরে আমি তাকে বাংলা লোককথার নাককাটা রাজার গল্পটা স্মরণ করতে বলেছিলাম। বলেছিলাম : গল্পটায় আছে—একটা টুনটুনি হঠাৎ করেই একটা টাকা পেয়ে গিয়েছিল। সেই অহঙ্কারে সে রাজার সামনে দিয়ে উড়ে উড়ে বলে বেড়াতে লাগল, রাজার ঘরে যা আছে / আমার ঘরেও তা আছে। কথাটা মিথ্যা নয়। রাজার ঘরে টাকা আছে, তার ঘরেও টাকা আছে। তা হলে রাজা আর টুনটুনির পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এখানে যে, টুনটুনির একটা আছে, কিন্তু রাজার আছে হাজার। একই টাকা, কিন্তু রাজা তার বিপুল অধিক্য হাজার দিয়ে রাজা, টুনটুনির চেয়ে অনেক অনেক বড়।

ভালো কবিতা বড় কবিদের মতো ছোট কবিদেরও লিখতে হয়। অন্তত একটি স্মরণীয় কবিতা না লিখে কেউ 'কবি' হয় না। ওতে 'কাব্যিক' পর্যন্ত হওয়া যেতে পারে, কবি নয়। তাহলে একজন বড় কবি কী দিয়ে বড়? সংখ্যা দিয়ে। বেশি সংখ্যক স্মরণীয় কবিতা লিখে, অনাবিষ্কৃত হৃদয়জগৎকে অনেক বেশি সংখ্যায় উদ্ঘাটন করে, উপলব্ধির সমুদ্রে অনেক বেশি অবগাহন করতে পেরে। আশা করি বোঝাতে পেরেছি এই সংখ্যা গণিতের সংখ্যা নয়, মানের সংখ্যা। কত লক্ষ লাইন লিখে কত বিপুল আকৃতির রচনাসংগ্রহ তিনি প্রকাশ করলেন তার ওপর কোনো কিছু নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে কত বেশি অর্থহীন মর্মরখণ্ডকে কতগুলো শিল্পিত তাজমহলের মধ্যে তিনি ধারণ করতে পারলেন তার ওপর।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসফল রচনার বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা, গভীরতা ও সংখ্যা প্রমাণ করে যে তিনি একজন বড় লেখক; বিস্তর রজতমুদ্রার টাকশালওয়ালা রাজাদের দলের লোক। তাঁর লোকশ্রুত অবদানও অনেক। আধুনিক বাংলাভাষার জনক তিনি। আজকের বাঙালি জাতি যে-ভাষায় কথা বলে এবং ভবিষ্যতে বলবে, তার সৃষ্টি তাঁর হাত থেকেই। এ ছাড়া কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, প্রবন্ধকার—এমনি আরও যেসব অঙ্গনে তাঁর অনন্য শিল্পসাফল্য রয়েছে সেসব বারে বারে উল্লেখ করে বিরক্তি বাড়াতে চাই না। এ প্রসঙ্গে কেবল একটা কথা নিবেদন করতে চাই : কবে কতদিন আগে ইয়োরোপের কোন্ লেখকেরা কী সব আকাশ-পাতাল কথা বলে গিয়েছিলেন, তার খেসারত হিসেবে তাঁর এইসব অবিশ্বাস্য শিল্পসিদ্ধিগুলোকেও আমরা যদি মৌলিকতার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করি তবে তাঁর প্রতি কি খুব সুবিচার করা হবে?

৩

মৌলিকতা দু ধরনের : সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা আর বড় লেখকদের মৌলিকতা।

আগেই বলেছি সাধারণ লেখকেরা খুবই তীব্র ও উজ্জ্বল। এঁরা বিশুদ্ধভাবে মৌলিক। এঁদের অস্তিত্ব অনন্য, একক। জীবনানন্দ যেমন বলেছেন, 'আমার মতন নাই কেউ আর'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি। কিন্তু আগেই বলেছি বড় লেখকদের মৌলিকতা অত জ্বলজ্বলে নয়। অত স্বতন্ত্র নন এঁরা। নন অমন চাক্ষুষ ও প্রখর। ছোট লেখকদের তুলনায় এঁরা অনেক বেশি জীবনের মতো, প্রকৃতির মতো। এঁরা সহজ, অনায়াস। সহজ বলেই এঁরা এত সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেন, সকলের হয়ে উঠতে পারেন। এঁরা তাই হয়ে উঠতে পারেন সমস্ত মানবজাতির লেখক, বিশ্বজনের লেখক। সংকীর্ণ কুঠুরির তীব্র একাকিত্বের কথা এঁরা বলেন না, বলেন রৌদ্রকরোজ্জ্বল মানবতার কাহিনী। তাই সকলের কাছে এঁরা অনুভবগম্য, বোধগম্য, গ্রহণীয় ও আদরণীয়। এইজন্যেই এই দলের প্রতিনিধি বলতে পারেন :

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

সাধারণ লেখকদের মতো এঁরা অত বিশুদ্ধ নন। এঁদের মধ্যে অনেক খাদ থাকে, ধুলোমলিনতা থাকে। মহৎ শিল্পের কারবার সম্পূর্ণ জীবন নিয়ে। ঐ শিল্পীরা উপহার দেন পরিপূর্ণ জীবন। জীবনের গভীরে আকণ্ঠ ডুব দিয়ে নির্জলা শুভর সঙ্গে অনেক ক্লেদও এঁরা সঙ্গে করে তুলে আনেন বলে সাহিত্য থেকে এই আবিলতাকে এঁরা কিছুতেই এড়াতে পারেন না। এঁরা যা দিতে পারেন তার নাম ক্লেদজকুসুম। তাই অম্লানশুদ্ধতা এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব একমাত্র সাধারণ লেখকদের পক্ষেই।

যে জীবনকে বড় লেখকেরা সাহিত্যে উপহার দেন তা যেমন বলীয়ান আর পরাক্রান্ত তেমনি জন্মান্ধ ও আদিম। বিশুদ্ধতার চালুনিতে ছেঁকে তোলা শো-কেসের শীতল প্রাণহীন অনন্য সৌন্দর্য সে নয়। রক্তের উষ্ণতায় তা গন্ গন্-করা। খাদ থাকে বলেই এঁদের শিল্প অত মজবুত, অত দীর্ঘায়ু। সময়ের উত্তাল হিংস্র ঢেউয়ের আক্রোশকে অত অনায়াসে পার হয়ে যায়। কেবল খাদ নয়, বড় শিল্পে, ছোট শিল্পের তুলনায়, ভুলভ্রান্তিও বেশি। শক্তিমত্তা বেশি বলে ভুলভ্রান্তি বেশি। শক্তির কারণেই বেশি। কিন্তু ছোট শিল্পের কারবার স্বল্পশক্তির পুঁজি দিয়ে। তাই ভুল করার মতো শক্তিই নেই এর ধমনীতে; থাকলেও পরিসর কম বলে শুধরে নেবার অবকাশ আছে। তাই শুদ্ধতা হচ্ছে তার প্রাণ। ওটুকু হারালে তা বাঁচবে কী দিয়ে? তাই ছোট সাহিত্য এমন নির্ভুল, নিখাদ আর পরিস্রুত। জীবনের সবরকম ক্লেদ অশুদ্ধতা অপরিচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে সতর্কভাবে তফাতে রেখে একটা পরিপাটি স্নিগ্ধ বিচ্ছিন্নতার ভেতর অপলক উজ্জ্বল ফুলের মতো সে ফুটে থাকে। এই অতিপরিশীলনের কারণে বিশুদ্ধ কবিতা সহজ হয় না, সর্বজনীন হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণটা সত্যি সত্যি অসাধারণ। বড় সাহিত্যের মধ্যে থাকে উত্তমের গুণ। মহৎ ও তুচ্ছ, চোর ও সাধু, ঠগ ও পুণ্যবান সবার সঙ্গে তার অবারিত চলাফেরা। তার মধ্যে সবাই রয়েছে বলে সবাইকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সবার সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে তার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মধ্যম তার বিচ্ছিন্নতার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট। সত্যিকার অর্থে মধ্যম কে? মধ্যম সে-ই যে আসলে অধম কিন্তু পরে আছে উত্তমের বেশবাস, ভুল পরিচয়ে সবাইকে ঠকিয়ে চলেছে। সাহিত্যের জগতের মধ্যমও একই রকম। আসল হিসেবে সে ছোট, কেননা তার হৃদয়জগতে জৈবতাড়নার সেই বিশাল প্রবল উথালপাতাল নেই; কিন্তু বেশবাসে সে পালিশ-করা, নৈপুণ্যে পারিপাট্যে পুরোপুরি সযত্নচর্চিত—অর্থাৎ ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে উত্তম। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শুদ্ধতা' মাঝারিত্বের পরিচয়বাহী, শ্রেষ্ঠত্বের দ্যোতক নয়। তাই 'শুদ্ধতম কবি' শ্রেষ্ঠ কবি নয়।

ফিরে ফিরে আবারও যেখানে ফিরে আসছি তা হল, সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা বড় লেখকদের তুলনায় অনেক নির্জলা ও বিশুদ্ধ। জ্বলজ্বলে ক্ষুরধার এর দীপ্তি। ছোট পরিসরের মধ্যে শিল্পপ্রতিভার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে এ তৈরি হয় বলে, চশমার কাচে রোদের কেন্দ্রীভূত তীব্র তাপের মতো তা অনায়াসে কিছুকালের জন্যে পৃথিবীর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। ভারি ঝকঝকে আর দ্যুতিময় এ। ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ, শারীরিক কামনায় গোবিন্দ দাস, মধ্যবিত্তের যন্ত্রণায় সমর সেন, গ্রামীণ অন্তরঙ্গতায় জসীমউদ্‌দীন, প্রলেতারীয় চেতনায় সুকান্ত বা সিন্দাবাদের ফররুখ আহমদ এমনি বিশুদ্ধ ও মৌলিক। উজ্জ্বল, অনন্য। কিন্তু বড় মৌলিকতা বিস্তৃত গভীর বিশাল জায়গার ওপর ছড়িয়ে যায় বলে তা অনেক নম্র ও সহনীয়। তাকে শনাক্ত করা দুরূহ। যেন আর দশজন লেখকের মতোনই তা, কেবল একটি জায়গায় আলাদা। সে একটু প্রতারকরকমে উঁচু। মাইকেল, জীবনানন্দ, নজরুল, মোহিতলাল বা সমর সেন—এঁদের লেখা পড়তে গিয়ে যে কেউ প্রথম পরিচয়েই টের পেয়ে যান এঁদের মতো একটা লাইনও লেখা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে কেন যেন আশা জাগে, মনে হয় আমিও হয়তো লিখতে পারব অমন কিছু, হয়তো লিখেও ফেলা যায় পাঁচ সাত লাইন, কিন্তু অষ্টম লাইনে গিয়ে ধরা পড়ে ভুল নম্বরে ডায়াল করা হয়ে গেছে। দেখতে শাদাসিধা মনে হলেও এর মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে আত্মস্থ ও অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একই সঙ্গে এ লেখা কাছের এবং দূরের, সর্বসাধারণের তবু সর্বসাধারণ যাকে কোনোদিন খুঁজে পাবে না।

পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ বা ক্ল্যাসিক লেখকদের মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে সেই গুণ, যাকে বুদ্ধদেব বসু চিহ্নিত করেছিলেন 'প্রতারক সরলতা' বলে। এঁদের জীবন শক্তিমন্ত বলে এঁদের উচ্চারণও সর্বজনীন ও সহজ। শ্রেষ্ঠ লেখকদের এই আপাতসরল স্বভাবটি সম্বন্ধে অবহিত না-থাকায় আমাদের সেই লেখকবন্ধুটি রবীন্দ্রনাথের রচনার এই সহজ ব্যাপারটিকে হয়তো কমদামি বা পড়ে পাওয়া আটপৌরে ব্যাপার বলে ঠাউরে নিয়েছেন। চেতনার ছোট পরিসরে তাঁদের মৌলিকতা কেন্দ্রীভূত নয় বলে তাঁদের মৌলিকতা ঝট্ করে খুঁজে বের করা কঠিন। তাঁদের মৌলিকতা থাকে তাঁদের সমগ্রতায়; পুরো অবয়বে ছড়িয়ে গড়িয়ে। ছোট লেখকদের মতো আলাদা করে চোখে পড়বার জিনিস তা নয়। এইজন্যে ছোট লেখকদের বুঝতে হলে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা পড়তে হয়, আর বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকদের বুঝতে হলে পড়তে হয় তঁদের রচনাসমগ্র। এর মানে এই নয় যে এঁদের লেখার সামগ্রিকতার ভেতর প্রতিভার অসামান্য শক্তিমত্তা প্রদীপিত নয়। দস্তয়েভস্কির অনিঃশেষ প্রচণ্ডতা, কালিদাসের শক্তিমান চিত্রগুণ, স্যাফোর জান্তব হাহাকার, হোমারের প্রচণ্ড পেশিবহুলতা, হাফিজ বা রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় হৃদয়মাধুরী প্রতিমুহূর্তে বুঝিয়ে চলে যে তাঁরা অসাধারণ। সাধারণ কবিরা তাঁদের ছোট্ট উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটি দিয়ে সহজেই চিহ্নিত হয়ে যান—যেমন অমুক দেহবাদের কবি, অমুক ছন্দের জাদুকর, অমুক গণমানুষের কবি, অমুক দাম্পত্যপ্রেমের কবি কিন্তু বড় কবিদের ঠিক এভাবে কোনো বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁদের একজনের ভেতর অনেকজন অসাধারণ কবির শক্তি এমনভাবে মিলেমিশে থাকে যে কোনো-একটি বা দুটি পরিচয়ে তাঁদের শনাক্ত করা অসম্ভব। আসলে এঁদের মৌলিকতা কোনো একটি বা দুটি তীব্র বা দ্যুতিময় গুণের ভেতর থাকে না—থাকে সামগ্রিক সমন্বয়ের ভেতর। সাধারণ কবিদের মতো তাঁরা চাক্ষুষ অর্থে মৌলিক নন, যুগ যুগের অসংখ্য কবির মৌলিকতার এঁরা যোগফল। সভ্যতার বহুকালের ঐতিহ্যকে ধারণ করতে পারেন বলে এঁরা বড়। আপাতমৌলিকতা খুঁজলে রবীন্দ্রনাথকে অতটা উজ্জ্বল মনে নাও হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এতবড় তার কারণ তাঁর মধ্যে গত তিন হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হাজার বছরের ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি শক্তিশালী আবেগে বাঙ্ময় ও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এসব লেখকেরা বড় এঁদের ধারণক্ষমতায়, মানবজাতির যুগযুগান্তরের শিল্পপ্রয়াসকে উচ্চতর ব্যাখ্যা দেবার সামর্থ্যে, সহস্র চক্ষুতায় এবং আদিম ও অপরিমেয় শক্তিমত্তায়। কাজেই ছোট লেখকদের মতো এঁদের ডালপাতার আড়ালে আবডালে মৌলিকতা খুঁজে বেড়াতে গেলে হতাশ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

১৯৯৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা সাহিত্যে অন্তত একটি পুরুষ চরিত্র চাই

জার্মানরা তাদের দেশকে বলে পিতৃভূমি, আমরা বলি মাতৃভূমি। গোগলের 'তারাস বুলবা' উপন্যাসে বুলবার বীর সন্তান অস্তাপ মৃত্যুর আগমুহূর্তে 'দুর্বল মায়ের ক্রন্দন–অনুশোচনা শুনতে চায় নি। শুনতে চায় নি কোনো পত্নীর উন্মত্ত চিৎকার যে নিজের কেশ উৎপাটিত করে তার শুভ্র বক্ষে আঘাত করবে। সে শুধু দেখতে চেয়েছিল দৃঢ়চিত্ত পুরুষকে যার বিজ্ঞ বাণী তাকে দেবে মৃত্যুর পূর্বে শক্তি ও সান্ত্বনা।'

কিন্তু আমরা বেধড়ক মায়ের মুখে 'মাগো বাবাগো' বলে চ্যাঁচানোর সময় সম্ভ্রমবশে মায়ের পাশে বাবাকে কিছুটা কুণ্ঠিত স্থান দিলেও রোগশয্যার একাকিত্বে বা নিঃসঙ্গ জীবনের অসহায়তম মুহূর্তে যার নামটি আশ্বাস এবং নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে উচ্চারণ করতে ভালোবাসি, সেই প্রিয় নামটি মায়ের। আজো বাঙালির কাছে মা–ই শক্তি, আশ্রয় এবং সর্বজয়ী প্রাণের প্রতীক। গ্রিক দেবকুলের রাজা জিউস তাঁর স্ত্রী হেরার তীক্ষ্ণ সন্দেহদৃষ্টি এবং অমানুষিক হিংস্রতার সামনে মাঝেমধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও দেবতা এবং মানুষের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বজ্র নামের যে অমোঘ এবং দুর্জয় অস্ত্রটি তিনি ব্যবহার করেন, তার অধিকার কিন্তু একজন পুরুষ–দেবতারই, কোনো দেবীর নয়। বৈদিক দেবরাজ ইন্দ্র বা রোমান জুপিটারের (স্বর্গ–পিতা) পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বও নিরঙ্কুশ। তাদের ঐশী মন্ত্রিসভায় নারীসদস্য নেই তা নয়, কিন্তু ক্ষমতার সিঁড়িতে তাদের জায়গা অনেক অবহেলিত অবস্থানে।

আবহমান বাঙালি সমাজের চিত্র এর বিপরীত। পুরুষ নয়, নারীই সেখানে যাবতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধির একচ্ছত্র উৎস। নারী সেখানে কেবল নির্ধারক নয়, কাম্য ঈপ্সিত এবং পূজ্য। নিজেদের আশেক (প্রেমিক) এবং ঈশ্বরকে মাশুক (প্রেমিকা) কল্পনা করে ইরানের সুফিরা প্রকৃতির নির্জনতায় শত শত বছর ধরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেছেন, আর আমরা, প্রায় সারাটা জাতি নিজেদের শ্রীরাধা (জীবাত্মা) কল্পনা করে পরমাত্মার (কৃষ্ণের) জন্য তিনশ বছর ধরে নারী–হৃদয়ের উদ্বেলিত বেদনায় 'উদ্বাহু নৃত্য' করেছি। কেবল তাই নয়, এটা সেই জাতি যারা শিবের দেহেও পার্বতীর নারীরূপের লাবণ্য খুঁজে বেড়িয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় আর্যেরা পিতার ভেতরেই শক্তি ও কর্তৃত্বের ঐশ্বরিক প্রতীককে প্রত্যক্ষ করেছেন, মাতার ভেতর নয়।

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ'

এই কথা পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় আর্যসমাজের মূল আর্তি। এটা সেই সমাজ যেখানে পিতৃসত্য পালনের জন্য রামকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করে নিঃসঙ্গ বনবাসে পাঠানো হয়েছে, পরশুরামকে দিয়ে পিতার আদেশে ঘটানো হয়েছে মাতৃহত্যা, পিতার ভোগলিপ্সার বেদিতে আত্মাহুতি দিয়ে পুরুকে দিয়ে নিজের যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয়েছে এবং মহাভারতের বিখ্যাত দ্যূতক্রীড়া পর্বে পিতার প্রতিনিধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের মূঢ় সিদ্ধান্তের শিকারে পরিণত করে রাজ্য, ভ্রাতা ও বধূকে অসম্মানিত নিঃশেষের শেষপ্রান্তে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

বাঙালি সমাজের সঙ্গে আর্য, গ্রিক, রোমান, পারসিক বা অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজের মূল পার্থক্য এখানে যে, ওই সমাজগুলো যেখানে মূলত পিতৃতান্ত্রিক, সেখানে আমাদের নদীমাতৃক কৃষিবহুল জীবন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মাতৃতান্ত্রিক। চট্টগ্রামের মারমা-মুরংদের গ্রামে এমন একটা পারিবারিক দৃশ্য কল্পনা করা অবাস্তব নয়, যেখানে নারীরা খাদ্য বা জীবিকার অন্বেষণে বাড়ির বাইরে গিয়ে উদয়াস্ত সংগ্রাম করছে আর পুরুষরা দাওয়ার নিচে সন্তান কোলে নিয়ে বসে তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টায় প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে চলেছে। এই সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক উঁচুতে থাকার কথা, ছিলও তাই। নারী এখানে কর্তা, প্রতিপালক, সমৃদ্ধি ও বরাভয়ের উৎস এবং দৈবের নিয়ামক।

এজন্যেই কালের অগ্রযাত্রার ভেতর দিয়ে যেসব দৈবী ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা ও পূজায় অভিষিক্ত হয়েছে তারা প্রায় কেউই দেবতা নন, সবাই দেবী। না, আবহমান বাঙালির কোনো দেবতা নেই, ছিল না। দেবতা বলে যে দুয়েকজনের নাম পাওয়া যায় (ধর্মরাজ, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, সত্যনারায়ণ) তারা সংখ্যায় যেমন হাতে-গোনা, শক্তির দিক থেকে তেমনি অনুল্লেখ্য। নারীই বাঙালির জীবনের ত্রাতা, উদ্ধার এবং মঙ্গলের প্রতীক। বাংলাদেশের একালের প্রধান দেবী দুর্গা—নারী। অন্নদায়িনী অন্নদা বা অন্নপূর্ণাও তিনিই। শক্তির অধিষ্ঠাত্রী কালী নারী। নদী অরণ্য-পরিকীর্ণ মধ্যযুগের মেঘাচ্ছন্ন বাংলাদেশের হিংস্র কুটিল সর্পদেবী মনসাও নারী। শক্তিশালী ব্যাধ বা সবর সম্প্রদায়ের দেবীও নারী। পিতৃতান্ত্রিক আর্যদের সভায় পুরুষ-দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মতো এক-আধজন কল্যাণী মূর্তি হয়তো তবু পাওয়া যাবে কিন্তু বাঙালি দেবসম্প্রদায় প্রায় নিরাপোষ-রকমে নারীবাদী। পুরুষদের স্থান সেখানে পুরোপুরি উপেক্ষিত।

পরবর্তীকালে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পথ ধরে, পুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধিপত্যের মুখে এই সমাজের নারীপ্রাধান্য ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করলেও নারীর এই সংগ্রামী, শক্তিমন্ত ও কল্যাণী রূপ দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজে বহমান ছিল। মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার অবিচল শপথে উদ্যত মনসামঙ্গল-এর বেহুলা যে অনমনীয় আত্মবিশ্বাসে স্বামীর মৃতদেহ ভেলায় তুলে অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছিল, চারপাশের মোহকে জয় করে যেভাবে স্বর্গে পৌঁছেছিল, অনিন্দ্যনৃত্যে ইন্দ্রকে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল বা যেভাবে শ্বশুরকে মনসার বেদিতে পুজো দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল—সবকিছুর মধ্যে সেই সংগ্রামী ও কল্যাণী নারীর অপরাজেয় প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া যেভাবে নদের চাঁদকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেদের দল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে, সওদাগরের অভিলাষকে ব্যর্থ করে তাকে সদলে ধ্বংস করেছে, সন্ন্যাসীর কবল থেকে স্বামীকে ও নিজেকে বাঁচিয়ে বেদের দলের হিংস্র আক্রমণ এড়িয়ে সুখের জন্য সংগ্রাম করেছে—তার মধ্যেই নারীর এই মঙ্গলময় ও শক্তিমন্ত রূপটি স্পষ্ট হয়ে আছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজে নারীপ্রাধান্যের জায়গায় পুরুষপ্রাধান্য ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু এ সমাজের পুরুষ এখনো সাবালক হয়ে ওঠে নি। আমাদের সমাজের পুরুষ এখনো অস্থিমজ্জাহীন এবং অক্ষম; জীবনসংগ্রামে অবিশ্বাসী ও উদ্যোগহীন, শক্তি-কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিচলিত এবং আত্মপ্রত্যয়ে আস্থাহীন। বাঙালি পুরুষের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিনিধি শ্রীকান্ত সুযোগ পেলে প্রেমিকার আশ্রিত হয়ে বেঁচে থাকতে সংকোচ অনুভব করে না এবং নিরুপায় অবস্থায় প্রেমিকা তাকে বিদায় করে দিলে এই দার্শনিকতত্ত্বের আড়ালে আত্মসান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে যে, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, তাহা দূরেও ঠেলিয়ে দেয়।' এমনই আত্মমর্যাদাহীন আর অসহায় আমাদের জাতির অন্যতম প্রধান পুরুষচরিত্র।

পুরোপুরি স্বকপোলকল্পনা থেকে কোনো লেখক কিছুই লিখতে পারে না। এতে লেখা অশিল্পে পর্যবসিত হয়। সমাজে যা থাকে লেখকেরা সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটান। বাঙালি নারীর শক্তি সংগ্রাম এবং মঙ্গলময় রূপ বাঙালির জীবনের সামনে উজ্জ্বল মহিমায় দীর্ঘকাল কিরণ ছড়িয়েছিল বলেই সারা বাংলাসাহিত্য জুড়ে সেই মহিমার ছবি এমন অবিরল। কিন্তু শপথের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ পুরুষ কোথায় বাংলাসাহিত্যে? মহুয়ার পাশে নদের চাঁদ, রোহিণীর পাশে গোবিন্দলাল, কুসুমের পাসে শশী ডাক্তার কেবল অপদার্থ নয়, হাস্যকর। একেকবার আমার সন্দেহ হয় বাংলাসাহিত্যে সত্যিকার পুরুষচরিত্র আদৌ আঁকা হয়েছে কি না কখনো? প্রাগৈতিহাসিক-এর ভিখুর ভেতর আদিমতার শক্তি থাকলেও মনে রাখতে হবে ভিখু পুরুষ নয়, জন্তু। সিরাজদ্দৌলার বক্তৃতাসর্বস্ব অসহায়তা ও আস্ফালন অসহনীয়। মহেন্দ্র মূঢ়, মধুসূদন বর্বর এবং হোসেন মিয়ার বিশাল স্বপ্নসাম্রাজ্য যতটা অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বিধানে তৈরি ততটা বাস্তব সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় শক্তিশালী নয়। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা, এ যাবৎকালের বাংলাসাহিত্যে সত্যিকার পুরুষচরিত্র চিত্রিত হয়েছে মোট দুটি। একজন মধ্যযুগের চাঁদ সওদাগর—কালের পরিপ্রেক্ষিতে অতিকায় রকমের আত্মপ্রত্যয়ী ও বলীয়ান—নিজের ধ্বংস বা পতন নিশ্চিত জেনেও সমস্ত ভীতি আর সন্ত্রাসের সামনে অপরাভূত ও অবিচল। দ্বিতীয়জন গোরা, প্রচণ্ড ও বলিষ্ঠ জীবনাগ্রহে জ্বলন্ত। কিন্তু ঘটনা উন্মোচনের ভেতর থেকে একসময় বেরিয়ে পড়ে দুজনার একজনও বাঙালি নয়—প্রথমজন, চাঁদ সওদাগর, আর্য; দ্বিতীয়জন, গোরা, আইরিশ।

শক্তিতে ও সংগ্রামে দৃপ্ত পুরুষচরিত্র বাংলাসাহিত্য আজো আমাদের উপহার দিতে পারে নি। আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক পৌরুষদীপ্ত নায়ক আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি—বিদ্যাসাগর, মাইকেল, আশুতোষ, সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, নজরুল, ফজলুল হক বা শেখ মুজিবের মতো অনেক পরাক্রান্ত পুরুষচরিত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এঁরা সবাই বাঙালিত্বের স্বপ্ন, এর বাস্তবতা নয়। এঁরা বাঙালি জীবনের প্রতিভা ও ত্রাতা। বাস্তবের বাঙালির ভেতর আজো কি তেমন কোনো পুরুষ চরিত্রের উত্থান ঘটে নি? না হলে এত অসংখ্য উজ্জ্বল নারীচরিত্রের পাশে কেন এই সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একজন পৌরুষদীপ্ত চরিত্র চিত্রিত হল না।

১৯৯৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পের বাস্তব

'পোস্টমাস্টার' গল্প লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখনই একবার লিখে ফেললেন যে রতনের বয়স তেরো বছর, সে একজন অজ পাড়াগাঁর মেয়ে—সে-মুহূর্ত থেকে ওই গল্পের জন্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার দরকার মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। এখন থেকে যে অনুভব করবে, ভাববে, সম্ভাবনায় উৎকর্ণ ও কষ্টে বিপর্যস্ত হয়ে জীবনকে পায়ে পায়ে রচনা করবে—তার নাম রতন। এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাজ একটিই : ওই মেয়েটিকে অনুসরণ করে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে যাওয়া। কৈশোর-যৌবনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানো অজ পাড়াগাঁর তেরো-চৌদ্দ বছরের একজন উন্মুখ অবোধ কিশোরী যা ভাবতে পারে, করতে পারে, অবোধ অস্ফুট অপরিণত আবেগের কারণে পৃথিবীতে যতরকম দুর্দৈবের হাতে বিপর্যস্ত হতে পারে—ইচ্ছামতো তাই সে একে একে করতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দায়িত্ব হল রতনের সেই স্বেচ্ছাযাত্রাকে, তার প্রতিটি পদপাতের ইতিহাসকে বিশ্বস্ত তুলিতে এঁকে চলা। রতনকে তিনি পথ বাতলাতে পারবেন না, আদেশ-নির্দেশ দিতে পারবেন না। বিপদ-বিপর্যয়ের মুখে সতর্ক করতে পারবেন না। কেবল নীরবে অনুসরণ করবেন। এই অনুগমনের পথ ধরে ওই গল্পে যার ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে সেটি মূলত রবীন্দ্রনাথের নয়, রতনের। রতন যত উজ্জ্বল আর রক্তপ্রাণময় মানুষ হবে, রবীন্দ্রনাথ ততটাই সফল।

এইভাবে শিল্পী জীবনের কাছে জিম্মি। জীবন ঠিক যেরকম তাকে মোটামুটি সে হিসেবে আঁকাই তাঁর কাজ। এই জীবনকে বাঁকিয়ে, দুমড়ে, ভেঙেচুরে নিজের ইচ্ছেমতো করে গড়েপিটে অন্য কিছু বানিয়ে নেবার অধিকার তাঁর নেই। এমনটা করলে তিনি বড়জোর নিজের ব্যক্তিগত ছবিটুকুই এঁকে যেতে পারবেন। কিন্তু বাইরের বিশ্বচরাচরের বিশাল অবয়ব থেকে যাবে তাঁর নাগালের ওপারে। ফলে তিনি নিতান্তই ছোট মাপের শিল্পী হয়ে দাঁড়াবেন।

এজরা পাউন্ড হয়তো এজন্যেই একবার লিখেছিলেন : খারাপ শিল্পী মাত্রেই অপরাধী, কেননা তারা জীবনের ভুল ছবি তুলে ধরেন। একজন শিল্পী তো কালের দলিলরক্ষক, রেকর্ডকিপার। একজন প্রকৃত শিল্পী তো তিনিই যিনি তাঁর কাল ও পরিপার্শ্বের বিশ্বস্ত ছবিকে আগামী পৃথিবীর সজীব অনুভবের জন্যে রেখে যান। এই দরকারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যা আঁকতে যাচ্ছেন তার ওপর যদি ফিরে ফিরে কেবলই নিজের ছোপ লাগাতে থাকেন, তবে আগামীকালের পৃথিবী তাঁর লেখার ভেতর তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে পেলেও তাঁর অব্যবহিত পৃথিবীকে খুঁজে পাবে না। একজন শিল্পী যা-কিছুই আঁকেন তাকে তাঁর ভিতরকার রুচি ও পরিশীলন দিয়ে তিনি আলোকিত করে তুলতে পারেন, তাঁর জ্বলন্ত বাস্তববোধের স্পর্শে বিশ্বাসযোগ্য ও রক্তমাংসময় করে তুলতে পারেন—উচ্চায়ত মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টির সংক্রামে তাকে বড় করে তুলতে পারেন, কিন্তু তার সত্য পরিচয় থেকে তাকে সরিয়ে অন্য কিছু করে তুলতে পারেন না। এটা করতে গেলে শিল্প শক্তিহীন হয়ে পড়েন।

বাংলা কথাসাহিত্যে আমি এযাবৎ দুজন লেখকের কথা ভাবতে পারি যাঁরা তাঁদের চারপাশের জীবন ও পৃথিবীকে বিশ্বস্তভাবে আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সাহিত্যের বাকি প্রায় সবাই জীবনকে আঁকতে চেয়েছেন জীবনের চেয়ে সুন্দর বা কদাকার করে। এঁদের চোখে সুন্দরতর বা কুৎসিততর পৃথিবীর একটা করে স্বপ্ন ছিল। শিল্পরচনার সময় সেই স্বপ্ন থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র হয়ে একালের শীর্ষেন্দু পর্যন্ত প্রায় সব লেখকই এই ধারার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে একটা ছোট্ট ও চমৎকার ইঙ্গিত করেছিলেন :

> 'রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয়, এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়-ভারে ভারাক্রান্ত, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতের অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।'

জীবনকে অতিক্রম করার নামে জীবনকে ওইসব লেখকেরা এমনি বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে আনেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলো থেকে আরম্ভ করে সামাজিক উপন্যাসগুলোর সবখানে তাঁর এই স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটোকে দেখতে পাওয়া যায়। বড়বেশি তিনি খুঁজেছেন এই পৃথিবীর কাছে, যা কোথাও নেই অথচ যা থাকলে তিনি খুশি হতেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মতো উপন্যাসও এই আদর্শায়িত দৃষ্টির আক্রমণ এড়াতে পারে নি। শরৎচন্দ্রের পৃথিবীও মোটামুটি তাঁর আদর্শেরই পৃথিবী। এইজন্যেই তা একরৈখিক ও অচিরকালীন। একদিকে তুচ্ছ উজ্জ্বল বাস্তবতা, অন্যদিকে অপ্রাপনীয় আদর্শলোকের অভিঘাতে তা মাঝারি। এইরকম ঘটনা বাংলাসাহিত্যের প্রায় সব ঔপন্যাসিকের বেলাতেই ঘটেছে। এই ধারার প্রথম ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনি পাঠককে বলছেন, আমি জীবনের শিল্পী। এই জীবনের বিশ্বস্ত দলিল আমাকে রেখে যেতে হবে। জীবন যেমনটি তা যত নির্মম ও যন্ত্রণাদায়ক হোক, হুবহু ওই জীবনই আমাকে আঁকতে হবে—তার বেশিও না, কমও না। ওই সত্যটুকুর জন্যেই আমি শিল্পের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 'শেষের কবিতা'র অমিত এবং লাবণ্যের বিচ্ছেদ কষ্টদায়ক, কিন্তু জীবন যদি অমন রক্তঘাতীই হয় তবে কী করার আছে লেখকের—নিঃশব্দ মূক বেদনায় জীবনের ওই অবধারিত প্রতিকৃতি এঁকে যাওয়া ছাড়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। রতনের বয়স তেরো বছর। এরই মধ্যে কখন অগোচরে যে তার ভেতর কৈশোরকে সরিয়ে যৌবন ঘাতকের মতো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে জানে নি। যখন টের পেয়েছে তখন এক বিশাল নিঃসঙ্গতার ভেতর নিজেকে সে আবিষ্কার করেছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও অসহায় অবস্থায়।

পোস্টমাস্টারও প্রথমে রতনের অনুভূতিকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন নি। বুঝেছেন যখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে তখন :

> "যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কতো বিচ্ছেদ, কতো মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"

পোস্ট মাস্টারের মনে হয়েছিল, 'ফিরিয়া যাই', এ–অনুভূতি কেবল পোস্টমাস্টারের নয়, প্রতিটি মানুষেরই—তাদের প্রতিটি বিদায়–মুহূর্তের। পিছে ফেলে যাওয়া পৃথিবীকে অনেক বড় বলে মনে হয় তখন। তাকে আর একবার পাবার কথা মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন এই মুহূর্তের এই আকাঙ্ক্ষাটুকুর মধ্যে কোনো খাদ নেই। কিন্তু এও জানেন যে, ব্যাপারটা যত আকাঙ্ক্ষিতই হোক, ফিরে যাওয়া যায় না। সামনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ব্যাপ্ত পৃথিবী তখন অবারিত বিপুল আমন্ত্রণে ডাকছে। পালে বাতাস পেয়েছে, বর্ষার স্রোত খরতর হয়ে বইতে শুরু করেছে, 'গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান' দেখা দিয়াছে, এবং 'নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয়' ইতিমধ্যেই হয়েছে: 'ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।' রবীন্দ্রনাথ জানেন মানুষ আন্তরিকভাবেই পেছনে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু সে ফেরে না। জীবনের অগ্রসরমান প্রয়োজন তাকে ছিঁড়ে নিয়ে আসে। ('এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত/এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেইমত'।) রবীন্দ্রনাথ জানেন জীবন এমনি নিষ্ঠুর ও রক্তদীর্ণ। এই সত্য মৃত্যুর মতো, বিদায়ের মতোই নির্মম। তাই তিনি পোস্টমাস্টারের নৌকাকে পদ্মার বিস্ফারিত জলধারায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন নি।

একটা ভেদাভেদহীন বাংলা সিনেমা হলে এমন জায়গায় হয়তো উল্টোরকমের একটি ছবিই পেতাম আমরা। দেখতাম, সেই মুহূর্তে—যখন পোস্টমাস্টারের মনে হয়েছে 'ফিরিয়া যাই'—নায়ক আবেগের উদ্দীপনায় ঘটিয়ে বসত একান্ত ঈপ্সিত সেই ঘটনাটিই: উদ্বেল আগ্রহে জ্বলে উঠে হেঁকে উঠত : মাঝি, নৌকা ফেরাও। তার 'নৌকা ফেরাও' কথাটা হয়তো শব্দগ্রহণ যন্ত্রের বিস্ময়কর কৌশলে উত্তাল পদ্মার বুককে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে প্রতিটা দর্শকের মনে আশার কাঁপন জাগিয়ে তুলতে। তারপরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো দেখা যেত উদ্দাম বাতাস লাগা স্ফারিত পালে নৌকা ছুটে চলেছে ঘাটের দিকে। আর সেইসঙ্গে একবার পোস্টমাস্টারের আকুল চেহারা, একবার রতনের উজ্জ্বল মুখ ঘনঘন ক্লোজআপে দেখতে থাকতাম আমরা এবং তারপরই হয়তো দেখতাম আমাদের অন্তরের সবচেয়ে কাম্য সেই ছবিটি : নৌকা ঘাটে লাগার আগেই 'আমি এসেছি রতন' বলে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে রতনের দিকে পোস্টমাস্টারের মরিয়া ছুটে যাওয়া এবং একই গতিতে নদীর ধারে অপেক্ষমাণ আকুল রতনের এগিয় আসা এবং তার পরেই উভয়কে উভয়ের বুকে আছড়ে পড়ার আলিঙ্গনাবদ্ধ উদ্দাম ও পরিতৃপ্ত দৃশ্য। সিনেমাহলের দর্শকদের তুমুল প্রবল করতালির মধ্যে মিলনদৃশ্যটি উদযাপিত হত এভাবেই।

চলচ্চিত্রের পরিচালক দৃশ্যটিকে এভাবে আঁকতে চাইতেন, কারণ এটাই আমাদের সবার চাওয়া। জীবন এমনটি হলেই আমরা খুশি। কিন্তু জীবন যে আমার-আপনার চাওয়া-পাওয়ার তোয়াক্কা করে না, জীবন যে নিজে একটা নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম পৃথিবী—এটা কেবল বড় শিল্পীরাই টের পান। বড় শিল্পী হলেন ক্রিকেট মাঠের আম্পায়ার। যাঁর সামনে দিয়ে তাঁর দেশের দলের একের পর এক ব্যাটসম্যান আউট হয়ে মাঠ থেকে মুখ নিচু করে চলে যাবে, সারা জাতি বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। অথচ হাতের নিঃশব্দ ইশারায় বিদায়-ঘোষণা ছাড়া তার করণীয় কিছু থাককে না। এইজন্য জীবনের ভুল ছবি তাঁদের কাছ থেকে আমরা কম পাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কুসুমকে একদিন চলে যেতে হয়। আমাদের সবার বেদনাকে পায়ে দলেই সে যায়। না গিয়ে সে কী করবে। কুসুম যে তখন আর নেই। তার হৃদয় যে মরে গেছে। এই ধরনের নিষ্ঠুর বাস্তবকে নিরঞ্জন চোখে আঁকতে পেরেছেন বলেই জীবনের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছবি পাওয়া গেছে এঁদের হাত থেকে।

এরই পাশাপাশি একটা ছোট্ট উদাহরণ—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলক্ষ্মীকে তুলনা করলে শক্তির অনটন স্পষ্ট হবে। কৈশোরে রাজলক্ষ্মী যেমন অপরিণতভাবে বঁইচি ফুলের মালা দিয়ে শ্রীকান্তকে, তার অজান্তে, চিরকালের মতো বরণ করে নিয়েছে এবং পরে, উপন্যাসের পরিণতিতে, পরের জন্মে শ্রীকান্তকে পাওয়ার ইচ্ছায় আকুল হয়েছে তা থেকে টের পেতে দেরি হয় না পুরো উপন্যাসের ভিত্তিকে তা কী অবাস্তবতা আর অপরিণতির ভেতর নিক্ষেপ করেছে। আমরা ঈপ্সিতকে পেয়েছি কিন্তু হারিয়ে গেছে শিল্পকে।

১৯৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক কবিতায় ইঙ্গিত

কবিতা কী, কথাটা বললে অভ্যস্ত বাকপটুতায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তার একটা চটপট উত্তর দিয়ে দেওয়া যায় না, তার কারণ, আর যেখানেই হোক, অন্তত কবিতার বেলায় কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞার একচেটিয়া প্রভুত্ব কেউ কোনোদিন মেনে নেন নি। এই না-মেনে নেবার আসল কারণটা বোধহয় এই যে, পৃথিবীতে যে-কোনো একটা সংজ্ঞা যতখানি বলতে পারে, কবিতা তার চাইতে বড়। আর বড় বলেই তাকে নানা কথায়, নানা ইশারায় বুঝিয়ে বলতে হয়।

উনিশ শতকের ইংরেজ কবিদের অনেকেই কবিতার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সবার উক্তির মধ্যেই অল্পবিস্তর সত্যতা আছে কিন্তু কারো যে-কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞার মধ্যে কবিতার সবটুকু সত্যকে আমরা একখানে করে পাই না; যতটুকু যা পাই তা তাঁদের সবগুলো সংজ্ঞাকে এক করলে। আসল কথা, তাঁরা সবাই কবিতার জাতি নির্ণয় করতে গিয়ে গোষ্ঠী নির্ণয় করেছিলেন।

যে-কোনো শিল্পের বেলাতেই এ অসুবিধা ধরা পড়ে। যদি বলা হয়, কবিতার কবিত্বগুণ জিনিসটি কী? আমি বলব, তার আগে জানা দরকার কবিত্বগুণ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা কী? যদি বলা হয়, কেবল ভাষা, কিংবা কেবল ছন্দ কিংবা কেবল শব্দ কবিতার মূল কথা; তবে তার উত্তরে বলব, এর প্রতিটিতে আংশিকভাবে কবিতার পরিচয় থাকলেও পুরোপুরি পরিচয় হয়তো নেই। কেননা কবিতায় ছন্দ, শব্দ সবই শিল্পের জন্য অপরিহার্য হলেও, শুধুমাত্র ছন্দ কিংবা শুধুমাত্র শব্দচয়নই শিল্প নয়। যা শিল্প তা এদের সবগুলোর সাধারণ গুণ মিলিয়ে তার মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে, কিংবা সব মিলিয়ে তা এমন একটা কিছু যাকে নানান ইশারায় ইঙ্গিতে আভাসিত করা যায়, বুঝিয়ে বলা যায় না।

কিন্তু এক কথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব না হলেও শিল্প কী, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা যুগে যুগে চলেছে এবং তার ফলেই আজ আমরা কবিতার আলোচনায় কবিত্বগুণ বলতে কবিতার এমন কিছু লক্ষণকে বুঝে নিতে পেরেছি যা দিয়ে এই আলোচনার কাজটা মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায়। আধুনিক কবিতার শিল্পবৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধেও ওই একই কথা মোটামুটি খাটে।

কবিতার আর্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন যুগের লেখকেরা বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে কবিতার আর্ট সম্বন্ধে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছি। বলাবাহুল্য এই আর্টের কোনো নতুন ব্যাখ্যা এ আলোচনায় আমি দিতে চাই না। আমার লক্ষ্য এই কবিতার কাণ্ডের দিকে নয় বরং এর ওপরের ফুলপাতাবহুল ইশারা আর ইঙ্গিতের দিকে। এই কবিতা পাঠ করতে গিয়ে এর ইঙ্গিতের রূপটি আমার চোখে যেমনভাবে ধরা পড়েছে, সেটাকেই আমি নিজের কথায় বলার চেষ্টা করব।

কথা সরাসরি বা শাদামাঠা করে বললে তা যে সাধারণত কবিতা হয় না, সাহিত্যের মহলে এ-বিষয়ে আজ পর্যন্ত খুব একটা দ্বিমত নেই। সে কারণেই কবিতার মধ্যে ছলাকলার প্রশ্নটি সবকালেই গ্রহণীয় হয়েছে। কবির কাজ হবে লুকিয়ে ফেলা, আর পাঠক তাকে উদ্‌ঘাটন করবেন, এই নান্দনিক লুকোচুরির আনন্দটাই কবিতার আসল কথা।

তবু এই ছলাকলার চরিত্র নিয়ে আধুনিক কবিতার সঙ্গে আধুনিক-পূর্ব কবিতার একটা পার্থক্য রয়েছে। আমার ধারণা এই পার্থক্য মাত্রার পার্থক্য। এতদিন কবিতা যে সংজ্ঞা মেনে চলেছে তার আসল কথা হল, 'সবটাই বলে দিও না, কিছুটা রেখো।' অর্থাৎ সরাসরিভাবে সবটুকু বলে ফেললে তা আর কবিতা হয় না, তার মধ্যে একটা না-বলা থাকা চাই, যেটুকু কোনোদিন বলা হবে না বলেই তা চিরদিন আমাদের কাছে ভালো লাগতে থাকবে। কিন্তু সেখানে সেইসঙ্গে এ-কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাই বলে এই না-বলাটা যেন এতখানি না হয়ে পড়ে যাতে করে তার আসল অর্থটাই একেবারে লুপ্ত হবার জোগাড় হয়। আসলে বলাটাই থাকবে সেখানে মূল কথা, না-বলাটা সেই বলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সেই বলাটাকে আরও বড় করে বলতে থাকবে।

আধুনিক কবিতায় যে প্রবণতাটা দেখা যাচ্ছে, অনেকদিক থেকেই তাকে এর থেকে আলাদা সারির বলে মনে হয়। এখানে যে-কথাটা বড় হয়ে উঠেছে সেটা হল, সবটুকুই রেখে দিও না, কিছুটা বোলো-ও। যেন ঝোঁকটা না-বলার দিকেই : আর এই না-বলার মধ্যে যেটুকু বলে দেওয়া থাকবে সেটুকুকে অবলম্বন করেই যেন বলাটুকুর দরবারে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা। অন্য কথায়, এর যেটুকু বলা তা যেন অনেকটা কেবল এর ভেতরের ভাবটাকে ধরিয়ে দেবার জন্যেই, যাতে করে সে এই বলাটুকুকে বুঝে নিয়ে এর না-বলাটুকুকে বুঝবার জন্যেও এগিয়ে যেতে পারে। একজন পরিচিত আধুনিক ইংরেজ কবির একটি উক্তির মধ্যে কথাটার প্রমাণ মিলবে। কবি বলছেন : কবিতার অর্থ সবটা লুকিয়ে না ফেলে কিছুটা বাইরে রেখে দেওয়াই ভালো। কেননা, তার মধ্যে পাঠকের মন যখন ধরবে, নিজের কাজে কবিতা তখন সহজেই এগিয়ে যেতে পারবে। আর কবিতার এই কাজটা যে কী ধরনের সে-কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, চোর রাত্রিবেলায় বাড়ির পোষা কুকুরের সুমুখে মাংস ছুড়ে দিয়ে যেভাবে নিজের কাজ সেরে চলে যায়, এ-ও অনেকটা তেমনি।

কবিতায় ইঙ্গিতের ওপর জোর সব যুগে সব সাহিত্যে প্রায় একই রকমভাবে দিয়েছে। বলার ভেতর দিয়ে কবিতা যতটা বলেছে না বলে বলেছে, তার-চাইতে অনেক বেশি। কবিতা সম্বন্ধে তাই এখন অন্তত একটা কথা বলতে পারি যে, কবিতা বলে কম কিন্তু করে বেশি। কথাটা অবশ্যি আরও কিছুটা খোলাসা করে বলা দরকার।

প্রথমে একটি পুরোনো কবিতার উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শ্যামের নাম রাধা শুনে উতলা হয়েছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কিন্তু যে একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই।" চণ্ডীদাসের "কে বা শুনাইল শ্যাম নাম" কবিতার অনুভূতির তীব্রতার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, তার শেষ নেই বলেই নিজেকে প্রকাশ করার জন্যেই সে এমন ব্যাকুল।

এবার আসা যাক—এ-যুগের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর 'চিল্কায় সকালে'র নায়কের মনেও একটা বেগ জন্মেছে, আর তাই সেও এমনি কিছুই বলতে চায়। সে বলে, তোমাকে ভালোবেসে আমি আকুল হয়েছি বটে, কিন্তু কী করে বোঝাই তোমাকে আমি কত ভালোবাসি। মুখের ভাষা দিয়ে তো সে আকুলতাকে বোঝানো যাবে না, পৃথিবীর সব কথা একখানে করলেও আমার মনের সে ব্যাকুলতাকে বলা হবে না! তবে কী করে বোঝাই তোমাকে? 'কেমন করে বলি?' 'কেবলি ঢেউ উঠতে লাগল।' তাই দেখা যাচ্ছে, রাধার মতো তারও মনে একটা আকুলতা আছে, তবে রাধার মতো সে মনের সব কথাকেই বলে দিচ্ছে না, একটু অন্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে। রাধা যেখানে মনের সব কথাকে বলে ফেলে নিজেকে ব্যক্ত করেছে, এ কবিতার নায়ক সেখানে নিজেকে ব্যক্ত করছে অনেকখানি না-বলে। আর এই না-বলার মধ্যদিয়েই বলাটা আমাদের কানে বাজতে থাকল।

দুটোর মধ্যেই কবিতা আছে, কেননা দুটোই সুন্দর করে বলা। তফাতটা কেবল এই যে একটাতে কবি নিজের সবটাকে ব্যক্ত করেছেন সুন্দর করে বলে, অন্যটাতে কবি নিজেকে সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন সবটাকে না-বলে। আর এখানেই আধুনিক কবিতার সঙ্গে আধুনিক-পূর্ব কবিতার পার্থক্য চিহ্নিত হয়ে যায়, আধুনিক কবিতা এগিয়ে আসে। একটা সংযম, একটা সংক্ষেপ এখানে বড় হয়ে ওঠে যা একটা গভীর ইশারা করার ভেতর দিয়েই শেষ হয়ে যায়। 'চিল্কায় সকাল' সম্বন্ধে বলতে পারি, এই সংকেতের গুণে এর বক্তব্যই এখানে কবিতা হয়ে উঠেছে। কবিতায় ইঙ্গিতের আসল সার্থকতাই এখানে। অনেক সময় ইঙ্গিতই যেন কবিতা।

এ প্রসঙ্গে এখানে আর একটি কবিতাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। কবিতাটি চিল্কায় সকালের তুলনায় আরও একটু একালের। কবিতাটির নাম 'একদিন একটি লোক' :

একদিন একটি লোক এসে বলল, 'পারো?'
বললাম 'কী?'
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে'। সে বলল আরো,
'সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'
'কেন?' আমি বললাম শুনে।
সে বলল, 'আমি সেটা পোড়াব আগুনে।'

[ওমর আলী]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যস! আর বলে দিতে হল না। এই সামান্য কথা কয়টির পেছনে অতীতের একটা পরিপূর্ণ কাহিনী আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা নিরপরাধ প্রেমিক, তার হৃদয়ের পবিত্র প্রেম—একটি সুন্দরী নারীর প্রবঞ্চনা—ধুলায় রক্তে মিশে যাওয়া সেই প্রেমিকের হৃদয়ের অসহায় আর্তনাদ এবং সর্বশেষে তার ক্ষুব্ধ মনের বিকৃত প্রতিহিংসা— সব যেন একসঙ্গে কবিতাটির মধ্যে কথা বলে উঠল। অথচ কী আশ্চর্য সংযম, এতটুকু বাজে খরচ নেই। না কথার, না আবেগের। যেন কবি এতটুকু বলেই পাঠককে বলে দিতে চান, আমি আর বুঝিয়ে বলব না, এবার তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। আর আমাদেরও তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, কেননা কবি এর মধ্যেই আমাদের সবটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটাকেই কবিতার ইঙ্গিত বলতে পারি। এখানে বক্তব্যের মিতব্যয়িতা দেখতে পেলাম, কথার সংযমও পুরোপুরি। ঠিক এ ধরনের একই ভাবের কবিতা যদি দেড়শ বছর আগে কোনো কবির হাতে গিয়ে পড়ত তবে তা যে কীভাবে প্রকাশ পেত, কীটসের 'লা বেলে ডেম্ স্যান্স মার্সি' পড়লে পাঠকের তা আন্দাজ করে নিতে কষ্ট হবে না।

বলাকে কমিয়ে এনে ইঙ্গিত দিয়ে তার জায়গা ভরিয়ে তুলবার এই অভিযান আধুনিক কবিতার সব জায়গায় নিজের পায়ের ছাপ রেখে গেছে। উপমাগুলো হয়ে পড়েছে অপাতদৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ, তার অনেকখানি বলা থাকে, অনেকখানিই থাকে না, নিজের অনুভূতির গভীরতায় পাঠককে তা বুঝে নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে আধুনিক কবিতার ও আধুনিক-পূর্ব কবিতার একটি করে বিখ্যাত উপমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তফাতটা দেখানো যাক। কোনো সদ্যনীরব বিষাদাকুলা রমণীর উপমা দিতে গিয়ে মাইকেল যখন তাকে বর্ণনা করেন 'নীরবিলা শোকাকুলা হায়রে যেমতি/নীরবে ঝংকৃত বীণা' বলে তখন আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, আর যাই হোক, উপমা ও উপমেয়ের মধ্যে যোগসূত্র এখানে এমন অচ্ছেদ্য যে এর ফলে কেউ কাউকে কোথাও পুরোপুরি ছেড়ে যেতে পারছে না। এখানে যতটুকু বলবার তার সবটাই যেন বলা হয়ে গেছে, আর যেন কোনোকিছু বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। কিন্তু এ-ধরনের একটা চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এ-যুগের জীবনানন্দ দাশ যখন তার প্রেমিকার চোখদুটোকে 'পাখির নীড়ের' সঙ্গে তুলনা করে বসেন, তখন স্বতই মনে হয়, উপমাটা সুন্দর হল নাহয় মানলাম, কিন্তু পাখির নীড়ের সঙ্গে চোখের সম্বন্ধটা কোথায়? এখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটা কি আকারগত না প্রকারগত তার কোনো সঠিক উত্তর তো এর মধ্যে দেওয়া নেই। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এখানে কোনো একটি কথাকে গোড়া থেকেই অনুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছে যার সবটা কোনোদিন ব্যক্ত হবে না বলেই যা আমাদের কাছে আরও গভীরতর ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা পড়বে এবং এই উপমাটিকে আমাদের চেতনার ওপর আরও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল করে রাখবে। কবি এখানে প্রিয়ার স্নিগ্ধ শান্ত চোখদুটির সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা দিতে গিয়ে তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন একটি চোখ যা পাখির নীড়ের মতো 'স্নেহ ও আশ্রয়ে পরিপূর্ণ'। এখানে 'পাখির নীড়ের মতো'— এই ধ্বনি কয়টির মিষ্টি ব্যঞ্জনাটুকুর মধ্যেই স্নেহ ও আশ্রয়ে পরিপূর্ণ বনলতা সেনের স্নিগ্ধ চোখদুটো চোখের সুমুখে ভেসে উঠল, কথাগুলোকে পুরো বুঝিয়ে বলতে হল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আধুনিক কবিতার ব্যয়-সংকোচের প্রবণতাটা এর কাব্যজগতের সব জায়গায় সংক্রমিত। মাঝে মাঝে দু-একটি শব্দকে অনুচ্চ রেখে বক্তব্যকে আরও গতি দেওয়া এখানে সম্ভব হয় এবং সেই অনুচ্চ শব্দের শূন্যস্থান ইশারার গুণে নিজের নীরবতার মধ্যে আরও বড় হয়ে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিই। কবিতাটি সুধীন দত্তের :

ভার নদী তার আবেগের প্রতিনিধি
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি;
শূন্য আকাশে তারই প্রেম অভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম;
সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে,
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম;
আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।

অংশটুকু পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে এখানে কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তির ঠিক আগের পঙ্‌ক্তিতে একটি 'কিন্তু' অনুচ্চ থেকে গেছে, যা রয়ে গেছে বলেই আগের অংশটুকু পড়ে আসার পর শেষের দুই স্তবকের ভেতরকার গভীর অসহায় যন্ত্রণাটা অমন মর্মান্তিক বৈপরীত্য নিয়ে আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে গেছে। এখানে এই অনুচ্চ শব্দের খালি জায়গাটিকে কবি কোনো শব্দ না বসিয়ে যেন একটা অসহায় আর্তনাদ দিয়েই ভরে দিলেন।

দু-এক জায়গায় এই সংকোচন একটা বিশেষ শব্দের এলাকা ছাড়িয়ে এক-একটি অসম্পূর্ণ পঙ্‌ক্তিই হয়ে ওঠে যেন। কবিতা সেখানে আর হেঁটে এগোয় না, একেবারে লাফ দিয়ে পার হয়ে যায়। আর তা যায় বলেই বাইরের দিক থেকে তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটা অসঙ্গতি বড় হয়ে ধরা পড়ে, যাকে অবিশ্য সামান্য অভিনিবেশের ফলে অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। কবিতার আগাগোড়ার মধ্যে সংযোগ থাকে ঠিকই, তবে মাঝখানের পঙ্‌ক্তিটি অনুক্ত থাকার ফলে সে তার বক্তব্যের অনেকখানিই বলে ইঙ্গিতে। ফলে বক্তব্যের মধ্যে এমন একটা তির্যক গভীর সূক্ষ্মতা এসে যায় যার ফলে অনুক্ত স্তবকটির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। বিষ্ণু দের কবিতাটি থেকে একটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করেই কথাটাকে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করা যাক। হেলেনের প্রেম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।

এবং তার পরের পঙ্‌ক্তিতে প্রায় সম্পূর্ণ একটা নতুন সুর

'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।'

অংশটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির পর এবং শেষের পঙ্‌ক্তির আগে একটি পঙ্‌ক্তি অনুক্ত রাখা হয়েছে, যার ফলে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির সঙ্গে শেষ পঙ্‌ক্তির অর্থগত এমন একটা আপাত অসংলগ্নতা এসেছে যা কবিতার গতিকে স্বতই একটা বাধার সুমুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : এই অনুচ্চ রাখার কারণ কী? উত্তরে বলা চলবে : পঙ্‌ক্তিটিকে অনুচ্চ রেখে সেই অনুচ্চ পঙ্‌ক্তির অর্থটিকেই একটা ব্যঞ্জনাগত সূক্ষ্মতা দিয়ে পাঠকের মধ্যে আরও গভীরভাবে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যেই এমনটা করা। এখানে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি উত্তীর্ণ হবার পর হঠাৎ তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটিতে এসেই আমরা যে একটা অসংগতির সামনে দাঁড়াই তার মধ্যদিয়েই ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রণয়ে হেলেনের প্রেম যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছিল, সেই বাধার অনুভূতিকে আরও বেশি করে অনুভব করতে থাকি। বলে যা বোঝানো চলত, এখানে না-বলেই তার অনেক বেশি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হল।

সঙ্কেতের সাহায্যে নিজেকে ব্যক্ত করবার এই প্রবণতা আধুনিক কবিতার সবগুলো দিককে প্রভাবিত করেছে। ব্যবহারের গুণে এখানে এক-একটা শব্দই অনেকখানি বলে, তার বক্তব্য এক-এক সময় এক-একটা পুরো বাক্যকেও ছাড়িয়ে যায়। দু-একটি শব্দের সংযত টানে আধুনিক কবি ছবির পর ছবি এঁকে চলেন। উদাহরণত :

"ভরা সকাল।
ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, ঝি ঝি সন্ধ্যা; ঘুঁটে পোড়ানো"
— *অমিয় চক্রবর্তী*

একটা দিনের আগাগোড়া চেহারা যেন চোখের সামনে দেখা গেল। অথচ সে দিনটি কোথাও এতটুকু থেমে নেই, সে ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে ভোরের ভরা ঐশ্বর্য, তারপর ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের উত্তাপ, তারপর সন্ধ্যা, আর সেখানে রঙিন আগুনে চারদিকে ঘুঁটে পোড়ানোর আয়োজন— এ সবেরই যেন একটি আনুপূর্বিক লেখচিত্র পাওয়া গেল। কবি এখানে কয়েকটা কথার ইঙ্গিত দিয়েই একটি সমগ্র ছবিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

দেখা গেছে, বিন্যাসের গুণে পঙ্‌ক্তি প্যারাগ্রাফগুলো থেকে আরম্ভ করে যতিচিহ্নগুলো পর্যন্ত আর চুপ করে বসে থাকছে না, ভেতরের একটা ঐকান্তিক তাগিদে নিজের অতিরিক্ত একটি নতুন অর্থকে ব্যক্ত করছে। আর কবিতার ভেতরের অর্থটা সেইসঙ্গে একটা আশ্চর্য জোর পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে সুন্দরী
স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার
চিমড়ানো চিন্তাশীলের নোংরা ঘুণধরা
অশ্লীল
আঙুল তোমাকে
খুঁটে
খুঁচিয়ে
চিমটি কেটে অস্থির করেছে
তোমাকে
বিজ্ঞানের বজ্জাত বুড়ো আঙ্গুল তোমাকে
টিপে
টিপে
খুঁজেছে তোমার
মাধুরী কত
বার পালে পালে পুরুত তোমাকে
হাড্ডিসার হাঁটুতে তুলে
চেপে
চেপে
কুস্তি করে তোমার গর্ভে জন্মাতে চেয়েছে
দেবতা,
কিন্তু
তুমি
তোমার ছন্দে বাঁধা
মৃতদয়িতের
অপরূপ বাসরে সতী তুমি
তাদের জবাবে শুধু
বসন্তের ফুল
ফোটাও

এ কবিতার সবখানি গৌরব কেবল এর কাব্যগুণের মধ্যে নেই, পঙ্‌ক্তিবিন্যাস থেকে আরম্ভ করে যতিচিহ্নের ব্যবহার, সবকিছু মিলেই এ সম্পূর্ণ। বিশেষ করে পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের ওপর এ কবিতার সাফল্য কতখানি নির্ভরশীল তা এ কবিতার শেষাংশের দিকে সবচেয়ে বেশি করে বোঝা যায়। কবিতার শেষ জায়গায় 'ফোটাও' কথাটার মধ্যদিয়ে কবিতার মূল অনুভূতিটা কোনোমতেই অমন গভীরভাবে, বর্শার ফলার মতো ক্রমশ অমন জমাট, ছুঁচোলো ও তীক্ষ্ণ হয়ে আমাদের মনের ভেতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরাসরি ঢুকে যেতে পারত না, যদি না পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিগুলোকে ওভাবে সাজিয়ে এনে 'ফোটাও' কথাটাকে কবিতার শেষে অমন অমোঘ কঠিন একাকিত্বের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া না হত।

আধুনিক কবিতায় ইশারার এই সংক্রমণ ঘটেছে চারদিক থেকে। ভাষা হয়ে পড়ছে সঙ্কেতের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা, ভাব পেয়ে যাচ্ছে ব্যঞ্জনা, কবিতা আসছে এগিয়ে এবং সে কবিতার সবটা শরীর সঙ্কেতের এই সূক্ষ্ম অশরীরী উপস্থিতির দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত যে, কবিতার কাব্যগুণ থেকে তাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

কিন্তু সে সম্ভাবনার ঐশ্বর্যকে বড়সড় করে তুলে ধরা এ মুহূর্তে অসম্ভব। এই ক্ষুদ্র আলোচনার সংক্ষিপ্ত গণ্ডির মধ্যে আধুনিক কবিতার ইঙ্গিতধর্মিতার পুরো পরিচয় দেওয়া সাধের না হলেও সাধ্যের অতীত। আপাতত পরিসরের অনুরোধে অসমাপ্ত কথাগুলোকে সমাপ্তির গোঁজামিল দিয়ে থেমে পড়তে হচ্ছে এবং তা হয়তো এই জাতীয় একটা মনোব্যথা নিয়ে যে —

... this is matter for another rhyme
And I to this may add a second tale.

১৯৬০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূত্রাকারে 'শেষের কবিতা'

১

'শেষের কবিতা' শব্দের তাজমহল। হাজার হাজার শব্দ-হীরেয় তৈরি একটা দ্যুতিময় প্রাসাদ। লেখকের ভেতরের আলোকোজ্জ্বলতা এর জ্বলিত অবয়বে দীপ্ত।

২

রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কবিত্বের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ-জেগে-ওঠা হৃদয়ের অপার্থিব ভালোবাসার মিশেলে শেষের কবিতার বুদ্ধিরুচিময় ভাষা তৈরি। এই ভাষা সার্বভৌম ও অপরাজেয়। এই ভাষা আর ভালোবাসার মতো শেষের কবিতা জগৎ ও বাস্তব-অতিক্রমী। 'শেষের কবিতা' মানুষের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ স্বপ্নের নাম। এই জগৎ স্বপ্নলৌকিক, চির-আরাধ্য ও চির অপ্রাপনীয়। শেষের কবিতার জগৎ তাই এমন চির-আধুনিক।

৩

মেঘদূতের মতোই শেষের কবিতা প্রেমের আলেখ্য। কিন্তু প্রেম এর যাত্রায়, গন্তব্যে নয়। গন্তব্যে শেষের কবিতা প্রেম-বিরোধী, বুদ্ধি-প্ররোচিত। এর সমাপ্তি হৃদয়হীন, স্বার্থান্বেষী—মহৎ প্রেমের অশ্রুময় ভ্রান্তির অযোগ্য। জন্মান্ধ নয় বলে এই প্রেম বন্ধুত্বের ওপর উঠতে পারে নি। প্রেমিক-প্রেমিকারা কাউকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে, কাউকে স্থায়ীভাবে বিদায় দিয়ে, সবাইকে বন্ধুত্বের সাধারণত্বে নামিয়ে প্রেমকে ব্যর্থ করেছে। ঘরের ভেতরকার প্রাত্যহিক ঘড়ার জল আর দূরের দিঘির অপ্রাত্যহিক বিরল সাঁতার একই জিনিশ। একটা অতিপাওয়ায় আরেকটা কদাচিৎ পাওয়ায় বিনষ্ট।

৪

শেষের কবিতায় ভালোবাসার যে অপার্থিব ফুল ফুটেছে তা প্রকৃতি জগতের বিস্মিত উপহার। এতে 'অপ্রাপ্ত বয়সের ফুল' আছে, 'পরিণত বয়সের ফল' নেই। হৃদয়ের পাপড়ি মেলা আছে, দুঃখের দায়িত্বগ্রহণ নেই। স্বপ্ন আর বাস্তবকে এই ভালোবাসা যুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নি। এই প্রেম নিঃসন্তান। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার মতো জেগে ওঠাতেই এর সম্পূর্ণতা। সব মহত্তম প্রেমের মতো স্বপ্নের পরেই এর সমাধি।

৫

ভালোবাসার যে অভ্রভেদী শিখর রচিত হয়েছে শেষের কবিতায়, তা আমাদের প্রাত্যহিক পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে। কলকাতার ক্লেদজর্জর বাস্তব জগতে এই ভালোবাসা অভাবনীয় হত। তাই এই ভালোবাসার যোগ্য পরিবেশের জন্য লেখককে উঠতে হয়েছে এই ভালোবাসারই মতো অনেক উঁচুতে—শিলং পাহাড়ের মেঘ আর পাইনবনের অপার্থিব চূড়ায়। তাজমহলের জন্য যমুনাতীর যেমন, শেষের কবিতার ভালোবাসার জন্যে শিলং-এর পাহাড়ও তেমনি। শিলং-এর শিখর ছাড়া এ প্রেম কল্পনাতীত। সমভূমির বাস্তবে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রেমের দুঃখজনক অবসান এর প্রমাণ।

৬

বহুচারিতা মানুষের সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি। ঘড়ার জল আর দিঘির জলের অনবদ্য উপমায়, দার্শনিকতার মহিমান্বিত আড়ালে, রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতায় মানুষের ভেতরকার বহুচারিতার সহজাত আকাঙ্ক্ষাকে বৈধতা দিয়েছেন। মানুষের সমাজে নিষিদ্ধ ও মানবস্বভাবের অতি প্রিয় এই মৌল আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরতে পেরে লেখক পাঠকধন্য হয়েছেন। শেষের কবিতার প্রেম এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অনুকূলে সর্বজনীন অভিনন্দনের কারণ সম্ভবত এইটাই।[১]

অপার্থিব একপ্রেমনির্ভর সূচনা আর বহুচারী বাস্তবনির্ভর পরিণতি—দুই কারণেই শেষের কবিতা চিরন্তন।

---

১. এ গান শুনিনি এ আলো দেখিনি
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরাণ পুরিয়া
করেনি রে সুধা দান,
এমন প্রভাত কিরণ মাঝারে
কখনো করিনি স্নান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য সমালোচনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া

১

আমার এক লেখক বন্ধু–একবার, ষাটের দশকে, কিশোর–উপযোগী একটা সুখপাঠ্য বই লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁকে শিশুসাহিত্যের ব্যাপারে আরো খানিকটা উদ্বুদ্ধ করার জন্য আন্তরিক উৎসাহ থেকে একদিন আমি শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সম্পন্নতাগুলো তাঁর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়েছিল বিপরীত। আমার উৎসাহে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। আমার কথা শেষ হলে বিমর্ষ গলায় হতাশা ফুটিয়ে বলেছিলেন : আমাকে তুমি শিশুসাহিত্যিক হতে বলছ!

মাইকেল মধুসূদন দত্তও অদ্ভুতভাবে মনে করতেন যে, গীতিকবিতা লিখে তাঁর পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নয়, অমর হতে হলে তাঁকে মহাকবি হতে হবে। তাই তিনি মহাকাব্য লেখায় হাত বাড়িয়েছিলেন।

আমাদের চারপাশের প্রায় সব কবির মতো হয়তো আমার সেই কবি–বন্ধুটিরও ধারণা ছিল যে স্মরণের জগতে টিকে থাকতে হলে শুধু কবি হয়েই কেবল তা সম্ভব। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক বা শিশুসাহিত্যের অর্থহীন আয়োজনে তার সম্ভাবনা নেহাতই ক্ষীণ, এমনকি ভালো লিখলেও। এমনটা যাঁর ভাবনা তাঁর কাছে শিশুসাহিত্যের রাস্তায় ভাগ্যান্বেষণের প্রস্তাব এলে গলায় নৈরাশ্যের সুর ফুটে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমার ওই কবি–বন্ধু একটু ভালো করে পর্যালোচনা করলেই টের পেতেন যে কাব্যদেবীর বন্দনা কোনো কবির অমরত্বের যেমন নিঃশর্ত গ্যারান্টি নয় তেমনি শিশুসাহিত্যের মতো সাহিত্যের অন্য শাখাগুলোও যে যশোপ্রার্থীদের দীর্ঘায়ুর দরজা থেকে পত্রপাঠ বিদায় করে তাও নয়। পৃথিবীর এ–যাবৎকালের কোটি কোটি কবিযশপ্রার্থী যেমন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন তেমনি শিশুসাহিত্যের অসংখ্য শক্তিমান স্রষ্টা মানব–স্মরণে অমর জায়গা পেয়েছেন। হ্যান্স ক্রিশ্চান এন্ডারসন বা লুই ক্যারল, অস্কার ওয়াইল্ড বা মার্ক টোয়েন তাঁদের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় যে অনুপম স্বপ্নজগৎ রচনা করেছেন, সেসবের শিল্পসিদ্ধি পৃথিবীর হাতে–গোনা গুটিকয় শ্রেষ্ঠ কবিকে বাদ দিলে ক'জনার চাইতেই বা খাটো?

মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল কাব্যদেবীর আবাহনের পরপরই বন্দনা করছেন কল্পনাদেবীকে :

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাব্যরচনায় হাত দিয়ে তিনি টের পেয়েছিলেন যে বাকদেবীর দুর্লভ আনুকূল্য কবিতার দুঃসাধ্যের যাত্রায় তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে ভরসা যোগালেও যা তাঁর নিয়তির সামনে 'উজ্জ্বল উদ্ধার' হয়ে দেখা দেবে, তাঁর চিত্ত-ফুলবন-মধু দিয়ে নিরবধিকালের জন্য অত্যাশ্চর্য মৌচাক রচনা করতে পারবে তার নাম কল্পনা। এই কল্পনাই তাঁর সম্পন্ন বক্তব্যকে ছবি আর গানের বর্ণোজ্জ্বল জগতে—ধ্বনিময় চিত্রলোকে—স্মরণীয় জায়গা দেবে।

এই কল্পনা যাকে স্পর্শ করে তার নামই শিল্প—অনুপম, অশ্রুতপূর্ব ও অপার্থিব। কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য এমনকি প্রবন্ধ—যা-ই এর হিরণ ত্বকের স্পর্শ পায়, তাই সোনা হয়ে যায়। এখানে ছেঁড়াছাতা আর রাজছত্রের মতো, আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির মতো, কবিতা আর শিশুসাহিত্যের কোনো ভেদ নেই। কল্পনার দীপ্তিতে সম্পন্ন হলে এরা একইরকম চিরন্তন।

যে সম্পন্ন কল্পনা ছড়া বা শিশুরচনাকে শিল্পের টোপর পরায়, কবিতাকেও তা-ই জ্বলিত করে অলীক দীপ্রতায়। গড়নে, অবয়বে, শিল্প-স্বভাবে ও ভেতরের তাগিদে ছড়া আর কবিতা তো একই জিনিস। তাই বলে ছড়া বা শিশুরচনা আর কবিতাকে কি হুবহু এক বা সমমাপের জিনিস বলতে পারব? না, তা পারব না। অনেকদূর পর্যন্ত ছড়া বা শিশুকবিতা কবিতার সহযাত্রী হলেও মনে রাখতে হবে ছড়া শেষ অবধি কেবল শিশুরই কবিতা, তার অসম্পূর্ণ উদ্ভট অবিকশিত জীবনের স্বপ্ন ও সত্য। এই জগৎ অনেকটাই খাপছাড়া—স্বপ্নে দেখা পৃথিবীর মতো পারম্পর্যহীন। পরিণত মানুষের জীবনবোধ, গভীরতা, বহুমুখিতা, উত্থান ও অবসানের প্রগাঢ় পদাবলী কী করে আসবে ছড়ায়? শিল্পের সর্বোচ্চ সিদ্ধিকে, গভীরতম উপলব্ধি বা রক্তক্ষরণকে কী করে স্পর্শ করবে সে? কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরকে স্পর্শ না করলেও একটা উঁচু চূড়া পর্যন্ত ছড়া তো কবিতাই। শিল্প-সাফল্যের জন্য কবিতার মতো হুবহু একই শর্ত পূরণ করে ছড়াকেও তো এগোতে হয়।

আগেই বলেছি কবিতার সঙ্গে ছড়ার পার্থক্য প্রকরণে নয়, প্রসঙ্গে; আধারে নয়, আধেয়তে। ছড়াকার মানুষের সমগ্র জীবনের কবি নন—তাঁর জীবনের শিশু-পর্বের কবি। শৈশব-কৈশোরের পর তাঁর এলাকা শেষ হয়ে যায়, কবি এসে দায়িত্ব বুঝে নেন। পরবর্তী পুরো জীবনটার তিনিই রূপকার। জীবনের এই দুটি পর্বের স্বভাব আর মতিগতি আলাদা বলেই কবি আর ছড়াকার আলাদা। নইলে জীবনকে জ্বলিত করার উপকরণ আর উপাচারে এরা দুজনেই এক। দুজনেরই কারবারের মূল পুঁজি সেই দুই আদি অকৃত্রিম জিনিস : শব্দ আর ছন্দ। কবির মতো ছড়াকারকেও জীবনের কোনো একটা আবেগাশ্রিত বিষয়কে ধ্বনিময় চিত্রলোকের বিস্মিত বাসিন্দা করে তুলতে হয় কল্পনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐশ্বর্যের সমান সচ্ছলতা দিয়ে—কবিত্বেরই শক্তি দিয়ে। এখানে কি কেউ কারো চেয়ে কম? 'লুকোচুরি', 'বীরপুরুষ', 'একদিন রাতে আমি', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' রচনাগুলোয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রজগৎ, ধ্বনিজগৎ বা ভাবনাজগৎ রচনার কল্পনা কি কোনোখানে কম তাঁর কবিতার অন্য এলাকাগুলোর চেয়ে? নজরুলের 'খুকি ও কাঠবেড়ালি' কবিতায় শিশুমনের যে করুণ লুব্ধ অসহায়তা আর্ত হয়ে উঠেছে, কবিতাপ্রতিভার নিরিখে তাকে তাঁর কটা কবিতার চেয়ে হীন বলা যাবে? সুকুমার রায়ের 'ছায়াবাজি'তে যে কবিত্বের প্রমাণ মেলে বাংলাসাহিত্যে কটি কবিতা তার সমান মাপের?

ছড়াকারকে আমি তাই 'কবি' নামে ডাকতে পারলেই খুশি। ছড়াকার সুকুমার রায়কে 'ছড়াকার' না বলে বলতে চাই 'কবি সুকুমার রায়'। মহাকাব্যের কবি, গীতিকাব্যের কবি, প্রকৃতির কবি, প্রেমের কবি—সবাই যদি কবি হতে পারেন, তবে শিশুর কবির 'কবি' হতে আপত্তি কোথায়?

২

আগেই বলেছি শিশুর কবি মানুষের জীবনের শৈশব-পর্বের কবি, শিশুর হৃদয়ের ঈপ্সা আর বাস্তবতার কবি। শিশুর স্বপ্ন-লোভ-কামনা ও আকাঙ্ক্ষার জিনিসগুলিকে তাঁর কবিতায় স্বাদে-গন্ধে জীবন্ত করে তুলতে হয় তাঁকে, না হলে শিশুর রসনায় তা ঠিকমতো রোচে না। শিশুর জগৎটি ঠিক কেমন, এবার তা শিশুর কয়েকটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

পৃথিবীর অরণ্যচারী আদিম মানুষদের মতো শিশুরাও এক অবারিত কল্পনা-জগতের অধিবাসী। তার ইচ্ছা-রঙিন 'যা খুশি তাই'-এর পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা'র অলীক বাগানে ক্ষিপ্র চটুল কাঠবেরালির মতো তার ইতিউতি ছোটাছুটি। এ-কারণেই আমাদের এই ধরাবাঁধা নিয়মের পৃথিবীটা তাকে পদে পদে রক্তাক্ত করে, ক্ষতবিক্ষত করে। বাস্তবের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে পৃথিবীতে সে উদ্ধারহীন আর যন্ত্রণাকাতর একটা জীবন কাটায়। যুক্তির জগৎ তার অপরিণত, কাঁচা মনটার ওপর হত্যাকারীর মতো চেপে বসে থাকে। এর অত্যাচারে সে আর্তনাদ করে। এ-কারণেই নিয়মের জগতের সামান্যতম বিপর্যয় বা পদস্খলন তাকে উৎফুল্ল করে, আশান্বিত করে। নিয়মহীনতার স্বেচ্ছাচার তাই শিশুর শক্তি আর আনন্দের আকুতি। এজন্যেই শিশু যখন দেখতে পায় তার চোখের সামনে, হোক সে স্বপ্নে, ভারী ভারী ইট কংক্রিটে গাঁথা দানবীয় বিশাল কলকাতা শহরটা তার শ্বাসরোধকারী শান-বাঁধানো দাপট হারিয়ে হঠাৎ পাগলের মতো দৌড়োতে শুরু করেছে, তখন এক অপার্থিব উল্লাসে তার মনটা ভরে যায়। এমনই তো সে দেখতে চায় এই জগৎটাকে—এমনি ছুটি-পাওয়া ভেসে-যাওয়া অবস্থায়। নিয়ম আগলভাঙা স্বেচ্ছাচারী জগৎ শিশুর অবিকশিত কচি মনটার খুব কাছাকাছি। সেই জগতে সে স্বস্তি বোধ করে। পরিণত মানুষের বুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়ে ওঠে নি বলে কেবলমাত্র হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া দিয়েই সে জীবনের যাবতীয় দেনা শোধ করতে চায়। তাই নিয়ম-বাস্তবহীন 'যেমন খুশি তেমন'-এর বাড়াবাড়িতে সে তার রুপোর গাছের অলীক হীরে ফলটিকে পেয়ে যায় ভারি অনায়াসেই। এইজন্য সম্ভাব্যতার সবরকম সীমানা পেরিয়ে 'বীরপুরুষ' কবিতায় অসহায় খোকা যখন তেপান্তরের মাঠে একা বিরাট দস্যুদলকে হারিয়ে মায়ের পাশে এসে বীরের মতো দাঁড়ায়, তখন সেই গল্প পড়তে গিয়ে গর্বে আর আত্মবিশ্বাসে তার মন ভরে যায়, তৃপ্তির আনন্দাশ্রুতে চোখ ভিজে ওঠে।

এই যুক্তিহীন অবাস্তবতার জগৎই শিশুর জগৎ। এই জগৎকে যে কবি সুস্বাদু খাবারের মতো স্বাদে গন্ধে মুখরোচক করে তার টেবিলে পরিবেশন করতে পারবেন তিনিই তার কবি। শিশুমনের হয়তো সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটিই—যুক্তির এই সার্বভৌম বিপর্যয়। ওই ব্যাপারটা তার গড়েই ওঠে নি—শিশুর সঙ্গে পরিণত মানুষের মূল তফাতটা এটাই। তার মাথায় অভিজ্ঞতার জগৎ এখনো দানা বাঁধে নি, বুকে জমে ওঠে নি 'আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি'। শিশুর কবিকে হতে হয় শিশুমনের এই যুক্তিহীনতার প্রতিভাবান লিপিকর।

কিন্তু এ-ছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে একজন শিশুর। শিশুদের ভেতরে রয়েছে সুস্বাদু খাবারের প্রতি জিভে পানি-আসা লোভ; পরিণত মানুষদের তুলনায় হয়তো বেশিই রয়েছে। তাদের শিশুত্বের মতোই তাদের ওই লোভ স্বাস্থ্যবান আর সজীব। খাবারদাবারের কথামাত্রেই শিশুর রসনা অজান্তে সজল হয়ে যায়; চেহারা করুণ আর অসহায় হয়ে ওঠে। উষ্ণ তপ্ত পরিচর্যায় তার এইসব স্বাদেন্দ্রিয়ের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি ঘটাতে হবে শিশুর কবিকে, না হলে তিনি শিশুর মনের আসল মানুষটি হতে পারবেন না।

শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ?
টক টক থাকে নাক হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'টক টক গন্ধ' পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার রসনায় যে সজীবতা দেখা দিয়েছিল শেষ পঙ্‌ক্তিতে আসার পর তা পুরো সক্রিয় হয়ে উঠল। এক আকাশ মাধুর্য চেটে দেখার আস্বাদে তার জিভ ততক্ষণে ভিজে সারা। কাব্যরসের আড়াল দিয়ে খাদ্যরসের বিস্তার তাকে এই কবিতার আরো নিমগ্ন পাঠক করে তুলেছে।

টক, ঝাল, ভাজা-পোড়া বড় প্রিয় শিশুর। 'চিনে বাদাম ভাজে' বা 'চানাচুর গরম' জাতের কথাগুলো কানে আসতেই তার ইন্দ্রিয়জগতে যেন তোলপাড় পড়ে যায়। সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে একটা জবরজং মুখরোচক পৃথিবী এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইসব খাদ্যরক্তিম জগতের বর্ণনা তুলে ধরে শিশুর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রসনাজগৎকে তরতাজা রাখতে হয় শিশুর কবিকে। তাই 'ছায়াবাজি' কবিতায় সুকুমার রায়কে নানাজাতের ছায়ার কথা বলতে গিয়ে একধরনের ছায়ার বর্ণনা দিতে হয়েছে এভাবে : গ্রীষ্মকালে শুক্‌নো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভীষণ রোদে ভাজা'—শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয় একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। 'ভাজা' শব্দটি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর রসনাপরায়ণ চোখ নিজের ঈপ্সিত ভুবন যেন খুঁজে পেল সামনে। শিশুর কবি বলেই শিশুর সামনে তার রসনার জগৎকে এমন জীবন্ত করে তুলতে হল কবিকে। সুকুমার রায় পরিণত মানুষের কবি হলে কবিতার রূপটি হয়তো তিনি খুঁজতে চাইতেন খানিকটা আলাদা উপমায়। খুব বেশি জীবনানন্দীয় হলে হয়তো ভাজার জায়গায় 'ভেজা' শব্দটা ব্যবহার করতেন তিনি। দুপুরের ছায়ার একটা সজল মধুর ছবি ফুটিয়ে তুলতে উৎসাহী হতেন।

শিশুর ভেতর রয়েছে এক দুর্দান্ত ও আদিম শক্তিমত্তা। তার শারীরিক যোগ্যতা নির্জলা, অফুরন্ত ও নৈসর্গিক। এই শক্তির প্রাচুর্যে তার স্বগোত্রের পরিণত সভ্যদের চেয়ে সে ভাগ্যবান। জেগে থাকার মুহূর্তগুলোয় সে অদম্য কর্মমুখর, নিদ্রায় সে পরিপূর্ণ ও নিখাদ। কিন্তু যে শক্তিতে সে আর সবার চেয়ে বড় তা হল বিস্মিত হতে পারার শক্তি। পৃথিবীর ঘরে নতুন এসেছে সে। প্রতিটা বস্তুকে সে তাকিয়ে দেখছে প্রথমবারের মতো। দেখে দেখে বিস্ময়ের শেষ খুঁজে পাচ্ছে না। কেউ আজো তার সরল বিশ্বাসের বুকে হঠকারী ছুরি বসায় নি, জাগতিক প্রতারণা গুঁড়িয়ে দেয় নি হাড়। মিথ্যা বা ভুলের সঙ্গে আজো সে অপরিচিত। কোনোকিছুকে যাচিয়ে খতিয়ে সন্দেহ করে দেখার মোহহীন চাউনি আজো তাকে অধিকার করে নি। সাত ভাইয়ের সাতটি চাঁপাফুল হয়ে গাছের ডালে ফুটে-থাকা পারুল বোনের সঙ্গে কথোপকথন, রাক্ষসের তাড়া খাওয়া নিরাশ্রয় রাজপুত্রকে 'সত্য গাছে'র দু ভাগ হয়ে নিজের ভেতর নিয়ে নেওয়া, তারপর ক্রমে তাকে ফলে পরিণত করে রাক্ষসীর অলক্ষ্যে পুকুরের পানিতে ফেলে দেওয়া, দুধের সাগর ক্ষীরের সাগরের মাঝখানে আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা গজমোতির হার মাথায় ক্রীড়ারত হাতি—সবকিছু তার কাছে সত্যি আর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কোনোকিছুতেই তার অনাস্থা নেই। যাকেই সে বিশ্বাস করে, তাকে দেখেই তার বিস্ময়। 'এমন অদ্ভুত সব জিনিস দিয়েই এই জগৎ তৈরি তা হলে'—আবিষ্কারের খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ভাবে সে। ভেবে অবাক হয়।

আচার্য জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদ্‌কে বলেছেন পশু।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদকে জলজ্যান্ত পশু হয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখছে সে চোখের সামনে। আরে, না হেঁটে কি পারে! আচার্য জগদীশ বসু তাদের পশু বানিয়ে দিয়েছেন না! এমনি সজীব বিস্ময়ের শক্তিতে উজ্জ্বল তাদের জগৎ। বাড়ির কাছের গরমের ছুটির সময়কার নিশ্চুপ তালা-লাগানো বিশাল কলেজ- ভবনটাকে দেখে সে সহজেই ভেবে বসতে পারে : এই সেই রূপকথার ঘুমন্ত রাজবাড়ি, যেখানে হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া ঘুমায়, সিংহাসনে ঘুমায় রাজা আর রানী, চারপাশে পাত্র-মিত্র সভাসদ সিপাই সান্ত্রী। বাড়ির পেছনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে তার ঝোপঝাড়ের আড়ালে তেপান্তরের উল্কি-আঁকা ডাকাতদের ঘাপটি মেরে বসে থাকার কথা মনে হয়। শিশুর জগৎ 'নেই মানা'র জগৎ। আকাশ এর সীমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুর কবি শিশুমনের এইসব বিস্ময়ের কবি, নিয়ম-আগল-উধাও করা শিশুদের যুক্তিহীন পৃথিবীর রূপকার। তার এইসব অসম্পূর্ণ, ভাঙাচোরা, উদ্ভট কামনা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের নিরন্তর যোগানদার। শব্দে, ছন্দে, ছবিতে, গানে, সম্পন্ন কল্পনায় ও বিরল সৌকর্যে শিশুর পৃথিবীকে শিশুর সামনে রংদার করে তাঁকে তুলে ধরতে হয়।

৩

লুৎফর রহমান রিটনের শিশু-কিশোর কবিতার যে দিকগুলো আমাকে তাঁর ব্যাপারে আশান্বিত করে তার একটি হল শিশুর হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার ভালোরকমের খবরাখবর তিনি রাখেন। 'বর্ষশেষ' কবিতায় 'নতুন'কে বিশেষিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, আপাতভাবে সরল নিষ্পাপ মনে হলেও নতুন আসলে নিষ্ঠুর। ['হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন। সহজ প্রবল।'] আগেই বলেছি, শিশুর ভেতরেও রয়েছে এমনি এক সরল অতন্দ্র নিষ্ঠুরতা। 'নতুন' বলেই, জীবনের কঠিন বাস্তবে জেগে ওঠে নি বলেই, এই নিষ্ঠুরতা। রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের শুরুতে শিশু-কিশোর বয়সের এই নিষ্ঠুরতার অনাবিল রূপটি অনন্য :

> বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটি নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইবে।
>
> যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ-প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

আমি ফটিক আর তার সঙ্গী বালকদের নিষ্ঠুর না বলে জড় বলতে পারলেই বেশি খুশি হব। পৃথিবীর শিশুরা এদের মতোই জড় ও অবোধ। তাদের এই মূঢ়তা সকালবেলার আলোর মতোই অনিন্দ্য। এক জরাহীন, বেদনাহীন, চিরনবীন জগতের বাসিন্দা তারা। বয়স্ক পৃথিবীর দুঃখগুলোও তাদের কাছে খুশির ব্যাপার। আমাদের কাছে যা পতনঘটিত মৃত্যু-আশঙ্কা, তার কাছে তাই তেতলার কার্নিশের ওপর দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা দুদ্দাড় দাবড়ে বেড়ানো। আমাদের কাছে যা কবিতার প্রিয়তম পাণ্ডুলিপির মর্মান্তিক দুর্দশা, শিশুর কাছে তা-ই একপ্রস্থ পাতলা কাগজের ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে ছিঁড়ে ফেলার অকারণ উল্লাস। শিশুর জগৎ তাই পুলকের জগৎ। অকারণ অনাবিল এক পুলকের পৃথিবী। বাস্তবতা বা পতনের সঙ্গে এখনো পরিচয় হয় নি বলে শিশুর জগতে বেদনার পদচারণা বেশ খানিকটা সংকুচিত। তার দুঃখের পৃথিবী চেতনা-জগতে সুদূরপ্রসারী হলেও উপস্থিত মূল্যে স্থূল ও ছোট — শারীরিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই তার বসবাস। পরিণত মানুষের আত্মধ্বংসী অভিঘাত তার ভেতর ক্রিয়াশীল নয়। তার দুঃখ তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নিম্নমাত্রার দুঃখ'। এজন্যে অদ্ভুত-রসের পাশাপাশি শিশুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের অন্যতর প্রধান রস কৌতুকরস। পরিণত মানুষ এখানেই শিশুর থেকে পৃথক। তার জীবনের প্রধান বিষয় বিষাদ। তাই শিশুর মতো তার মূল রস কৌতুক নয়, করুণ। এ জন্যই *Our sweetest songs are those that tell of saddest thought*— পরিণত মানুষের জীবনের গভীরতর সত্য।

প্রগাঢ় বেদনাকে উপজীব্য করে বলে পরিণত মানুষের কবিতা মহত্ত্বের যে শীর্ষকে স্পর্শ করতে পারে, শিশু-কিশোর কবিতা তা হয়তো পারে না; কিন্তু হাস্য-পরিহাসমুখর আস্বাদ উপভোগের যে রঙিন ও চটুল পৃথিবী শিশু-কবিতায় রচিত হতে পারে তা অতুলনীয়। পরিণামজ্ঞানহীনতার কারণে শিশু গাঢ় দুঃখকেও অনাবিল উপভোগের বিষয় করে তুলতে পারে, এমনকি গভীরতম দুঃখকেও।

লুৎফর রহমান রিটন শিশুমনের এই প্রবণতাগুলোর খবর কমবেশি রাখেন। এইজন্যে জীবনের ছোট ছোট হাজারো বিপর্যয় আর অসঙ্গতিকে তিনি তাঁর ছড়ার মুখরোচক প্লেটে সাজিয়ে শিশুমনের সামনে হাজির করতে পারেন। বড় মানুষদের ফাঁদে-পড়া জীবনটার কৌতুককর দুরবস্থা দেখে অনাবিল হাসিতে গড়িয়ে পড়তে শিশুদের অসুবিধা নেই। কারো কোনো হঠাৎ বিপদ, আছাড় বা মার খাওয়ার দৃশ্য, শিশুরা, তাই অমন নির্জলা উপভোগ করে।

হোটেলে ঢুকেই চ্যাঁচালেন তিনি
আন দেখি বেটা বিরিয়ানি !
হোটেলের বয় সবিনয়ে কয়—
দ্যান ট্যাহা দ্যান, বিড়ি আনি।
রেগে কন তিনি আন দারুচিনি
সাথে ওয়াটার ঠাণ্ডা।
মাথা চুলকিয়ে বলে বয় ইয়ে...
কই পামু সাব আণ্ডা?
মেজাজটা তার সপ্তমে ওঠে
রেগে কন ব্যাটা বেয়াকুব?
তবু সেই বয় বিচলিত নয়
বলে স্যার, আমি এয়াকুব !

এখানে হোটেলের অবিচলিত বয় এয়াকুবের শ্রবণশক্তির ত্রুটি একটা পরম উপভোগের ব্যাপার হয়ে উঠল শিশু-কিশোরদের কাছে। কিংবা সেই খাই খাই করা আব্দুল হাই, খাই খাই এর সঙ্গে মিল দিতে গিয়ে যার নাম হাই হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, যে মানুষটি আম জামের সঙ্গে টিভি প্রোগ্রাম খাওয়ার পর হাসি, খুশি, ভুসি এমনকি ঘুসি খেয়েও নির্বিকার এবং একপর্যায়ে বাড়ি-গাড়ির সঙ্গে পুলিশের ফাঁড়ি খাওয়ার সুবাদে মাঝে মাঝে লাথি খাওয়ার ভাগ্যও পাকা করে নিয়েছে; তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দিগ্বিদিকহীন ব্যগ্রতা শিশু-কিশোরদের বড় বড় চোখগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য অবাক করে রাখে। কিংবা নিজের নাম ভুলে যাওয়া বিমর্ষ ভোলারাম, বাংলা এবং অঙ্কে একই রকম কাঁচা ভোম্বল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগী 'বাবার বাবা'র হাতে ছেলেবেলার 'বাবা'র হেনস্তা হওয়ার প্রিয় উপভোগ্য কাল্পনিক দৃশ্য বা নিধিরাম মিত্রের আঁকা সেই ছবিটা যা দেখে কেউ বলছে ও ছবি পেত্নীর, কেউ বলছে হায়েনার, কেউ বলছে গরুর বা ছাগলের 'নয়তোবা হাইজাম্প পাগলের'—কিন্তু শেষে নিধিরাম মিত্র নিজেই এসে ফাঁস করে দেয় যে ছবিটি তার নিজেরই আত্মপ্রতিকৃতি—এ-সবকিছুই শিশু-কিশোরদের নির্জলা হাসিতে সৎসুক করে রাখে।

বোঝার ব্যাপারটাই আসলে শিশুদের বিষয় নয়। তাই শিশুসাহিত্যের বোঝার বিষয়টুকু, বলার কথাটুকু , বক্তব্যটুকু —কোনোদিন শিশুদের জন্য রচিত হয় না। শিশুসাহিত্যের এটুকু চিরকালই বড়দের। শিশুসাহিত্যের ভেতর গভীর যা-কিছুই থাক সেই জিনিসগুলো কবিকে ধরতে হয় শিশুর ইন্দ্রিয়জগতের ভেতর দিয়ে ওই জগতের রস, গন্ধ, শব্দ, স্বাদের চমৎকারিত্বের ভেতর দিয়ে। ওই পাওনাটুকু হাতে-নাতে বুঝে পেলেই সে তার নালিশের খাতা থেকে কবিকে মুক্তি দিয়ে দেয়। আজকের সভ্যতার স্বার্থলোলুপ থাবার নিচে মানুষের সরল অবোধ আদিম হৃদয়টা যে কী নির্দয়ভাবে পদদলিত তার ব্যথিত পদাবলী এই বইয়ের 'বাঘের বাচ্চা' ছড়াটি পড়ার সময় শিশুরা হয়তো টের পাবে না ঠিকই, কিন্তু চিড়িয়াখানা পালানো গাট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ বাঘের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে গুটুল মুটুল টুটুলের উদ্দাম শহর-পরিভ্রমণের মুখর মুহূর্তগুলোকে সে প্রাণভরেই উপভোগ করবে। শিশুর জগৎ ওইটুকুই । দরজা-ভাঙা খুশির জগৎ। ওইটুকু পেলেই সে খুশি। সেখানে সে প্রতিদিনকার ছক-কাটা, গৎ-বাঁধা, পাঠ্যবইশাসিত জীবন থেকে ছুটি পেয়ে একটা সত্যিকার জ্যান্ত বাঘের বাচ্চার সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো সারা শহর ঘুরে বেড়ায়, ওই ভ্রমণের সব ঈর্ষিত গৌরব আর রোমাঞ্চ আস্বাদ করে। শিশুর জীবনকে সুপরিসরভাবে জানেন বলেই রিটন কবিতাটার মধ্যে শিশুর বিস্ময়ের পৃথিবীকে এমন অবলীলায় রচনা করতে পেরেছেন। আর একটা ছোট্ট কবিতা তুলে ধরছি :

নাম তার হরিদাস পাল ছিল
গায়ে তার ডোরাকাটা শাল ছিল
পান খেয়ে মুখ তার লাল ছিল
মা-বাবার আদুরে দুলাল ছিল।
তার মামাবাড়ি বরিশাল ছিল
মামিমার তরকারি ঝাল ছিল
সেই ঝাল খাওয়া তার কাল ছিল
বেঁচে নেই আজ, গতকাল ছিল।

এ কবিতার বিষয় পুরোপুরিই বড়দের। মৃত্যুর সঙ্গে শিশু-কিশোর কেবল যে অপরিচিত তাই নয়, এ বিষয়ে প্রায় অবিশ্বাসীই সে। কিন্তু কবিতার ভেতর শাল গায়ে দেওয়া হরিদাস পালের যে পান-খাওয়া ঢিলেঢালা অগোছালো চেহারাটি ভেসে ওঠে সে-মানুষটি শিশুমনের কল্পনাকে উৎকর্ণ করে। ওই খাপছাড়া আর উদ্ভটের ছোঁয়া-লাগা লোকটার ভেতর সে তার স্বপ্নের মানুষটাকেই খুঁজে পায় কিছুটা। ওই স্বল্পভাষী অদ্ভুত মানুষটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যেই এটিতে শিশুজীবনের রস ঘন হয়ে জমেছে, কবিতাটির গাঢ় বক্তব্যটুকুর জন্যে নয়। এর শেষ পঙ্‌ক্তি কবিতাটিকে বড়দের কবিতা করেছে, বাকিটুকু শিশুকবিতা।

রিটনের কবিতার সবখানে এমনি বিস্ময় আর হাসির প্রাচুর্য। সেখানে বিস্ময় আর হাসি পরস্পরের উল্টোপিঠ। যে উদ্ভট আর অসঙ্গতিকে দেখে শিশুরা একখানে হাসিতে ভেঙে পড়ছে একটু পরে তাকেই সামান্য অন্যভাবে দেখে তারা একই পরিমাণে অবাক হচ্ছে। শিশুর রসনাকে তৃপ্ত করবার মতো এমনি নানান মুখরোচক মশলাই রয়েছে এখানে। কিন্তু কেবল রসনাকে তৃপ্ত করারই নয়, কানকে প্রীত করার মতো ধ্বনিসৌকর্যের যোগানও রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর ছন্দের জগৎ বৈচিত্র্যময়। এই ছন্দ নিখুঁত, সূক্ষ্ম, স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্ষিপ্র। ছন্দের উচ্ছল ধারাই অনেক সময় কবিতা ফলিয়ে তোলে। মিলের সপারগতা, ক্ষিপ্রতা, দ্যুতি মনকে অবাক করে। ছন্দ ও মিলের সপ্রতিভ শক্তিতে তাঁর সাফল্য বাংলা শিশুসাহিত্যের বেশকিছু উজ্জ্বল সাফল্যের পাশে জায়গা পাবার মতো।

রিটনের কবিতা পড়তে গিয়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা হল তার মৌলিকতা। তাঁর এই মৌলিকতাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে– কোনো অনুভূতিশীল স্মৃতি–প্রভাবিত মানুষের মতো বা সৎ কবির মতো তাঁর এই মৌলিকতাও নিখাদ নয়। একটু খতিয়ে তাকালেই দেখা যাবে বাংলাসাহিত্যের বেশকিছু লেখকের প্রভাব তাঁর ওপর ছায়া ফেলে আছে। তাঁর অনেক সফল কবিতাও এর বাইরে নয়। এই বইয়ের কবিতার ছন্দশরীরে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষান্তি পিসির দিদিশ্বাশুড়ির' কবিতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে আঁকা, যেমন 'ম্যাকগাইভারের কাণ্ড' কবিতার গায়ে নজরুলের 'লিচু চুরি'র। তাঁর 'খিদে'কে সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' আর রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদা'র ককটেলই হয়তো বলা যাবে, যেমন 'তোমার আমার', 'ঈদের দিনে' এ–সব কবিতায় জসীমউদদীনের 'আসমানী–খোসমানি'র। 'পাত্র সমাচার'–এ সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র'–এর এবং বেশকিছু কবিতায় সুকান্তের স্পষ্ট উপস্থিতি চোখে পড়বে। তবু এইসব বিভিন্নমুখী প্রভাবের ভেতর থেকেও তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, শৈল্পিক দীপ্ততা ও কল্পনাশক্তির অনন্যতা এই কবিতাগুলোর শরীরে এমন একটা স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাকে দীপ্ত করেছে যা এগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় মৌলিক করে তুলেছে। যে কবিতাগুলোয় তিনি মৌলিক সেগুলো সত্যি সত্যি অনবদ্য জিনিস। তাঁর 'বালকের দিনরাত্রি', 'বাঘের বাচ্চা', 'হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা', 'হোটেলের বয়', 'নাই মামা কানা মামা' কিংবা আরো কিছু চটুল কবিতা যেমন 'ডাক্তার', 'কুস্তি', 'গোবর্ধনের সংবর্ধনায়', 'ভোলারাম', 'ভোম্বল সংবাদ', 'বাবারে বাবা', 'নিধিরাম মিত্র' ইত্যাদি আগামীকালের বাংলা শিশুসাহিত্যের পাঠকের কাছে আদর পাবে।

বুদ্ধির দীপ্তিতে, সজীব রসিকতায়, স্বতঃস্ফূর্ততায়, বিস্ময়ের শক্তিতে তাঁর শিশু–কিশোর কবিতা আমাদের সময়ের অন্যতম সেরা উপহার। আমার অনুভূতি এ–রকম যে, সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের শিশুকবিতার ধারার তিনি সবচেয়ে সফল কবি এবং বাংলাসাহিত্যের শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের একজন।

১৯৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুশ শাকুরের রম্যরচনা

১

নন্দন-শাস্ত্রবিদেরা অনেককাল আগেই ধরে ফেলেছিলেন যে ট্র্যাজেডি জিনিসটি মহত্তম দুঃখের ব্যাপার হলেও কমেডি নির্ভেজাল আনন্দ নয়। আসলে কমেডির মতো ট্র্যাজেডিরও মূল সুর বেদনা। পার্থক্য মাত্রায়। কমেডি অল্পমাত্রার দুঃখ, ট্রাজেডি বেশিমাত্রার।

কমেডির শরীর যেসব উপাদানে তৈরি, কৌতুকের মুখরোচক মশলা প্রজাতিগতভাবে তার একটি। কমেডির সঙ্গে কৌতুকের এই পারিবারিক অভিন্নতার কারণে, কমেডির মতো কৌতুকও একধরনের 'নিম্নমাত্রার দুঃখ'। রাশভারি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সবার সামনে আচমকা আছাড় খেলে যে চাপা হাসির রোল ওঠে তার মূলেও আছে এই নিম্নমাত্রার বেদনা। একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদার পতনজনিত বেদনা। একজন শিশু বা বৃদ্ধের এ ধরনের পদস্খলনে এমন হাসির রোল উঠবে না। বরং মর্মান্তিক পরিণতির আতঙ্কে—যা শিশুর জন্যে অতটা না হলেও বৃদ্ধের জন্যে খুবই স্বাভাবিক—হয়তো সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবে। এ ধরনের হাসির আর একটি উদাহরণ হিসেবে ভাবা যায় আর একটি ঘটনা। ধরা যাক প্রথম-প্রেমে-পড়া একজুটি প্রেমিক-প্রেমিকা শাদা-মেঘ-ওড়া সুন্দর নীল আকাশের নিচ দিয়ে গল্প করতে করতে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলেছে। ভাবা যেতে পারে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তারা এ ওর দিকে এক আধ পলক তাকিয়ে নিলেও দৃষ্টি তাদের মোটামুটিভাবে ওপরের দিকেই, প্রেমের স্বপ্নবিভোর মুহূর্তে মানব-মানবীর দৃষ্টি যেভাবে ওপরের দিকে কল্পনার মরালদের সঙ্গে হারিয়ে যেতে চায়, তেমনি। ধরা যাক, এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একবার কথা বলছে প্রেমিকা, একবার প্রেমিক, আবার প্রেমিকা, আবার প্রেমিক—এমনিভাবে সৌন্দর্যের এক বিভোর পৃথিবীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলছে তারা। এভাবে হাঁটার একপর্যায়ে হঠাৎ পাশের প্রেমিকের দিকে চোখ ফেরাল প্রেমিকা। কিন্তু কোথায় প্রেমিক? এ-পাশে ও-পাশে সবদিকে দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে নিল ত্রস্তা নায়িকা। কিন্তু কোথাও সে নেই! হঠাৎ আচমকাই খোঁজ মিলল তার। গজ বিশেক পেছনে ফুটপাতের দিকে তাকাতেই স্পষ্ট হল ব্যাপারটা। একটা ম্যানহোলের ভেতর থেকে নায়কের করুণ হাতদুটো প্রত্যাশার আকুতিতে আকাশের দিকে অসহায়ভাবে নড়াচড়া করে চলেছে।

এমনি কৌতুকের মূলেও আছে একটি বেদনা। স্বপ্নের সুউচ্চ শিখর থেকে বাস্তবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লেদাক্ত ম্যানহোলে পতনজনিত বেদনা। তবে এই বেদনার সঙ্গে ওই হাসির ভেতর মুখ লুকিয়ে রয়েছে আরেকটা জিনিস : অসঙ্গতি। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ বা বিভোর প্রেমিকের অপ্রস্তুত পতনের মধ্যে যে খানিকটা দুঃখই কেবল আছে তাই নয়, সেইসঙ্গে আছে একটা অসঙ্গতির অনুভূতি, ওই মুহূর্তে তাদের থেকে যা অপ্রত্যাশিত।

২

বাংলা গদ্যের প্রথম সফল লেখক বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম থেকে শুরু করে আজকের আসহাবউদ্দীন আহমদ বা আবদুশ শাকুর বা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখার ভেতর দিয়ে এই সাহিত্যের দুঃখ-অসঙ্গতি-ভরা সম্পন্ন কৌতুকরসের স্রোত অপ্রতিহতভাবে বয়ে চলেছে। দুটি ভিন্ন শাখায় এই কৌতুকের ধারাকে বইতে দেখা যায়। এক, যে লেখকেরা গভীর জীবনবোধকে উদ্‌ঘাটন করার পথে হাস্যকৌতুকের সজীব ছোঁয়ায় রচনাকে স্নিগ্ধ করেছেন। দুই, যারা কেবলমাত্র কৌতুকরসেরই কারবার করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের বীরযুগের অন্তত দুজন লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে—আমরা প্রথম ধারার প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সাহিত্যে তাঁদের মূল আকুতি ছিল গভীর জীবনবোধের উৎসার ঘটানো। এটা করেছিলেন তাঁরা হাস্যপরিহাসের সজীব ধারায় সাহিত্যকে নিরন্তরভাবে প্রাণোচ্ছল রেখে। নিজেদের প্রায় সবধরনের লেখায় তাঁরা মার্জিত প্রসন্ন কৌতুকরসের যে দুর্লভ স্বাক্ষর রেখেছেন, যেভাবে গহন হৃদয়োপলব্ধির সঙ্গে সুস্মিত কৌতুককে অবলীলায় লতিয়ে দিয়েছেন তা বিশ্বসাহিত্যের কিছু কিছু স্মরণীয় সাফল্যের সঙ্গেই কেবল তুলনীয়। সাহিত্যের এই ধারাটি বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ডি এল রায়, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী পেরিয়ে নজরুল, বনফুল হয়ে এগিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ধারা রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে আসহাবউদ্দীন আহমদ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। আমাদের সাহিত্যের কৌতুক অঙ্গনের এটা রম্যরচনার ধারা। এই ধারার লেখকেরা প্রধানত কৌতুকরসের কারবারি। জীবনের গভীর রহস্যোদ্‌ঘাটনের চাইতে এঁরা যে ব্যাপারটির উপর বেশি গুরুত্ব দেন, তাকে এক কথায় বলা যায় কৌতুকাশ্রিত বিনোদন। রম্যরচনার এই ধারাটি, আমার ধারণা আমাদের সাহিত্যের কৌতুকরসেরই একটি অবক্ষয়ী শাখা, উচ্চতর শক্তিমত্তা থেকে আমাদের সাহিত্যের পতন থেকেই সম্ভবত এর উদ্ভব। ঘটনাটি তিরিশোত্তর যুগের। তিরিশের ব্যাপারে আমাদের উচ্ছ্বাস যত অবারিত হোক, মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম বা মাইকেলের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে উত্তুঙ্গ জীবনাগ্রহের যে অবিশ্বাস্য জোয়ার জেগেছিল, তিরিশের দশকই সেই বৈভবময় যুগের অনটন কবলিত হবার কাল। এই অবক্ষয়ের কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ-বিচ্যুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃস্বতাক্রান্ত বাঙালি জীবনই ছিল এই অবক্ষয়ের মূল উৎসভূমি।

মূল বিষয় ছেড়ে এই আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে পারে আশঙ্কা করে বিষয়টিকে অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

৩

আবদুশ শাকুরকে ওপরের ধারা দুটোর যে-কোনো একটায় ঝটপট ফেলে দেব—একটু মন দিয়ে তাঁর রচনাগুলো পড়ার পর এমন অতিসরল সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে না। ধারা দুটোর কোনোটিরই তিনি পুরোপুরি দখলে নন, আসলে তাঁর অবস্থান একটি তৃতীয় জায়গায়। লেখনভঙ্গির দিক থেকে তিনি অবশ্য পুরোপুরিই রম্যরচনা ধারার লেখক। রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবরাম চক্রবর্তী—এঁদের রচনাশৈলীর ভেতর থেকে উঠে-আসা। তাঁর ভাষার গড়ন বা রম্যরচনার বৈশিষ্ট্য এঁদের অনেকের লেখাকেই স্মরণ করায়। এঁদের মধ্যে শিবরামের আছরই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। তাঁর রম্যরচনায় মানবিক বিপর্যয়ের পরিচিত ঢঙ বা অনুপ্রাসের কুহকী জগৎ—দুটোতেই শিবরামের উপস্থিতি জ্বলজ্বলে। তবু ওই ধারার রম্যরচনাকারদের থেকে একটা জায়গায় তিনি আলাদা। কেবল হাসির জন্য হাসির যোগান দেন না শাকুর। তিনি কৌতুকরস সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব চিন্তা প্রকাশের বাহন হিসেবে। তাঁর লেখায় রম্যতার সাফল্য বিস্তর, তবু চিন্তার প্রকাশই তাঁর লক্ষ্য, রম্যতা উপলক্ষ। এইখানে তিনি প্রথম ধারার কাছাকাছি। প্রকরণের দিক থেকে দ্বিতীয় ধারার সগোত্র হলেও প্রসঙ্গের দিক থেকে তাঁর স্বাজাত্য প্রথম ধারার সঙ্গে। না, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের গভীর বেদনাজগৎ তাঁর নেই। কিংবা নেই প্রমথ চৌধুরীর অবলীল দীপ্র উপলব্ধিজগৎ, কিন্তু তাঁর ভেতর আছে এঁদেরই কাছাকাছি আর একটি জিনিস—চিন্তা—বৈদগ্ধ্যময়, ধারালো ছুরির মতো শাণিত একটি চকচকে চিন্তাজগৎ। জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়কে দেখার মতো অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণক্ষম একটি প্রখর মনন-সম্পত্তি রয়েছে তাঁর চেতনার ভেতর, যাকে ক্ষিপ্রচটুল হাস্যপরিহাসের ভেতর দিয়ে রম্যরচনায় তিনি তুলে ধরেন সুস্মিত শিল্পীর মতো।

এজন্য কৌতুকের ভেতর দিয়ে কখনো হয়তো একটি পুরোপুরি ছোটগল্পের আস্বাদ জোটে তাঁর লেখার ভেতর (গুপ্তধন) ; কখনো পাওয়া যায় দুর্জ্ঞেয় মানবচরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন (আত্মরতি)। কখনো এ আমাদের পৌঁছে দেয় গভীর কোনো বোধের জগতে (আরেক পা)। তাঁর প্রতিটি লেখার সবখানে ঘাই-দেওয়া কাঁটাওয়ালা মাছের মতো ক্রূর আঘাতে যা আমাদের নিরন্তর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে যায় তা হল তাঁর এই দ্যুতিময় মননশীলতা। প্রতি পদে এই চিন্তার আঘাত আমাদের আহত করে, জাগ্রত করে, আলোকিত করে এবং একটি নতুন দীপিত জগতে আমাদের তুলে নেয়। একটি রম্যরচনার কাছ থেকে এতখানি প্রাপ্তি সত্যিকার অর্থেই দুর্লভ। এ দিক থেকে বাংলা হাস্যকৌতুকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারায় তাঁর স্থান তৃতীয় একটি বিন্দুতে। তিনি সেই দলের লেখক যাঁরা রম্যরচনার ছদ্মাবরণে উচ্চতর চেতনাসম্পদ সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন। শাকুরকে তাই শুধমাত্র রম্যরচনাকার হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। তিনি রম্যরচনার ক্ষেত্রে একটি সম্পন্ন ধারার প্রবর্তক। তিনি যা উপহার দিয়েছেন তা সঠিক অর্থে রম্যরচনা নয়, এগুলো রমণীয় রচনা।

শাকুরের রম্যরচনার আর একটা দামি সম্পত্তি এর বৈদগ্ধ্য। এই রম্যরচনাগুলো হাতে নিলেই টের পেতে দেরি হয় না যে এই লেখকের পড়াশোনা বিস্তর এবং ওই জগতে তিনি নিদ্রাহীনভাবে জাগ্রত। ক্ষুরধার ধী-শক্তির কারণে তিনি পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে দৃষ্টিপাত মাত্র নিজের ভেতর আত্মসাৎ করতে পারেন। তাঁর মেধা প্রখর এবং মনন জাগ্রত। তাঁর চিন্তাপ্রক্রিয়া আধুনিক। জ্ঞান, মেধা এবং মননের সমবায় তাঁর বৈদগ্ধ্যকে এমন এক পরিশীলিত শ্রী এবং উপভোগ্যতা দিয়েছে যার কাছাকাছি জিনিশ চিরায়ত বাংলাসাহিত্যের ভেতরেই কেবল খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর প্রতিটি বাক্য পরিশীলন ও মননের উদ্ভাসে আলোকিত এবং আকণ্ঠ উপভোগ্য। তাঁর শব্দেরা সজাগ ও গতিময়। প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন মানুষের আটপৌরে জীবনকে উপহার দিয়েছিলেন কৌতুকরসের চটুল তারল্যে উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী ভাবের আভিজাত্যকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁদের বর্ণাঢ্য ভাষায়, কৌতুকের মার্জিত রস সংযোজন করে। শাকুরের এলাকা একটু আলাদা। মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ও অসহায়তাকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বৈদগ্ধ্যময় ভাষায়। কৌতুকাশ্রিত বাংলাসাহিত্যের ধারায় এটি একটি পৃথক পদপাত।

৪

কৌতুকরস আবদুশ শাকুরের সহজাত। কৌতুকরসের উপাদান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে নিম্নমাত্রার দুঃখের কথা বলেছেন সেই অক্ষতিকর মানবিক দুর্দশার ছবি ফুটিয়ে তোলায় তাঁর ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। নিম্নমাত্রার দুঃখের উদাহরণ দিতে গিয়ে আবদুশ শাকুর তাঁর 'হাস্যরস' প্রবন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তাঁর নিজের হাস্যরসের প্রকৃতি বোঝাবার জন্যেও সে দৃষ্টান্তটি এখানে তুলে ধরছি :

> পঞ্চদশ লুইয়ের সভাসদ এক মার্কুইস একদিন সফর থেকে অপ্রত্যাশিত প্রহরে ঘরে ফিরে এলেন। কোথাও কাউকে না পেয়ে বেগম সাহেবার খাস খামরায় ঢুকলেন। সেখানে স্বীয় স্ত্রীকে তিনি পেলেন বটে, তবে জনৈক বিশপের আলিঙ্গনপাশে 'আবদ্ধাবস্থায়'। মুহূর্তকাল দ্বিধার পর মার্কুইস শান্তপদে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে রাজপথের দৃশ্যমান জনারণ্যকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করার ঢঙে হাত নাড়তে লাগলেন।
>
> 'ও কী করছ তুমি?' দুশ্চিন্তাকাতর পত্নীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।
>
> 'আমার কর্তব্য পালন করছেন বিশপ। তাই তাঁর দায়িত্ব পালন করছি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যন্ত্রণা ফুলেফেঁপে দুঃসহ আবেগে বিস্ফোরিত হতে পারত তাকে আলতো হাতে পাংচার করে দেওয়ায় যন্ত্রণা কমে গিয়ে মন হাসিতে সপ্রাণ হয়ে উঠল। শাকুর জীবনের ওই পাংচার হওয়া টায়ারের দুমড়ে-কুঁকড়ে যাওয়ার অসহায়তাকে সূক্ষ্ম রসিকতার সঙ্গে দেখতে পান ও উপভোগ করতে পারেন। তাঁর 'হায় সপ্তাহান্ত' বা 'গুপ্তধন'-এর স্ত্রীর পেরেকে পাংচার হওয়া স্বামী, 'বঁড়শি'তে আদালতের সর্বভুক লোভের বঁড়শিতে পাংচার হওয়া মামলার উমেদার, 'যন্ত্রস্থ যাত্রা'য় যানবাহনের নিগ্রহের তারকাঁটায় পাংচার হওয়া যাত্রী কিংবা 'হরিষে বিষাদ'-এ নিমন্ত্রণের আক্রমণে পাংচার হওয়া করুণ গৃহকর্তা কৌতুক জাগায়। সবখানেই এক অক্ষতিকর মানবিক বিপর্যয় মৃদু বেদনার সহযোগে কৌতুকের জিনিস হয়ে ওঠে। তাঁর রম্যরচনা পরিমাণে খুব একটা বেশি না হলেও এর আপাদমস্তক শরীর নিখাদ ও শাণিত। এবং যেখানে তা সত্যিকার সফল, সেখানে বাংলাসাহিত্যের রম্যরচনার সেরা উদাহরণ বা অবদানগুলোর সঙ্গেই তা তুলনীয়।

যে বিশদ বাস্তবতার বোধ না থাকলে রম্যরচনার ভিত মজবুত হয় না সেই বাস্তবতার ওপর সুপরিসর দখল রয়েছে তাঁর প্রতিভার। প্রখর ধীশক্তির সাহায্যে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে তিনি দৃষ্টিপাতমাত্রে আত্মসাৎ করতে পারেন বলে চারপাশের বাস্তব জগতের খুঁটিনাটিগুলো তাঁর লেখায় সসম্মানে জায়গা করে নিতে পেরেছে। কবিদের মতো বিমূর্তের লীলাজগৎ তাঁর চারণভূমি নয়। জীবনের বাস্তব সংকটকে পুরোপুরি বাস্তব চোখেই দেখতে জানেন তিনি। এই দেখা সপ্রস্থ ও অন্তর্ভেদী। তাই মানবিক বিপর্যয়ের কৌতুককর পরিস্থিতিগুলো তাঁর লেখায় এমন পরিপূর্ণ ও নিখাদভাবে উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপনার বাস্তবতায় রসিকতাগুলো হয়ে ওঠে জ্বলজ্বলে আর উপাদেয়।

৫

শোনা যায় পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা এবং লেখার ভাষা হয়ে এসেছিল কাছাকাছি। ১৯৭৩ সালে একবার বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সেদিন কথোপকথনের সময় তাঁর কথা বলার ভাষার সঙ্গে তাঁর লেখার ভাষার তেমন কোনো পার্থক্য আমি পাই নি। হয়তো এমনটাই কমবেশি ঘটে থাকে প্রায় সব লেখক, বিশেষ করে গদ্যলেখকদের বেলায়। তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহারের সার্বক্ষণিক ভাষাকে সামান্য পরিশীলিত রূপে তাঁদের কলমের ভাষা করে তোলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, শিবনারায়ণ রায় থেকে শুরু করে সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ সবার ব্যাপারে এমনটাই আমি লক্ষ্য করেছি।

শাকুরের যেসব গুণের প্রতি আমার সবিশেষ অনুরাগ তাঁর দীপান্বিত ও দ্যুতিময় বাচনভঙ্গি তার একটি। অফুরন্ত উৎসাহে অবারিত ও বিরতিহীনভাবে কথা বলে যাবার এক বিচ্ছুরিত প্রতিভার অধিকারী তিনি। মনে হয় অনায়াসে, মুখে মুখে, কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন অবলীলায় রচনা করে চলেছে ভাষাশিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। আবদুশ শাকুর আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। অনেকদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর এই অদমিত, মুখরিত ও আত্মবিস্মৃত কথাবলার স্বতঃস্ফূর্ত উদযাপন দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁর এই ভাষা উজ্জ্বল ও অনিন্দ্য ; বুদ্ধির দীপ্তিতে, ক্ষিপ্র রসিকতায় ও স্বতঃস্ফূর্ততায় সম্পন্ন ও চলিষ্ণু। তাঁর রম্যরচনার ভাষা তাঁর মুখের ভাষারই পরিশ্রুত শৈল্পিক রূপ—তাঁর মুখের কথার আকরিক উপাদানগুলো থেকে মনোরমভাবে ছেঁকে-তোলা একেবারে খাঁটি জিনিস। এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। তাঁর মুখের ভাষা তাঁর ব্যক্তি-প্রকৃতির মতোই, অপ্রতিরোধ্য, দুর্দমনীয় ও জন্মান্ধ। অনেক সময় শ্রোতার প্রীতি বা অপ্রীতির ওপর জবরদস্তিরকমভাবে অত্যাচারী ও আত্মবিস্মৃতিপরায়ণ। কিন্তু তাঁর রম্যরচনার ভাষা শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। নিটোলতায়, পরিমিতিতে ও সম্পূর্ণতায় কবিতার বিরল সাফল্য আছে এতে। তাঁর মুখের ভাষার আগ্রহ, আকুতি, প্রতিভা ও শক্তিমত্তা থেকে জেগে-ওঠা এ এক পরিশ্রুত পৃথিবী।

তাঁর মুখের ভাষার মতো তাঁর গদ্যও অনিন্দ্য ও উজ্জ্বল। এই গদ্য বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্র, কাব্যময়, রঙিন ও ক্ষুরধার। গদ্যশরীর যতখানি নিখাদ আর শাণিত হতে পারে তাঁর ভাষা প্রায় তারই উপমা। আজ আমাদের চারপাশে অযত্ন আর অবহেলায় লেখা শিথিল গদ্যভাষার যে 'অলীক কুনাট্যরঙ্গ' মাথা উঁচিয়ে রয়েছে শাকুরের রম্যরচনার গদ্য চিরায়ত গদ্যের পক্ষ থেকে তার শক্তিমান প্রতিবাদ। এই ভাষা নিটোল ও নির্মেদ—শৈথিল্য, বাহুল্য বা অতিরিক্ততা থেকে অব্যাহতি পাওয়া। বিরতিহীন আক্রমণে একটু একটু এগিয়ে বক্তব্যের অবয়বকে পাঠকমনে সম্পূর্ণ করে তোলার পরেই কেবল এই ভাষার ক্ষান্তি। কেবল একটি রচনা (বঁড়শি) থেকে এখানে গোটা দুই উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

> সেদিন আমি এক পা কবরে-যাওয়া বুড়োদের আরেক পা আবিষ্কার করেছিলাম কোর্টঘরে। আর সেই কোর্টে আমার দুখানি পা-ই যাওয়ার যোগাড় হয়েছিল। হেঁটে হেঁটে হাঁটু-ভাঙা হয়ে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু দ'-টি হবার যো ছিল না। কেননা সেখানে সকলকে কেবল হাঁটতেই হয়, বসে শুধু কোর্ট। ফলে আদালতে মানুষমাত্রই অণুর মতো অস্থির, নিয়তই নড়নশীল। কোর্টে তাই কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ করাকে ধরা জ্ঞান করা হয়। যেমন—উকিল মক্কেল ধরে, মক্কেল মুহুরি ধরে, মুহুরি পেশকার ধরে। তবে পেশকার আর হাকিম, এ-দুজনেই কেবল করে। একজনে করে মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ, আরেকজনে করে তারই পোশাকি সমর্থন—নির্ধারিত স্থানে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর অঙ্কনের মাধ্যমে।

শাকুরের শব্দের শক্তি বিস্ময়কর। নির্মেদ ও লক্ষ্যভেদী শব্দে তিনি বক্তব্যের ছবি ফুটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন, শব্দের ধ্বনি-জগৎ তৈরি করে ছবিকে জীবন্ত করে তোলেন।

> যত্রতত্র কিলবিল করছে উকিল আর উকিল। শুধু আমার উকিলটিই মিলছে না। শকুনের মেলে-থাকা ডানার মতো গাউন-উড়ানো উকিলদের চতুর্দিকে ঊর্ধ্বশ্বাস চক্কর-মারা দেখলে মনে হয়—মৃত মক্কেলদের উপর শত শত শকুন পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপবাসগ্রস্ত উকিলদের কালো জগৎ চোখে ভেসে উঠল।

তাঁর গদ্যভাষাই যে কেবল শৈথিল্য বাহুল্যহীন তাই নয়, তাঁর রম্যরচনাগুলোর শৈল্পিক সম্পূর্ণতাও অবাক করার মতো। আমাদের সমকালের সবচেয়ে শিল্পসচেতন লেখকদের একজন তিনি। প্রাচীন লঙ্গিনুস দুই হাজার বছর আগেই লক্ষ করেছিলেন যে অতিশয়োক্তি এক ধরনের নয়, দু ধরনের। অতিকথনের মতো স্বল্পকথনও অতিশয়োক্তি। এই দুই ধরনের অতিশয়োক্তি থেকে বাঁচিয়ে সম্যক কথনের ভেতর শিল্পশরীরকে রমণীয় করে তোলাতেই শিল্পের সিদ্ধি। শাকুরের রম্যরচনাগুলো এই ধরনের নিখাদ পারিপাট্যের চমৎকার উদাহরণ। সবরকম স্খলন, অযত্ন, অতিরিক্ততা থেকে বাঁচিয়ে শিল্পের অনিবার্য উপাদানগুলোকে এক নিখুঁত পরিমিতিবোধের ভেতর রূপায়িত করেছেন তিনি। একজন সৎ কবির বিশুদ্ধতার আবেগ দিয়ে তিনি তাড়িত হয়েছেন এই রচনাগুলোয়। আশ্চর্য যে, এই অভিনন্দনযোগ্য চেষ্টা তিনি করেছেন তাঁর এই রম্যরচনাগুলোয়—সাহিত্যের তুলনামূলকভাবে অপাঙ্‌ক্তেয় একটি সরণিতে। শিল্পের পরমা নির্মাণে তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। যাঁরা শিল্পের শুদ্ধতায় বিশ্বাস করেন, এই শৈল্পিক সম্পূর্ণতা তাঁদের চোখে যেমন বিস্ময় জাগাবে, তেমনি শিল্পের স্খলনকে যাঁরা উদার ও ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে ভালোবাসেন তারাও এই সম্পূর্ণতার সৌন্দর্যকে প্রশংসা না-করে পারবেন না।

৬

মানুষের মধ্যে কৌতুকরসের জনপ্রিয়তা সব কালেই ব্যাপক। এর সফল স্রষ্টা মানুষের সমাজে প্রিয় ও আদরণীয়। পরশুরাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবরাম থেকে টেনিদা-ঘনাদার স্রষ্টারা সবাই বিপুলভাবে পাঠকনন্দিত। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার পেছনেও রয়েছে তাঁদের গদ্যের এই অন্তঃসলিলা হাস্যরস। কিন্তু শাকুরের নিয়তি এর বিপরীত। হাস্যরসের কারবারি হয়েও তাঁর পাঠকপ্রিয়তা তেমন বেশি নয়। এর কারণ তাঁর রচনার সেই দুটি অনন্যসাধারণ সম্পত্তি—মননশীলতা ও বৈদগ্ধ্য। হৃদয়ের ভাষা চিরকালই সর্বজনীন। প্রাকৃত-নাগরিক, বিদ্বান-ব্রাত্য, হরিপদ কেরানি বা আকবর বাদশাহর সবার মনে তা একইভাবে হিল্লোলিত। কিন্তু মনন, জগৎ রয়েছে খুব অল্পসংখ্যক মানুষের ভেতর। মানব প্রজাতির বিরলতম সম্পত্তির এটি একটি। এর অধিকারী যেমন সীমিত তেমনি সীমিত এর ভোক্তা। দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্যান্য জ্ঞানজগতের দীপ্র জটিল অন্বেষণের মতো, চিন্তাশীলতার প্রদীপ্ত তীব্র বিভার মতো, মানুষের মননশীলতাও আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘিষ্ঠের আস্বাদের জিনিস। এইজন্য শাকুরের মননাশ্রিত কৌতুক ভিড়ের সম্পত্তি নয়, আর তা হবেও না কোনো দিন, হাসির খোরাক উপহার দিয়েও তাই তাঁকে হয়তো কমবেশি থেকে যেতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সামাজিকের উৎসাহের বাইরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যজগতের মননির্ভর লেখকদের মতো—বাংলা কবিতার মাইকেল, মোহিতলাল, সুধীন দত্ত, বিষ্ণুদের মতো বা উপন্যাস-জগতের রবীন্দ্রনাথ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মননশীল ও বিদগ্ধ স্বল্পসংখ্যক পরিশীলিত সুধী পাঠকের জন্য তিনি হবেন আকণ্ঠ উপভোগ ও আগ্রহের বিষয়। এদিক থেকে তাঁর ভাগ্য সাহিত্যের ছোটগল্পকারদের মতো। আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখব, গল্পের প্রতি মানবসমাজের বিপুল উৎসাহ থাকলেও 'ছোটগল্পে'র পাঠকসংখ্যা সে-তুলনায় বেদনাদায়ক-রকমে কম। এর কারণও ছোটগল্পের মননশীল চরিত্র। গল্পের মানবীয় সরসতায় পরিবেশিত হলেও ছোটগল্প আসলে গল্প নয়, প্রবন্ধ, জীবনরসাশ্রিত সহৃদয় প্রবন্ধ। গল্প শোনানো ছোটগল্পের উদ্দেশ্য নয়, এর আসল উদ্দেশ্য সত্যোদ্‌ঘাটন। তাই সত্যটিকে তুলে ধরা মাত্র ছোটগল্পের ভেতরকার গল্পের উদ্দীপনাটিকে মমতাহীনভাবে শেষ করে দেওয়া হয়। ফলে ছোটগল্পের সত্যের অংশটুকু শেষ হলেও গল্প তখনো অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই ছোটগল্পের শেষে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'-এর অতৃপ্তির ভেতর পাঠককে একটা শ্বাসরুদ্ধকর নির্যাতন পোহাতে হয়। জীবনের সত্যকে তুলে ধরার জন্যেই গল্পের ভেতর এতসব জীবনরসের আয়োজন। তাই গল্প যত না আমাদের দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবায়। গল্পের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ অসীম হলেও, ওই চিন্তামূলক পরিণতিটির কারণে 'ছোটগল্পে'র ব্যাপারে তাদের উৎসাহ তাই কম, তাই ছোটগল্পের পাঠক এত সীমিত। গল্প এবং ছোট হওয়া সত্ত্বেও ছোটগল্প অজনপ্রিয়।

আবদুশ শাকুরের মূল দীপ্তি তাঁর মননশীলতা। এই মননশীল প্রকৃতির কারণেই তাঁর রম্যরচনাকেও পড়তে হয় ধীরে, স্বাদ নিয়ে, চেটে, উপভোগ করে করে। তরতরিয়ে এগিয়ে যাবার অবকাশ এখানে নেই। এ ধরনের বৈদগ্ধ্য আর মননের জগতে সে সুযোগ থাকার কথাও নয়। তাঁর বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল প্রকৃতি সত্যিকারের রসভোক্তার প্রতীক্ষা করে। এই বৈদগ্ধ্যের কারণেই তাঁর রম্যরচনাকে হয়তো থেকে যেতে হবে পাঠকজগতের জনবিরল এলাকায়—মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ ও মেধাবী মানুষের ভালোবাসার পৃথিবীতে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো হয়তো তাঁকেও বলতে হবে : আমার নৈশভোজ জমবে দেরিতে, কিন্তু ভোজের টেবিল হবে আলোকোজ্জ্বল, অতিথি হবে সুনির্ধারিত, হাতে গোনা।

মননশীলতার কারণে তাঁকে কমবেশি পাঠক হারাতে হয়েছে সত্যি, তবু যা তাঁর রম্যরচনাকে আরো পাঠকবিরল করেছে তা তাঁর মননশীলতা নয় বরং তাঁর ওই সম্পদটির বিপজ্জনক রকমের অপব্যবহার।

অতিশয়োক্তি তাঁর রচনাশরীরে নেই, আছে তাঁর মননের আর বৈদগ্ধ্যের আধিক্যে। তাঁর রম্যরচনা এই উপাদানগুলোর বিরতিহীন অতিব্যবহারে যান্ত্রিক। তাঁর তীব্র বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল মনন এমনিতেই সাধারণ পাঠককে হতবুদ্ধি করে। ফলে এসবের আধিক্য হয়ে ওঠে নির্মমতা পর্যায়ের। তাঁর মননশীলতার অনন্য ও অসহনীয় রূপের জগৎ বড়বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতনকারী। এই উজ্জ্বল দীপ্র বৈদগ্ধ্যের ঠাসবুননির ভেতর সহজ নিশ্বাসের জায়গা কম। গা-এলিয়ে, হাতপা ছড়িয়ে, দৈনন্দিনের সহজ অবকাশের ভেতর একে আস্বাদনের পথ নেই। আমার ধারণা, তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্যের এই উজ্জ্বল অত্যাচার সাধারণ পাঠককে চিরকাল এর পাঠক হবার পথে বিরত, ব্যাহত করবে।

৭

উজ্জ্বল কৌতুক, বৈদগ্ধ্য, মননশীলতা ও শব্দের প্রতিভাকে সমন্বিত করে আবদুশ শাকুর এমন একধরনের রম্যরচনার জন্ম দিয়েছেন যা এগুলোকে রম্যরচনার চেয়ে বড় করে তুলেছে। রম্যরচনার ধারার ভেতর থেকেও এসবের সহযোগে তিনি তাঁর রচনাকে যে পরিশীলন ও শৈল্পিক সম্পূর্ণতা দিয়েছেন তার আস্বাদন প্রকৃত রসভোক্তার প্রতীক্ষা করে। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী যে-ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন বা কবিতার ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র যে-ধারার প্রতিনিধি, তিনি সেই ধারারই উত্তরসাধক। বিপুলভাবে পাঠকবিরল এবং সমালোচকদের অনাগ্রহের শিকার হলেও আমার ধারণা, আবদুশ শাকুর বাংলা সাহিত্যের সেইসব সম্পন্ন কৌতুকরস স্রষ্টাদের একজন যাঁরা আমাদের সাহিত্যে, মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও স্মরণীয় হাস্যরস উপহার দিয়েছেন।

১৯৯৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর
জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*

১

যেসব লেখক আমাদের সমকালের নন, অতীতের, সাহিত্যের জগৎকে একদিন উষ্ণ উত্তপ্ত ও প্রবহমান রেখেছিলেন যাঁরা—তাঁদের সাহিত্যের মূল্যায়ন যে আমরা একালে অনেকটা নির্ভরযোগ্যভাবে করতে পারি তার কারণ, আর সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল তাঁদের রচনাটুকুই আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয়। তাঁদের যে ব্যক্তিত্ব এসময় তাঁদের সমকালের মানুষদের হতচকিত করে তাঁদের রচনার মান সম্বন্ধে যুগের মতামতকে প্রভাবিত করেছিল; দীর্ঘ ব্যবধানের ফলে, একালে, তা একজন সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতেও অক্ষম। পৃথিবীর সেই লোকশ্রুত সোনার তরী নদীতীরের ব্যাপ্ত, নিঃসঙ্গ, ভয়সঙ্কুল চরে করিব ব্যক্তিপরিচয়কে নির্দ্বধায় উপেক্ষা করে শুধু সোনার ধানগুলোকেই পরবর্তী যুগের ঘাটে উপহার দিয়ে যায়। ফলে সবরকম ব্যক্তিপ্রভাবের বাইরে গিয়ে অনেকটা মুক্ত ও স্বচ্ছ চোখে আমরা তাঁদের রচনাকে বিচার করতে পারি।

কিন্তু নানা কারণে নিজের কালের লেখকদের সাহিত্য সম্বন্ধে রায় দেয়া কঠিন। তাঁরা আমাদের এত কাছের, চারপাশে এত জীবন্ত, মাথার ওপর জলবহুল মেঘখণ্ডের মতো এমন অবধারিতভাবে ঝুলে আছেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাবকে পুরো কাটিয়ে, তাঁদের নিরপেক্ষ সাহিত্যের বিচার প্রায় অসম্ভব। শুধু প্রতিভাধরদের ব্যাপারেই নয়, বিত্তহীন ও সাধারণ লেখকদের বেলাতেও, ছোট আকারে, বিষয়টি সত্য।

তাছাড়া এমনিতেও কোনো সাহিত্যের মূল্যায়ন সমকালে কঠিন। সমযুগের সাহিত্যের অনেক উজ্জ্বলতা ও দৌর্বল্য, খুববেশি নৈকট্যের কারণে অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে না। খুব কাছে থেকে দেখা হয় বলেই, সাহিত্যের অনেক নতুনত্ব ও পরিবর্তন বা শিল্পের অনেক গভীর সিদ্ধিও আমাদের অবলোকন এড়িয়ে যায়। ফলে সমালোচকদের দ্বারা স্বকালের লেখকদের মূল্যায়নের মহত্তম সদিচ্ছাও অনেক সময় ব্যর্থতার বালুতে মুখ গোঁজে। আমার বিশ্বাস, নিজেদের কালের সাহিত্যের সত্যিকার বিচার আমাদের দ্বারা অসম্ভব, আমরা উজ্জ্বল ভাষায় সমকালের সাহিত্যের বিস্ময়কর দিকগুলোর বন্দনা বা নিন্দা রেখে যেতে পারি মাত্র।

---

* আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর প্রথম কবিতাগ্রন্থ।

২

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ-এর রচয়িতা আবদুল মান্নান সৈয়দ আমাদের সমকালের একজন তরুণ-কবি। তরুণ নয় কেবল, আমাদের পরিচিত এবং সগোত্র সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আমাদের অনেকের ব্যক্তিগত বন্ধু। আমাদের হাতে তাঁর কবিতার যে যথেষ্ট সুবিচার পাবার সম্ভাবনা নেই, উপরের কারণগুলোই তার জন্য যথেষ্ট। আমরা তাঁর কবিতা পড়ি, পরিবেশভেদে তাঁর আনন্দজনক ও বিরক্তিকর সান্নিধ্যে বাস করি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা চেতনাগতভাবে এতটাই অধিকৃত থাকি যে সেগুলোর হাত এড়িয়ে তাঁর কবিতার ন্যায্য বিচার আমাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন।

এছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে। সম্প্রতি আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা আমাদের কাব্যবিচারকে একটা বিব্রত প্রশ্নের সামনে ফেলেছে। তাঁর কবিতা পাঠকমহলে বেশ বিতর্ক তুলেছে। একজন তরুণ-কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এটি একটি সাফল্য। কেননা, অনেক কবিতার ক্ষেতে সমকালের বিতর্কই সেই কষ্টিপাথর যার দ্বারা সেই কবিতার ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়েছে। এই কবিতাগুলো কবিতা হিশেবে কোন্ মনের—আদপেই কবিতা কিনা এগুলো, নাকি দামি জিনিশ—এর কোনোটা সম্বন্ধেই পাঠকের ধারণা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। যাঁরা এই কবিতাকে কবিতাপদবাচ্য ভাবতে নারাজ তাঁরাও নিরুপায় হয়ে লক্ষ করেন যে এসবের মধ্যে এমনকিছু আছে যা সত্যিকারের কবিতার জীবন-লক্ষণ। আবার যাঁরা এই কবিতাকে 'সৎ' ভাবছেন তাঁরাও তাঁর এই কবিতার অনন্যতার কারণগুলো নির্দেশ করতে অপারগ হচ্ছেন। মোটকথা, এই কবিতার সাহিত্যমূল্যের ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা অনিশ্চিত জায়গায় বিভ্রান্ত হয়ে আছে। আমি এই আলোচনায় তাঁর কবিতার সেই বিভ্রম বা রহস্যভেদের চেষ্টা করব না। তাঁর কবিতার কাব্যিক উপচারগুলো নিয়ে আমি শুধু আলোচনার চেষ্টা করব এবং দেখতে চেষ্টা করব সেই উপাদানগুলো কবিতাকে কতখানি শক্তি বা ব্যর্থতা দিয়েছে।

৩

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ হাতে নিয়ে একজন নির্বোধ পাঠকও, আমার বিশ্বাস, অনুভব করবেন যে এই কবিতাগুলো অর্ধমনস্ক শৌখিন চেষ্টার ফসল নয়। এই কবিতাগুলো রচিত হবার পেছনে চেষ্টা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য রয়েছে। কবিতাগুলোতে প্রতিটি শব্দের ব্যবহার সচেতন, প্রতিটি উপমা সযত্ন এবং প্রতিটি কবিতাই সশ্রম ও সতর্ক প্রয়াসের ফল। বোঝা যায়, কবিতার ব্যাপারে কর্মঠ চেষ্টায় হাত দিয়েছেন কবি, প্রাণপণে ও সচেতনভাবে চেষ্টা করছেন গতানুগতিক কবিতার সহজ পেলব ও পরিচিত জগৎ থেকে, চেনা উপমা ও পুরোনো রূপকের ভিড় থেকে নিজেকে পৃথক করে তুলতে। বারবার তিনি নতুন শব্দ, নতুন চিত্রকল্প ও রূপকের দ্বারস্থ হচ্ছেন; স্বস্তিহীনভাবে খুঁজে আনছেন তাদের, রাখছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করছেন—নতুন অনুষঙ্গে, অপরিচিত অভিধায়। আর সেইসঙ্গে চেষ্টা করছেন যা একজন সৎকবির চিরকালের ঈপ্সা : নিবৃত্তিহীনভাবে খুঁজে যাওয়া 'স্বকীয়তা'—গতানুগতিক কবিতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছন্দ শব্দ রূপকল্পের কিছু 'নিজস্ব' সম্পত্তি রোজগার। আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুণ-লেখকদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ সেই ব্যক্তি যিনি স্বকীয়তা অর্জনের জন্য সবচেয়ে দুরূহ শ্রম দিয়েছেন।

একজন তরুণ-কবির পক্ষে এই উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। নিজের স্বকীয়তা আবিষ্কার করার জন্য সচেতন শ্রমও একজন সৎকবিকে অল্পবিস্তর প্রমাণ করে—তাঁকে অকবির দল থেকে আলাদা করে, স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা দেয়। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রতিটি কবিতা তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর অন্বেষণের সাক্ষ্য।

ব্যাপারটি এত স্পষ্ট ও চক্ষুগ্রাহ্য যে এ-বিষয়ে বাক্যব্যয় অবান্তর। এবং কবিও ব্যাপারটাকে অকপট ও খোলাখুলিভাবে জানান দিয়েছেন। এই চেষ্টা এতটাই যে এই গ্রন্থের মলাটের বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়েছে : এ কবিতা 'বীততিরিশ'। অর্থাৎ, এই কবিতা ছন্দ, শব্দ, অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্পে 'তিরিশ' বলে কথিত কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র্য রেখেছে।

প্রশ্ন হতে পারে : শুধু 'বীততিরিশ' কেন? কবিতা যদি সত্যি 'স্বকীয়' হয়ে থাকে, তবে সে কবিতা, সভ্যতার প্রথম থেকে আরম্ভ করে আজ অব্দি যত কবিতা লেখা হয়েছে বা লেখা হবে—তাদের সবার থেকে তো চিরকালের জন্যই আলাদা হয়ে গেছে। তবে কেন কেবল 'বীততিরিশ'? আমার মনে হয়, আত্মসন্দেহে ভুগছেন কবি। তাঁর সচেতন চেষ্টা 'তিরিশে'র হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু সে-সিদ্ধি এখন পর্যন্ত তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর বিধিলিপি তাঁর বিরুদ্ধে। জন্মসূত্রে তিনি তিরিশের সন্তান—রবীন্দ্রনাথ কিংবা বাংলাসাহিত্যের অন্য কোনো যুগের লেখকেরা নন, তিরিশের কবিরাই তাঁর পূর্বসূরি। তাঁর পাঠের প্রধান ক্ষেত্র 'তিরিশে'র সাহিত্য ; আলোচনার প্রধান বিষয় তিরিশের কবিকুল। উপরন্তু তাঁর প্রবন্ধ এমন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাঁর সাহিত্যবোধও অনেকটাই তিরিশের কাছে ঋণী। এমন অবস্থায়, তিরিশের প্রভাব থেকে নিরঙ্কুশ অব্যাহতি তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অথচ তাঁর মতো একজন তরুণ-কবি—যিনি বিরামহীন বিশ্রামহীন খুঁজে যাচ্ছেন মৌলিকতা, তিরিশের লোমশ গর্ত থেকে প্রাণপণে বেরোতে চাচ্ছেন—তাঁর পক্ষে এই সত্যে বিশ্বাস মর্মান্তিক। মর্মান্তিক নয় শুধু, অবমাননাকর ; তাঁর স্বকীয়তার ওপর আঘাত বিশেষ। এইজন্য তাঁর কবিতার মধ্যে তিরিশের অস্তিত্বকে তিনি হয়তো অস্বীকার করতে চান এমনি সচেতনভাবে ও প্রকাশ্যে। এ কবিতা যদি নিজের রক্তের ভেতর কোনো স্পষ্ট প্রভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকত, তবে তা নিজের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে থাকত নীরব, নিজেকে 'বীততিরিশ' বলে প্রমাণ করার এমন সরব ও প্রকাশ্য চেষ্টা থেকে বিরত হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বক্তব্য : যতই অস্বীকার করা হোক, আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা, আপদমস্তক, তিরিশের দ্বারা প্রভাবিত। মনে হয় তাঁর কবিতার অন্যান্য বিষয়ে আলোচনায় যাবার আগে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে নেয়া দরকার। নইলে তাঁর কবিতার স্বকীয়তার স্বরূপটি বুঝতে অসুবিধা হতে পারে।

প্রথমে তাঁর কবিতায় তিরিশের বিভিন্ন কবির প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে এই কবিতাগুলো তিরিশের কবিদের কাব্যপ্রয়াসের কাছে কতখানি ঋণী। মান্নানের কবিতা যেসব কবির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে, যাঁদের রচনা তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে, উৎকর্ষ দিয়েছে শব্দ ও চিত্রকল্পকে, তাঁরা আসলে তিরিশেরই দুজন প্রধান কবি—জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বললে হয়তো ভুল হবে না মান্নানের কবিতার মূলসূর আজ পর্যন্ত তাঁদের প্রভাবের বাইরে বেরোতে পারেনি। প্রসঙ্গত মান্নান সৈয়দের কবিতা থেকে দু-একটি উদাহরণ খুঁজে নিয়ে তিরিশের এই প্রভাব যে সেখানে কতখানি গভীর, দেখাবার চেষ্টা করা যাক।

> 'কমলালেবুর আলো পেয়েছিল এখানে সুবিধা,
> ইতিহাস, ভবিষ্যৎ—উভয়েই যথাযথা ডানা মেলেছিল একদিন,
> একদিন রাত্রিভোর ছুড়েছে তরল তীর কার্তিক তারার সৈন্যদল:
> চেতনা পায়নি টের শুধু, শিশিরে গিয়েছে মন ভিজে
> আবার শুকায় অনন্তের লতা; তখন বুঝেছি
> এসে চলে গেছে সুবাতাস কবে।'

এই কবিতা কি বীততিরিশ? যে কেউ অনুভব করবেন, জীবনানন্দের প্রভাব এই কবিতার শরীরে কী ব্যাপ্তভাবে মিশে আছে। সেটা এতই যে এই কবিতা জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কোনো কবিতা বলে প্রকাশিত হলে অনেক পাঠককে হয়তো ফাঁকি দেওয়াও সম্ভব হত।

প্রথমে ছন্দের কথা ধরা যাক। অক্ষরবৃত্তের এই বিশেষ ঢঙটি জীবনানন্দীয়। চিত্রকল্পের ব্যাপারেও একই কথা। যাঁরা জীবনানন্দ দাশের মিষ্টি নরম জাফরানি রঙের আলো-আঁধারি জগতের খবর রাখেন, তাঁরা অনুভব করবেন, এই 'কমলালেবুর আলো' কী গভীরভাবে জীবনানন্দীয়। এছাড়াও অন্যান্য, যেমন, 'কার্তিক তারার সৈন্যদল', 'শিশিরে গিয়েছে মন ভিজে' 'একদিন রাত্রিভোর ছুড়েছে তরল তীর'—এসব চিত্রকল্প জীবনানন্দের জগতের সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ত।

শব্দের কথাও ধরা যেতে পারে। কবিতাটির নাম ('সুবাতাস') দিয়েই আরম্ভ করছি। যদ্দুর মনে হয়, 'সুপবন'কে 'সুবাতাস' করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ নিজেই এবং শব্দটিকে কবিতায় ব্যবহার করে এর কাব্যসম্ভাবনা তুলে ধরেছিলেন। 'অতীত ও ভবিষৎ'কে 'ইতিহাস-ভবিষ্যৎ', 'ডানা মেলেছিল', 'তারার সৈন্যদল'—প্রায় সবগুলো শব্দ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দগুচ্ছই জীবনানন্দের অনুষঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়। এ কেবল এখানে নয়, অনেক কবিতাতেই হয়েছে এমনটা। এবার আরেক ধরনের একটি কবিতা নেয়া যাক। কবিতাটির নাম —'*বেগনা সেরেনাদ: ১*'

'তোমার একটি চোখ ফেলে গ্যাছো আমার কৈশোরে, হে
বৈদেহী, নাস্তিক নেমির মধ্যে জন্মমৃত্যু একাধারে তুমি; ধর্মাধর্ম
লুফে নিয়ে অঙ্গুলিরুচিতে খেলা করো, কিবা দীর্ঘ নোখের
ত্রিকোণে এমুড়োওমুড়ো চিরে ফ্যালো হৃৎপিণ্ড আমার,
তুমি রবে আমার শারদ বিদ্যা, অলৌকিক শ্রাবণরজনী
তোমার বৈকুণ্ঠ ক্ষরণ; চন্দ্রাবলী, আমার
সমগ্র দর্প তোমার সম্মুখে আনত আভূমি; যদি আশুতোষে
যাই, আমি রবো তোমার অধিকতর সঞ্চিত'।

আমার বিশ্বাস, সচেতন পাঠের পর এ-কবিতাকে যে-কেউ সুধীন দত্তের জলমেশানো সংস্করণ বলে চিহ্নিত করতে পারবেন। এখানে 'তোমার একটি চোখ ফেলে গ্যাছো আমার কৈশোরে'—[পঙ্‌ক্তিটি, সন্দেহ নেই, খানিকটা কবির নিজের এবং খানিকটা জীবনানন্দের! কিন্তু তারপরেই 'বৈদেহী', 'নাস্তি', 'নেমি', 'জন্মমৃত্যু', 'একাধারে'—সুধীনদত্তীয়। 'ধর্মাধর্ম'—এই ধরনের পদের ব্যবহার সুধীন দত্তের অনুষঙ্গের কথা স্মরণ করায়। তাছাড়া, 'বৈকুণ্ঠ থেকে অকুণ্ঠ ক্ষরণ', 'শারদ বিদ্যা', 'আনত', 'আভূমি' শব্দগুলোকেও অস্ফুটভাবে সুধীনদত্তীয় আবহের বাসিন্দা বলে শনাক্ত করা কঠিন নয়।

সম্পূর্ণ সমিল ছন্দের কবিতা এ গ্রন্থে একটি। কবিতাটির নাম— 'অনয় কবিতা' :

'আমি যখন সন্ধে হবো,
তখনো আমি অনাগত
জীবন আমার প্রসন্নতা
তোমার মতো, প্রভু, তোমার মতো;
কটির তলে নতুন-জাগা পাতা
কৃতজ্ঞতার নকশি-কাঁথা
পাঠিয়েছিলো কবে,
আজ সে কাঁদে স্মৃতির হাতে
করুণ-উন্নত।'

এ কবিতা, স্পষ্টত, রবীন্দ্র-আবহাওয়ায় লালিত। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতার আবহ এখানে প্রকটভাবে উপস্থিত। কবিতাটির সংগীতের জগৎও পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক—বেশকিছু পঙ্‌ক্তি, শব্দ, শব্দের ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যমিলের স্বভাব পর্যন্ত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। দেখানো যেতে পারে, তাঁর কবিতা তিরিশের কবিদের, এমনকি রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও কী অন্তর্গতভাবে আক্রান্ত হয়ে আছে।

তাহলে আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় নতুনত্ব কোথায়? ছন্দে? না। তাঁর কবিতার ছন্দও গতানুগতিক। তাঁর ব্যবহৃত গদ্যছন্দ (যে ছন্দে তাঁর কাব্যের অধিকাংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা রচিত) তাঁর পূর্বে, তিরিশের কবিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে।

তবে কোথায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য? চিত্রকল্পে? তাঁর চিত্রকল্পে স্বকীয়তার অভাব নেই, তবু উদ্ধৃতির সাহায্যে এমন ভূরি-ভূরি চিত্রকল্পের উদাহরণ তাঁর কবিতা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব, যেগুলো তিরিশের চিহ্নিত সম্পত্তি।

তাহলে স্বকীয়তা কি শব্দে? আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুণ-কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতার শব্দই সবচেয়ে বেশি তিরিশাশ্রিত।

তবে কিসে তিনি 'বীততিরিশ? তাঁর কবিতার স্যুররিয়ালিজমের ব্যবহারে? তাও নয়। তাঁর কবিতার রাত্রির রাস্তায় যে রহস্যময় স্যুররিয়ালিজমকে অস্পষ্ট টোপর মাথায় নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়, আমাদের সাহিত্যে সেই অশরীরীর জন্ম তো তিরিশের যুগেই হয়েছে।

৪

স্বকীয়তা কোথায় তাঁর—তবে? এক কথায় উত্তর দেব—অনেকখানে। আমি সংক্ষেপে বিষয়গুলো এক এক করে তুলে ধরছি। দেখাতে চাচ্ছি, তিরিশের দ্বারা আপাদমস্তক কবলিত হবার পরেও কী করে স্বকীয়তা তাঁকে বৈশিষ্ট্যের দরোজায় উত্তীর্ণ করেছে।

তাঁর প্রধান স্বকীয়তা উপমায়—এর বিচিত্রমুখ ব্যবহারে, সাফল্যে, অজস্রতায়। 'উপমাই কবিত্ব' উক্তিটির সত্যতা বিচারসাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা আসলে কতকগুলো উপমা। এই কবিতাগুলো পড়ার সময় একটা আর্ট গ্যালারির কথা মনে পড়ে; যার তাকে-তাকে, সারে-সারে সাজানো রয়েছে বিচিত্র রকমের অসংখ্য ছবি; যার দেয়ালে, চারপাশে, উঁচুতে, নিচুতে অজস্র ছবির সমাহার। মোটকথা, এই কবিতার প্রতিটি বাক্য একটি উপমা; প্রতিটি শব্দ পরিপূর্ণ চিত্র।

তাই বলে তাঁর সব উপমাই সাফল্যে উজ্জ্বল, এমন কথা কিন্তু বলব না আমি। আমার বক্তব্য তাঁর অধিকাংশ উপমাই অনিন্দ্য, নিটোল এবং উজ্জ্বল। সেসব উপমা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে হয় অচেনা কোনো জগৎ থেকে পালিয়ে এসে এইসব 'বাসা-ছাড়া পাখি' এই কাব্যের জলাভূমিতে ঘর বেঁধেছে।

তাঁর কবিতার অন্ধকার গলিতে আপনিও সেই 'লাল নীল সবুজ' উপমাগুলোকে ঝাঁকে-ঝাঁকে জোনাকির মতো ঘুরে বেড়াতে দেখবেন। বোঝা যায়, কী ক্ষিপ্র, কী সক্রিয়, কী জাগ্রত সেই মস্তিষ্ক যা প্রতিটি উপমানের পাশে উপমেয়কে আবিষ্কার করে চোখের পলকে, অনুভূতিগুলো এক মুহূর্তে বদলে যায় একগুচ্ছ পরিচিত চিত্রে।

'জ্বলন্ত গাছসকল সবুজ মশাল।' একটা সফল চিত্রের উদাহরণ। পড়ার পর অবাক হয়ে অনুভব করা যায় যে আমাদের চারপাশের চিরপরিচিত গাছপালার জগৎ হঠাৎ যেন একটা রহস্যের পৃথিবী হয়ে উঠল যেখানে সবুজ গাছেরা চারধারে সার-সার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে অবাক সবুজ মশালের মতো আকাশের দিকে প্রজ্বলিত হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অচিন্ত্য লাগে, পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ গাছপালার একমুহূর্তে নির্বাক অসংখ্য মশাল হয়ে জ্বলতে থাকার ব্যাপারটাকে। অথবা : 'জনৈক বৃদ্ধ শাদা এবড়োখেবড়ো ডালপাতার দাঁত বের করে খুব পরিষ্কার হাসছেন।' কান্তিমান আলোয় একটা নির্মল হাসি চোখে পড়ল। অথবা এমন উপমা : 'আমি তোমার ডাকনাম রাখলুম বাতাসে আর অম্নি দুষ্টু বাতাস একটা বল হয়ে ঠোঁট কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়ল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুগাছের মাথায়।' উপমাটিতে যে দুষ্টুশিশুকে ঠোঁট কুঁকড়ে নিজের অজান্তে 'পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুগাছের মাথায়' ঘুমিয়ে পড়তে দেখা গেল, সে শিশুকে এত অনায়াসে একটা বল বানিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া সোজা নয়।

আমার মনে হয়, আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতার অপর্যাপ্ত উপমাপ্রতিভা তাঁর কবিত্বশক্তিকে অনেকখানি প্রমাণ করছে। উপমার এত অজস্র ও সপারগ দীপ্রতা একজন অকবির পক্ষে অসম্ভব। তবু আমি নিঃসন্দেহ যে তাঁর কবিতার অযাচিত উপমাবাহুল্য কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্তও করেছে। এক এক সময় সন্দেহ হয়, তাঁর কবিতার উদ্দেশ্যই হয়তো কতকগুলো উপমা নির্মাণ—অনেক সময় সেখানে কিছু উজ্জ্বল চকিত উপমা ছাড়া প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না।

একজন কবির এতবেশি উপমা কবিতার জন্য লাভজনক হতে পারে না। শুধু উপমা কিংবা শুধু শব্দ বা ছন্দ—বিচ্ছিন্নভাবে এদের কোনো-একটির মধ্যে পুরো কবিতা থাকে না—কবিতা এদের সবার অবাক সন্নিবেশের নাম। '*জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* উপমার ব্যবহার ততটুকুই স্বীকৃতি পেতে পারে, যতটুকু বক্তব্যকে ফলবান করার জন্যে তা জরুরি, তার বেশি হলেই তা কবিতার শত্রু। তাঁর কবিতায় উপমা প্রথমত বক্তব্যের পায়ের ছাপ অনুসরণ করেই আসে, তারপর তিনি উপমার লোভে পড়ে যান; ছবির পর ছবি রচনার আকাঙ্ক্ষায় জন্ম নিতে থাকে উপমার পর উপমা; কবিতা উপমাসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়।

> এই রাত্রিরা সেই লাল আলোর ভালো যা তোমাকে প্রশস্ত স্ট্রীট থেকে নিয়ে যাবে কঙ্কালের সরু-সরু পথে, অনন্য স্ত্রীর মতো কেবলি অন্যদিকে;—যখন জানালায় ছিন্ন-পত্র ঝরে অবিচ্ছিন্ন, লোকালোক পুড়ে যায় বরফে। এই রাত্রি জিরাফের গলা বেয়ে লতিয়ে উঠতে দ্যায় আগুন, যেটা আমাদের আকাঙ্ক্ষা, অবশ্য যদি তার মাংস হতে রাজি হই তুমি আর আমি; ঈশ্বর নামক গৃহপালিত মিস্তিরি ভুলসিঁড়ি বানাচ্ছেন আমাদের উঠোনে বসে—আগুনের, যে অসম্ভবের সিঁড়িতে উঠতে আমরা সবাই পাতালে নেমে যাবো হঠাৎ।

কবিতাংশটি ছবিতে ঠাসা। অথচ পুরো কবিতাটি তুলে দিতে পারলে দেখানো যেত, কবিতার মূল আবেগের কত সুদূর আত্মীয় এইসব চিত্রকল্প— যোগাযোগ কত ক্ষীণ। অথচ ছবির পর ছবি আসছে—ছবির কামনা ছবিকে নিয়ে আসছে—উপমা রচনার আনন্দে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক কবিতাতেই অনেক সময় এমন অনেক বিফল অংশ চোখে পড়ে যেগুলো অকেজো মৃত অঙ্গের মতো কবিতার শরীরের সঙ্গে শেষপর্যন্ত ঝুলে আছে। এসব অচল অংশ কবিতার নিটোল তাকে খানিকটা ক্ষুণ্ন করলেও, শেষপর্যন্ত আমাদের সহৃদয় ক্ষমা পেয়ে যেতে পারত, যদি দেখা যেত যে তারা নিজেদের ব্যর্থতার লজ্জায় ও অপরাধবোধে লজ্জিত ও অধোমুখ হয়ে একপাশে সরে রয়েছে। কিন্তু তারা যদি তা না করে উল্টো দাম্ভিকতা দেখিয়ে অন্যসব সফল অংশগুলোর সঙ্গে দুঃশীল প্রতিযোগিতায় নামে, তবে কবিতাদেহে তার উৎকট অস্তিত্ব আমাদের ক্ষমার বাইরে চলে যায়। এমন একটি বিসদৃশ অংশের উপস্থিতি একটি কবিতার পূর্ণাঙ্গ সাফল্যকে মিথ্যা করে দিতে পারে।

এমনি প্রচুর উপমা আছে আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায়। একটা উদাহারণ দিয়ে দেখানো যাক :

পৃথিবীতে একটি সারাক্ষণ পাখি জীবনের ঔরসে প্রসব করে বন্দুকের গুলি।

উপমাটির অর্থ অনুসরণ করে একধরনের সাফল্য অনুভব করা যেতে পারে হয়ত, কিন্তু উপমাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেচারা 'সারাক্ষণ পাখি'র প্রায় অসাধ্য ও অসম্ভব একটি কর্মের যে প্রাণান্তকর চিত্র ভেসে ওঠে, তার কৌতুকবহতা এ উপমাটির সমস্ত সাফল্যকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। একটি নিটোল নিখুঁত কবিতার দেহে এমন একটি উৎকট উপমাই তার আর সমস্তরকম সাফল্যকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

একজন ভালো কবি তিনি যিনি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব শব্দাবলিকে পাশাপাশি জুড়ে দিয়ে রচনা করে তুলতে পারেন কবিতা, সেইসব বিষম শব্দাবলি সেখানে এমন মধুর সাযুজ্যে সামঞ্জস্যময় হয় যে মনে হয় এর একটি শব্দকেও আর পাল্টানো সম্ভব নয়। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় এ জাতীয় একটা সাফল্য চোখে পড়ে অনেক অনুষঙ্গেই। কবিতার ললিত শব্দাবলির সঙ্গে সাধারণ চলতি ও আটপৌরে শব্দ এখানে মিশে যায়—বলা যায় 'বিবাহিত' হয় :

'ধর্মাধর্ম লুফে নিয়ে অঙ্গুলিবুচিতে খেলা করো, কিবা দীর্ঘ
নোখের ত্রিকোণে এমুড়োওমুড়ো ছিঁড়ে ফ্যালো হৃদপিণ্ড আমার....

'এমুড়োওমুড়ো'র মতো একটা উৎকট চলতি শব্দও কবিতার নমনীয় শব্দের সামঞ্জস্যের ভেতর বেমানান লাগছে না।

শব্দের ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দ এমন কতকগুলো অদ্ভুত পরীক্ষা করেছেন, যেগুলোকে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করব। আমার বিশ্বাস, কাব্যপাঠক মাত্রেই এসব পরীক্ষার অভিনবত্বে এবং সাফল্যে চমৎকৃত হবেন। এক একটা শব্দের মধ্যে তিনি এমনভাবে জীবন পুরে দেন যে তাঁর কবিতায় অচেতন পদার্থগুলো মানুষের মতো বেঁচে উঠে কৌতুকে ঢলাঢলি করতে থাকে। অনেক উদাহরণের মধ্যথেকে মাত্র দুটি উদাহরণ এখানে তুলে দিলাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. এই কথা হাওয়ায় ছিটিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল মুশকিল।

খ. প্রতিভার জানালা থেকে কাঁচুলি ফেলে ডাক দিচ্ছে শ্রীমতী সংকেত।

প্রথম উদাহরণটা নিই। 'মুশকিল' নামের অস্বস্তিকর লোকটা হঠাৎ গুমোট ভেঙে হেসে উঠল আর অমনি দম–আটকানো ভাবটা ঝেড়ে আমরাও যেন প্রাণে বেঁচে গেলাম। ভাবতে অবাক লাগে : 'মুশকিল'ও আবার হাসে। এখানে কবি বলতে চান কী? বলতে চান, 'মুশকিল' ঘুচে গিয়ে সবাই হেসে উঠল। অথচ এটা বলতে গিয়ে 'মুশকিল' নামের বিশেষ্যটাকে মানুষ বানিয়ে তাকে হাসিয়ে দিয়ে কত সহজে বুঝিয়ে দেয়া গেল। পরের উদাহরণটা দেখা যাক। 'সংকেত' নামের কলাবতী মেয়েটি, আমাদের পাড়ার সেই তন্বী রূপসী, জানালা খুলে ডাক দিয়ে গেল যেন। 'সংকেত' এই বিশেষ্যটিকে শ্রীমতী করে তুলে (সেই আশ্চর্য মেয়ে, চকিত জানালা থেকে আঙুলের নীরব ইশারায় যে ডেকে যায় শুধু) আশ্চর্য সফলতা পেল এই অনুভূতি।

শব্দের অনেক অন্যরকম ব্যবহার আছে মাঝে মাঝে। এত বেশিরকম যে এই আলোচনায় তা পুরোপুরি তুলে ধরা অসম্ভব।

'আস্তিন ভিজিয়ে ব্যতিক্রম খাও'।

এখানে 'ব্যতিক্রম খাও' অংশটুকু ধরা যাক। 'ব্যতিক্রমে'র মতো গুণবাচক বিশেষ্যকে আস্ত গলাধঃকরণ করে ফেলার মতো স্থূল ও অমানুষিক ব্যাপারটি রুচিবান ব্যক্তিদের কাছে বিসদৃশ ঠেকতে পারে। তবু, এই অংশটুকুতে প্রকাশভঙ্গির এমন একটা অভিনব দিক আছে, যা উল্লেখযোগ্য। এখানে খাও–এর মোটামুটি মানে 'গ্রহণ করো'। কিন্তু একটিমাত্র ক্রিয়াপদের পরিবর্তনের ফলে 'গ্রহণ করো' ব্যাপারটি যেন সুখাদ্যের মতো একটা জীবন্ত আস্বাদন হয়ে আমাদের চোখের সামনে দেখা দিল, যাকে খেতে হবে 'আস্তিন ভিজিয়ে'।

এরকম সাফল্য বিস্তর আছে। অনেক জায়গায় শব্দের ব্যয়সংকোচ করার জন্য একআধটা শব্দকে অনুক্ত রেখে চলে যাওয়া হয়েছে :

তোমার বুকের চাঁদ দেখে মেঘের ভিতর দিয়ে বজ্র চলে যাবো।

এখানে হওয়া উচিত ছিল 'বজ্র হয়ে' বা বজ্রের মতো'। একটি শব্দকে অনুক্ত রাখার ফলে একটা শাণিত দ্যুতি পেল বাক্যাংশ।

এমনি অনেক উজ্জ্বল ব্যাপার আছে এ বইয়ে। পাঠক মূলকাব্য পড়ে এই কাব্যের স্বকীয়তার পুরো আস্বাদন পাবেন, আশা রাখি।

৫

কবিতা বিশালের স্বর। বিশালতর হৃদয়ের প্রশ্বাস কবিতার প্রত্যঙ্গ, স্নায়ু, শিরার গভীর গোপন সরণিপথে ঝড়ের আবেগে বয়ে যায়। এইজন্য কবিতায় শব্দেরা সজীব—প্রাণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়ায় কেঁপে ওঠে শুধু। নড়ে যায়। কোলাহলময় কবিতা এই কারণে অবিরাম বেজে চলে। সমুদ্রপাড়ের নারকেল-শাখার উত্তাল অফুরন্ত হাওয়ার মতো—ক্লান্তিহীন বেজে যায় কেবল। এইজন্য কবিতার রক্তের ভেতর দিয়ে দিনরাত্রিহীনভাবে আমরা ছুটে ফিরতে দেখি এক প্রাণবন্ত সংগীতের প্রবাহকে—দিগন্ত ছাড়ানো উত্তাল হাওয়ার মতো। আমরা সৎকবিতার বুকের ওপর কান পেতে সেই সংগীতের অন্তহীন অনুরণনকে ছুটে বেড়াতে অনুভব করি।

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা পড়ার সময় অনুভব করা যায়, তাঁর কবিতায় কবিতার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রয়োজনীয় এই সংগীত অনেকটাই অনুপস্থিত। তাঁর কবিতার অধিকাংশ শব্দই মৃত, নিশ্চল। শব্দগুলো গতিহীন, আড়ষ্ট। যেন অতীত শহরের অন্ধকার রাজপথের পাশে দাঁড়ানো মৃত বিনষ্ট সার-সার থাম। সঙ্গীতের এই অনটন ধরা পড়ে শব্দদের উপবাসক্লিষ্ট চোখে-মুখে সারা শরীরে। মনে হয়, বিশালতার স্বর বয়ে যাচ্ছে না এদের রহস্যময় অসংখ্য স্নায়ু ও তন্ত্রীর সরণি পথে—বেজে উঠছে না এ কবিতা।

অবিশ্য এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আমি পৌছোতে চাচ্ছি না যে, এইসব কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো অন্তর্গতভাবেই সংগীতবর্জিত। বিচ্ছিন্নভাবে শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে এই সঙ্গীত। কিন্তু কবিতার ভেতর শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে সংগীত জমে এই কবিতাকে গুঞ্জরণময় করে তোলেনি শরৎ-সকালের মতো। এই কবিতা পড়ার পর মন সংগীতে অনুরণিত হয়ে ওঠে না, স্মিত প্রশান্তিতে পরিণত হয় না অনুভূতি; অথচ সৎকবিতার কাছ থেকে এই উপহার পেতেই হবে পাঠককে। সত্যিকারের কবিতা আমাদের দৈনন্দিন কাজে চিন্তায় অবচেতনভাবে বেঁচে থাকবে, বেজে যাবে নির্জনে, আমাদের মাথার চারপাশে, চোখের চারপাশে, মুখের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে একটা মিষ্টি হাতের মতো স্নিগ্ধতা ছড়াবে। এসব এখানে কোথায়?

এর কারণ সম্ভবত এই যে এই কবিতা প্রধানত বুদ্ধির নির্মাণ—সপরাগ, বিস্ময়কর, চাতুর্যময়। বিদ্যুতের আলোর ওপর ধারালো ঝকঝকে ছুরি—উদ্যত ও সপ্রতিভ। বুদ্ধিদীপ্র ও ইস্পাতঋজু এই কবিতা—দুর্বলতার বিন্দুমাত্রও যেন নেই এর আচরণে। মনে হয়, বড় সপরাগ, বড় সপ্রতিভ এই কবিতা, পরিপক্ব, হয়তো কিছুটা অকালপক্বই, বড়বেশি ত্রুটিহীন ও সাবধানী। এ কবিতার ভেতর নেই সেই দুর্বলতা, সেই বিখ্যাত দুর্বলতা, সেই ভুল, অসহায়তা, অথবা সেই অস্পষ্ট অর্ধালোকিত বিস্ময়ময় জগৎ—যেখানে গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনেক নিঃশব্দ রহস্যেরা সচকিত হেঁটে বেড়ায়, যেখানকার অবাক ঋতুরা রুপোর ডালে হীরের পাখিকে বিনম্র বাতাসে ডেকে আনে।—অথচ এইসব জিনিশই তো পরিচিত সাধারণ শব্দের ভেতরে অলৌকিক কবিতাকে দুলিয়ে দেয় সুনীল আলোয়; কিছুটা ভুল, কিছুটা অস্পষ্টতায় কবিতা সুদূর দ্বীপের অপরিচিত মানুষ হয়ে ওঠে। এটা এমন একটা জগৎ যেখানে আমরা যেতে চাই, কিন্তু সাবধানী সতর্কচোখে জীবনের পরিচিত বীজগণিত হাতে নিয়ে নয়; যেতে চাই খানিকটা নির্বোধের মতো, নিরস্ত্রের মতো, অরক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থায়; আমাদের সজাগ বুদ্ধির উদ্যত চোখদুটোকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমোতে দিয়ে। বোঝা যায়, এই কবিতার আগাগোড়া নির্মিত হচ্ছে একটা কর্মঠ, তীক্ষ্ণ ও সচেতন মনের সচেষ্ট শ্রমে—এর শব্দচয়ন থেকে আরম্ভ করে যতিচিহ্নের ব্যবহার সবকিছু। অথচ এই সচেতনতার পেছনে নেই সেই অজানা অবচেতনার অপরূপ দেশ, যার দৃশ্যের লীলায় অবাক হয়ে আমরা বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতার যে-ত্রুটিটি আমার কাছে আরো বড় হয়ে ধরা পড়ে তা হচ্ছে : এই কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। একটা গভীর শ্রমের দুরূহ চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে আছে এই কবিতার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। সহজে, অনায়াসে, নিজের অজান্তে, লতার মতো কি আঙুলের মতো বেড়ে ওঠেনি এই কবিতা, হওয়ার মতো বা রোদের মতো এগিয়ে আসেনি। মনে হয়, বড়বেশি জবরদস্তি করা হয়েছে, উৎকট জুলুম চালানো হয়েছে এই কবিতাগুলোর সহজভাবে 'বেড়ে ওঠা'র ওপর; শব্দগুলোকে ভেঙেচুরে, পঙ্‌ক্তিগুলোকে বাঁকিয়ে দুমড়ে, রূপকল্পগুলোকে উল্টেপাল্টে, কষ্ট দিয়ে একে এক নির্যাতনশালায় পরিণত করা হয়েছে—সশ্রম-প্রয়াসে নির্ধারিত সময়ের আগে উপহার দেবার উদ্দেশ্যে স্মরণযোগ্য কবিতা।

একজন তরুণ-কবি, যাঁর কর্তব্য শুধু সহজভাবে এগিয়ে যাওয়া—রক্তের কামনায়, উন্মুখতায়, রোদনে—সাজিয়ে যাওয়া শব্দের পর শব্দ—সহজে, অনায়াসে-চাপ না দিয়ে, জবরদস্তি না করে প্রতিভার তরুণ ক্ষমতার ওপর, ক্ষতি স্বীকার করে, ভুলের পর ভুলের ছাপ আঁকতে আঁকতে—তাঁর পক্ষে এই প্রাণান্ত শ্রম, এই কঠিন কষ্ট, এই সচেতন কষ্টকর প্রয়াস, এই প্রকরণবহুল কৃত্রিমতার আশ্রয় তাঁর কবিতাকে প্রাণহীন ও উৎকট করে তুলতে বাধ্য—যে ক্ষতি এই তরুণ বয়সের জন্য অপূরণীয়, বৃদ্ধির জন্য মারাত্মক তাঁর কবিতাপাঠে আনন্দ পাবার চেষ্টা রীতিমতো কসরৎময়—বুদ্ধির দুরূহ ব্যায়াম বিশেষ। আরো বোঝা দরকার, আজও তাঁর কবিতা অনায়াসে বেড়ে উঠতে আরম্ভ করেনি—শরীর থেকে লুকোতে পারেনি সেইসব শ্রমের চিহ্ন—সেইসব স্বেদ, রেখা, কুঞ্চন—সৎকবিতা হয়ে ওঠার জন্য যা লুকোতেই হবে তাকে। কবিতা রচনার মুহূর্তে যে অমানুষিক ক্লেশ কবিকে মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশেষ করতে থাকে, তার অভিশাপ পাঠকের শরীর স্পর্শ করতে দেয়া চলবে না—সেই যন্ত্রণা, শ্রম, রিক্ততা নিজের মধ্যে শোষণ করে তাঁকে উপহার দিতে হবে সরু-সরু আঙুলের 'একমুষ্টি হাত'।—আর কবি? কবি সেই 'পাপের ভেতরে গোলাপ'—যাঁর কাছে (তাঁর নিজের কবিতা অনুসরণেই) 'জোৎস্না' একটি 'ভূত কিন্তু একটি গানের ওপর', 'দরোজা' একটি 'পুলিশ কিন্তু একটি জন্মের ওপর', 'মৃত্যু' একটি দোজখ কিন্তু একটি ফুলের ওপর'।

৬

কবিতা এক অর্থে 'আগুন নিয়ে খেলা'। কবিকে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে আকণ্ঠ যন্ত্রণার সঙ্গে, হাতে নাড়তে হচ্ছে সেই জ্বলন্ত আগুনের দুঃসহতা; অথচ সেই প্রচণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতনকেই মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে লতিয়ে তুলতে হচ্ছে কবিতায়; বেঁধে দিতে হচ্ছে ব্যাকরণে, প্রথায়, ছন্দে, শব্দে। এটা সেই খেলা যে-খেলায় বাঘের খাঁচার মধ্যে বসে মানুষ তৈরি করে জীবনের চতুর্দশপদী, পঙ্‌ক্তি গুণে, মাত্রা নির্ভুল রেখে। কবিতা সেই বিখ্যাত বাগান, যার মধ্যে আমরা আমাদের দুঃখের ফুল ফোটাই—রক্তগোলাপের সারিতে। দুরূহ এই কাজ, কেননা প্রচণ্ডতম আলোড়নকে কবিতার মধ্যে কবিকে বাঁধতে হয় পরিমিত শব্দে, নির্মমতম শৃঙ্খলায়। গদ্যের মধ্যে জীবনের এই উত্তাপ ছড়িয়ে যায় বিস্তৃত মেঝেয়, গড়িয়ে চলে বিচিত্র ধারায়, রচিত হয় খেয়ালে—শিথিলতর বিন্যাসে, কিছুটা ভুলে, কিছুটা অমনোযোগে। এইজন্য কোনো-একজনের সাহিত্যজীবনে কবিতার ক্ষেত্রে সিদ্ধি আসে গদ্যের অনেক পরে, দিনের পর দিনের ব্যর্থতায়, চেষ্টায়, অগ্রগতিতে। এই কারণেই একজন তরুণ-লেখকের প্রথম গদ্যগ্রন্থের মধ্যে যে-পরিণতি, প্রস্তুতি ও নৈপুণ্যের পরিচয় মিলবে, তার পাশে তাঁর কাব্যগ্রন্থটিকে একটি 'নাবালক' রচনা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, কেউ যদি আমার দেখার আগেই এই গ্রন্থের মলাট ছিঁড়ে ফেলতেন, লেখকের নাম প্রকাশকের নাম ছিঁড়ে ফেলতেন, শুধু বইটি আমার হাতে তুলে দিয়ে এর বিভিন্ন পরিচয় জানতে চাইতেন দু-মিনিট সময়দৈর্ঘ্যের মধ্যে—তবে, আমি, প্রথমেই তিনটি কথা বলতে পারতাম, সেগুলো এই : এটি একটি তরুণ-কবি রচিত গ্রন্থ, এই কবি সম্ভাবনাময় এবং এই কবি অপরিণত।*

বইটি পড়লে বোঝা যায়, এই কবির প্রতিভা দরিদ্র নয়। এমন সব উপাদান তাঁর রচনায় পাওয়া যাচ্ছে যা খুব অল্প কবিরই নাগালের জিনিশ এবং যা একজন ভালো কবিকে জন্ম দেবার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন; তবু এই কবিকে মনে হয় এমন একজন প্রবৃত্তিতাড়িত তরুণের মতো, বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও অনভিজ্ঞতার জন্য নিজের সম্পত্তির ওপর যে দখল আনতে পারছে না। বারবার মনে হচ্ছে, তিনি খুববেশি অপচয় করছেন, নষ্ট করছেন— তবু বিশেষ বিষয়টিকে যথাস্থানে খুঁজে পাচ্ছেন না। সব ব্যাপারেই একটা উচ্ছ্বসিত অতিরিক্ততা এসে নষ্ট করে দিচ্ছে চেহারা, অঢেল রঙ নিটেক তাকে চেবড়ে ফেলছে। একটা শব্দের জায়গায় দশটা শব্দ এসে ভিড় করছে,

---

* আমি আশংকা করছি যে এই নিবন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর প্রতি ব্যবহৃত 'অপরিণত' শব্দটি তাঁর ভক্ত পাঠকের উষ্মার কারণ ঘটাতে পারে। তাঁদের কাছে প্রথমেই বলে নিতে চাই যে শব্দটি আমার সচেতন ব্যবহার। এমন কথা আমি ঢেরবার ভেবেছি যে, একজন তরুণ কবি সম্পর্কে 'অপরিণত' বিশেষণটি প্রশংসাসূচক অর্থে গৃহীত হওয়াই বিহিত। কেননা, একজন তরুণ কবি যে এখনো 'অপরিণত'—এই কথাটি বলে দিচ্ছে যে এ কবি 'পরিণত' হবে, 'এগোবে'। অপরিণত ব্যক্তির ভাগ্যেই অগ্রসরের জয়টিকা অংকিত থাকতে পারে শুধু:— 'অপরিণত' ব্যক্তি এগোয়—দিনের পর দিনের, ঘণ্টার পর ঘণ্টার ইচ্ছা, চেষ্টা শ্রমের বন্ধুর অগ্রসরে। একজন বয়স্ক কবির পক্ষেই 'অপরিণত' শব্দটি নিন্দাসূচক অভিধা পেতে পারে, যেমন পেতে পারে একজন তরুণ কবির পক্ষে পরিণত—এই নিরুদ্বেগ আত্মসন্তুষ্ট সমাপ্তিবোধক শব্দটি—কেননা, এই শব্দ লক্ষ্য করছে এমন একজন কবিকে যে 'পরিণত' অর্থাৎ শেষ হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে—বাড়বে না আর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা উপমার দরকার মেটাতে দেখা দিচ্ছে একঝাঁক উপমা। তবু আসছে যে, এটা কবির উজ্জ্বলতারই প্রমাণ। বোঝা যাচ্ছে, নষ্ট করার মতো, ছড়াবার মতো যথেষ্ট মূলধন আছে তাঁর; তবু তাঁর কবিতাই যেন প্রমাণ করতে চায়, তিনি এখনও তাঁর দরকারি উপাদানগুলোকে আলাদা করে বেছে নিতে পারছেন না কবিতার দরকারি জায়গাগুলোর জন্য। অপ্রয়োজনীয় অসংখ্য অবাঞ্ছিত আবর্জনা অসংকলিত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে কবিতার ভেতর। তাদের বিশৃঙ্খল ভিড়ের ভেতর সঠিক শব্দটি চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কবিতাকে যে এক এক সময় উচ্ছল প্রলাপের মতো মনে হয়, তার কারণ বোধ হয় এ-ই। অথচ একটি রচনাকে কবিতা হয়ে উঠতে হলে এই ঐশ্বর্যময় অভিশাপটির হাত থেকে মুক্তি নিতেই হবে কবিকে; বাছাই করে, ছেঁকে, একে একে বসাতেই হবে শব্দ, উপমা; মেজে ঘষে যত্ন করে তৈরি করতে হবে কবিতার বাহুল্যহীন শরীর।

৭

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হবার ঢের আগে থেকেই আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা আমি পাড়ে আসছি। অনেক সময় এক-একটি শব্দের বৈদ্যুতিক সাফল্য কিংবা উপমার নতুনত্ব আশ্চর্য করেছে—বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্য আস্বাদন করেছি। কিন্তু একটি জায়গায় প্রায় সব সময়েই তাঁকে মনে হয়েছে দুর্বল। সেটি তাঁর 'বক্তব্যে'র ব্যাপারে। একটা কবিতার বিভিন্ন উপাদান—যেমন শব্দ, ছন্দ, উপমা আলাদা-আলাদাভাবে আমাদের রসনায় কয়েকটা উজ্জ্বল স্বতন্ত্র আস্বাদন দিয়েই শেষ হতে পারে না। কবিতায় শব্দ ছন্দ উপমা সবাই নিজ-নিজ কাজ করে যায় কবিতাকে শেষপর্যন্ত একটা সম্পূর্ণ অনুভূতিতে--একটা বক্তব্যে পৌঁছে দেবার জন্যই। কবিতা যদি উজ্জ্বল প্রকরণে নিজেকে সজ্জিত করার পরও একটা নিবিড় 'বক্তব্য' উপহার পারে, তবে খণ্ডিত ব্যর্থতা পেতে সে বাধ্য।

৮

আমাদের আশপাশের এমন একজন কবির কথা বলতে পারি যিনি গতানুগতিক ছন্দ শব্দ ও উপমার বাইরে না গিয়েও অনেকগুলো নিটোল ও সুপাঠ্য কবিতা লিখেছেন। এই কবিতাগুলো মোটামুটি নিখুঁত ও পরিপাটি। এদের মধ্যে শব্দব্যবহার পরিমিত, উপমাগুলো নিপুণ ও ছন্দ সুবিন্যস্ত। মোটকথা, কবিতা বিচারের যত মানদণ্ড আছে তার প্রায় সবগুলোর বিচারেই এই কবিতা উত্তীর্ণ ও নির্ভুল। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর কবিতাই প্রমাণ করে যে, তিনি একজন মধ্যবিত্ত ক্ষমতার কবি—কয়েকটা পরিপাট্যময়, সফল ও জনপ্রিয় কবিতার জন্ম দিতে পারলেও 'ভালো কবি' হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ নয়। এর মূল কারণ, তাঁর কবিতায় কোথাও বিপজ্জনক ঝুঁকি নেবার উদ্যোগী চেষ্টা দেখা যায় না; অথচ এই ঝুঁকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবার দুঃসাহসই সেই দলিল যার দ্বারা একজন সত্যিকার কবি নিজেকে সপ্রমাণ করেন। একজন প্রকৃত কবিকে এই ঝুঁকির সামনে দাঁড়াতে হয়; সাধারণ, লোকরঞ্জক কবির সহজ অনায়াস ও বহুল-পরিচিত মসৃণ পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁকে নেমে যেতে হয় বিপদসংকুল সরণিতে, দায়িত্বের কঠিন অচেনা রাস্তায়, গতানুগতিকতার প্রলোভনকে উপেক্ষা করে তাঁকে বেরোতে হয় সম্পূর্ণ নতুন উপাদানের খোঁজে—শ্রমে, অন্বেষায় খুঁজে পেতে হয় শব্দ, রূপক, অলঙ্কার—কবিতার নতুন ভাষারূপ। অনিশ্চয়ের এই উৎকণ্ঠা, শ্রমের এই কাঠিন্য, সহজ নির্দ্বন্দ্ব পথের তাৎক্ষণিক আহ্বানকে ছেড়ে ধন্যবাদহীন অজ্ঞাত পথের বন্ধুরতাকে আলিঙ্গন কেবল সম্পন্ন প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব; অকবির পক্ষে এসব অর্থহীন, অকারণ ও ক্ষমতাতিরিক্ত। সপারগ কবির অন্তর্গত প্রতিভাই তাঁকে দিতে পারে সেই শক্তি যার দ্বারা তিনি তরঙ্গসংকুল অনিশ্চিত সমুদ্রে নিঃসঙ্গ ভেলা ভাসাতে পারেন, এগিয়ে যেতে পারেন মৃত্যুবহুল ঢেউয়ের ভেতর। অবশ্যি এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত আসতে চাচ্ছি না আমি যে, কবিতার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে পারলেই কেউ একজন উঁচুমানের কবি হয়ে যাবে। আমার বক্তব্য, কবিতার ইতিহাসে কেন, পৃথিবীর যে-কোনো মহৎ সাফল্যের পরিভাষাতেই, 'সৎ প্রতিভা' ও 'অজ্ঞাত অনিশ্চিত ঝুঁকি' কথাদুটি সমার্থক।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর কবিতায় এই ধরনের একটা অনিবার্য ঝুঁকির মধ্যে নেমেছেন। এমন সব পদচিহ্নহীন পথে তিনি এগিয়েছেন, যেখানে অন্যেরা পা ফেলেনি। চিত্রকল্পের অদ্ভুত ব্যবহারে, শব্দের নতুন অভিধায়, অনুষঙ্গের দুঃসাহসী প্রয়োগে এমনকি ভাষারূপের অনেক নতুন ও বিচিত্র ব্যবহার ও সংযোজনে তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। আমাদের সমসময়ের বাংলা ভাষার আর কোনো 'তরুণ' কবি এতখানি দুঃসাধ্যের রাস্তায় এগিয়েছেন কিনা সন্দেহ। মান্নানের সামনে, সুতরাং দুটো পথই মাত্র খোলা থাকছে : হয় তাঁকে টিকে থাকতে হবে স্ব-ক্ষমতায়, নয় তাঁকে চলে যেতে হবে। নিঃশব্দে। যদি টিকে থাকা সম্ভব হয় তবে তিনি প্রতিষ্ঠিত, যদি সম্ভব না হয়, তবে উদ্ভট। এটা নির্ধারণের দায়িত্ব সময়ের হাতে ছেড়ে দেয়াই আমাদের কর্তব্য হতে পারে শুধু।

১৯৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর
জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা

কয়েক বছর আগে আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতাগ্রন্থ 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' বের হবার পর আমি বইটির একটি বিব্রতকর-রকম দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম, যদিও, আমি সুনিশ্চিতভাবেই জানতাম যে ওই বইটিতে এমন একটি কবিতাও নেই যা প্রকৃত বিচারে কবিতার সাফল্যে উত্তীর্ণ। এ সত্ত্বেও বইটি সম্পর্কে যে ওরকম দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তার কারণ : কাব্যগ্রন্থটি পড়ার সময় এক বিস্মিত নতুনের শিহরণ আমাকে এভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিল যে, প্রায় তড়িতাহত, আমার মনে হয়েছিল বইটির মধ্যে সাফল্যের পরিমাণ খুব বেশি না হলেও এর প্রতিটি শব্দ চিত্র উপমা এক অমিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছে। শব্দ ব্যবহারের বৈদ্যুতিক সাফল্যে এবং রঙিন বর্ণিল অজস্র চিত্র রচনার ব্যাপারে যে অসামান্য প্রতিশ্রুতি তিনি দেখিয়েছিলেন সেই গ্রন্থে তা তাঁর বয়সের একজন অতিতরুণ কবির পক্ষে সত্যি সত্যি বিস্ময়কর— যা অব্যবহিতভাবে নিটোল ও পরিপূর্ণ কবিতার জন্ম দিতে না পারলেও এমন প্রতীতি জাগায় যে ওই সম্পন্নতা থেকে একজন সত্যিকার কবির জন্মলাভ আসন্ন। সহজে, অনায়াসে উজ্জ্বল ও অনবদ্য উপমা-রচনার অবলীল সেই সজীবতা, শব্দচয়নের সেই সপারগ সপ্রতিভতা—কাব্যজীবনের শুরুতে শুধুমাত্র 'প্রকৃত' কবিদের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও অন্য আর একটি কারণ আমাকে তাঁর কবিতার প্রতি আশান্বিত করে তুলেছিল। সেটা হল তাঁর কবিতার ব্যতিক্রমী 'বিশিষ্টতা'। পূর্বসূরি কবিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পরও তাঁর কবিতার শরীর অন্যদের থেকে এত আলাদা, তাকাবার চোখ এত নতুন ও মৌলিক, কণ্ঠস্বর এমন স্বতন্ত্র ও স্বকীয়, উপমা ও চিত্র রচনা এমন একক ও নিজস্ব যে কেবল সমকালের নয়, গত কয়েক দশকের পটভূমিতেও মান্নানের কবিতা অনন্য। কারো কারো কাছে অপ্রিয় লাগতে পারে, কিন্তু এ-কথা বলতেই হবে যে আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে মান্নান যে জীবনানুভূতি উপহার দিয়েছেন, সংযোজন করেছেন শব্দের ভাষার এবং রূপকল্পের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার মূল্য যা-ই হোক, তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজের। মান্নানের কবিতার জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে

একটা আলাদা ও অপরিচিত পৃথিবীতে প্রবেশ করতে হয়।

যে-কোনো তরুণ কবির মতো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটিরও প্রধান দোষ ছিল বক্তব্যহীনতা ও অসংযম। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' পড়ে অনুভব করা গিয়েছিল : ভালো কবিতা রচনার অনেকগুলো ঈর্ষিত ও দুর্লভ উপকরণ তাঁর করায়ত্ত। তাঁর উদগ্রীব কল্পনাশক্তি যে-কোনো সজীব অঙ্কুরকেই লালনের জন্যে পুরোপুরি উন্মুখ ও উপযোগী। শুধুমাত্র উচ্চতর বক্তব্যের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হলেই তা শ্রেয় কবিতার ফলোৎপাদনে সপারগ হয়ে উঠবে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা সম্বন্ধে সেই উদগ্রীব আশাবাদ বহুলাংশে সফল হয়েছে। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র তুলনায় 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা' পরিণত চৈতন্যের ফসল। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র চেয়ে এর শব্দেরা অনেক উজ্জ্বল ও তীব্র, উপমারা নিটোল ও বলিষ্ঠ, চিত্রকল্প সপ্রতিভ ও রক্তিম এবং প্রায় প্রতিটি কবিতা কিছু-না-কিছু বক্তব্যের দ্বারা সংক্রমিত। অভিনিবেশের সঙ্গে পড়লে সহজেই বোঝা যায় : প্রথম গ্রন্থের অপরিণতি, অসংযম ও দুর্বলতা কাটিয়ে তাঁর কবিতা সমর্থপায়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। অনুভূতির অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা ও কুয়াশা সরে গিয়ে আত্মার ঘনিষ্ঠ স্বর নতুন দ্বীপের মতো জেগে উঠেছে।

তা ছাড়া এ বইয়ের আর একটি উল্লেখ্য দিক আছে। এই বইয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের জীবনবোধ তাঁর বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। একেক সময় মনে হয় জীবনকে যেন অনেকখানি দেখে ফেলেছেন তিনি, জেনে ফেলেছেন মানবভাগ্যের বহু অর্থহীন পূর্বাপর, জীবনের স্বাভাবিক ক্ষয় ও বিফলতাকে সহজে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার মতো নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত মানসিক পরিণতি ও নির্মোহ পৌঢ়ত্ব আয়ত্ত করেছেন। তাঁর এই মানসিক পরিণতি এই গ্রন্থের কাব্য-শরীরকে আক্রান্ত করেছে। মাঝে মাঝে তাঁর হৃদয়ের মতো কবিতার স্বরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, আনত হৃদয় গাঢ় বেদনায় কথা বলেছে প্রশান্ত বিকেলের মতো :

> সবুজ চাঁদের নীচে পড়ে আছে আমার শরীর।
> চেতনা, তারার নীচে। আমার চিৎকার উঠে যায়
> অলীক ফিটনে চড়ে ঘুরে ঘুরে আরক্ত রাস্তায়
> নীল শূন্যে। নদী : আমার জীবন; বাকী সব : তীর।
>
> *[মরণের অভিজ্ঞান]*

আগেই বলেছি প্রথম গ্রন্থের মতো এই কাব্যেরও প্রধান সম্পত্তি অজস্র অনিন্দ্য উপমা, অগণ্য রঙিন ও বিস্ময়কর চিত্রকল্প, শব্দের অবার ও বিপুল সচ্ছলতা। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র মতোই এই কাব্যের কবিতাগুলো পড়ার সময় একটা আর্টগ্যালারির কথা মনে আসে, যার তাকে তাকে সাজানো রয়েছে বিচিত্র রকমের ছবি; যার দেয়ালে, চারপাশে, উঁচুতে, নিচুতে অজস্র ছবির সমাহার। প্রতিটি বাক্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন একটি উপমা; প্রতিটি শব্দকে মনে হয় একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। নিচে দু'চারটি চিত্র তুলে দিচ্ছি। পাঠকেরা এগুলো থেকে এ গ্রন্থের উপমাসাফল্যের খানিকটা পরিচয় পাবেন :

ক. জাফরান-রোদ সন্ধ্যার চিকুরে আঁচড়ায় সোনার চিরুনি
খ. হাবসী মেঘের দল চাঁদের রানীকে ঘিরে আসে
গ. যখন তারার আলপিনে আঁটা রাত
ঘ. জ্যোতি ফ্যালে লম্বা গাছগুলি—
দুমড়ানো শিক যেনো সরু, প্রাকৃতিক বারাণ্ডায়;
ঙ. রাত্রি আকাশের গাঢ় ফেজ টুপি-পরা কালো খোজা
আর সোনালী ফরশা সুলতানা
শুয়ে আছে মেঘে আর চাঁদে আকাশের সুনীল পালঙে
চ. আংটির মতো ঠোঁট গোল-করা এতটুকু মেয়ে
ছ. ন্যাংটো ফরশা মেয়েমানুষের মতো আগুন জ্বলছে দূরে
জ. সূর্যাস্ত ফেলেছে নিঃশব্দে ফেরেশতাদের রঙ-চঙে কাপড়-চোপড়

'উপমাই কবিত্ব'— জীবনানন্দ দাশের এই ঢালাও উক্তিটিকে যদি কবিতা বিচারের শেষ কথা বলে মেনে নেওয়া যেত, তবে মান্নানকে শুধুমাত্র 'সৎ কবি' বললে তাঁর প্রতি অবিচার হত, তাঁকে তখন আখ্যায়িত করাতে হত একজন 'রীতিমতো সম্পন্ন' কবি বলে। তাঁর উপমা ও রূপকল্প নির্মাণের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা যে-কোনো কবির পক্ষেই আকাঙ্ক্ষার দুর্লভ সামগ্রী। চিত্রকল্প রচনার ক্ষেত্রে আমাদের যে-কোনো সমসাময়িক কবির চেয়ে তিনি সম্ভবত বেশি শক্তিমান। তা ছাড়া তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যও বিস্ময়কর। শুধুমাত্র মৌলিকতার জন্য নাম যদি কবিতা হত-- একজন কবির কাব্যমূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হত তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তার পরিমাণের দ্বারা, তা হলেও মান্নানকে একজন উল্লেখযোগ্য কবির মর্যাদা দিতে হত। মান্নানের কবিতা যে কী অনিবার্যভাবে বিশিষ্ট, তাঁর কাব্যস্বাতন্ত্র্য যে কী ঈর্ষাজনকরকমে একক, তা তাঁর যে-কোনো একটি কবিতা হাতে নিলেই অনুভব করা যায়। বলতে বাধা নেই যে আমাদের সমকালের বাংলাভাষার অনেক উল্লেখযোগ্য কবির চেয়েও তিনি মৌলিক। তরুণ কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতাই সম্ভবত সবচেয়ে 'বিশিষ্ট'। তবু আবদুল মান্নান সৈয়দের শব্দ, উপমা রূপকল্পের উজ্জ্বলতা ও সাফল্য তাঁর কবিতাকে যতখানি 'সম্পন্ন' বলে দাবি করে, তাঁর কবিতার প্রকৃত মান সে পর্যায়ের নয় বলেই আমার মনে হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এসবের পর তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ ভাবার পথে বাধা কোথায়? এ-কথার উত্তর দেবার আগে, আমার বিশ্বাস, কবিতার একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

কবিতা কী? কবিতা কি শুধু ছন্দ? শুধু শব্দ? শুধু উপমা? শুধু মৌলিকতা? শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহত্তর বিষয়, শুধুমাত্র হৃদয়োৎসার বা মনন?— না। এরা প্রত্যেকেই কবিতার অনিবার্য উপাদান—কাব্যের সহজাত ও মৌলিক উপচারাবলি। এদের সবার মধ্যেই আংশিকভাবে কবিতার সম্ভাবনা থাকলেও এরা কেউ এককভাবে কবিতা নয়। কবিতা এদের অবাক অনিন্দ্য যোগফলের নাম। কবিতা এদের অলীক সমবায়ে রচিত এক বিস্ময়সুস্মিত রজনীগন্ধা।

কবিতার যে উপাদানগুলোর কথা ওপরে উল্লেখ করলাম, মান্নানের কবিতায় তার অধিকাংশ লক্ষণই বর্তমান। শুধু বর্তমান নয়, কখনো কখনো উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহে তাঁর তীব্র ও বৈদ্যুতিক ক্ষমতা, তাঁর ধারালো ও উদ্যত মনন, চিত্রকল্প রচনার জাদুকরি সপারগতা, বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অনেক সময় প্রায় বড় কবিদের কাছাকাছি। যে-কোনো কবির পক্ষে এতগুলো দুর্মূল্য সম্পদের অধিকার, নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর কবিতাকে সফল ও পরিপূর্ণ ভাবতে যে দ্বিধা অনুভব করি তার কারণ : তাঁর কবিতা বিচিত্র ও অনিন্দ্য উপকরণের আশ্চর্য সমবায়ে হয়ে ওঠে নি সেই নিটোল অনুপম গোলাপ; নিজেকে মেলে ধরতে পারে নি জীবিত ছন্দে, রঙিন উপমায়, আনন্দিত শব্দাবলিতে। তাঁর প্রতিভার একটি দিক যে পরিমাণে উজ্জ্বল ও সপারগ, অন্য অংশ ঠিক একই পরিমাণে নিরক্ত ও মৃত। এই কারণে কবিতার জৈবিক পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করা সম্ভব হয় নি এর পক্ষে।

তাঁর কবিতায় বহিরঙ্গের প্রসাধনসৌকর্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি দুঃখময় ও অনটনগ্রস্ত এর অন্তরঙ্গের জীবনানুভূতি। তাঁর কবিতা পড়ার সময় একেকবার মনে হয় : বাইরের অনবদ্য আভরণ-সৌন্দর্যের অন্তরালে এ কবিতা বুঝিবা এক রুগ্ণ বিকল মৃতুকে লালন করছে। যে অসময়োচিত মানসিক পরিণতি তাঁর কবিতায় স্থানবিশেষে ভূয়িষ্ঠ জীবনচেতনার সম্পদ উপহার দিয়েছে, সেই অকাল পরিণতির সপ্রতিভ পাপই তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে শুষ্ক, নিরস, হৃদয়বর্জিত ও প্রাণহীন। তাঁর কবিতায় 'মনন' যে পরিমাণে তীব্র ও উজ্জ্বল, 'হৃদয়' সে পরিমাণে জাগ্রত নয়। ফলে তাঁর কবিতাকে অনেক সময় বুদ্ধি ও মননের এক চমকপ্রদ সংকলনক্ষেত্র বলে মনে হয়। জীবন্ত হৃদয়ের স্পর্শ তাঁর কবিতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে উজ্জীবিত ও প্রাণময় করে তোলে না— শব্দেরা হয়ে ওঠে না সপ্রাণ ও কোলাহলময়। উদ্বেল হৃদয়প্রাচুর্যের ভাঁড়ারে অনটন থাকায় তা আমাদের জীবিত হৃদয়ের ভেতর প্রবেশপথ না পেয়ে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়।

তা ছাড়া, তাঁর কবিতার পরতে পরতে সাবলীল সংগীতময়তার অভাবও প্রকট। তাঁর কবিতা সচ্ছল স্বাভাবিকতায় নদীর মতো বা বাতাসের মতো বয়ে যায় না। গতিহীন, মন্থর ও আড়ষ্ট এর অবয়ব। ছন্দের অসমতল ও বিদ্‌ঘুটে রাস্তার বিব্রত উঁচু-নিচুতে পথ হাঁটতে হোঁচট খেতে হয়। মাঝেমধ্যে ছন্দের ত্রুটিও লক্ষণীয়। দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার বন্যার মতো গলগল করে বলি অমিতাভ আকাঙ্ক্ষার কথা
যেন উড়ে চলে যায় বালকের হাত থেকে হাওয়া-ভরা শত রঙিন ফানুস;

অথবা

রাত দিন ঢুঁড়ে মরছি সবুজ স্বর।
আজ খুশী দেখি : এই-তো ঈশ্বর॥

প্রথম উদ্ধৃতিটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুই মাত্রা বেশি হওয়ায় ছন্দস্খলন ঘটেছে। দ্বিতীয় উদাহরণটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে এক মাত্রার অভাব লক্ষণীয়। মান্নানের মতো একজন সচেতন কবির পক্ষে এসব ত্রুটি অসংগত।

আবদুল মান্নান সৈয়দ সেইসব কবিদের একজন যাঁদের কবিতার ঔজ্জ্বল্য ও দ্যুতি সীমিতসংখ্যক কাব্যামোদীর বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের কারণ হলেও বৃহত্তর পাঠকসমাজকে স্পর্শ করতে পারে না। এর জন্যে দায়ী প্রধানত তাঁদের বিশিষ্ট ও নিজস্ব ভাষাভঙ্গি, শব্দ উপমা ও রূপকল্পের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বকীয় প্রকৃতি; জীবনাস্বাদনের সম্পূর্ণ পৃথক ও ব্যক্তিগত চরিত্র— এক কথায় তাঁদের একান্ত, বিশিষ্ট ও উৎকট মৌলিকতা—যা তাঁদের সীমিত, খণ্ডিত ও একান্তভাবে নিজস্ব জীবনবোধের ফসল। তাঁদের এই বিস্ময়কর 'মৌলিকতা' এবং 'স্বাতন্ত্র্যে'র নিরাপোষ একক ও স্ব-স্বভাবী প্রকৃতি তাঁদের জীবন-কৌতূহলকে জীবনের বহু বিচিত্র পিপাসা ও প্রয়াসের বিপুল অবগাহন থেকে সরিয়ে এনে সীমিত ব্যক্তিত্বের স্বকীয় ও নিজস্ব পথে এগিয়ে দেয়। ফলে তাঁদের জীবনবোধ হয়ে দাঁড়ায় বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও একক—আপোষহীনরকমে মৌলিক অর্থাৎ খণ্ডিত। তাঁদের পরিপার্শ্বের দেশ ও কাল-ধৃত ব্যাপক জনসংঘের বিচিত্র ও বহুমুখী চিন্তা ও অনুভবের সহজ প্রতিনিধিত্ব থাকে না তাঁদের মধ্যে। এ কারণেই তাঁদের অব্যবহিত জনগোষ্ঠী তাঁদের রচনার পৃষ্ঠায় নিজেদের জীবন-প্রয়াসের অব্যর্থ ও সমার্থক প্রতিরূপ খুঁজে পায় না। ফলে তাঁদের রচনা স্বল্পসংখ্যক প্রবুদ্ধ চিত্তের আংশিক শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করলেও বৃহত্তর জনসংঘের জীবন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দের মৌলিকতা তাঁর জীবনবোধের ক্ষেত্রে দুঃখজনক গণ্ডি এঁকে দিয়েছে। তাঁর জীবনানুভূতি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর ক্রন্দন ও পিপাসা তাঁর একলার, তাঁর বিশ্বাস ও ব্যর্থতা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়, তাঁর পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর 'চাল-ডাল-নুন, অন্ন-বস্ত্র-গৃহ, শস্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষা, চাকরি-ব্যবসা' অধ্যুষিত 'ভুবনডাঙার' মানুষের বিপুল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তার মিল সামান্য। 'দরজা-জানালা-বন্ধ করা' একটা অদ্ভুত পৃথিবীর মানুষ তিনি। যখন সবাই চলে যায় 'গলায় জড়িয়ে গলা গল্প করতে করতে মানবীর খোঁপে'; বাইরে যখন জীবনের তুমুল উজ্জ্বল সুসমাচার মুখরিত, তখন এই নির্জন বিচ্ছিন্ন স্ব-স্বভাবী কবি আত্মগত নিঃসঙ্গতার অন্ধকার প্রদোষছায়ায় জীবনের জীর্ণ স্বস্তয়নে নিয়োজিত :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু আমি গৃহকোণে, গোধূলির নীলাঞ্জনে অক্ষর বসিয়ে চলি সারে-সারে
বিধিলিপি, মুদ্রাদোষে, দায়িত্বের ভার, কিংবা শুধু ঝোঁকে,'

এক আলো-জানালাহীন কুঠুরির অদ্ভুত নির্বাসন তাঁর বিধিলিপি, যা তাঁকে প্রতিমুহূর্তে চারপাশের ব্যাপক জনসমাজের বোধ-চৈতন্য-অনুভূতি-পিপাসা থেকে আলাদা করে এক ভিন্ন ও একগুঁয়ে স্বাতন্ত্র্যের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে নিশ্চিত উপলব্ধি :

'কবিতা, আমার মুশকিল, কেন যে হল না লোকায়ত।'

অথবা

'আমার কী দোষ, বলো, যদি বেঁকে-বেঁকে যায় যতোবার অক্ষর লিখেছি?'

যখন 'বিশ্ব-বাংলার ঘরে-ঘরে' আলোর উৎসব রটিত তখন নিজের 'দীপহীন অন্ধকার ঘরে' 'নিজের আগুনে জ্বালা' লণ্ঠনকে উন্মুখ ও সক্রিয় রাখবার একান্ত ও নিবিষ্ট চেষ্টায় তিনি ব্রতী। বাইরের বিপুল ও বিচিত্র জীবনপ্রবাহের অজস্রমুখ কল্লোল তাঁর কাছে স্থূল, অকর্ষিত, বোধশক্তিহীন একজন মাংসাশী বর্বরের নির্বোধ অর্থশূন্য 'কোরাস' শুধু। মানবতার বিপুল মহান সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্যের প্রতি আস্থাহীন, অবিশ্বাসী তিনি। তাই ভয় :

'সুতরাং— সুতরাং কোরাসের সদস্যই হবো?'

এর চেয়ে ঢের ভালো সেই একাকিত্ব— সেই দুঃসহ, দুর্বহ তবু প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত একাকিত্ব :

'বরং একলা করো— এ প্রার্থনা :'

যে বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বাইরের অবার জীবনপ্রবাহকে আলিঙ্গনের কামনায় চারপাশের অবধারিত কারাগারের নির্দয় ও পাষাণপ্রাচীর ভেঙে পৃথিবীর পথে বেরোবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, সেই সময় মান্নান ফিরে যেতে চান অন্ধকার, মলিন ও ঘিনঘিনে তাঁর সেই একাকিত্বের চক্ষুহীন ঘরের শ্বাসরোধকারী সংকীর্ণতায়, যেখানে 'বই হচ্ছে আজকালকার দরোজা-জানালা, আমি ঘরের দরোজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে ওর ভিতর দিয়ে বাতাস বওয়াতে চাই, আকাশ থেকে নীলিমা ছেঁকে আনতে চাই।'

মানবতার বিপুল ও বহুমুখী বিকাশকে নিজের ভেতর শোষণ করতে পারেন নি মান্নান। তাই তাঁর জীবনবোধ এত সীমিত ও অপরিসর। জীবনকে তিনি দেখেছেন দেয়াল-ঘেরা সংকীর্ণ কুঠুরির আলো-বাতাসহীন অপর্যাপ্ততার জগৎ থেকে— বাইরের বিশাল ও বহতা জীবনের সাবলীল পদপাত সেখানে অনাহূত অতিথির মতো সংকোচ এবং কুণ্ঠায় অপরাধীর মতো প্রবেশ করে। মান্নানের সমস্যা এবং বিশ্বাস একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত পৃথিবীর সমস্যা ও বিশ্বাস। অন্যদের জীবন-প্রয়োজন থেকে তা এমন উৎকট রকমে আলাদা, কুঠুরিগত, স্ব-স্বভাবী ও বিশিষ্ট যে সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতার কোনো বাস্তব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাবে এমন আশা করা কঠিন। ব্যাপকতর জীবনবোধের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয় না বলেই তাঁর কবিতার বক্তব্য এত অপর্যাপ্ত। সুস্পষ্ট ও সদর্থক বক্তব্যের অভাবে তাঁর কবিতাকে যে প্রায়শই লক্ষ্যহীন উপমা-রূপকের সংকলন হয়ে উঠতে দেখা যায়, তার কারণ এই-ই। আমার বিশ্বাস : প্রতিভা ও প্রসাধনসৌকর্যের যত উজ্জ্বল ও অনন্য উপচারেই সজ্জিত হোক এ কবিতা, যত অনবদ্য উপকরণরাজিতেই অনিন্দ্য হয়ে উঠুক; যতক্ষণ পর্যন্ত ফলবান জীবনচেতনার দ্বারা আক্রান্ত না হচ্ছে এ শিল্প, ততক্ষণ অর্থপূর্ণ সফলতাকে স্পর্শ করা এ কবিতার পক্ষে অসম্ভব হবে।

'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'র প্রথম পর্ব—'শব্দের জ্যামিতি' এবং মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা বিধৃত করলাম। এই কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব—'উড়ন্ত অনুভূতি' অস্পষ্টতায় এবং তরল ও অপরিণত উচ্ছ্বাসপ্রাবল্যে 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র সমগোত্রীয়। এই পর্বে কবিতার উজ্জ্বল ও শাণিত সফলতা মাঝে মাঝে মুখ ঝিকিয়ে উঠলেও বক্তব্যের অস্বচ্ছতা, জটিলতা, কুয়াশা ও উদ্দেশ্যহীন অপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাহুল্যে ও অসংযমে কবিতার উর্বর সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে।

এই অংশের দ্বিতীয় কবিতানাট্য 'বিশ্বাসের তরু'তে একটি মহৎ কাব্য পরিকল্পনা লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে ঐশ্বর্যবান খণ্ডও রয়েছে। এই কাব্যনাট্যের শেষপর্যায়ে উন্মত্ত কাঠুরেদের কুঠারের অবিশ্রান্ত উদ্যত আঘাতে উচ্চকিত ও সন্ত্রস্ত বনভূমির আর্তনাদ ও বিশাল পতনের শব্দ জীবন্ত হয়ে উঠেছে শব্দব্যবহারের ধ্বনিময় সাফল্যে। কাঠুরেদের দুর্জয় ক্রোধ ও ধ্বংসোন্মাদনা ও বনভূমির ভীত, উৎকণ্ঠিত আর্তি ও হাহাকার আমাদের অস্তিত্বকে দীর্ঘকালের জন্যে সেই সর্বধ্বংসী তাণ্ডবলীলার ভয়াবহ ও শিহরিত ঘটনাস্থল করে রাখে :

ধিতাং কুঠার বাজে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু,
আজ সে সর্বতোশূন্য যাকে পুরো চেয়েছি ভিতরে,
ধিতাং কুঠার নাচে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু,
রক্তবুকে তীব্রনাদ শ্রাবণের মেঘের মাদলে,
ধিতাং কুঠার জ্বলে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু,
ধিতাং কুঠার বাজে, শক্ত কাঠে হৃদয় উপড়ে
ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু, ভাঙো বিশ্বাসের তরু,
শূন্য বুকে তাথৈ সুরমার জল ফুঁশে ওঠে জোরে,
ভাঙো, ভেঙে ফ্যালো, মানবিক আদিম শিকড় থেকে
বর্তমান ডালপালা ছিন্নভিন্ন করো ভেঙেচুরে
ধিতাং কুঠার চৈতন্যের, বাজো, ধ্বংস করো তরু,
উড়াই পিতার ভুল, ধর্ম নির্দেশের পাতা ছিঁড়ে
ফ্যালো তাথৈ সুরমায়, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে এই মাপের সাফল্য বিরল। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতার মতো এই কাব্যনাট্যেরও বক্তব্য অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ, কুয়াশাময়। এতে পরিপূর্ণ কবিতার ফলন বিঘ্নিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। শেষ কবিতানাট্য 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'র বক্তব্য অংশ নতুনত্বের নিশ্চিত আলো জ্বালাতে পারে নি সত্যি, কিন্তু এর কবিত্বময় ভাষা বাংলাসাহিত্যের স্মরণীয় লেখকদের সঙ্গেই শুধু তুলনীয়।

'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা' গত এক দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর অন্যতম। অন্যতম দুটি কারণে। এক, এই কাব্যের সাফল্যের অংশ সমকালীন প্রায় যে-কোনো কাব্যের চেয়ে বেশি। দুই, এই কাব্যের ব্যর্থতার পরিমাণও অধিকাংশ সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থের তুলনায় অধিক। আবদুল মান্নান সৈয়দের শক্তি এবং দুর্বলতা দুটোই তাঁর সমকালীন প্রায় সব কবির চেয়ে বেশি। ফলে অনেক উজ্জ্বল, সপরাগ অনিন্দ্য কাব্যাংশের স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও ভারসাম্যময়, নিটোল ও পরিপূর্ণ কবিতার জনক হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর চেয়ে অনেক কম শক্তিমান কবিও আমাদের কাব্যক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে সার্থকতর কবিতা উপহার দিয়েছেন। এসবের পরেও তাঁর কবিতা যে আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহলকে উন্মুখ রাখে তার কারণ : অনেক ত্রুটি, অক্ষমতা ও বিফলতা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় সাফল্যের উচ্চতম শাখাকে ছোঁবার যে স্পর্ধিত আকাশচুম্বী উদ্যোগ দেখা যায়, আমাদের চারপাশের আলোহীন ভবিষ্যৎহীন মাঝারির ভেদাভেদহীন দঙ্গলে তা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

ভবিষ্যতে মান্নানের কবিতা কোন্ পথে এগোবে, কোন্ ঋদ্ধ সাফল্যের শীর্ষকে তা ছুঁতে সক্ষম হবে, অথবা অদৃশ্য হবে কোন্ নামহীন প্রয়োজনহীন উৎরাইয়ে—এই মুহূর্তে তা বলা দুরূহ। তাঁর এযাবৎকালের কবিতা সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা যায় : সমৃদ্ধ সার্থকতায় না পৌঁছোলেও তাঁর কবিতায় মৌলিক কবিতার লক্ষণসমূহ বর্তমান।

১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক আজাদ-এর
অসম্ভবের পায়ে

১

কোনো কাল যখন নতুন পালাবদলের চৌহদ্দিতে এসে দাঁড়ায়, নতুন ঋতুর সাথে অসংখ্য নতুন অপরিচিত চেতনা, অপরিচিত দেশের অচেনা রাজপুত্রদের মতো, সমাজ জীবনের অঙ্গনে দেখা দিতে শুরু করে, তখন, সেইসব অস্ফুট অলক্ষ্য অনুভূতিকে প্রথমবারের মতো জীবিত শব্দে গেঁথে নেবার ভার পড়ে প্রধানত কবির ওপর। মোটামুটিভাবে কবি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজমানসের অঙ্গনে নতুন চেতনার এই রক্তিম সংক্রামকে প্রথমবারের মতো অনুভব করেন উৎকর্ণ রক্তে; সেইসব জীবানুভূতিগুলোর ব্যাপারে সজাগ হন , যারা নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর প্রায় অজান্তে, আমাদের সমাজশরীরে দেখা দিতে শুরু করেছে। অনেকটা এ কারণেই, সমাজমানসের মৃদুতম আলোড়ন বা অস্ফুটতম পরিবর্তন অন্য কোথাও ধরা পড়ার আগে কবিতাদেহে অমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে সামাজিক ঋতুবদলের রোমাঞ্চকর খবর পরিবেশনাই কবিতার সবচেয়ে বড় কিংবা শেষ কথা নয়—এটা কবিতার একটা অনিবার্য শর্ত। একজন কবি শেষপর্যন্ত তাঁর কালের বিশ্বস্ত ছবিই আঁকতে পারেন—সচেতনভাবে বা নিজের অজান্তে। কবি যদি হন সাধারণ ও বিত্তহীন তবে স্বভাবতই তিনি হয়ে দাঁড়াবেন আপাতরম্যের উপাসক—ফলে যুগের বাইরের চেহারাটাই সুস্পষ্ট হবে তাঁর কবিতায়। কিন্তু যদি গভীরতর জীবনানুভব ছুঁয়ে থাকে তাঁর আঙুল, বোধি হয় বেদনাময়, তবে তাঁর কালের পিপাসা যন্ত্রণা ও পরিপূর্ণতাকেই তিনি আঁকবেন মহত্তর অভিধায়— স্বকালকে তিনি সর্বকালের প্রতিনিধি করে তুলতে পারবেন।

২

ষাটের দশক আমাদের সামাজিক অঙ্গনে এসেছিল আশীর্বাদ ও অভিশাপ নিয়ে। একদিকে বিত্তের বিপুল সম্ভাবনায় স্পন্দিত হয়েছিল সমাজজীবনের চৌহদ্দি, অন্যদিকে অবারিত সুলভ মুদ্রার দর্পিত প্রবেশ নতুন সচ্ছলতার সঙ্গে নতুন ও অপ্রতিহত পাপ বয়ে এনেছিল আমাদের জাতির জীবনে। সুকুমার মূল্যবোধের ওপর হাত রেখেছিল হত্যাকারী অবক্ষয়।

ঐশ্বর্যের আস্ফালনে, বর্বরের দম্ভে, আপাতরকমের ফেনিল বন্দনায়, ক্লেদে ও কদর্যতায় ষাটের দশক একদিকে যেমন আবিল, ঠিক তেমনি, ওই সময়কার অধঃপতনের ক্রন্দনে, আত্মক্লেদের গ্লানিতে, নৈরাশ্যে ও নিঃস্বতায় তা বেদনাময়। ষাটের দশকের কবিতা, এই কারণেই, সম্ভাবনা ও পরাজিত বিবেকের স্বপ্নে ও বিকারে, ক্রন্দনে ও কামনায় অমন স্ববিরোধী।

সমাজজীবনের এমনি এক পালাবদলের কালে রফিক আজাদ কবিতা লিখতে শুরু করেন। শুধুমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেন বললে সবটা বলা হবে না। তিনি ছিলেন ওই নতুন সময়ের সবচেয়ে ও অনিবার্য সন্তান। ষাটের দশক বলতে যে ক্লেদ এবং কদর্যতার ছবি আমাদের চোখে ভাসে, ষাটের রফিক প্রায় তারই প্রতীক। যে পচন এবং বিকার, রোগ এবং বৈকল্য ষাটের দশককে নিঃশেষিত করেছিল, যে কালো অবক্ষয় আমাদের সামাজিক অঙ্গনের বুকের ওপর কঠিন ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, রফিক তারই প্রতিভূ। তাঁর এই পর্বের কবিতাগ্রন্থ 'অসম্ভবের পায়ে' সেই প্রতিকারহীন অধঃপতনের কান্নায়, আত্মক্লেদের গ্লানিতে আগাগোড়া আবিল ও অশ্রুময়—অবধারিত পচন থেকে অম্লান উদ্ধারের দিকে—দুর্লভ অথচ ঈপ্সিত, অপ্রাপনীয় তবু প্রার্থিত অসম্ভবের পায়ের প্রতি নতজানু :

'পদাঘাতে মোহ্যমান নই—
পদাশ্রিত : হে মাধবী, তোমাতেই পুঁতে রাখি আয়ু।'

রফিক আজাদের মধ্যে একটা 'স্পর্শকাতর যৌবনকে' দেখেছিলাম আমরা, একদিন। তাঁর যুগের পাপ এবং যন্ত্রণা তাঁকে, তাঁর সতীর্থদের মধ্যে, সবচেয়ে বেশি বিস্রস্ত ও বিষণ্ন করেছিল— ওই যন্ত্রণা ও ক্লেদের রক্তিম ও ব্যথিত বর্ণনা, এজন্যেই, তাঁর কবিতায়, অতখানি উজ্জ্বল। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'অসম্ভবের পায়ে'র ভেতর এমন একজন যন্ত্রণাকাতর যুবককে দেখতে পাই, জীবনের স্বাস্থ্যময়তা যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—আর যে দুঃস্বপ্ন-আক্রান্ত, অম্লান উদ্ধারের "দ্বারে এসে পড়ে আছে কনকনে শীতের রাত্রিতে" আর তার সামনে "ঠা ঠা হাসে অন্ধকার। আর প্রবেশ-নিষেধ বলে জ্বলে এক রক্ত-চক্ষু বাল্ব।" [হে দরোজা]

চার পাশে অগভীর অস্বচ্ছ অমিল জলরাশি।
রক্তপুঁজে মাখামাখি আমাদের ভাল বাসাবাসি
এখন পাবো না আর সুস্থতার আকাঙ্ক্ষার খেই।
[*নগর ধ্বংসের আগে*]

তাঁকে ঘিরে যা দাঁড়িয়ে আছে তা এক পতিত লাম্পট্যগ্রস্ত সময়—যে অজন্মা দুরূহ কালে কোমল স্বপ্নেরা উধাও—আর সে ওষ্ঠহীন উদ্ধারহীন আবিলতার ভিতর :

এ গ্রহের কেউ হায় প্রকৃত আনন্দকে জানলো না
শুভ্রতা ও মৃত্যুকে জানলো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষাদ ও মৃত্যুকে জানলো না
মুক্তি ও মৃত্যুকে জানলো না
অন্বেষণকে না, হৃদয়কে না, মেধাকে না
ভালোবাসাকে না।

তাঁর যুগের মতো, তাঁর অম্লান হৃদয়ও হয়েছিল ওই পাপের দুরপনেয় শিকার, তাই অপচিত অন্ধকার থেকে আলোময় মুক্তির কামনা তাঁর কবিতায় অমন তীব্র।

ষাটের দশকের ক্লেদাক্ত ছবি এঁকেছিলেন রফিক আজাদ—সে প্রতিশোধপরায়ণ ক্লেদ তাঁর কবিতাকেও আক্রমণ করেছিল। একটা আবিল উদ্ভট গুমোট আবহাওয়া ঘিরে রেখেছে তাঁর কবিতাকে।— রূপকল্পগুলোও প্রায়শ যৌনতাক্রান্ত : (১) অথচ অন্যেরা জানে :/ লাম্পট্যে সে মুঘল সম্রাট; নির্বিবেক বদমাশ,/ ঘৃণ্য গণিকালয়ের সন্ত !— যদিও জানে না কেউ/ নবুয়ত-প্রাপ্তিকালে পয়গম্বরের মতো সে শিউরে ওঠে/ অন্তরঙ্গ গণিকাবৃন্দের নষ্ট উরুর আঘ্রাণে [*কবি*]। (২) আলোকিত রাস্তাগুলো তাদের পাতলা পেটিকোট খুলে আমায় আহ্বান করছে, অলৌকিক [*শরীরী পুতুল*]। (৩) কিংবা নিরুপায় ছুটে যাই বারের নৈঃসঙ্গ্য থেকে/ সিফিলিসাক্রান্ত কোনো গণিকার ঘরে, মধ্যরাতে [*জন্মদিনের জর্নাল*]। (৪) ফিরে যাই/ ব্যর্থ মনোরথ। হে দরোজা, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতায়,/ উন্মাদের অহংকারে তবু তোমাকে আযোনি-আত্মা/ অনুভবে ধরি [*হে দরোজা*]।

ষাটের দশকে তাঁর কবিতা রুগ্ণতা ও অশ্লীলতার অভিযোগে যে অমন সার্বিকভাবে নিন্দিত হয়েছিল, তার কারণও এ-ই। আর এইটে আরো বেশি করে হয়েছিল ওই সময়কার রক্তাক্ত মুখাবয়বের যথার্থ ছবি তিনি ফোটাতে পেরেছিলেন বলেই। কিন্তু একজন সহৃদয় পাঠক, যিনি বাইরের এইসব বর্ণিল, উজ্জ্বল আপাতরম্যের আবরণ তুলে ভেতরের প্রকৃত দৃশ্য দেখতে পারেন, তিনি এই আপাত আবিলতার পেছনে আলোকপ্রত্যাশী একটি আত্মার কণ্ঠস্বরই শুনতে পারবেন :

"হে নরো, হে নারি,/ দ্যাখো, একটা মানুষের চোখে ঘুম নেই, রাত্রি কেড়ে নিয়েছে নিদ্রা তার— আর/ তোমরা কি গভীর মজা লুঠছো! একটি মানুষ তার কণ্ঠমণি সাঁড়াশির/ মতো হাতে চেপে ধরেছে, বেদনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, ... ট্রাক চাপা-পড়া কুকুরের মতো থেঁতলে যাচ্ছে; অথচ তোমরা, হে নরো, হে নারি, স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় তাকে উপেক্ষা করছো; মোজেস, মোহাম্মদের মতোই অমল ছিলো তার আত্মা।"

মৃত্যু আর যৌনতা তাঁর কাছে জীবনের এপিঠ ওপিঠ, প্রেম এবং মৃত্যুচেতনা সমার্থক। যে ঘাতক সময় ভালোবাসার উজ্জ্বলিত কামনাকে ক্রূর পাশব হাতে যৌনতার আবিলতায় প্রতিকারহীন ঠেলে দিচ্ছে, সে যৌনতা মৃত্যুর নামান্তর নয় তো কি? ওই নিশ্চিত অর্থহীনতাবোধের সংক্রামেই তাঁর কবিতায় যৌনতা অমন নৈরাশ্য-আক্রান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং জীবন মৃত্যুধৃত।

হে মহিলা অম্লান গোলাপ, বিবর্ণ বিকেলে তুমি
মৃত্যুকেই জেনেছো কি সর্বশেষ প্রিয়জন বলে?
স্থির জেনো, প্রসাধিত হে আমার প্রফুল্ল প্রতিমা—
কোমল ও মোলায়েম স্থানগুলি তোমার তনুর
শক্ত ও নীরক্ত হবে, ক্রমান্বয়ে, কোনো একদিন।
একদা তোমার ঐ অকৃত্রিম ওষ্ঠাধরুনিমা
অতর্কিতে তার আক্রমণে আজকের মতো সাদা
হয়ে যাবে— প্রতিপ্রভ নিতম্ব তোমার, স্বচ্ছতম
উরুসন্ধি, হে মধুর মহিলা, কদর্য পুরুষকেও
আকর্ষণে, হায়, ক্ষমতা হারাবে যেনো সেইদিন।

[জন্মদিনের জর্নাল]

তাঁর কবিতার এই মৃত্যু-আক্রান্ত রূপটি অনুভব করতে না পারলে এ-কথা বোঝা সম্ভব হবে না-কেন তাঁর কবিতার বিষয়গত অধঃপতনও এতখানি মহত্ত্বময়—যার ফলে তা শক্তিমান কবিতার উপযোগী উপকরণ।

৩

'অসম্ভবের পায়ে'র নতুন বিষয়ের মতো এর ভাষাও ছিল সে-সময়ের পক্ষে নতুন। কেবল নতুন নয়, দুঃসাহসী। সে-সময়কার গতানুগতিক শব্দের ভিড়ে তাঁর শব্দেরা নতুন টাকার উজ্জ্বলতায় ও ঝনৎকারে চমক জাগিয়েছিল। আর এটা হয়েছিল তাঁর কবিতা নতুন সময়ের জীবনানুভূতিতে সঠিকভাবে অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে। অনেক উষ্ণ অনাস্বাদিত পুলক, অনেক উত্তপ্ত রক্তিম জীবনচেতনা তাঁর কবিতায় শিল্পায়িত হয়েছে অনিবার্য সজীব শব্দে। ভাষার উদাহরণের জন্যে দ্বিতীয় দফা উদ্ধৃতি আহরণ নিষ্প্রয়োজন। সচেতন পাঠক এ-যাবৎ উদ্ধৃত বাক্যগুলো থেকে তাঁর শব্দপ্রতিভার নমুনা পেয়েছেন।

প্রসংগত একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সে-সময়কার কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে রফিকের নতুনত্ব যেসব জিনিসের কাছে ঋণী, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর ওপর বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলেয়ারের কবিতার প্রভাব। শুধু রফিক আজাদ নয়, সামগ্রিকভাবে ষাটের কবিতা, কি এখানকার কি পশ্চিমবঙ্গের, এই বুদ্ধদেবীয় বোদলেয়ারের কাছে ঋণী। বোদলেয়ারীয় নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণাবোধ, দুঃখ, পাপ-চেতনা ও বিষাদগ্রস্ততা— এসব ষাটের প্রায় সব কবির মতো রফিক আজাদকেও আক্রান্ত করেছিল। তবে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য যে তাঁর ওপর এ প্রভাব ছিল প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বাত্মক— প্রায় আপাদমস্তক আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি এই মানসতার দ্বারা, যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ষাট দশকের বোদলেয়ারী মানসিকতার অনিবার্য বাংলাদেশীয় প্রতিনিধি। ১৯৭০ সালের দিকে তরুণ সমালোচক মাহবুবুল আলম 'কণ্ঠস্বরে' 'অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস'-এর ('অসম্ভবের পায়ে' বইটি ওই নামে বের হবে বলে তখনকার পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল) প্রকাশ-পূর্ব আলোচনা করতে গিয়েও অনুরূপ ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ভাষায় : "কিছু কিছু শব্দ, যেমন দরোজা, মধ্যরাত, জাদুকর, অন্ধকার, আত্মা, মৃত্যু, উজ্জ্বল, অন্তরঙ্গ, রাত্রি, আলোকিত, নিঃসঙ্গতা, গোলাপ, অলৌকিক রফিকের কবিতায় পৌনঃপুনিক বিচরণ করে (স্মরণীয় বোদলেয়ার)।

৪

'অসম্ভবের পায়ে' কাব্যগ্রন্থে ষাটের দশকের ছবি এঁকেছিলেন রফিক আজাদ, ওই দশকের পাপ ও পবিত্রতার। যদি ষাটের দশকেই এই কবিতাগুলো গ্রন্থিত হয়ে বেরোতে পারত, তবে, এই বইয়ের মধ্যে ওই সময়কার বিক্ষত মুখচ্ছবিকে সমকালীন পাঠকেরা রক্তময় পরিপূর্ণতায় প্রত্যক্ষ করতে পারতেন— এ বই চিহ্নিত হয়ে যেত নিপতিত সময়ের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থ হিসেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ন্যায়সংগত সময় থেকে অনেক দেরি করে—১৯৭২ এ। যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন রফিক আজাদ যে সময়ের অধঃবসিত চিত্র এঁকেছিলেন, সে সময়, আমাদের জীবনের অনেক সোনালি মুহূর্তের সঙ্গে ইতিপূর্বেই অতীতের উৎরাইয়ে হারিয়ে গেছে এবং নতুন জীবনাগ্রহে স্পন্দিত নতুন কাল নতুন ভাষায় এবং শব্দে কথা বলে উঠেছে, এমনকি তাঁর নিজের কবিতাতেও। আর এরই ফলে নতুন সময়ের নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনায় উচ্চকিত পাঠক এই পুরোনো সাফল্যটির মূল্যায়নে পরিপূর্ণ মনোযোগ দেবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। মাহবুবুল আলম তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনাটিতে ১৯৭০ সালেই এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে লিখেছিলেন : "যে রচনারীতিতে আলোচ্য অপ্রকাশিত গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ রচিত, তা ইতিমধ্যেই প্রাচীনতা লাভ করার পথে। সুতরাং কথিত পুস্তকের প্রকাশনার জন্যে যে জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তার গুরুত্ব প্রাকৃতিক নিয়মেই উপশমিত হচ্ছে।"

প্রকৃতিরাজ্যের সময়োচিত ফলোৎপাদনের মতো কবিতাজগতে কবিদের গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারটি যথাসময়ে না ঘটলে তা যে কী অহেতুক খেসারতের কারণ ঘটাতে পারে, রফিক আজাদের 'অসম্ভবের পায়ে' তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। খুশির কথা, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে'র বেলায় এ ভুল ঘটে নি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের মাঝখানকার কয়েক বছর কবিতা রচনা থেকে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনের কাল— এই দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বিরতি এই দুই বইকে বিষয়-প্রকরণের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের বিষয় অধঃপতিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়, দ্বিতীয় গ্রন্থের : জাগ্রত দেশকাল। বললে কি খুব ভুল হবে যে দুটি আলাদা ভাষায় ও শব্দে এ বই দুটি রচিত— দুটি প্রায় যোগাযোগরহিত ভিন্ন মানুষের আলাদা জীবনচেতনার উৎসার?

আমার এ আলোচনা অবশ্যই রফিকের কবিতার মূল্যায়নের কোনো সার্বিক উদ্যোগ নয়। মনেও হয় না একজন কবির কোনো একটিমাত্র কাব্যের ওপর নির্ভর করে তা সম্ভব, বিশেষ করে রফিকের মতো একজন কবির— যিনি ইতোমধ্যেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে এসে সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন। তবু এ আলোচনা শেষ করার আগে রফিক আজাদ সম্বন্ধে অন্তত একটা কথা বলে নিতেই হবে। রফিক আমাদের সেই বিরল কবিদের একজন যাঁরা কবিতার ফর্মের ব্যাপারে অসাধারণ সজাগ। কবিতায় শুদ্ধ সারাৎসারকে উপহার দিতে চান বলেই তিনি কবিতায় সংহতি ও নিটোলতাকে সনিষ্ঠভাবে অন্বেষণ করেন। তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রুজু করা চলে, অনেক স্খলন-ত্রুটি দেখানো সম্ভব। সাংগীতিক অনটনে তাঁর কবিতা অনেকখানেই নীরক্ত ও নিশ্চল, এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না। উজ্জ্বল তীব্র আবেগস্পন্দনে উচ্চকিত নয় বলে রফিক আজাদের কবিতা মূল্যবান কাব্যোপচার নিয়েও প্রতিভাবান মাঝারিত্বকে অনেকখানেই ডিঙোতে পারে না। এসব অভিযোগ উঠেছেও তাঁর বিরুদ্ধে—হয়তো ওঠানো চলেও। কিন্তু শিথিলতার, আতিশয্যের, অমনোযোগের, অব্যস্থাপনার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে অচল। নিপুণ যত্নে, বাহুল্য সরিয়ে, সবরকম আতিশয্য মুছে, তিল তিল করে, চেতনার অসংকলিত উপাদান থেকে তিনি তুলে আনেন কবিতার সংহত শরীর। যতদূর মনে করি এই সংহতিচর্চায় তিনি সচেতনভাবেই মাইকেলের আদর্শ অনুসারী এবং কাব্যকুশলতার অন্যান্য অনেক সাফল্যের মতো এই দুর্লভ সংহতির কারণেই তিনি আমাদের প্রথম সারির কবিদের অন্যতম।

১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিচারণমূলক রচনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা ইমাম

পঞ্চাশের দশকে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, জাহানারা ইমাম তখন ঢাকা শহরের সুচিত্রা সেন। সেকালে, সেই পঞ্চাশের দশকে, প্রতিটা বাঙালি মেয়েই সুচিত্রা সেন হতে চাইত। নায়িকা হিশেবে জনপ্রিয়তায় সুচিত্রা সেন তখন তাঁর শিল্পীজীবনের শীর্ষে। বাঙালিরা তাদের আরাধ্য নারীর ভেতর যে দুর্লভ গুণগুলো খুঁজে বেড়ায় এবং ভবিষ্যতেও খুঁজবে বলে মনে হয়—সৌন্দর্যে, ব্যক্তিত্বে, পরিশীলনে এবং মাধুর্যে তিনি ছিলেন তার নিকটতম উপমা। এখন চলচ্চিত্রের যুগ শেষ হয়ে টেলিভিশনের উত্তেজনামুখর ছোট পর্দার ক্ষিপ্রচটুল অপসৃয়মান যুগের পদপাত ঘটেছে। এমন যুগে সারা জাতির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত, আরাধ্য এবং অপ্রাপনীয় এমনি কোনো সর্বজনীন পরমাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে বলে মনে হয় না।

এমন পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটা মেয়ের সুচিত্রা সেন হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকা অবাস্তব নয়। ছিলও তাই। তাঁরা সুচিত্রা সেনের ঢঙে শাড়ি পরতেন, খোঁপা বাঁধতেন, মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি করে সামনের চুলগুলোকে দুদিকে আলতোভাবে উঁচিয়ে বিছিয়ে দিতেন এবং তাঁরই মতোই দৃপ্ত ঋজু গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়ে বিনীতা অপরূপা হতে চাইতেন। জাহানারা ইমামের সঙ্গে সে-সময়ের অন্য মেয়েদের পার্থক্য এখানে যে, তাঁরা সবাই সুচিত্রা সেন 'হতে চেয়েছিলেন', আর জাহানারা ইমাম তা 'হয়েছিলেন'।

প্রথম দিন জাহানারা ইমামকে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কী করে কোলকাতা থেকে এত দূরে, এই ঢাকা শহরে, অবিকল একই রকম একজন সুচিত্রা সেন থাকতে পারেন, যিনি পর্দার অলীক নায়িকা নন, একজন বাস্তব মানুষ, তাঁরই মতো হেঁটে ফিরে বেড়ান, হাসেন, কথা বলেন! বাঙালিরা নানা জাতির সমাহার। একজনের সঙ্গে আরেকজনের চেহারার মিল নেই। প্রত্যেকের ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য আলাদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অমিলভাবে ছড়িয়ে আছে। আমার ধারণা আজ পৃথিবীতে যতজন বঙ্গভাষী আছে ততজন আলাদা চেহারার বাঙালি আছে। তবুও মাঝেমাঝেই বাঙালির সমিল অবয়ব আমাকে বিমূঢ় করে। আমি এ যাবৎ বাংলাদেশে অবিকল শেখ মুজিবের মতো দেখতে অন্তত তিনজন মানুষ দেখেছি।

আমরা যখন এম. এ. শেষ পর্বের ছাত্র, তখন, উনিশ শ ষাট-একষট্টির দিকে

হতবাক হয়ে দেখলাম, সেই সুচিত্রা সেন, আমারই বিভাগে, বাংলায়, এম. এ. প্রথম পর্বে এসে ভর্তি হয়েছেন। তিনি তখন সম্ভবত সিদ্ধেশ্বরীর কেনো মেয়ে-স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বা শিক্ষিকা। বি.এ. তিনি অনেক আগেই পাস করেছিলেন, নানান কারণে এম.এ. পড়াটা হয়ে ওঠেনি, সেটা শেষ করে নিতে চান। সামনাসামনি একজন চলমান সুচিত্রা সেনকে রোজ রোজ দেখতে পাবার কথা ভেবে উৎসাহিত হলাম।

দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এল। সে সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ছিল মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ অংশ জুড়ে, যার পুবধারের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের অফিস, এখন হাসপাতালের জরুরি বিভাগ—রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন রোগীদের যন্ত্রণা আর কাতরোক্তির অবিশ্রাম আর্তনাদমুখর চৌহদ্দি। আর আমাদের সেই শ্রেণীকক্ষগুলো, যেখানে আমাদের রক্তিম স্বপ্নেরা এক এক করে পাপড়ি মেলেছিল সেগুলো এখন দুঃস্বপ্নগ্রস্ত রোগীদের ওয়ার্ড। আর কলাভবনের আঙিনার মাঝখানটার যে আমতলা থেকে একদিন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল সেই আমগাছের চিহ্ন আজ কোথাও নেই।

বাংলা বিভাগের পাঠকক্ষের বারান্দা দিয়ে আমরা জনাতিনেক ছাত্র হেঁটে যাচ্ছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই কথা শুরু হল। তাঁর ফুটফুটে সুন্দর জীবন্ত ত্বক তখনো তাঁর সারা অবয়ব জুড়ে বিভা ছড়াচ্ছে। আমাদের দলের একজন তাঁর পরিচিত ছিল, তাকে দেখে নিজে থেকেই কথা শুরু করলেন তিনি। এক-দুই বার আমিও কথাবার্তায় যোগ দিলাম।

প্রতিটা মানুষের জীবনে, বিশেষ করে তরুণ বয়সে এমন একটা সময় যায় যখন নিজের মুখটাকে সবার সামনে বাল্বের মতো উঁচু করে তুলে ধরতে সাধ জাগে। নিজেকে সবার সামনে পরিচিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত দেখার ইচ্ছায় হৃদয় উন্মুখ হয়। সবাই আমার দিকে একটু তাকাক, আমাকে একটু লক্ষ্য করুক, চোখে সপ্রশংস বিস্ময় ফুটিয়ে এক-আধটু উচ্ছ্বসিত হোক, এমনি একটা আকাঙ্ক্ষা ভেতরে ভেতরে আকুলিবিকুলি করতে থাকে। আমার মনে হয় কেবল ঐ বিশেষ বয়সে নয়, সব বয়সের মানুষের ভেতরেই কাজ করে ব্যাপারটা, জীবনের সাফল্যের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বয়সের বিভিন্ন পর্বে এর চরিত্র আর তীব্রতার পার্থক্য হয়। আমি তখন অপরিচিত মফস্বল থেকে আসা নাম-পরিচয়হীন তরুণ, আমার ভেতর এই উৎসাহ এক-আধটু বাড়াবাড়ির পর্যায়েই হয়তো ছিল। সবখানেই নিজেকে একটু রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরার ইচ্ছা মাঝেমাঝেই সহনীয় মাত্রা ছাড়াত। কে কী ভাবছে বা বলছে তা নিজেকে বুঝতে দিলেও সেখানে বোকামি, আকাঙ্ক্ষাটাকে অবাধে পুরোপুরি তুলে ধরা যাবে না।

তাঁর কাছে নিজেকে কেউকেটা প্রমাণ করার নেশা বোধহয় একটু বেশি মাত্রাতেই পেয়ে বসেছিল। হঠাৎ কথায় কথায় কী একটা ব্যাপারে একটা জাঁকালো মন্তব্য করে বসেছিলাম। আমার এই ছোট্ট নিরপরাধ কথাটা আমার জন্য যে কতখানি দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে পারে, ভাবতে পারি নি। আমার কথা শেষ হতে পারল না। প্রায় সম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণহীনভাবেই ফেটে পড়লেন তিনি। তাঁর চেহারা পাল্টে গেল। মুখ নির্মম হয়ে উঠল। আমার উক্তিটিকে তিনি নির্দয় চাবুকে ছিন্নভিন্ন করে চললেন। যেন তার ওপর অনুষ্ঠিত কোনো জগৎ-ব্যাপী অন্যায়ের ক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন তিনি। তাঁর চোখ থেকে উত্তপ্ত তীব্র আগ্নেয় হলকা আমি বেরিয়ে আসছে দেখতে পেলাম।

আমি জানি না আমার কী ত্রুটি হয়েছিল। আমি কি না-জেনে তাঁর জীবনের করুণ ও অসহায় কোনো জায়গায় অযাচিত আঘাত করেছিলাম? সে যাই হোক, তাঁর সেদিনকার সেই নির্মমতা আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় নি। বরং স্নায়ুর উত্তেজনা ঘটিত একধরনের নিয়ন্ত্রণহীন অসুস্থ মানসিক অবস্থা বলেই মনে হয়েছিল।

রাগলে কাউকেই সুন্দর দেখায় না, এমনকি সুচিত্রা সেনদেরও নয়। ওটা হতে পারে শিল্পের মঞ্চে, যেখানে ক্রোধকে মধুররূপে ফুটিয়ে তোলা হয়। বাস্তব জীবনের রাগ সবসময়ই দৃষ্টিকটু। আমাদের ঢাকার সুচিত্রা সেনকেও সেদিন আমার কাছে সুন্দর মনে হয় নি। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে কিছুক্ষণ আগেই হতাশ হয়েছিলাম। তাঁর ক্রোধ আমার সেই হতাশাকে আরও প্রকট করে দিল।

আগেই বলেছি আমি তখন মফস্বল শহর থেকে আসা নিতান্ত গোবেচারি তরুণ। একটা স্ত্রীবর্জিত পৃথিবীতে আমাদের শৈশব কেটেছে। সুন্দরী অত্যাধুনিক মহিলা দূরের কথা, সাধারণ আটপৌরে মহিলা দেখার সুযোগও প্রায় আমাদের ছিল না। নারী মাত্রই তখনো আমাদের কাছে দেবী। সুন্দরী রমণী দেখার যা একটু-আধটু সুযোগ ছিল তা কেবলই সিনেমার পর্দায়। সেখানে আমাদের স্বপ্নের সবকিছুই ঘটতে পারে। সে জগৎ অবাস্তব। রাগও সেখানে সৌন্দর্যময় ও অনিন্দ্য। কিন্তু বাস্তব সুন্দরী তাই বলে এত ক্ষমাহীন, এত নির্মম হবে? আত্ম-অবমাননার কষ্ট আমার ভেতরটাকে ক্ষতবিক্ষত আর অবসন্ন করে তুলল। মানবীর সৌন্দর্য আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। সেই মানসিক বৈকল্য কাটাতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

আমার ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার চারপাশে অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান মহিলা কমই দেখেছি যিনি মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। এমন অবিবেকী, হৃদয়হীন আর অত্যাচারী এই সমাজ, এমন নিষ্ঠুর আর বর্বরোচিত যে, মহিলা তো দূরের কথা, প্রতিভাবান পুরুষদের পক্ষেও এই সমাজে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন। প্রতিভাবান মানুষদের চৈতন্যজগৎ এমনিতেই সাধারণ মানুষদের চেয়ে দীপ্র ও দ্যুতিময়। তাদের অনুভূতিশীলতা ও স্পর্শকাতরতা তুলনামূলকভাবে বেশি। অল্প আঘাতে এরা কুঁকড়ে যায়। তাদের ইচ্ছা ও স্বপ্ন, প্রাপ্য ও প্রাপ্তি সাধারণ মানুষ থেকে বিপুলভাবে আলাদা। এই পৃথিবীকে পাল্টে যারা নতুন পৃথিবী তৈরি করবে, ভিন্নপথে মোড় ফেরাবে, ধরেই নিতে হবে তাদের চাওয়া-পাওয়া চেতনা-অনুভূতি ঠিক চারপাশের দশটা একাকার মানুষের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু সমষ্টির হিতের নামে এই মূঢ় ভেদাভেদহীন ভিড়ের জগৎ, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এইসব অনুভূতিসম্পন্ন ও স্পর্শকাতর মানুষদের ওপর এমন অমানবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যাচার চালায়, নিজেদের সাধারণত্বের স্থূল আস্তিনের নিচে তাদের একাকার করে ফেলার জন্যে এমন নিষ্কৃতিহীন ও পাশবিক চাপ দিতে থাকে যে তাঁরা ধীরে ধীরে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে।

প্রতিভাবান মানুষেরা এমনিতেই একটু তেড়িয়া। তাঁরা যুদ্ধপ্রিয় ও কলহপরায়ণ। উন্নততর কিছু করতে চায় বলেই এরা চারপাশের অমানবিকতার সঙ্গে কলহপরায়ণ। শক্তিমান বলেই যুদ্ধপ্রিয়। চারপাশের বিবেকহীনতা এবং অন্যায়ের সঙ্গে তারা বিরতিহীনভাবে যুদ্ধ করে চলে। কিন্তু আমাদের সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থূল ও অকর্ষিত আক্রমণ তাঁদের ক্রমাগতভাবে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে থাকে। পুরুষেরা তবু তাদের শক্তিশালী সামাজিক অবস্থানের কারণে এই হামলা উৎরে কোনোমতে হয়তো মানসিক ভারসাম্য জিইয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহিলারা প্রায়শই ভেঙে পড়ে।

এই সমাজে আজও পর্যন্ত সম্মানজনক মানুষ হিশেবে একজন নারীর কোনো অবস্থান নেই। আদর্শ স্ত্রীর গুণপনা তুলে ধরতে গিয়ে মহাভারতে কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামাকে দ্রৌপদী বলেছিলেন : সফল স্ত্রীর একটা গুণ হবে, সে শুতে যাবে সবার শেষে, উঠবে সবার আগে। নারীজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এইসব ধারণা আজও অবিকল একইরকম। আজও এ সমাজে একজন নারীর কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই। তার শ্রম বা জীবনপাতের অর্থনৈতিক মূল্য বা স্বীকৃতি নেই—রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার সেই গৃহবধূর মতোই রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার অর্থহীন চক্রাবর্তের ভেতরেই তার জীবন নিঃশেষিত। আজও আমাদের সমাজের একজন মেয়ে, সে যত বড় বা বৈভবশালী পরিবারেরই সন্তান হোক, যখন স্বামীর ঘরে ঢোকে, তখন দাসী হয়েই ঢোকে। সামাজিকভাবে পুরোপুরি অস্তিত্বহীন অবস্থানহীন এই পরিবেশে অনুভূতিসম্পন্ন সংবেদনশীল বা প্রতিভাবান হওয়া কিংবা এই সমাজের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা একজন নারীর জন্য অমার্জনীয় ধৃষ্টতার পর্যায়েই পড়ে। সমস্ত মধ্যযুগের ইয়োরোপে এইসব প্রতিভাময়ী নারীদের ডাইনি আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা প্রতিভার অপরাধে খনার মতো জিভ কেটে নিয়ে বা গার্গীর মতো মাথা খসে পড়ার ত্রাসের নিচে তাঁদের দমিত করে রখেছে।

আমাদের সমাজে যে মেয়ে কোনো অতিরিক্ত সম্পন্নতা বা শক্তি নিয়ে জন্মায়, প্রতিভার দণ্ড হিশেবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর যে অকারণ হিংস্রতা এবং আক্রমণ চলতে থাকে তা তাকে একসময় সারা পৃথিবীর ওপর বিদ্বেষপরায়ণ ক্ষুব্ধ এবং তিক্ত করে তোলে। তার স্বাভাবিক সহনশীলতা ও মানসিক সুস্থিরতা নিজের অজান্তেই নষ্ট হয়ে যায়। সবকিছুর ওপর অকারণে সে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। তার মানসিক সুস্থতা হারিয়ে যায় এবং তার ওপরে অনুষ্ঠিত এই উদ্ধারহীন ও বিশ্বজনীন অত্যাচারের প্রতিশোধ হিশেবে মরিয়া অবস্থায় নিজের অজান্তে শত্রুমিত্র সবার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকারণে ও নির্মমভাবে সে আক্রমণ চালাতে থাকে। যাঁরা জীবনে সাফল্যের মুখ দেখার সৌভাগ্য পান তাঁদের ভেতরকার এই অবদমিত ক্রোধ, প্রাপ্তিজনিত পরিতৃপ্তির কারণে, একসময় মনের ভেতরকার সুস্থিত ভারসাম্য খুঁজে পায় হয়তো। কিন্তু যাদের জীবনে ঐ আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য জোটে না বা অন্যায়জনকরকমে কম জোটে (নানান গ্রহণযোগ্য কারণেই অমনটা ঘটতে পারে) তারা এক আক্রোশতিক্ত পৃথিবীর ভেতর, সবার বিরক্তি এবং বৈরিতা ঘটিয়ে অসুস্থভাবে জীবন শেষ করে।

আমার ধারণা, জাহানারা ইমামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে আমাকে যে অকারণ আক্রোশের শিকার হতে হয়েছিল তা আমাদের দেশের মহিলাদের ওপর অনুষ্ঠিত সমাজ ও পরিপার্শ্বের অযৌক্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ও অসমভাবে যুদ্ধরত একজন অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিভাময়ী নারীর নিত্যনৈমিত্তিক নির্যাতনেরই তিক্ত প্রতিক্রিয়া। আট-নয় বছর পর যখন তাঁর সঙ্গে আমার আবার পরিচয় হয় তখন তাঁর প্রকৃতিতে ঐ তিক্ততা আমি দেখি নি। তিনি তীব্র ও নিরাপোষ ছিলেন কিন্তু কোনোমতেই অপ্রীতিকর ছিলেন না। বরং ছিলেন উল্টো। আতিথ্যে এবং অন্তরঙ্গতায় তিনি সবাইকে তাঁর উত্তাপ-মধুর মানবিক সান্নিধ্যে টেনে নিতেন। আট-নয় বছরে তাঁর এই পরিবর্তনের একটা কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি নানাদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নানান ধরনের সাফল্য তাঁকে সুমিত করেছিল। জীবনের পথে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সুস্থিরতা এবং সাফল্যের স্বস্তি ততদিনে তাঁর ভেতরকার সেই নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ এবং তিক্ততাকে উন্নীত করেছে একধরনের আপোষহীন ভারসাম্যময় তেজস্বিতায়। গত কয়েক বছরে সারা জাতির হৃদয়ে আবহমান বাঙালিত্বের বিলীয়মান চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রজ্জ্বলিত করার এবং বিস্মৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে ফিরিয়ে দেবার সংগ্রামে তিনি যে অনমনীয় নির্ভীক ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছেন তা তাঁর চরিত্রের এই দুর্লভ তেজস্বিতার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। অনেক বছর আগে তাঁর চরিত্রের যে দৃপ্ত শক্তিকে আমি সার্বক্ষণিক সামাজিক উৎপীড়নের ফলে অকারণ ক্রোধে পর্যবসিত হতে দেখেছি, একালের মৌলবাদীরা সেই শক্তিকেই সুসংহত ও লক্ষ্যভেদী এক অমোঘ মারণাস্ত্ররূপে অনুভব করেছে।

উনিশ শতকের বাঙালিরা মানুষের ব্যক্তিত্বে এই তেজস্বিতার দিকটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। ঐ কালটাই ছিল শক্তিমান মানুষ আর তাদের অভাবনীয় সব কর্মোদ্যোগের যুগ। অমানুষিক সংগ্রাম আর সাধনার ভেতর দিয়ে একেকজন মানুষ সে সময় সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতেন। এজন্যে কীর্তিমান মানুষদের জীবনকালে বা মৃত্যুর পর তাদের নিয়ে জীবনী লেখার উৎসব পড়ে যেত। জীবনীগুলোতেও ঐসব মানুষদের গুণপনার উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা যে-গুণটির কথা সবচেয়ে জোর দিয়ে উল্লেখ করতেন তা হচ্ছে এই তেজস্বিতা। একজন শক্তিমান মানুষের ব্যক্তিত্বে এই তেজস্বিতার উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। দুঃসাধ্যের অনিশ্চিত যাত্রায় যাঁকে নিঃসঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, তেজস্বিতার বিরল পাথেয় ছাড়া তিনি কী করে তা করবেন? ঐ যুগ বিশ্বাস করত জাতির ভূয়িষ্ঠ সম্ভাবনায়, আস্থা রাখত ব্যক্তির চারিত্রিক অখণ্ডতায়। কিন্তু আমাদের কালে, চারপাশে অবাধ লুণ্ঠন আর নৈতিকতার দুরপনেয় পতন দেখে দেখে, সব ব্যাপারে আমরা সংশয়ী ও নেতিবাদী হয়ে পড়েছি। আমাদের চারপাশেও শক্তিমান তেজস্বী মানুষের অভাব নেই, কিন্তু অবিশ্বাস-দ্বিখণ্ডিত আমরা তাদের শ্রেয়ত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে অপারগ হচ্ছি।

২

জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমার পরবর্তী যোগাযোগ বছর সাতেক পরে, তাঁর নিজের উৎসাহেই। ততদিনে আমাকে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। মনে থাকা সম্ভবও নয়। কবে কোন্ পাঠকক্ষের বারান্দায় কোনো অপরিচিত ছাত্রকে তিনি বুদ্ধির অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে তিরস্কার করেছিলেন, তাকে কদিনই বা মনে রাখা যায়! হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

খুব সম্ভব উনিশ শ আটষট্টি সাল সেটা। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার বছর দেড়েক পার হয়েছে আমার। আমার অনুষ্ঠান ততদিনে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে। একদিন স্কুটারে করে সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ভোকসওয়াগন গাড়ি আমাকে পার হয়ে রাস্তার বাঁ দিকে চেপে আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গাড়ির ভেতরে তাকালাম; দেখলাম, স্টিয়ারিং-এ বসে আছেন আমাদের সুচিত্রা সেন—সেই আগের মতোই উজ্জ্বল আর অনিন্দ্য। সঙ্গে তাঁর দুই স্কুলে-পড়া ছেলে—রুমী আর জামী। ঢাকা শহরে সে সময় হাতে-গোনা যে পাঁচ-সাতজন মহিলা নিজেরা গাড়ি চালাতেন, তিনি তাঁদের একজন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রূঢ় আঘাতের ক্ষত অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে বিচলিত করে রেখেছিল, তাঁকে দেখতেই আমি আমার ভেতর সেই প্রাক্তন আতঙ্কের প্রত্যাবর্তন অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ স্নিগ্ধ সকালের মতো অভয় মাখানো। না, ভয় নেই, মেঘ কেটে নির্মল আকাশ দেখা দিয়েছে। বোঝা গেল এই মানুষটি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমদিনের মতো নন আদৌ। আমরা তাঁকে যেমন ভাবতে ভালোবাসতাম, ঠিক তেমনি। একটু অবাকই হলাম। আমাকে তিনি চিনলেন কী করে? কিছুতেই তো মনে থাকার কথা নয়। চকিতে একবার টেলিভিশনের কথা মনে হল। অসম্ভব নয়। দর্শকদের উৎসাহ নামে একটা ব্যাপারের সঙ্গে আমি ততদিনে অনেকখানিই পরিচিত।

আমি থেমে পড়তেই তিনি হাসিমুখে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। সহজ স্বরে বললেন : 'একটু অভদ্রতা করলাম। আমার দুই ছেলে আপনার দারুন ফ্যান। আপনাকে দেখেই গাড়ির ভেতরে হৈচৈ লাগিয়ে দিল' বলে দুই ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মুখে 'ফ্যান' শব্দটা শুনেই বুঝলাম যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। টেলিভিশনের কারণেই রাস্তার ওপর এই অভাবিত দৃশ্যের অবতারণা। আশ্চর্য এই নির্বোধ বাক্সের মহিমা, একেকজন অকারণ মানুষকে রাতারাতি কোথায় উঠিয়ে ফেলে! তুচ্ছকে করে তোলে মূল্যবান, তিরস্কৃতকে পুরস্কৃত। আমাকে দেখে আমার ফ্যানদের চোখেমুখে কিন্তু ততটা উচ্ছলতা দেখা গেল না, যতটা দেখা গেল মায়ের চেহারায়। একেকবার সন্দেহ হল ছেলেদের বেনামীতে আসল ফ্যানটি তাঁর পরিচয় লুকিয়ে যাচ্ছেন কিনা? ছেলেদুটো আমাকে সামনাসামনি দেখে এমনিতেই লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছিল। অবাক চোখে ওরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'নিউমার্কেটে।'

'আমরা নিউমার্কেটের পাশেই থাকি, এলিফ্যান্ট রোডে। সময় থাকলে আসুন না আমাদের বাসায়। গল্প করতে করতে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।'

রাজি না-হওয়ার কোনো উৎসাহ ছিল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'আমার গাড়ি ফলো করে আসুন, আমি আস্তে আস্তে চালাচ্ছি।' বলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন। প্রতিটা কথায় আচরণে কী স্বতঃস্ফূর্ত রকম সহজ আর অকুণ্ঠ। কোথাও কোনো জড়তা বা সংকোচ নেই। তাঁর ভেতর একটা উচ্ছল ঝর্নার সাবলীলতা অনুভব করলাম।

তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে তাঁদের বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছিমছাম ছোট্ট বাড়িটার মতো বাড়ির নামটাও সুন্দর : কণিকা। সেকালের হাল ফ্যাশনের ধাঁচে ইংরেজিতে লেখা নামটা। ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই একটা সাজানো-গোছানো সম্পন্ন সংসারের ছবি চোখে পড়ল। সারাটা বাড়ি জুড়ে একটা রুচি আর বৈদগ্ধ্যের অবারিত সৌরভ। দেখলেই বোঝা যায় অনেক যত্ন, পরিশ্রম আর মার্জিত বৈভব দিয়ে একটু একটু করে তৈরি এই নিটোল বাড়ির অনবদ্য তিলোত্তমা। কোথাও অবহেলা, অসতর্কতা বা বিচ্যুতির সামান্যতম চিহ্ন নেই। বাড়িটার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই বাড়ি যার রুচি আর পরিচর্যায় তৈরি তিনি একজন সুযোগ্য মানুষ, নিজের এবং চারপাশের সবার পুরোপুরি উপভোগের যোগ্য করে পৃথিবীকে গড়ে তোলার শক্তি যাঁর হাতে। অনুভব করলাম সেকালে প্রতিটা বাঙালি মেয়ে সুচিত্রা সেন হতে চেয়েছিল, কিন্তু কেন তখন একমাত্র তিনিই তা হয়েছিলেন। এটা কেবল রূপের ব্যাপার নয়। রূপ, রুচি, বৈদগ্ধ ব্যক্তিত্ব সব মিলে একটা বর্ণনাতীত ঘটনা।

চা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। কিন্তু আসার আগে কথা দিয়ে আসতে হল পরের শুক্রবারে অনেকক্ষণ গল্প করার জন্যে আবার যেতে হবে, সেদিন পরিচয় হবে শরীফ সাহেবের সঙ্গে।

এরপর অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনো তাঁর বাসায়, কখনো বাইরে। কখনো মুহূর্তের, কখনো দীর্ঘক্ষণের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিশ্বাস্য জীবনমুখী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনীর মতো ছিলেন তিনি, যে দামিনী "উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিয়া আছে।" প্রচুরভাবে, বিপুলভাবে, পর্যাপ্তভাবে বেঁচে থাকায় বিশ্বাস করতেন তিনি। তাঁকে দেখলেই মনে হত তাঁর সজীব দুই চোখ সরাসরি তাকিয়ে আছে জীবনের দিকে, যে জীবন উষ্ণ এবং জীবন্ত। তাঁর কাছে গেলে জীবনের ওপর আস্থা ফিরে আসত। হতাশার নদীতে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শোনা যেত। না, তিনি মৃত্যুকে চিনতেন না। চেনার আগ্রহও ছিল না তাঁর। তিনি চিনতেন উষ্ণ তপ্ত উপচানো পরিপূর্ণ জীবন। জীবনের শেষ দশ বছরে ক্যানসারের আক্রমণে তিলে তিলে ক্ষয়ে-যাওয়া শরীর নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন গৌরবময় সংগ্রামে, এমনকি মৃত্যুর আগের মুহূর্তের বেঁচে থাকার নিঃশেষিত দিনগুলোতেও তাঁর এই প্রচণ্ড জীবনপিপাসা একইরকম অপরাজেয় ছিল। তিনি মৃত্যুর ভেতরে হেঁটে গেছেন মৃত্যুর সঙ্গে অপরিচিত অবস্থায়।

উনিশ শ আটষট্টির শেষের দিকে আমি একের পর এক ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব পেতে শুরু করি। এর আগেও দু-একটা প্রস্তাব পেয়েছিলাম, দ্বিধার কারণে এগোই নি। আমার শিক্ষক সত্তার সঙ্গে অভিনেতা সত্তার বিরোধজনিত স্বাভাবিক কারণেই এগোনো হয় নি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি এ-ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তিনি অভিনেতার জীবন বেছে নেয়ার পক্ষে মত দিলেন। কেবল দিলেন না, অভিনেতা হিশেবে আমার যোগ্যতা এবং সম্ভাবনাগুলোকে এমন জীবন্ত আর রক্তিম করে আমার সামনে তুলে ধরলেন যে আমি তরুণ বয়সের যুবকদের মতো উৎসাহী হয়ে উঠলাম। শেষ অব্দি ফিল্মে যাওয়া আমার হয় নি। শিক্ষকতার জন্যে আমার জন্মান্ধ আকুতিই তা হতে দেয় নি। আমার মনে হয়, না গিয়ে শেষ অব্দি ভালোই হয়েছিল। আমার ভেতরকার শিক্ষকের হৃদয়কে চেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ঐ হৃদয়টি ছিল তাঁর দৃষ্টির অনেক আড়ালে—আমার একান্ত ভেতরে। দূর থেকে আমার মঞ্চের মানুষটাকেই তিনি চিনতেন। সে জায়গায় তিনি ভুল করেন নি। এই গুণগ্রাহিতা ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর আশেপাশের প্রতিটা মানুষের প্রতিটা সুপ্ত ও প্রকাশিত সম্ভাবনাকে তিনি টের পেতেন এবং অকুণ্ঠ সংবর্ধনা জানাতেন। তিনি নিজে ছিলেন তপ্ত হৃদয়ের অধিকারী, তাঁর কাছে আসা মানে ছিল জেগে-ওঠা। সেইজন্যে তিনি কখনো নিঃসঙ্গ ছিলেন না। আমাদের বয়সের সে সময়কার প্রাণবন্ত তরুণ-তরুণীরা তাঁকে বড়বোন হিশেবে, কনিষ্ঠেরা মা হিশেবে আমৃত্যু তাঁকে ঘিরে রেখেছে।

তাঁর কথাবার্তা ছিল প্রাণৈশ্বর্যে ভরা। পাগলা-ঝোরার মতো উচ্ছল তীব্রতায় তা উৎসারিত হত। যতক্ষণ তাঁর ভেতরকার প্রকাশের আকুতি পুরোপুরি শেষ না হত ততক্ষণ এই কথার আবেগ থেকে তাঁর মুক্তি ছিল না। তাঁর অনুভূতিশীল ভাষা-কথাময় উজ্জ্বল দুই চোখে তাঁর তীব্র সজীব চৈতন্যধারাকে উচ্ছ্বত হতে দেখা যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই জীবনের ক্ষতির সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হতে দেখি। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তাঁর সম্ভাবনাময় তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মৃত্যু এবং ঐ মৃত্যুর পথ ধরে স্বামীর জীবনাবসান তাঁকে নিঃসঙ্গ করে ফেলে। যে-কোনো মানুষেরই এমনি পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ার কথা। কিন্তু তিনি ভাঙেন নি। তাঁর প্রবল জীবনবাদ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি বিষণ্ন হয়েছেন, কিন্তু বিমর্ষ হন নি। তাঁর যে তেজস্বিতাকে আমি একদিন ক্রোধ হিশেবে দেখেছিলাম, আজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা তার অমিত ধার অনুভব করছে।

উনসত্তর থেকে একাত্তুরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দুই ছেলে, রুমী আর জামী, দুজনেই ছিল ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র। সভা-সমিতিতে আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, 'আমার ছেলেরা আপনার নাম বলতে অজ্ঞান। বাসায় আসবেন সময় করে।'

একাত্তর পর্যন্ত তাঁর বাসায় যাওয়া হয় নি। পরে তাঁর বাসায় যখন গেলাম, তখন বাড়ির সেই প্রথমদিনের রুচি এবং বৈভবের জগতে অবহেলার ছোঁয়া লেগেছে। বাড়ির চার সদস্যের মধ্যে দুজনই তখন আর নেই।

একাত্তর তাঁর স্বামী-সন্তানকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেছে, বিনিময়ে তাঁর ভেতর জাগিয়ে দিয়েছে একজন স্মরণীয় লেখিকাকে। তাঁর ভেতর একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখিকার শক্তি আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল, একাত্তর তাঁকে লেখার বিষয়বস্তু দিয়েছে। যে নির্লিপ্ত ও আবেগময় বর্ণনায় তিনি একাত্তরের ঢাকাকে উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা স্মরণীয় হবে।

'একাত্তরের দিনগুলি' পড়া মানে একাত্তুরের ঢাকায় বেঁচে থাকা। কেবল ঢাকা নয়, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বেঁচে থাকা। এই বই পড়তে গিয়ে যতবার আমার চোখ অসহায়ভাবে অশ্রুসিক্ত হয়েছে, অব্যক্ত কষ্টে বুকের ভেতরটা পাথরের মতো হয়ে গেছে, আমার জীবনে আর কোনো বই পড়ে তেমনটা হয় নি। আমার ধারণা, বাংলাদেশে এই বইয়ের পাঠকমাত্রেই আমার সেই সিক্ত হৃদয়কে একইভাবে অনুভব করবেন।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর বাংলাদেশে এযাবৎ যত বই লেখা হয়েছে, এ বইটি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মানবিক। কেবল আমাদের নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে এমন বই বিরল। এ্যানা ফ্রাংকের ডায়রি এই বইয়ের প্রেরণা হিশেবে কাজ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ্যানা ফ্রাংকের ডায়রির চেয়ে এই বই অনেক গভীর, ব্যাপ্ত, তলদেশবহুল। যুদ্ধধৃত দৈনন্দিন জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পাশাপাশি এই বইয়ের মধ্যে একটা গোটা জাতির রক্তাক্ত হৃদয়কে দেখা যায়। যে বেদনার ভেতর দিয়ে একদিন বাংলাদেশের উত্থান ঘটেছিল, যা আজ আমরা ভুলে গেছি, একজন বিপর্যস্ত গৃহবধূর করুণ জীবনের ভেতর সেই দেশ ও দুঃখ পুরোপুরি প্রতীকায়িত হয়ে রয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটিও অনন্য। 'একাত্তুরের দিনগুলি' আগামী দিনের বাঙালি জাতির কাছে জীবন্ত মুক্তিযুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকবে।

আরেকবার তিনি জেগে ওঠেন পঞ্চান্ন বছরের দিকে—ক্যানসারে আক্রান্ত হবার পর। দরোজার পাশে নিশ্চিত মৃত্যু তাঁর সহজাত জীবনবাদিতাকে আরো দুর্জয় করে তোলে। যে পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর হাতে শর্তহীন আত্মসমর্পণ করে, সেই পরিস্থিতিতে জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর পরিপূর্ণভাবে বাঁচার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাঁর 'ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস' বইয়ে তাঁর অসাধারণ জীবনীশক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এমন শান্ত নির্লিপ্তভাবে তাঁর ক্যানসার হওয়ার ঘটনাগুলোকে গুছিয়ে এক এক করে আমার কাছে একদিন বর্ণনা করেছিলেন যে তাঁর সেই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা দেখে আমি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় নীরব থাকলে মানুষের হৃদয় সবচেয়ে বেশি করে বেজে ওঠে, তা তিনি সহজাতভাবে জানতেন। 'একাত্তুরের দিনগুলি'তে রুমীর চিরবিদায়, পীরের হঠকারিতা, শরীফ সাহেবের মৃত্যু—এমনি নীরবতার ভেতর দিয়ে, ছোট্ট পরোক্ষ ইশারায় তুলে ধরা হয়েছে বলেই তা স্মৃতি থেকে হারায় না। স্বামী-সন্তান একাত্তুরেই হারিয়েছিলেন তিনি। একমাত্র জীবিত সন্তান দেশান্তরিত। সামনে মৃত্যু। সব হারিয়ে তাঁর জীবনাগ্রহ সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। একাত্তুরে তাঁর মতো সারা জাতির হারানো প্রিয় পরিজনদের অন্যায় হত্যার বিচারের দাবিকে এগিয়ে নেবার বিশ্রামহীন সংগ্রামে তিনি প্রদীপের মতো জ্বলতে শুরু করেন।

একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র হিশেবে পাকিস্তানের পতন ঘটে। কিন্তু জাতির হৃদয়ের ভেতরে যে পাকিস্তান বেঁচে ছিল, এরপর প্রয়োজন পড়ে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের। এই পাকিস্তানই আসল পাকিস্তান। তাই এই যুদ্ধ সর্বাত্মক। একাত্তুরের রাজাকার-আলবদরদের উত্তরাধিকার থেকে জন্ম-নেওয়া কট্টর বা কোমলপন্থী কোটি কোটি মানুষের এ এক বিশাল বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ বাস্তব। এই বাংলাদেশ আমাদের নিজেদের হৃদয়ে ও বাইরে। জাহানারা ইমাম এই যুদ্ধের অবিসংবাদী নায়িকা। এই নায়িকা পঞ্চাশের দশকের 'ঢাকার সুচিত্রা সেন' নন—কিংবা যাঁর মতো তিনি হতে চাইতেন সেই কিংবদন্তির নায়িকা সুচিত্রা সেনও নন—ঐ দুজনের চাইতেই তিনি বড়। জাহানারা ইমাম এই জাতির উদার নিরপেক্ষ প্রগতিশীলতার যাত্রার প্রথম ও প্রধান সাংস্কৃতিক নায়িকা।

সবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় কয়েক বছর আগে তাঁর বাড়িতে, তাঁর মুখের ক্যানসারের দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের পর। তখন তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় না। জিভ ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট অস্বাভাবিক, মুখ ক্লিষ্ট, কথা জড়ানো। বুকের ভেতর একটা মূক কষ্ট টের পেলাম। তাঁর বিগত দিনের সেই অম্লান মুখশ্রী আমার চোখের চারপাশে হাজারো উজ্জ্বল ছবির মতো ঘুরে বেড়াত লাগল—সেই নিষ্কৃতিহীন ছবির শোভাযাত্রা থামানো যায় না। আহা, এই সেই ঢাকা শহরের এককালের সুচিত্রা সেন, পঞ্চাশ দশকের আমাদের দেখা তিলোত্তমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা-দুই কথা হল। দেখা হতেই বললেন, 'দেখেছেন কেমন মা-কালী হয়ে গেছি।' সহজ সাবলীলভাবে বললেন তিনি। হ্যাঁ, সত্যিই মা-কালী। জিভ ঝুলে থাকা মা-কালী। ছেলেবেলা থেকেই আমি স্নায়বিকভাবে দুর্বল। জীবনের পতনকে আমি সহ্য করতে পারি না। বার্ধক্য থেকে পালিয়ে তাই আমি চির-তারুণ্যের সহচর হয়ে থাকতে চাই। অতৃপ্ত হাতে কেবল জরা-মৃত্যু-নির্লিপ্ত জীবনকে খুঁজি। জীবনের দুই বিপরীত মেরুকে পাশাপাশি দেখার শক্তি আমার নেই। পরিণত মানসিকতার চূড়াকে স্পর্শ করা তাই আমার হল না। মৃত্যু দেখলে এক অশুভ আতঙ্ক আমার স্নায়ুতন্ত্রীকে অধিকার করে। অন্ধকার দেখলে আমি ভয় পাই। সারা পৃথিবীতে তাই আমি কেবল দেখতে চাই আলো, সকালবেলার কচি নরম উজ্জ্বল একচ্ছত্র আলো।

জাহানারা ইমামকে দেখার মুহূর্ত থেকে আমি ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করি। বারে বারে আমার সামনের সেই মুখটাকে ভুলে থাকতে চাই। তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচার কথা মনে হতে থাকে। কেন দেখতে হল আমাকে এ দৃশ্য? কেন এতদিন বেঁচে থাকতে হল এর জন্য? এ দৃশ্য অন্যায়, অসহ্য, নির্বিবেক। মানুষের মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর! এই কি মানবজন্মের নিয়তি? কেন এমন হয়? বীণাপাণিকে কেন একদিন এভাবে ঝুলন্ত-জিহ্বা মা-কালী হয়ে যেতে হয়?

অথচ কত সহজভাবে জাহানারা ইমাম জানালেন কথাটা! যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি আমাকে রাস্তা থেকে বাসায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন, ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দভাবে। যেন তাঁর নয়, অন্য কারো জীবনে ঘটেছে ঘটনাটা। যেন তাঁর অব্যাহত সুখের পৃথিবীতে কিছুই ঘটে নি কোথাও, ঘটে থাকলেও যা-কিছু ঘটেছে সব তাঁর পরিচিত প্রত্যাশিত। এই নির্লিপ্ত পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল জীবন আমার ভেতরে কোথায়?

কিন্তু বীণাপাণিকে কেন একদিন এভাবে রক্ত-জিহ্বা কালী হয়ে যেতে হয়? 'বাণীরূপেণ সংস্থিতা'কে 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'? প্রত্যেক জাতির জীবনে একেকটা সময় আসে যখন তার বুদ্ধি বিবেক প্রজ্ঞা ধর্ম সব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্রেরা অশুভের দর্পিত আস্ফালনকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তখন বীণাপাণিকে পদ্মাসন থেকে নেমে খড়্গধারিণী রণরঙ্গিনী মূর্তি হতে হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবেই তা তিনি হয়েছিলেন। আমরা তরুণ বয়সে তাঁর বীণাপাণি রূপ দেখেছিলাম, পরিণত বয়সে তাঁর ভেতরকার বিবৃত রণরঙ্গিনী চণ্ডীকে।

৪

প্রথমদিন তাঁর সঙ্গে আমার যে-তর্কের সূত্রপাত হয়েছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার সামনাসামনি যত দেখা হয়েছে, টেলিফোনে কথা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। কথা শুরু হতে-না-হতেই আমাদের বিরোধ বেধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত—তারপর সেই উষ্ণ তীব্র আনন্দ-মধুর বিতর্ক নিরন্তরভাবে এগিয়ে চলত। ঝগড়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেই আমরা কেবল প্রসঙ্গে ছেদ টানার কথা ভাবতাম। ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি আমি চিরকালই শ্রদ্ধাশীল। যে আমার থেকে আলাদা ভাষায় কথা বলে, সে আমার বন্ধুর অধিক বন্ধু। তাঁর উক্তি আমাকে আলোকিত করে। আমার চেতনায় নতুন রঙ ধরায়। আমার অসম্পূর্ণ অস্তিত্বকে অল্প হলেও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। নানান জাতের গাছ যেমন একটা উদ্যানকে সম্পন্নতা দেয়, নানারকম মতবাদ তেমনি মানুষের চেতনাজগৎকে সমৃদ্ধ করে। এ মতবাদ সংখ্যায় যত বাড়বে তত ভালো। এজন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ঘোষণাপত্রে আমরা বারবার জানিয়েছি : আমাদের শক্তিমান মত-পার্থক্যই আমাদের শক্তি।

জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমার যে অন্তহীন তার্কিকতা চলত তার কারণ এ নয় যে সিদ্ধান্তের জায়গায় আমরা খুব একটা আলাদা ছিলাম। অনেক সময় দেখা যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দুজনে ভিন্ন ভাষায় হয়তো একই বিষয়কে বলে চলেছি। আমাদের ভেতর যা আলাদা ছিল তা তাকাবার ভঙ্গি। তিনি আশাবাদীর চোখে পৃথিবীকে দেখতেন, আমি বিষণ্ন দৃষ্টিতে। এই বিষণ্নতাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর কাছে এ ছিল জীবনবিমুখতারই প্রতীক।

একদিন তর্কের সময় তিনি আশাবাদ-নৈরাশ্যবাদের সেই ধ্রুপদী গল্পটা তুলেছিলেন। বলেছিলেন : ধরুন একটা গ্লাসের অর্ধেকটা পানিতে ভরা। আশাবাদী কী বলবেন? বলবেন, আধগ্লাস পানি আছে। নিরাশাবাদী বলবেন, আধগ্লাস পানি নেই। সত্য কোন্‌টা? কোন্‌টা বড়? আমি বলেছিলাম : সত্য হিশেবে বড় দুটোই। কিন্তু সত্য দেখলে এখানে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে ঐ দুই সত্যদ্রষ্টাকে। যে বলবে আধগ্লাস পানি আছে, সে, আমার মতে, স্বপ্নহীন পাথুরে মানুষ। সে যতটুকু পেয়েছে, ততটুকুকেই সে কেবল চিনতে পেরেছে। তাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি যায় না। কিন্তু নৈরাশ্যবাদী এদিক থেকে আশাবাদীর অধিক আশাবাদী। আধগ্লাস পানি নেই সে বলছে কেন? বলছে এজন্যে যে তার স্বপ্নে সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল পুরো গ্লাস পানি, তাই আধগ্লাস পেয়ে সে আশাহত। এই মানুষ কল্পনাপরায়ণ, স্বপ্নচারী এবং অতৃপ্ত। তাঁর আত্মার ক্রন্দন গ্লাসের ঐ বাকি অর্ধেককে পূর্ণ করে তোলার আর্তিতে। এই নৈরাশ্য একটা বলিষ্ঠ ইতিবাচক ব্যাপার। একে ভেঙেপড়া ভাবলে ভুল হবে। জীবনকে আমরা ভালোবাসি বলেই আমাদের ভেতর মৃত্যুবিষণ্নতা জাগে। এই বেদনাকে কি আমরা জীবনবিমুখতা বলতে পারি? নাকি এ জীবনের চেয়ে বড় জীবনের জন্য এক শক্তিমন্ত আকুতি? বিষণ্নতা, মানসিক ভারসাম্যের প্রয়োজনেই, আমাদের পরিপূর্ণ জীবন উপভোগের দিকে তাড়িয়ে নেয়। আমার ধারণা, বিষণ্নতা এবং বিষণ্নতা-রোগকে একাকার করে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

সেই বিতর্কের পর্ব চিরদিনের মত শেষ হয়েছে। ঐ প্রদীপ আর জ্বলবে না।

আমার বাসা উত্তরায়, বিমানবন্দরের ওপারে। তাঁর মৃত্যুর দিনকয়েক পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাগজে দেখলাম জাহানারা ইমামের মরদেহ আমেরিকা থেকে ঐদিনই বিকেল চারটায় ঢাকা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবে। আমার যাবার আগ্রহ ছিল, শক্তি ছিল না। আগেই বলেছি মৃত্যুকে আমি সহ্য করতে পারি না। মৃতের মুখ দেখলে জীবনকে আমার অর্থহীন মনে হয়। আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও আমি এড়িয়ে চলি। যে মানুষ একদিন আমাদের ভেতর নিশ্বাস নিয়েছে, সুখে-দুঃখে দোসর হয়ে বেঁচেছে, প্রাণবন্ত হুল্লোড়ে আসর মাতিয়েছে, সে মানুষটা শক্ত নীরক্ত হয়ে শুয়ে আছে—এই দৃশ্যে আমার কী প্রয়োজন? যদি তাঁর মৃত্যু হয়েই থাকে, সে থাক আমার কাছে খবরের কাগজের হারিয়ে-যাওয়া দশটা ভেদাভেদহীন নির্বিকার তথ্যের মতো। আমার স্মৃতিতে সে বেঁচে থাক চির তারুণ্যময় উজ্জ্বল এক পৃথিবীর অম্লান বাসিন্দা হয়ে। তাঁর মৃত্যু দিয়ে আমি কী করব? এই মৃত্যু-চিহ্নিত পৃথিবীতে শেষপর্যন্ত যে কথাটুকু সত্য, তার নাম তো জীবন।

জাহানারা ইমামের মরদেহ আসার সময়টা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বিকেলে কাজ পড়ায় শহরের উদ্দেশে বেবিট্যাক্সিতে করে রওনা হয়েছি, বিমানবন্দরের সামনে অজস্র মানুষের সুবিপুল শোভাযাত্রার সামনে পড়তে হল—জাহানারা ইমামের কফিন ট্রাকে করে এলিফ্যান্ট রোডের সেই বাড়িটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শোভাযাত্রায় অনেক পরিচিত বন্ধুদের মুখ দেখলাম। আমার বেবিট্যাক্সি জনতার একপাশ দিয়ে কোনোমতে জায়গা করে এগিয়ে চলেছে। মিছিলের সামনের দিকে জাহানারা ইমামের লাশবাহী ট্রাক। ট্রাকের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর কফিনটা চোখে পড়ল—কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা—ওপরে অজস্র ফুল আর ফুলের তোড়া। কফিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে শেষ বিদায় জানালাম। কেবলি মনে হতে লাগল সেই উজ্জ্বল দুই চোখ, প্রতিভা আর দুর্বার জীবনবাদিতা কফিনের ভেতর এখন কী নির্বিকার, প্রত্যুত্তরহীন।

একটা ভারী কষ্ট গলা অব্দি উঠে এসে বুক চেপে বসে রইল। আমার চোখ ছাপিয়ে পানি টলমল করে উঠল, কিন্তু মাটিতে পড়ল না। আমরা এখন আর কাঁদি না। বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি, যে দুঃখের অশ্রু একবার মাটিতে ঝরে, সে দুঃখকে মানুষ হারিয়ে ফেলে।

১৬/৭/৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদায়, অবন্তী!

১

গ্রামের মেঠো রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটা টগবগে মিছিল—ঘামে জ্যাবজেবে গেঁয়ো মানুষের একটা বিরাট শোভাযাত্রা। মিছিলে অধিকাংশের পরনে লুঙ্গি—গা খালি, ঘাড়ের উপর গামছা, কদাচিৎ দুয়েকজনের গায়ে গেঞ্জি। দুয়েকজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা আধা-ভদ্র বা ভদ্রচেহারার মানুষও রয়েছে মিছিলটায়।

এটাকে মিছিল না বলে উদ্দীপ্ত গ্রামীণ মানুষদের একটা বিরাট অরাজক ধাবমান দলই বলা যায়। লোকগুলোর অধিকাংশই গ্রামের গৃহস্থ বা ক্ষেতচাষী—যাদের শরীরের কটু গন্ধ, রোদে পোড়া তামাটে রঙ এবং অমার্জিত কর্কশ হাত-পাগুলো বলে দেয় যে সুদূরকাল থেকে পুরুষানুক্রমিকভাবে এরা উদ্ভূত হয়ে এসেছে এই গ্রামবাংলার মাটির ভেতর থেকে, এর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে এবং এর ভেতর দিয়েই টিকিয়ে রেখেছে নিজেদের প্রবহমান নৃতাত্ত্বিক ধারা।

মিছিলটা এগিয়ে চলছে উদ্দীপ্তভাবে। মানুষগুলোর চোখে স্বপ্ন, শিরায় শোণিতে উন্মাদনা—যেন এক সম্ভাব্য যুদ্ধ এবং তার নিশ্চিত বিজয়ের উদ্দীপনায় জেগে আছে সকলে। মিছিলের একেবারে সামনের দিকে কয়েকজন ভদ্রচেহারার প্রৌঢ় এবং যুবক। যুবকদের মধ্যে যে রয়েছে সবার সামনে, তার চেহারা শপথে ও প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত এবং অনন্য-সাধারণ—সবার মধ্যে থেকে তাকে সহজেই আলাদা করে চোখে পড়ে। যুবকটির হাতে একটা দোনলা বন্দুক, চলার ভঙ্গিতে সেনাপতিসুলভ নির্ভীকতার সুস্পষ্ট আভাস।

ধাবমান দলটির ভেতর থেকে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছে : 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান,' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। তাদের সেই মিলিত কণ্ঠের বলীয়ান আওয়াজ গ্রাম মাঠ প্রান্তরের ওপর দিয়ে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনেক পথ ঘুরে মিছিলটা এসে পৌঁছল একটা নদীর ধারে—তার তীরে হাটের মাঝখানে প্রাচীন বিশাল বটগাছটার তলায়। হাট লোকে লোকারণ্য। মিছিল এসে পড়ায় চারপাশ থেকে আরো অসংখ্য মানুষ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে মিছিলটাকে যেন আরো প্রাণোচ্ছল আর উদ্দাম করে তুলল। মিছিলের গগনভেদী স্লোগান মুহুর্মুহু ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল হাটের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। উদ্দীপনার চরম মুহূর্তে মিছিলের সামনের সেই দৃপ্ত যুবক তার দোনলা বন্দুক আকাশের দিকে তাক করে পরপর দুটো গুলি ছুড়ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সশব্দে। উদ্দাম জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল হাটের বিপুল জনসমুদ্র—যেন গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু নিপাত করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল পাকিস্তান।

সময়টা সম্ভবত ১৯৪৬ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাস। ঘটনাস্থল—টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া। প্রতিভাদীপ্ত বন্দুকধারী যুবকটি এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক ইব্রাহীম খাঁর বড় ছেলে—আমরা তাঁকে তুলাভাই বলে ডাকতাম। তিনি তখন আলিগড়ের ছাত্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে যেসব উদ্দীপ্ত মুসলমান তরুণ তখন আলিগড় থেকে সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি তাঁদের একজন। এর আগেই করটিয়ার জমিদারের সঙ্গে বেশকিছু সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান মুসলমান শিক্ষাবিদ একত্রিত হয়ে নেমে পড়েছেন করটিয়া কলেজকে 'বাংলার আলিগড়' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে—আধুনিক ধ্যানধারণায় প্রাণিত প্রগতিশীল মুসলমানদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিশেবে এর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা তখন করটিয়ায় পড়তে আসছে। এই করটিয়াকে কেন্দ্র করে সে সময় কলেজের শিক্ষক আর তরুণ মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের যে উদ্দীপনা জেগেছে, তুলাভাই তখন তার অন্যতম প্রেরণা।

এতক্ষণ যে মিছিলের দৃশ্যটি আমি বর্ণনা করছিলাম, সেটি আমার জীবনের রাজনৈতিক ঘটনার প্রথম স্মৃতি।

তখন সারা পূর্ববাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দীপনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সুদূর গ্রামবাংলার মেঠো পথেও সেই একই উদ্দীপনার জোয়ার। বাংলার গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে গ্রাম সবখানেই তখন পাকিস্তান আন্দোলনের একই উত্তাল ঢেউ। আমরা তখন করটিয়ায় থাকি। আমার আব্বা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। আমার বয়স ছয় কি সাত। সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনের সংগ্রাম কীভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে নিঃশব্দে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল সেই ইতিহাস আমার মতো একটা ছোট্ট শিশুর জানার কথা নয়—মিছিলের ঐ ছোট্ট উদ্দীপিত দৃশ্যটিই আজ আমার একমাত্র স্মৃতির সম্বল।

আমি সব সময়ই বয়সের তুলনায় কিছুটা অপরিণত। আমি লক্ষ্য করেছি আমার সমবয়সী বন্ধুরা বিশ বছর বয়সে যেসব জান্তব ও রোমশ বিষয় নিয়ে নির্বিকারে আলাপ করত, সেসব নিয়ে ভাবতে গেলে আমার চল্লিশ বৎসর বয়সেও কান লাল হয়ে উঠত। সেই সময় পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে সবখানে যে তোলপাড় চলছিল আমার মতন একজন ছ–সাত বছরের শিশুর মনে তা কমবেশি রেখাপাত করার কথা। সন্দেহ নেই যে আমার বয়সের অনেক ছেলেমেয়ের মনেই হয়তো সেসব অনেক ঘটনাই স্পষ্টভাবে এখনো জেগে আছে। কিন্তু আমার মনে ঐ একটিমাত্র দৃশ্য ছাড়া আর একটি স্মৃতিও বেঁচে নেই। আমার শৈশব ছিল দস্যিপনায় ভরা এবং দুরন্ত। সারাদিন অন্যের গাছ থেকে আম, ডাব, তেঁতুল চুরি করে খাওয়া, পুকুরে সাঁতরে বেড়ানো, পাখির বাসা থেকে ডিম চুরির পৈশাচিক মুহূর্তগুলোর আড়াল দিয়ে যুগের এইসব বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা কখন নিঃশব্দে যে পার হয়ে গেছে জানতে পারি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

এর পরের যে রাজনৈতিক ঘটনা আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেটা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের ছবি : পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ততদিনে আমার আব্বা করটিয়া থেকে জামালপুরে বদলি হয়ে অধ্যক্ষ হিশেবে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বাধীনতা দিবসের ছবিটি আজও জ্বলজ্বল করছে আমার চোখের সামনে। সারা শহর আনন্দে উদ্দীপনায় উদ্বেলিত, মুখরিত। আমার পরনে ততদিনে পাজামার উপর শেরোয়ানি চেপেছে, মাথায় জিন্নাহ্ ক্যাপ। অফুরন্ত উৎসাহে দল বেঁধে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা, যদিও কেন এই আনন্দ তা খুব স্পষ্টভাবে জানা নেই। কিন্তু মনে আছে আমার শরীরের প্রাণকোষে প্রাণকোষে একটা নতুন জাতির জন্মের আনন্দ আর স্বাধীনতার উন্মাদনা ঝলমল করেছিল।

কিছুক্ষণ আগে বয়সের তুলনায় আমার অপরিণতির কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেটা যে কতখানি হাস্যকর পর্যায়ের তা ঐ স্বাধীনতা দিবসের একটা ছোট্ট গল্প বলে বোঝানোর চেষ্টা করি।

ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশের সুরকি বিছানো লাল রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম, আমার সাথে ছিল জাভেদ। জাভেদের বয়স তখন সতেরো–আঠারো, ছেলেবেলায় আমাদের বাসায় সেই–যে কাজ করতে এসেছিল, তখনো সেই চাকরিতেই রয়েছে। হঠাৎ একখানে দেখলাম নদীর ভেতর জেলেরা মাছ ধরার জন্য সার বেঁধে যেসব খুঁটি পুঁতে রেখেছে পানির ওপর সেগুলোর জাগানো মাথা স্রোতের বেগে প্রচণ্ডভাবে এপাশ ওপাশ নড়ছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অবাক আর রহস্যময় মনে হল, আমি বুঝে উঠতে পারলাম না কী কারণে বাঁশের মাথাগুলো পানি থেকে মাথা জাগিয়ে এভাবে ক্রমাগতভাবে নড়ে যাচ্ছে। নিচে থেকে কে নাড়াচ্ছে তাদের? একসময় বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে পৌঁছে জাভেদকে জিজ্ঞেস করলাম : 'জাবেদ এগুলো কী?' আমার মনে হল জাভেদ রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দিল, 'ঘোড়ার ডিম'। এর আগে ঘোড়ার ডিম নামের রহস্যময় জিনিসটার কথা অনেকের মুখেই শুনেছি, কখনো দেখি নি। কাজেই ঐ জিনিশটা সম্বন্ধে আমার মনে এমনিতেই একটা কৌতূহল অনেকদিন থেকেই সক্রিয় ছিল। জাভেদের রহস্যময় হাসির ভেতর এমন কিছু ছিল, যা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকেই ঘোড়ার ডিম বলে বিশ্বাস করে ফেললাম। শুনে কে কতটুকু কৌতুকবোধ করবেন জানি না কিন্তু আমি সত্যিসত্যিই বলছি, বাঁশের খুঁটিগুলোর ঐ উদ্দাম রহস্যজনক নড়াচড়াকে আমি সেদিন থেকে ঘোড়ার ডিম বলে শুধু বিশ্বাস করেছিলাম তাই নয়, আমার এগারো–বারো বছর বয়স পর্যন্ত ওটাকে আমি ঘোড়ার ডিম বলেই জানতাম। এই ছিল আমার আট বছর বয়সের মানসিক পরিণতির নমুনা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এই উপমহাদেশের হিন্দু–মুসলমানদের জন্য এক বিরাট আনন্দ ও দুঃখের ব্যাপার হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তানের মুসলমান আর ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুরা স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসবে ফেটে পড়ল। কিন্তু একই রকম নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে তলিয়ে গেল পাকিস্তানের হিন্দু ও ভারতের মুসলমানদের জীবন। এখনও ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় আমরা পাকিস্তানের মুসলমানরা সেদিন যখন স্বাধীনতা উদযাপনের উৎসবে জয়োল্লাসে মত্ত ছিলাম ঠিক সেই সময়ে আমাদেরই পাড়ায় প্রতিবেশী হিন্দুবাড়ির হাট করে দেয়া দরজার আড়ালে মূহ্যমান একদল অসহায় বিমর্ষ মানুষ বাক্যহীন হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় নেতিয়ে গিয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল ভারতের প্রায় প্রতিটি ব্যথিত নির্বাক মুসলমান পরিবারের মানুষদের জীবনে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম' বইয়ে লিখেছেন : 'ভারতের স্বাধীনতার পর তিনি খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে টের পেয়েছিলেন যে ভারতের প্রায় অধিকাংশ মুসলমানই সে-সময় এমন একটি অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন যে, ভারতের ছোট বা বড় যেসব অঞ্চল মুসলমান-প্রধান সেগুলো পাকিস্তানের আওতাভুক্ত হবে, আর হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো ভারতের ।' আমার ধারণা ভারতবর্ষের হিন্দুরাও এ ধরনের একটা অদ্ভুত ভাবনায় ভুগত। (সাম্প্রতিককালের 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্যে অতীতের সেই ধারণাটিরই সম্প্রসারণ চলছে কি?)

আমার মনে হয়, বঙ্গদেশ মুসলমান-প্রধান এলাকা বলে কলকাতার মুসলমানদের অনেকে ভেবেছিল যে, বঙ্গদেশ সঙ্গতভাবেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কলকাতা হবে তার রাজধানী। কলকাতার মুসলমান-প্রধান পার্ক সার্কাসের মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা ছিল প্রবল। পার্ক সার্কাসকে তারা কলকাতার পাকিস্তান বলে মনে করত। এখানকার প্রায় প্রত্যেক বাড়ির বাসিন্দারাই এই সময় পাকিস্তানের পতাকা তৈরি করে রেখেছিলেন হয়তো এই ভেবে যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঐ পতাকা নিজ নিজ বাড়ির ওপর ওড়াতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের এই স্বপ্ন সফল হয় নি।

আমার জন্ম এই পার্ক সার্কাস এলাকাতে, আমার নানার বাড়িতে। ১৯৪৮ সালে নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আমি সেখানে পাকিস্তানের বিষণ্ন অবহেলিত পতাকাকে লাঠিতে জড়ানো অবস্থায় ঘরের এককোণে পড়ে থাকতে দেখেছি। সেইসঙ্গে দেখেছি বাড়ির বাসিন্দাদের লুকিয়ে লুকিয়ে তখনও কলের গানে আব্বাসউদ্দিনের সুরেলা কণ্ঠের উদ্দীপ্ত সেই গান শোনার আকুতি :

সকল দেশের চেয়ে পেয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন্ স্থান।
পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান।
পাকিস্তানে রোজ বিহানে আজান দেয় বুলবুল
হিম শিশিরে অজু করে নামাজ পড়ে সব ফুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়াতে আজ জুলমত ভারি নাই কো ইজ্জত নাই ঈমান
কে শোনাবে প্রেমের বাণী করবে কে মুশকিল আসান
এক কথায় তার সাফ জবাব দাও !—পাকিস্তান সে পাকিস্তান।

জানি না ঐ বাড়ির কোন কোনো বাসিন্দার মনে তখনো এমন অলীক দুরাশা কাজ করছিল কিনা যে হয়তো কোনো অসম্ভব সুদূর ভবিষ্যতে কলকাতা আবার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সেদিন এই লুকানো পতাকা আবার কলকাতার সুনীল আকাশে মুসলমানদের আশার প্রতীক হয়ে সগর্বে উত্তোলিত হবে। ভারতের মুসলমান এবং পাকিস্তানের হিন্দুদের এইসব অলীক দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছিল।

৩

আমার ধারণা, আমার আগের প্রজন্মের বাঙালি মুসলমানেরা প্রায় সবাই কমবেশি সাম্প্রদায়িক ছিল। অবশ্য কথাটাকে সরাসরি এভাবে না বলে 'তাঁরা ধীরে ধীরে একসময় সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল' এভাবে বললেই হয়তো তা সত্যের আরও কাছাকাছি হয়। বিশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব মুসলমান মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের যুগ। এই আত্মবিকাশের সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। এতকাল হিন্দুদের কাছ থেকে তারা যে মমতা ও উদারতা পেয়ে আসছিল তাতে কিছু ঘাটতি তারা লক্ষ্য করে। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, হিন্দুদের ব্যাপারে তাঁদেরও মনের গভীরে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান এবং বেদনাবোধ কাজ করত। হিন্দুদের কাছ থেকে তাঁরা যে অনুদারতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ এই সময় পেয়েছিল তা তাঁদের অনেকেরই হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। 'বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক মুসলমান' সেকালে প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। হিন্দুদের প্রতি অনাস্থা, অবিশ্বাস, ক্ষোভ, আক্রোশ, সহিংসতা, উন্মত্ততা বা নৈরাশ্য একেকজন মুসলমানের মধ্যে এক এক মাত্রায় কাজ করত। হিন্দুদের ব্যাপারে তাঁদের ভেতরে একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল। মুসলমানদের বাঁচতে হলে হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়েই যে টিকে থাকতে হবে সে-সময়কার মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাটা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধতাকে তাঁরা মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার একটা আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করত।

কিন্তু হিন্দু-বিদ্বেষের মতন এমন একটা দরকারি ব্যাপারকে আমাদের প্রজন্মের মূঢ় যুবকেরা যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না সেজন্যে তাঁরা আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ছিল। আমাদের আগের প্রজন্মের অনেককেই দুঃখের সঙ্গে বহুবার একই বিলাপ করতে শুনেছি : "হিন্দুদের আসল চেহারা তো দেখ নি, দেখলে বুঝতে কী চিজ এরা। তোমাদের কী? পাকিস্তান পেতে তো কষ্ট হয় নি বাবারা! চালাও, যত পার ফূর্তি চালিয়ে যাও এখন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ধারণা, পরিবারের ছোট্ট, তুচ্ছ কোন্দল-কলহ থেকে শুরু করে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিরাট বিরাট বিরোধের পেছনে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার অবদান যতখানি, মানুষের নির্বুদ্ধিতার অবদান তার চেয়ে কম নয়। শাদামাটা বুদ্ধির মানুষ খুব তাড়াতাড়ি সরলীকরণে পৌঁছে যায়। যেমন একজন মুসলমান খারাপ, দুজন মুসলমান খারাপ—ব্যস এর পরে আর কোনো অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ নেই; কোনো তত্ত্বতালাশের মাথাব্যথা নেই—সোজা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল : 'সব মুসলমান খারাপ।' সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে দুইয়ের পরে তিন বলে যে একটা সংখ্যা আছে, তিনের পরে চার—"সব মুসলমান" কথাটার আগে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমানের সুবিপুল পৃথিবী রয়ে গেছে—তাদের প্রত্যেকের ভালো-মন্দত্বের যে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের দরকার রয়ে গেছে—তার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্য, সময় বা মেধার ক্ষমতা নেই এই ভেদাভেদরহিত মানুষগুলোর। ঠিক একইভাবে একটা হিন্দু খারাপ, দুটো হিন্দু খারাপ থেকে এক লাফে 'সব হিন্দু খারাপ' সিদ্ধান্তটি একমুহূর্তেই এসে পড়ে। এমনিই ঘটে থাকে সবসময়। পৃথিবীর অনেক নির্বোধ ঘটনার মতোই সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটাও এমনি এক ধরনের নির্দোষ ও ঝটিতি সরলীকরণের ফল। এই সাধারণীকরণ যে সবসময় নিরেট বুদ্ধির বোকা মানুষের নির্বুদ্ধিতারই অবদান তা নয়, অনেক সময় অনেক আলোকিত মানুষও আবেগোন্মত্ত পর্যায়ে এই সহজ সরলীকরণের শিকার হয়ে পড়।

প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে তিক্ততা ও আক্রোশ জমে উঠেছিল সেই সহিংসতাই ঝকঝকে তলোয়ারের মতো ঝলসে উঠে ১৯৪৭ সালে এক কোপে ভারতের মানচিত্রকে দুটুকরো করে দেয়। ভারত বিভাগের মাত্র পনেরো বছর আগেও ব্যাপারটা প্রায় সবার কাছেই অকল্পনীয় ছিল। বড় মাপের মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ—কি হিন্দু কি মুসলমান—তখনও অখণ্ড ভারতবর্ষেরই স্বপ্ন দেখত। হাজার হাজার বছর ধরে এই বিশাল ভূখণ্ড একটা অখণ্ড রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নিয়ে তখনও সবার সামনে দণ্ডায়মান। রাষ্ট্রীয় স্বপ্নের সেই বৈভবময় ভাবমূর্তিটি ভেতরে ভেতরে ঘুণে ধরে যে এতখানি ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল এবং এত সহজে এমন ঠুনকো একটা আঘাতে তা যে এভাবে খানখান হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে, ঘটনাটা ঘটার সামান্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত তা বহু মানুষ ভাবতেই পারে নি। ভারত-বিভক্তির প্রথম সারির প্রবক্তাদের মধ্যেও এমন মানুষ অল্পই ছিল ভারতের এই দ্বিখণ্ডিত চেহারা যাদের হৃদয়কে ব্যথা-ভারাক্রান্ত করে নি। তবু ঘটেছে ঘটনাটা। ভারত বিভক্ত হয়েছে। নিষ্ঠুর বাস্তবের অমোঘ নির্দেশেই হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভক্ত হবার ভেতর প্রতিক্রিয়াশীলতার বিজয় লক্ষ্য করে অনেকে সেদিন গভীর বেদনা অনুভব করেছিল ঠিকই, কিন্তু আমার বিশ্বাস দেশবিভাগই ছিল সেদিনকার ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রগতিশীল ঘটনা। সেদিনের সেই ধর্মোন্মত্ত সহিংস পরিস্থিতির এরচেয়ে আর কোনো উন্নত ও মানবিক সমাধান বের করা সম্ভব ছিল না সেদিন। ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগ না হলে হিন্দুদের বা মুসলমানদের স্বার্থ কতখানি লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হত সে আলোচনায় না গিয়েও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেদিন ভারত বিভাগ না হলে ভারতবর্ষের প্রতিটা হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলমানের, এবং প্রতিটা মুসলমানপ্রধান এলাকায় হিন্দুর রক্তের যে বীভৎস বন্যা বইত এযাবৎকালের মানবসভ্যতার ইতিহাসে তা হত ভ্রাতৃহননের ভয়াবহতম ঘটনা। আমার ধারণা, মুসলমান-প্রধান এলাকার প্রত্যেকটা হিন্দু এবং হিন্দু-প্রধান এলাকার প্রতিটা মুসলমান এই অভাবনীয় তাণ্ডবে এমন নারকীয়ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যে আজকের মতো ভারতীয় উপমহাদেশ সহাবস্থান-প্রত্যাশী দু'টা মিশ্র জাতি অধ্যুষিত এলাকা না হয়ে হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত দুটো নির্ভেজাল আলাদা অঞ্চলে পরিণত হত।

ভারতবিভাগ এই সাম্প্রদায়িক নিধনকে পুরোপুরি বন্ধ করতে পেরেছে এটা এককথায় বলা যাবে না। দেশবিভাগের পর ভারত এবং পাকিস্তানে ছোটবড় দাঙ্গাহাঙ্গামা বিরতিহীনভাবে ঘটেছে। পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা কম হওয়ায় এবং বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মৌলিক স্বার্থের সংঘাত কমে যাওয়ায় এই দুই দেশে দাঙ্গার তীব্রতা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু ভারতে তিনশ বছরের দাঙ্গার ঐতিহ্য আজো প্রায় একই ধারায় বহমান। এসব দাঙ্গায় নিহত সর্বস্বান্ত মানুষের সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু ভারতবিভাগ না হলে এই উপমহাদেশ যে অচিন্ত্য গণ-নিধন প্রত্যক্ষ করত সে-কথা ভাবলে বোঝা যায় দেশবিভাগের মাধ্যমে কত স্বল্পমূল্যে কত অভাবনীয় একটা সৌভাগ্য আমরা সেদিন কিনে নিয়েছিলাম। ভারত-বিভাগের পর ভারতের মতো পাকিস্তানেও সংখ্যালঘুরা এতদিনের পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল ভূমিকা থেকে ক্রমে সরে গিয়ে নিজেদের ভাগ্যহীনতার বেদনার ভেতর ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে যেতে শুরু করে এবং সাম্প্রদায়িক উগ্রতা, প্রকৃতির নিয়মেই, দুর্বল হয়ে এসে শান্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়।

৪

আমাদের আগের প্রজন্মের মুসলমানেরা ধীরে ধীরে কেন যে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিল তার কারণ আন্দাজ করা কঠিন নয়। ব্যাপারটা নিয়ে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে একবার আমার দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর পরের প্রজন্মের এবং আমি তাঁকে আমার আগের প্রজন্মের মানুষ হিশেবে ধরে নিয়েই কথা বলে চলেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আপনার প্রজন্মের মানুষেরা যে কমবেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন তার কারণ হিন্দুদের আপনারা দেখে এসেছিলেন এক পরাক্রান্ত ও অত্যাচারী প্রতিপক্ষ হিশেবে। হিন্দুদের হাতে আপনারা শোষিত, নিগৃহীত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দু জমিদার ও হিন্দু কায়েমী স্বার্থের নিষ্পেষণে সাধারণ মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও মানবিক মর্যাদাকে আপনারা ধুলায় অপমানে গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছেন। আপনাদের প্রজন্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠতি মুসলমানেরা হিন্দুদের দেখেছেন তাঁদের উন্নতির ও সমৃদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিশেবে। দেখেছেন : হিন্দুরা অজ্ঞাত কারণে আপনাদের গলা টিপে ধরতে চায়, আপনাদের শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে আপনাদের পক্ষে একসময় সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রজন্মের তরুণেরা 'সাম্প্রদায়িক' হতে যাবে কেন? আমাদের প্রজন্ম শুরু হতে-না-হতেই প্রেক্ষাপট পুরোপুরি পাল্টে গেছে। ভারত-বিভাগ উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থানকে একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমাদের সামনে যে হিন্দুকে আমরা দেখেছি সে হিন্দু কোনো অত্যাচারী শক্তিমান প্রতিপক্ষ নয়; হিন্দুদের আমরা দেখেছি মৃত্যুভয়ে পলায়নপর একদল নিঃস্ব নিরস্ত্র মানুষ হিশেবে—যাদের দিকে সহিংসতার পরিবর্তে মমতাস্নিগ্ধ সহানুভূতির চোখে তাকানোই মানুষ হিশেবে আমরা কর্তব্য মনে করছি। রক্তাক্ত সংঘর্ষকে আমরা ভ্রাতৃত্বের অশ্রুজলে রুপোলি করে তুলেছি। সাম্প্রদায়িকতা এখন বাংলাদেশ থেকে মোটামুটিভাবে 'নির্বাসিত'ই বলা যেতে পারে।

হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষের ব্যাপারে আমাদের প্রজন্মের উদাসীনতা আমাদের আগের প্রজন্মের মুসলমানদের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে এবং তাঁরা এতে একধরনের আশাভঙ্গের বেদনাই অনুভব করেছে। এবং এই নির্বুদ্ধিতার খেসারত হিশেবে আমাদের প্রজন্মকে অচিরেই যে হিন্দুদের দাসত্বের শেকলে আটকা পড়ে আবার তাদের গোলাম হয়ে যেতে হবে এই অভাবনীয় দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে পৃথিবী থেকে তাঁরা বিদায় নিয়েছে। উনিশ শ একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁদের এই উৎকণ্ঠা সবচেয়ে প্রকট রূপ নিয়েছিল।

প্রতিটি প্রজন্মের মানুষই, কোন্ অদ্ভুত কারণে জানি না, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ধরে নেয় যে তাঁদের পরের প্রজন্মের মানুষেরা শক্তির দিক থেকে তাদের চেয়ে দুর্বল ও অসহায়। যে বিরুদ্ধ-পৃথিবীর সঙ্গে নিষ্ঠুর সংগ্রাম করে তারা ধীরে ধীরে জীবনের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে, তারা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, তাঁদের পরের প্রজন্মের মধ্যে সংগ্রামের সেই দুর্দম শক্তি অনুপস্থিত। তাদের পরের প্রজন্মের মানুষেরাও যে নিজেদের যুগের বৈরী পরিবেশের সঙ্গে তাদের মতো একইরকম সহিংস সংগ্রাম চালিয়ে জীবনের অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে সমর্থ, ব্যাপারটাকে তাঁরা পুরোপুরি যেন বিশ্বাস করতে পারে না। প্রাণিজগতের ভেতর নিজস্ব প্রজাতি-রক্ষার ব্যাপারে যে একটা নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা রয়েছে হয়তো এটা তারই ফলশ্রুতি। (মানুষের পৃথিবীতে এরই নাম হয়তো 'বাৎসল্য')। যে অসহায় শিশুকে একদিন প্রতিমুহূর্তের নিরাপত্তা, পরিচর্যা ও যত্ন দিয়ে লালন করতে হয়েছে, তাকে হঠাৎ করেই একজন পরাক্রান্ত মানুষ হিশেবে বিশ্বাস করতে মানুষের অসুবিধা হয়। এজন্যেই প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষ, তাদের সাধ্যমতো সামর্থ ও শক্তি দিয়ে পরের প্রজন্মক্রমের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার কাজ করতে চায়। আমাদের আগের প্রজন্মও আমাদের দিকে তাঁদের মমতাস্নিগ্ধ উৎকণ্ঠার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং শিউরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছিলেন এই ভেবে যে আমাদেরই সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে তাঁদের বিপুল কষ্ট ও তিতিক্ষায় অর্জিত পাকিস্তান আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যেই হয়তো একদিন ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং পরিণতিতে আমাদের অপরিসীম দুর্দশার কারণ ঘটাবে। তাঁরা আমাদের কালের রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও সেই নতুন বাস্তবতার ভেতর থেকে জাগ্রত আমাদের প্রজন্মের অগ্রযাত্রার ক্ষুরধার প্রকৃতিটিকে বুঝতে ভুল করেছিলেন।

৫

ভারত-বিভাগের পর পরই আরম্ভ হল হিন্দুদের অবিশ্বাস্য সংখ্যায় দেশত্যাগ। প্রথমে এক-আধ বছর কিছুই বোঝা গেল না—মনে হল গোলমাল মিটে গিয়ে বৃষ্টিধোয়া আকাশের মতো স্নিগ্ধ হয়ে গেছে সবকিছু। পরম নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশতে লাগল আমাদের হিন্দুবন্ধুরা—এমনকি তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই। যেন ব্যথিত হবার মতো কোনো কিছু আদৌ কোথাও ঘটে নি। আপাতদৃষ্টে মনে হল এই ধরনের দেশবিভাগের কথা তারা যেন আগে থেকেই জানত এবং সহজভাবে তা মেনেও নিয়েছে। মাঝখানের দুই সম্প্রদায়ের মূঢ় এবং প্রগলভ কিছু মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে যে সাময়িক তিক্ততা এবং সহিংসতা নেমে এসেছিল কিছুদিনের জন্য, এক লহমায় তা কেটে গিয়ে যেন এক দুর্ভাবনাহীন শান্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পৃথিবী ফিরে এসেছে। যেসব হিন্দুরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল এতকাল, এমনকি কংগ্রেসের জঙ্গী সদস্য ছিল, তাঁরাও রাতারাতি কেমন যেন ভালোমানুষ হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারি নি, একটু বড় হয়ে বুঝেছিলাম, বাইরের এই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্ন চেহারা ছিল এই দেশের মানুষেরই একটা বিরাট অংশের নীরব মৃত্যুবরণের বেদনাময় চিত্র। সারাদেশে এই মৃত্যু ঘটেছিল প্রায় প্রতিটা পরিবারে, প্রতিটা চালের নিচে, প্রায় প্রতিটি হিন্দুর নিভে যাওয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখের পোড়ো ভিটেয়।

আমাদের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে। এলাকাটা মুসলমান-প্রধান, কিন্তু কাছাকাছি নমশূদ্র হিন্দুদের বিরাট বসতি। মোটামুটিভাবে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর, নড়াইল, পিরোজপুর, বাগেরহাট আর বরিশালের হিন্দু-মুসলমান বসতির বৈশিষ্ট্য অনেকটা এই জাতেরই। এসব অঞ্চলে মুসলমান এলাকার ফাঁকে-ফোকরে রয়েছে বিরাট বিরাট হিন্দুপ্রধান এলাকা। জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দু মুসলমানেরা অনেক জায়গায় সমান। বহুকাল ধরে এরা পাশাপাশি বাস করেছে, সুখে সম্প্রীতিতে থেকেছে, মাঝে মাঝে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরাট খুনখারাবি আর কাইজ্যায় মেতে উঠেছে। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামাঞ্চলে শোনা অজ্ঞাত কোনো লোককাহিনীর প্রথম দুটো লাইন এখনো মনে পড়ে :

ভাই সকল কুতূহলে করি নিবেদন
নমু মুসলমানের দাঙ্গা করিব বর্ণন
জিলা যশোহর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা যেভাবে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে কাপুরুষোচিত খুনখারাবি চালায়, এই কাইজ্যাগুলোর ধরন ছিল তা থেকে আলাদা। এগুলো ছিল একজাতের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ, প্রায় সমবলীয়ান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌরবের শক্তি পরীক্ষা। মর্যাদার মনোভঙ্গিই এর মধ্যে ছিল বড়। আগে থেকেই দিন তারিখ দিয়ে একটা ফাঁকা বড় জায়গা কাইজ্যার জন্যে নির্ধারিত হত—তারপর ঐদিন নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দু-মুসলমান ঢাল, শড়কি, বল্লম, কোঁচ, হ্যাজা নিয়ে নিজ নিজ দলে জড়ো হত :

ঢাকার নবাব দিলেন জবাব হাজার মুসলমান,
পদ্মানদী পার হইয়া ঘিরিল আসমান।

তারপর গগনবিদারী ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হত তারা। দুই পক্ষের বড় বড় লেঠেলদের বর্ণনা এরকম :

এল নিধিরাম যেমন নাম তেমন তাহার কাম
বন সজারুর মতন তাহার গায়ের সকল চাম।
এল ছদন মাল জুতির কাল বিঁধত না যার চামে
দুই দশ দিন লড়াই করে গা নাহি যার ঘামে।
এল বচন মিঞা কোরান লিয়া এসমে আজম পাড়ি
ফুঁক ছুঁড়িলে হাজার লেঠেল করত গড়াগড়ি।
এল করিম ঢালি বারুদগুলি চিবায় যেন মুড়ি...

[জসীমউদদীন]

রক্তের নাচনে পাশব হয়ে উঠত লড়াইয়ের মাঠ। বীরত্বের নেশায়, ধর্মীয় গৌরবের উন্মাদনায় জীবনকে অগ্রাহ্য করে মদোন্মত্ত হয়ে উঠত দুদলের রক্ত পাগল দামাল-লড়ুয়েরা।

মার মার মার হাঁকল রূপা—মার মার মার ঘুরায় লাঠি,
ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।
আজ যেন সে মৃত্যু-জনম ইহার অনেক উপরে উঠে,
জীবনের এক সত্য মহান লাঠির আগায় নিচ্ছে লুটে !
মরণ যেন মুখোমুখি নাচছে তাহার নাচার তালে,
মহাকালের বাজছে বিষাণ আজকে ধরায় প্রলয় কালে।

নাচে রূপা—নাচে রূপা—লোহুর গাঙে সিনান করি,
মরণরে সে ফেলছে ছুড়ে রক্তমাখা হস্তে ধরি।
নাচে রূপা—নাচে রূপা—মুখে তাহার অট্টহাসি,
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।
হাড়েগোড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন,
কী যেন সে দেখেছে আজ, রুধতে নারে তারি মাতন।

[নক্সীকাঁথার মাঠ : জসীমউদ্‌দীন]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাশ আর রক্তের বন্যায় ভেসে যেত কাইজ্যার মাঠ। লড়াইয়ের পর আর্ত মাতম উঠত অসংখ্য বাড়ির নিঃস্ব ছাউনির নিচে। রক্তের স্রোত আর অশ্রুর নিচে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যেত অনেক সম্পন্ন সংসারের প্রীতিমধুর সুখশান্তি। কাইজ্যার পর লালপাগড়ি পরা পুলিশের দৌরাত্ম্যে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ত হাজার হাজার মানুষ। এই ছিল এই অঞ্চলের বিখ্যাত নমু-মুসলমানের কাইজা। জসীমউদ্‌দীনের লেখার নানান জায়গায় এই মহাকাইজ্যার জীবন্তরূপ অমর হয়ে আছে।

৬

বাগেরহাট জেলার এক সুদূর গ্রামে আমাদের বাড়ি। সেনবাবুরা সেখানে ছিলেন একমাত্র হিন্দুঘর। একমাত্র—কিন্তু শিক্ষা, সচ্ছলতা এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে তাঁরা ছিলেন একাই একশ। চারপাশের বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রীতিমতো দাপটের সঙ্গেই তাঁরা টিকে ছিলেন। কোনোদিন তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস কখনো কারো হয় নি এবং হবে এটাও কেউ ভাবে নি। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হবার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে একসময় একটা বিশ্রী সম্পর্কই তৈরি হয়ে গেল। বাগেরহাট তখন বৃহত্তর খুলনার মধ্যে। খুলনা তখন অল্প পরিমাণে হলেও হিন্দুপ্রধান। সুতরাং খুলনার ভাগ্য যে ভারতের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এই আশঙ্কাতে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা আগে থেকেই চুপসে ছিল। তবু আন্দোলন উদ্দাম গতিতেই এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের মনে হয়তো এমন একটা অলীক দুরাশা সুদূর সম্ভাবনার মতোই কাজ করছিল যে হাজার হাজার মানুষের এইসব প্রমত্ত মিছিল ইতিহাসের আমোঘ গতিকে পাল্টে দিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে একদিন সফল করে তুলবে। দেশের কর্ণধারদের কলমের সামান্য খোঁচায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নসাধ একমুহূর্তে কোথায় যে উড়ে যেতে পারে, এইসব সাধারণ মানুষগুলোর সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না।

মুসলমানদের ওপর সেনবাড়ির মেজকর্তার ঝাঁজই যেন ছিল সবচেয়ে বেশি। বড়বাবু কলকাতায় থাকতেন বলে মেজবাবুর ওপরেই ছিল এই বিরাট পরিবারটার দায়িত্ব। শীর্ণ চেহারার বদমেজাজি এবং জেদি মানুষ ছিলেন তিনি। মুসলমানদের সঙ্গে এ পর্যন্ত যা-কিছু তিক্ততা এবং রেষারেষি সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে অনেকটা ছিলেন তিনিই। খুলনা যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে তা ততদিনে, অনেকের মতো তাঁর কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাশ্য হাটের মাঝখানে হাতের লাঠিটাকে মাটিতে জোরে জোরে ঠুকে বলতেন—'যা খুশি চালয়ে যাও মেয়ারা। ইন্ডিয়া হলে টের পাবানে ঠেলাখান।' হাটের মুসলমানেরা শুকনো আশঙ্কাতুর মুখে সবকিছু শুনে যেত। কথা বলত না কেউ। দুয়েকটা জোয়ান ছোকরা হঠাৎ কথা বলে উঠতে দাপিয়ে উঠলে অন্যেরা মুখে হাত চেপে থামিয়ে দিত। বলত : 'এখন নয়রে ভাডি, এখন নয়, সময় আলি সব বলিস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৭ সালে খুলনা যথারীতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ পড়ল পাকিস্তানে।

মেজকর্তা সেনবাড়ির বিরাট শিরীষগাছটার মাথায় একটা ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে রাস্তায় নেমে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন : 'কই রে ন্যাড়ারা, বাড়ির মদ্যি সেদিয়ে আছিস কেন এখন, বাইরি আয়, তোগো পাকিস্তান দেইখে যা।' কিন্তু কোনো ন্যাড়ারপোকে আর তাদের সাধের পাকিস্তান দেখার জন্য বাইরে আসতে দেখা গেল না। ঘরের ভেতর মুহ্যমান অবস্থায় শুয়ে তারা তখন তাদের রিক্ত অন্ধকার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় নিস্পৃহ হয়ে আছে। এর তিনদিন পর, ১৭ই আগস্ট, হঠাৎ অভাবিতভাবে খবর এল খুলনা পাকিস্তানে পড়ে গেছে, পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ ভারতে। দেশনেতাদের কলমের খেয়ালি খোঁচায় ঘটে গেছে এই অলৌকিক ব্যাপার।

খবর পৌঁছোতেই প্রতিটা গোলপাতায় ছাওয়া দাওয়ার নিচে গালে হাত দিয়ে বসে-থাকা হাজার হাজার মুহ্যমান মুসলমান অপ্রত্যাশিত আনন্দে চিৎকার করতে করতে চারদিক থেকে পাগলের মতো ছুটে এল দেপাড়ার হাটের চৌহদ্দিতে। চিৎকারে, উল্লাসে, আনন্দাশ্রুতে, আলিঙ্গনে, কোলাকুলিতে জায়গাটাকে মুখর করে রাখল সারাটা দিন। বিকালের দিকে উত্তাপ খানিকটা ধরে এলে রোল উঠল : 'চল্ যাই, সেনবাবুরে একবার দেখে আসি।' হাজার হাজার কণ্ঠ সোল্লাসে সমর্থন জানাল।

দেখতে দেখতে শ-কয়েক অল্পবয়সী ছোকরা ফূর্তির তোড়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সেনবাবুদের বাড়ির ভেতরে। দলের মধ্যথেকে একজন রসিক ছোকরা হেঁকে উঠল—'কই মেজকর্তা, ঘরে শুয়ে ক্যানো। আপনার ইন্ডিয়া দেখতি তো একবার বাইরি আসতি হয়। উল্লসিত জনতা হো হো করে হেসে বিদ্রূপটাকে সারা তল্লাটে ছড়িয়ে দিল। আমার ধারণা, এই তিনদিনে মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছিল তার গল্প এ থেকে আলাদা কিছু নয়।

এরপর মেজকর্তার ইতিহাস বড় করুণ। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটা দিনে দিনে ছোট হতে হতে প্রায় ছায়ার সঙ্গে মিশে গেলেন। হাটে বাজারে ক্বচিৎ-কদাচিৎ তাঁকে দেখা যেত। অধিকাংশ সময় তিনি থাকতেন লোকচক্ষুর বাইরে, ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে কী সব যেন ভাবতেন দিনরাত, হয়তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নিজের মনের মধ্যেই জল্পনাকল্পনা করে যেতেন তিনি। যে মর্যাদা নিয়ে তিনি চারপাশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মুসলমান চাষাভূষোদের সামনে মাথা উঁচু করে এতকাল দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও যে ভালো।

বছরখানেক পর একদিন সকালে হঠাৎ শোনা গেল তিনি সপরিবারে ভারতে চলে গেছেন। দেখতে দেখতে তিন-চার বছরের মধ্যে সেনবাড়ির প্রায় সব কজন শরিক নামমাত্র দামে জমিজমা পৈতৃক ভিটা বিক্রি করে কলকাতা বা অন্য কোথাও চলে গেল। এককালের বৈভবোজ্জ্বল তাদের পরিত্যক্ত বিমর্ষ বাড়িতে গুটিকয় মুসলমান গৃহস্থ পরিবার উঠে এসে শ্রীহীন আস্তানা গেড়ে বসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দু ও শিখদের যে দাঙ্গা পাকিয়ে ওঠে, ব্যাপকতায় ও প্রচণ্ডতায় তা এই উপমহাদেশের স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহতম। পাশব তাণ্ডবলীলা যে কী ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে জেগে উঠেছিল তার খানিকটা বিবরণ আছে কৃষণ চন্দরের 'গাদ্দার' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক বৈজনাথের নিজের চোখে দেখা দুএকটা টুকরো ছবির মধ্যে হতভাগ্য মানবতার সেই করুণ অশ্রু জমাট বেঁধে আছে :

১. আমার দুচোখ পানিতে ভরে গেল। মনে হল সমগ্র পাঞ্জাব একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির বেশে দাঁড়িয়ে আছে। একটি শ্বেতশ্মশ্রু কৃষাণ—যার সাদা দাড়িতে দুর্বৃত্তেরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জাব জ্বলছে—আর ঐ শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ অসহায় বেদনায় কাঁদছে...দুটি চোখ মুছে মাথা নেড়ে নেড়ে রুদ্ধ গলায় বলছে :

"গাড়ি এল গাড়ি এল
নাড়ুয়াল থেকে
বুড়োর দাড়িতে
দেখো আগুন লেগেছে।"

২ "হায়! কেমন করে বলব এ দেশ আমার নয়, যে দেশের মাটির প্রতিটি কণা আমার হৃদয়ে হীরার কুঁচির মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছে। কেমন করে বলব, এই আমার দেশ যেখানে আমার সমগ্র অনুভূতি অচেনা আগন্তুকের মতো। ইরাবতীর এপার-ওপারে তো কোনো পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি না। দুই তীরে শবের রাশি। মধ্যে নদীর নীল জলস্রোত বইছে যা হিন্দু-মুসলমান এই দুনিয়াতে আসবার বহু আগে থেকেই বইছিল।"

৩. "মৃত্যুপথযাত্রীর মুখ থেকে শেষ যে নাম উচ্চারিত হয়েছিল সে নাম ঈশ্বরের। হত্যাকারীদের মুখেও ছিল তাঁরই নাম।..."

৪. "কোথায় যাচ্ছ তোমরা শ্বেতপক্ষ রাজহংসের দল, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো কোনো অজ্ঞাত ঝিলের কিনারায়। মানুষের দুনিয়া থেকে বহুদূরে।

...আমাকে এখানে ফেলে যেও না বন্ধু। আজ মানুষের দুনিয়ায় বড় অন্ধকার। বড় অন্ধকার। বড় নীচতায় ভরা এই পৃথিবী।"

দাঙ্গার আরও একটা জীবন্ত বর্ণনা আছে ভীষ্মদেব সাহানীর 'তমস'-এ।

এই দাঙ্গার ভয়ংকর হিংস্রতা একসময় থিতিয়েও এল, আপাত স্বস্তি নেমে এল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে :

মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা শেখ নূর ইলাহী হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা লালা লক্ষ্মীনারায়ণকে জড়িয়ে ধরল, ঠাট্টা করল, কিন্তু স্বার্থ তাদের এক করলেও এই ক্ষতচিহ্ন এত সহজেই মুছে গেল কি?

ভয়াবহ দাঙ্গার জের হিশেবে পূর্ব-পাঞ্জাবের মুসলমান এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের দেশত্যাগের ব্যাপকতা হল অবিশ্বাস্য। হত্যাকারীদের বল্লম থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান দলবেঁধে একসাথে নিজেদের পিতৃ-পিতামহের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-বন্ধু, জন্মভূমি, ধর্ষিতা মা-বোন আর প্রিয়জনের লাশ ফেলে ভয়ার্ত পশুর মতো সীমান্তের অপর পারের দিকে ছুটে গেল।

এই সময়কার কোলকাতার দাঙ্গাও আদিমতার নগ্ন আত্মপ্রকাশে কম হৃদয়বিদারক ছিল না। দেশবিভাগের সমসময়ে বা পরপরই ঢাকায়, নোয়াখালিতে এবং পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের নানান বিক্ষিপ্ত জায়গায় দাঙ্গার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে যায়। প্রায় সব এলাকাতে দাঙ্গার চরিত্র ছিল একই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অরক্ষিত অসহায় নরনারীর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের লুটতরাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ আর ধর্ষণের বেদনাময় ইতিহাস।

উত্তর-ভারতের ভয়াবহ দাঙ্গার বর্ণনা ঐ এলাকার বেশকিছু প্রতিভাবান লেখকের শক্তিমান লেখনীর কারণে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশবিভাগ ও হৃদয়বিভাগের মর্মন্তুদ কাহিনী আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষার কোনো শক্তিমান সাহিত্যিক তাঁর রচনার উপজীব্য করেন নি। ফলে যুগ-যুগান্তের নৃতাত্ত্বিক ও অভিন্ন একটি জনগোষ্ঠীর বিভক্ত হয়ে যাবার বেদনাময় ইতিবৃত্ত নিঃশব্দেই বিস্মৃতির নিচে চাপা পড়ে গেল।

আগেই বলেছি, পাঞ্জাবের দাঙ্গা টর্নেডোর মতো আকস্মিক ঝাপটায় দুটো সম্প্রদায়কেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। স্তব্ধ, হতচকিত, দিশেহারা মানুষের আকস্মিক দেশত্যাগ তাই হয়েছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন ও সর্বাত্মক। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের দেশত্যাগ কিন্তু এমন দিশেহারা এবং বিভ্রান্ত ছিল না। এদের দেশত্যাগের ব্যাপারটা ঘটেছিল অনেক ধীরে ধীরে, অনেক বছর ধরে, বুঝে-শুনে পরিকল্পিতভাবে। হিন্দুদের দেশত্যাগের উন্মাদনা সবচেয়ে সক্রিয় ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে। এরপরে এই গতি ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে।

আমার আব্বা জামালপুর থেকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যান ১৯৪৮ সালে, আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই ১৯৫৫ সালে। কাজেই বলা যেতে পারে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রধান নাটকটি আমার চোখের সামনেই সংঘটিত হয় আমার স্কুলজীবনের সময়পরিসরে--আমার জীবনের সবচেয়ে স্বপ্ন-স্নিগ্ধ দিনগুলোয়।

৮

পাবনায় আসার আগে আমি যে দুই জায়গায় ছিলাম সে জায়গা দুটোতেই ছিল মুসলমান সংস্কৃতির প্রাধান্য। অনেক কিছুর কর্তৃত্বও ছিল মুসলমানদের হাতে। কিন্তু পাবনার মধ্যবিত্ত ছিল হিন্দুপ্রধান। আমাদের বাসা ছিল কলেজ কম্পাউন্ডের এক নির্জন প্রান্তে, শীর্ণ রুপোলি ইছামতীর গা ঘেঁষে। কলেজ-মাঠের দক্ষিণদিকে রাধানগরের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল—রাধানগর মজুমদার একাডেমি। কলেজ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্কুল ঘিরে-থাকা বেশ একটা বিরাট এলাকা জুড়ে রাধানগর গ্রাম।
রাধানগরের উত্তরদিকের একটা বড় এলাকা জুড়ে মজুমদারদের বিশাল দোতলা জমিদার বাড়ি—বাড়ির সামনে পুকুরের একটা ধার-বরাবর দেবদারুর রহস্যময় সবুজ অরণ্য। সারাটা পাড়া জুড়ে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের একের পর এক ছিমছাম পরিপাটি বাড়িঘর—এদের কেউবা উকিল, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ ছোট চাকুরে, কেউবা গ্রাম এলাকার বিস্তর জায়গা-সম্পত্তির মালিক। বিকেলের দিকে রোদ পড়ে এলে বাড়িগুলোকে শান্ত ছবির মতো দেখাত। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি করে ছোট্ট ফুলের বাগান। দৈনন্দিন পূজা-অর্চনায় ফুল দরকার হত বলে প্রায় প্রতিটা হিন্দুপরিবারেই কমবেশি ফুলগাছের চর্চা ছিল। ভোরে আর সন্ধ্যায় প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে হারমোনিয়মের মিষ্টি শব্দ ভেসে আসত। সব মিলে মোটামুটি মার্জিত প্রাণঢালা মনোরম পরিবেশ। যাঁরা নেহাতই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছিলেন তাদের ঘরবাড়িগুলোতেও পরিপাট্য ও পরিশীলনের একই ব্যতিক্রমহীন ছাপ পাওয়া যেত।

অদ্ভুত মানুষ ছিল এই মধ্যবিত্তেরা। একটা বড় জীবনের মূল্যবোধের স্বপ্ন ছিল এদের সামনে—সে স্বপ্নে এরা উজ্জীবিত ছিল। সবকিছুকে সহজ আর সুন্দর করে বেঁচে থাকতে শিখেছিল এরা। হয়তো বাড়িঘর নেহাতই আটপৌরে, কিন্তু সবকিছুর ভেতর এমন একটা অসামান্য শ্রী যে দেখে লোভ হত। বেড়ার বাড়ির সযত্নে নিকোনো পরিপাটি আঙিনা বা মেঝে দেখে লোভ জাগত, বিছানা-আলনা-আসবাবের ছোট্ট সাজানো পরিপাটি সংসারটুকু দেখে লোভ হত, এমনকি লোভ হত কপালে টিপ-পরা ঘরের টুকটুকে লক্ষ্মী বউটিকে দেখলেও। সরল অনাড়ম্বর আর পরিতৃপ্ত জীবনের আদর্শ প্রতিচ্ছবি ছিল এরা।

শিক্ষকতা উপলক্ষে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মূল্য' নামে একটা গল্প আমাকে ছাত্রদের পড়াতে হত। ইংরেজদের সৌন্দর্যবোধ এবং মূল্যবোধগুলো সমাজের কত নীচুস্তরের মানুষের চেতনা পর্যন্ত চারিয়ে গিয়েছিল এটা দেখানোই ছিল গল্পটার উদ্দেশ্য। সাধারণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের একটা মেয়ের মধ্যেও সংস্কৃতির আলো কীভাবে দীপ্তি ছড়াচ্ছে সেটা তুলে ধরে তিনি তাঁর বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন গল্পটাতে। নানান ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে ইউরোপের রেনেসাঁসের মতো বাংলাদেশে রেনেসাঁসের আলো এদেশের আপামর জনসাধারণের জীবনের নীচুতলা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি, মধ্যবিত্তের ছোট্ট গণ্ডির ভেতরেই সীমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেশের মানুষের ছোট্ট একটা অংশের চিত্তকে এই রেনেসাঁস যেভাবে আলোকিত ও পরিশীলিত করে তুলেছিল তা সত্যি সত্যি অপূর্ব। সংখ্যায় অল্প হলেও এই রেনেসাঁসের স্বপ্ন ও জীবনসাধনার ভেতর থেকে এই জাতির মধ্যে এমন কিছু শুদ্ধচিত্তসম্পন্ন, উচ্চায়ত মানুষের উত্থান ঘটেছিল, পৃথিবীর প্রধান সভ্যতাগুলোর রাজপথেই কেবল যাদের সমকক্ষ মানুষদের খোঁজ মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতিবান ও আলোকিত এই হিন্দু-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আমি দেখেছিলাম আমার কৈশোরে। তাঁদের সেই দীপান্বিত স্মৃতি আজও আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই হিন্দু-মধ্যবিত্তের জন্ম একদিনে হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সূচিত হয়ে যে রেনেসাঁসের আলো বাঙালির একটা অংশের চিত্তকে সম্পন্ন বর্ণচ্ছটায় আলোকিত করেছিল এই মধ্যবিত্তেরা ছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী। আমার কৈশোরে দেখা হিন্দু-মধ্যবিত্তের মধ্যে মহান বাঙালিত্বের সেই সর্বশেষ বর্ণচ্ছটাকে আমি বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সত্যি সত্যিই একটা সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত হিন্দুসম্প্রদায়কে দেখেছিলাম আমি এই সময়ে। আদর্শবান, সৌন্দর্যপ্রিয়, মূল্যবোধসম্পন্ন, জ্ঞানপিপাসু, পরিশীলিত ও সপ্রতিভ একটা সম্প্রদায়। বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে যখন উপেক্ষিত মুসলমানেরা বৃটিশদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের অভিমানী বিবরের ভেতর তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে এই হিন্দু-মধ্যবিত্তদেরই একটা অংশ বৃটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে, বৃটিশ-প্রভুদের সামনে নতজানু হয়ে এদেশে তাদের টিকে থাকার সুবিধা করে দিয়েছে। অথচ আবার এদেরই অন্যকিছু মানুষ সেকালের ইউরোপের রেনেসাঁসের মহান চেতনাকে আত্মস্থ করেছে, স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, দেশপ্রেমের গান গেয়েছে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, সহিংস সংগ্রাম করেছে। বৃটিশদের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবোধ দিয়েই তাঁরা বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করেছে। বৃটিশদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তাঁরা প্রকৃতির নিয়মেই জেনে গিয়েছিলেন যে এমন চতুর, প্রবল ও জ্ঞানবান শত্রুকে এদেশ ছাড়তে বাধ্য করা কেবল অস্ত্রের শক্তি দিয়ে সম্ভব হবে না—শারীরিক শক্তির পাশাপাশি জ্ঞানের শক্তিও তাদের বাড়াতে হবে। এজন্যে সারাদেশের পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা স্বাস্থ্যচর্চা সংঘের (আখড়ার) পাশাপাশি অসংখ্য পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। আমার সারাটা স্কুলজীবনের পরিসর জুড়ে, অকর্ষিত পাকিস্তানি মনোভাবের কঠোর বিরোধিতার মুখে এক গভীর বেদনার ভেতর আমি আমার শহরের প্রতিটা পাড়ার লাইব্রেরি আর আখড়াগুলোকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে দেখেছি।

৯

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমার এক আত্মীয়াকে তার প্রবল অমতে এক ডাক্তার ভদ্রলোকের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। রুচির দিক থেকে ডাক্তার ভদ্রলোকটি ছিলেন আমার ঐ আত্মীয়ার তুলনায় বেশ খানিকটা নীচু মানের এবং কিছুটা অকর্ষিত। পারিবারিক অভিজাত্যের দিক থেকেও ভদ্রলোকটির অবস্থান ছিল ভদ্রমহিলার অনেক নীচে। এর পরিণাম শেষপর্যন্ত এই দাঁড়িয়েছিল যে ভদ্রমহিলা সারাজীবন নিজের ভাইবোনদের আশ্রয়ে, অসম্মানিত নিঃস্ব জীবন কাটিয়ে তিলে তিলে নিজেকে শেষ করেছিলেন, কিন্তু ঐ অমার্জিত মানুষটির সঙ্গে ঘর করেন নি বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে স্বামী বলেও স্বীকার করেন নি। গল্পটার প্রসঙ্গ টেনে আনলাম এ–কথাটা বলার জন্য যে উন্নততর সংস্কৃতির মানুষের পক্ষে নিম্নতর সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে এক হয়ে বাস করা খুবই কঠিন, বিশেষ করে ঐ নিম্ন সংস্কৃতির অমার্জিত মানুষদের সামনে যদি নত হয়ে বাঁচতে হয়।

মনসামঙ্গলের গল্পে এরই একটা ছোট্ট উদাহরণ আছে। দেবাদিদেব শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও পূজারী ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারক চাঁদ সদাগরের কাছে নিম্নতর অনার্য সংস্কৃতির দেবী মনসা পূজা চাইলে নিজের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে গর্বিত চাঁদ সওদাগর দৃপ্তস্বরে জানিয়েছিল :

যে হাতে পূজেছি আমি দেবশূলপাণি।
সে হাতে পূজিমু আমি চেংমুড়ির কানি॥

না, একটা উন্নততর সংস্কৃতির গর্বিত উত্তরাধিকারী হয়ে একটা ইতর–সংস্কৃতির দেবীর বেদিতে পূজা দেয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে—কালীদহের আবর্তে তার সাধের সপ্তডিঙা বানচাল হয়ে গেলেও না, মনসার আক্রোশে তার সমৃদ্ধ বংশের ধ্বংস হয়ে গেলেও না। না, কিছুতেই পারবে না সে। পারে নি পূর্ব–পাকিস্তানের হিন্দু–মধ্যবিত্তরাও। পুরুষানুক্রমে তাঁদের বৈভব আর প্রতাপের সামনে নতজানু একদল ভূলুণ্ঠিত অপমানিত মানুষকে সমীহ করে এই অসম্মানিত দেশে ধিক্কৃত জীবনধারণ করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে। তাই তারা নিঃশব্দে, নতমুখে চলে গিয়েছিল।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে মুসলমানদের জীবনে। একটা রাজকীয় জীবনের বিত্ত আর বৈভব থেকে নিপতিত হয়ে, প্রায় একইভাবে, অভিমনাহত জীবনের অর্থহীনতার ভেতর তাঁরা ধীরে ধীরে একসময় নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছিল তারা।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের তুলনায় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভবে উন্নত ছিলেন না বলে তাঁদের ঠিক এ ধরনের অবমাননাকর অবস্থায় পড়তে হয় নি। ফলে পূর্ব–পাকিস্তানের হিন্দুদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে দেশত্যাগের তাড়না ছিল অনেক কম।

সংস্কৃতিবান হিন্দুরা একে একে নিঃসঙ্গভাবে দেশ ছেড়ে চলে গেল। আমাদের সৌন্দর্যের, আনন্দের, প্রেমের জগৎটাকে প্রায় খালি করে যেন চলে গেল তারা। সারাটা দেশে তাদের নিজ নিজ বাড়ির ছোট্ট বাগানগুলোয় ফুলের যে অপার জলসা তারা ফুটিয়ে রেখেছিল, তাদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফুলগুলোও যেন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথাও একটি ফুলের চিহ্নও যেন আর রইল না।

তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরগুলোয় একে একে এসে উঠল সেকালের উঠতি মুসলমানেরা। এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে আসা, শক্ত–সমর্থ, একধরনের খাটুয়ে মানুষ। শিক্ষার দিক থেকে প্রথম প্রজন্মের লোক এরা। সৌন্দর্যের বা মাধুর্যের স্পর্শ তখনও তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকের জীবনেই পৌঁছোয় নি। বাড়ির বাগানের ফুলগাছগুলোকে কেউ কেউ অলাভজনক পণ্ডশ্রম ভেবে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে দেয়ালের ওপারে চিরবিদায় করে দিল। তারপর সেই বাগানটাকে ভালোভাবে চষে পোক্ত অভ্যস্ত হাতে নানান মাপের জাংলা বানিয়ে হরেক রকম তরিতরকারির গাছ লাগাল চটপট। ফুল বিদায় হয়ে সারাটা দেশ চালকুমড়া, কদু, ওল আর ধুন্দুলে 'লাভজনক' হয়ে উঠল।

আমাদের দেশে এই তরিতরকারির যুগ চলেছে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর—১৯৫০-৫৫ থেকে ৭৫ পর্যন্ত। সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে প্রায় হঠাৎ করেই আবার দেখা গেল, ফুল ফিরে আসছে সব জায়গায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের পরের প্রজন্মের রুচি- প্রত্যাশী তরুণ-তরুণীরা, আমাদের চেয়ে সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রসর কিশোর-কিশোরীরা আবার ফুলের চর্চায় উন্মুখ হয়ে উঠছে। বাড়ির সামনের ছোট আঙিনাটুকুতে হোক, ছাদে হোক, হোক চিলতে পরিমাণ বারান্দায় বা কার্নিশে—যে যেখানেই পারছে নানা রঙের ফুলের সমারোহ ঘটিয়ে জীবনকে আবার সৌগন্ধময় ও বাসযোগ্য করে তুলতে চাইছে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে হিন্দু-মধ্যবিত্ত এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় যে রুচি ও সৌন্দর্যকে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে চলে গিয়েছিল, আমাদের পরের প্রজন্মের সুস্মিত ছেলেমেয়েরা সেই মাধুরী-পিপাসাকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে।

১০

হিন্দুদের দেশত্যাগের আরেকটা কারণ ছিল। দুশো বছর ধরে কোলকাতা ছিল বৃটিশ বাংলার রাজধানী। (এর আবার অধিকাংশ সময় জুড়েই তা ছিল খোদ বৃটিশ-ভারতের রাজধানী।) কাজেই এই দুই শতাব্দী ধরে কি হিন্দু কি মুসলমান—সারা বাংলার সব মানুষের স্বপ্ন ছিল এই শহর কোলকাতা। কেবল বাংলার মানুষের নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষেরই লক্ষ্য তখন কোলকাতা। বাংলার সব শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঢল তখন হিংস্র অপ্রতিহত স্রোতে কোলকাতামুখি। চল, চল, কোলকাতা চল—সবার স্বপ্ন আর শ্লোগান এই একটাই। একটু সুযোগ পেলেই হল—বিচার-বিবেচনার অবকাশ নেই, ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ নেই, তড়িঘড়ি ছুট লাগাও কোলকাতায়—দালানবাড়ি না হোক ওঠো গিয়ে বস্তিতে, বস্তি না পেলে মেসে, তবু চলো কোলকাতা। পরেরটা পরে দেখা যাবে, আপাতত মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই হলেই হয়। যেন কোলকাতাতেই ধর্ম, কোলকাতাতেই অর্থ, কোলকাতাতেই কাম ও মোক্ষ। দেড়শ বছর ধরে দেশজোড়া হাজার হাজার সমৃদ্ধ জনপদের সেরা মানুষদের বিচ্ছিন্ন হবার কান্না দিয়েই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল কোলকাতার সমৃদ্ধির বৈভবময় বিশাল সৌধের সারি।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের এই কোলকাতামুখি স্রোত দুর্বার হয়ে উঠল। আত্মীয়-স্বজনের সূত্র ধরে, সামান্য চাকরি সম্বল করে, ব্যবসার ক্ষীণতম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্বাস পেয়ে কিংবা কিছুই না-পেয়েও এখানকার বর্ধিষ্ণু হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলল। তবু মনে রাখতে হবে, এই দেশত্যাগ ছিল পরাজিতের দেশত্যাগ। তাই এটা ছিল নিঃশব্দ। নীরব বেদনার অগোচর পথে বছরের পর বছর ধরে এই অলক্ষ্য ব্যাপারটা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১১

উদ্বাস্তু মানুষের বিরামহীন অপ্রতিহত চাপে কোলকাতার নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল। ফুটপাতে শুয়ে-থাকা মানুষ, বেকার, ফেরিওয়ালা, উদ্দেশ্যহীন যুবক, সর্বস্ব-খোয়ানো এককালের সঙ্গতিপূর্ণ সম্ভ্রান্ত মানুষের ঠাসাঠাসিতে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল কোলকাতার মার্জিত নাগরিক পরিবেশ। বিশাল উদ্বাস্তু সমস্যার চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল কোলকাতার জনসাধারণের জীবন। যে আলোকিত হিন্দু-মধ্যবিত্তকে দেখে আমি একদিন মনুষ্যত্বের মহিমাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম, কোলকাতার অনিশ্চিত উদ্বাস্তু জীবনের আবিলতার ভেতর তাদের সেই ঐশ্বর্য আর মহিমা দেখতে দেখতে নিঃস্ব ও শ্রীহীন হয়ে এল। দুচারজন ভাগ্যবান ছাড়া এদের প্রায় সবাই কোলকাতা আর তার শহরতলির নিম্নবিত্ত বস্তিগুলোর ভেতর তাদের ফেলে-আসা জীবনের সম্পন্ন স্মৃতিগুলোকে বুকে নিয়ে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করে নিঃশেষিত হতে লাগল প্রতিদিন।

মহান বাঙালি রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারীদের যারা শেষপর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে গেল, চারপাশের প্রবল সামাজিক প্রতিকূলতার ভেতর, তারাও, প্রকৃতির নিয়মেই, একসময় বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির আনুকূল্য পেয়ে বাংলাদেশের ছোট বড় শহরগুলোর শান্ত ছায়াবহুল পৃথিবীতে সেই পরিশীলিত ও সংস্কৃতিস্নাত হিন্দু-মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর, সম্পূর্ণ আলাদা ও আবিল বাস্তবতার ভেতর পশ্চিমবঙ্গেও তাঁদের বিকাশ ও বেঁচে থাকা ধীরে ধীরে অসম্ভব হয়ে এল। পূর্ব পাকিস্তানের মতন পশ্চিমবঙ্গ থেকেও তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল একসময়। সারা পৃথিবী থেকেই যেন বিদায় নিয়ে গেলেন তারা। আজ পৃথিবীর কোথাও কোনোখানে তারা আর নেই।

১২

ইংরেজরা কোলকাতা শহরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল বৃটিশ-ভারতের বৈভবময় রাজধানী হিশেবে। চওড়া ফুটপাত, সুপ্রশস্ত সমান্তরাল সড়ক, সুচিন্তিত নগর-পরিকল্পনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পার্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর, সরকারি ও বাণিজ্যিক ভবনের রাজকীয় শ্রী এবং স্থাপত্য সৌকর্য আজও প্রমাণ দেয় বৃটিশ গৌরবের অভ্রভেদী চূড়া হিশেবেই তারা এই নগর নির্মাণ করতে চেয়েছিল।

আগেই জানিয়েছি আমার জন্ম কোলকাতায়। তাই বেড়াবার ছুতো ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেবেলায় কোলকাতায় যাওয়া পড়ত মাঝে মাঝেই। বৃটিশ মহিমার বিদায়-দিনের ছোঁয়া-লাগা ছবির মতো ঝকঝকে কোলকাতার স্মৃতি আজও চোখে ভাসে। সে কোলকাতার রাস্তা, বাড়ি, দোকানপাট সবকিছুর মধ্যেই আভিজাত্য, রুচি আর পরিচ্ছন্নতার স্পর্শ। প্রতি সকালে রাস্তাঘাট ধোয়া চলছে, উজ্জ্বল রঙিন ট্রামগুলো দৃষ্টিনন্দন, পার্কগুলো সবুজ, রাস্তা ছিমছাম, জনবিরল।

১৯৬৩ সালে কোলকাতায় বেড়াতে গিয়ে আমার শৈশবের সেই 'তিলোত্তমা' কোলকাতাকে আর দেখতে পাই নি। মানুষের চাপে, দারিদ্র্যের চাপে, সমস্যা-সংকটের চাপে কোলকাতা ততদিনে মৃত্যুপথযাত্রী। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে যে কোলকাতা একদিন সারা ভারতের ভাগ্যকে নির্ধারণ করেছে, সংকটে দুর্দিনে পথ দেখিয়েছে, যে কোলকাতার রাস্তায় রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো শক্তিমান, মানবদরদী আর তেজস্বী মানুষেরা হেঁটে বেড়িয়েছেন, যে শহর এই জাতির জীবনে অসংখ্য অবিস্মরণীয় মনীষী উপহার দিয়ে বাংলার রেনেসাঁস ঘটিয়েছে; সেই কোলকাতার কলেজ স্ট্রিটের চৌমাথায় বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ততদিনে ফুটপাথের খোলা দোকান, ক্যানভাস আর প্লাস্টিকের কাঁধ-ব্যাগের গাদাগাদির আড়ালে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে, কেবল ওপরের দিকে তাঁর খোলা গোল মাথাটুকুকে শহুরে পাখিদের নির্বিকার প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের চমৎকার জায়গা করে দিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিনিষ্ট নগরী কোলকাতা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে হয়তো তখনও পরোপকারের খানিকটা সুযোগ দিয়ে চলেছে।

১৩

সোমেন চট্টোপাধ্যায়, আমাদের সোমেন, রাধানগর স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। ওদের বাড়ি ছিল মজুমদারদের জমিদার বাড়ির কাছাকাছি, রাস্তার ধারেই। পাকা দোতলা বাড়ি। সোমেনদের বাড়ির সবাই ছিল খুব সুদর্শন। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং ছিল সবার। মনে আছে আমাদের সহপাঠী সুধীর একবাব লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কী কী ঐশী পারম্পর্যের ভেতর দিয়ে উঁচুঘরের ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ ওরকম সোনালি হয়ে যায়।

সোমেনরা ছিল দুই ভাই চার বোন। ওর বোনদের অসামান্য রূপের খ্যাতি তখন সারা শহরের আলোচনার বিষয়। বিকেলে ওর বোনেরা বাসার সামনের বাগানের ফুলগাছে পানি দিত, মাঝেমধ্যে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে রাস্তায় গল্প করতে বেরোত। পাড়ার প্রায় সবকটা উঠতি বয়সের ছেলে ঠিক এই সময়টাকেই রাস্তায় ওদের হেঁটে বেড়ানোর সময় করে নিয়েছিল। কিসের এক অদৃশ্য টানে ওরা এই সময় সোমেনদের বাসার সামনের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যেত, বাসার কাছাকাছি হতেই কমে আসত ওদের কথাবার্তার শব্দ আর পায়ের গতি, বাসার সামনের বাগানে ওর বোনদের আড়চোখে সাহস করে দুয়েকবার দেখে নিত দলের ভেতরকার সাহসী দুয়েকজন। তারপর একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় পেয়ে বসত ওদের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা আর কোনো কথা বলত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেনই আমাকে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। ওর মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বাসায় ভালো রান্নাবান্না হলে সোমেনকে দিয়ে আমাকে খবর দিয়ে দুজনকে পাশাপাশি মেঝেতে বসিয়ে খাওয়াতেন। ওর ছোট বোন অবন্তী আমাদের এক ক্লাস নিচে—ক্লাস ফাইভে পড়ত। আমাদের খাবার সময় বড় বড় চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে আমাদের স্কুলের গল্প শুনত অবন্তী।

বড় বড় কাঁসার থালার মাঝখানটায় উঁচু ঢিবির মতন ভাত বাড়া থাকত, চারপাশে ছোট ছোট বাটিতে নানা ধরনের মাছ, ডাল, নিরামিষ, শাকসবজি, দুধ আর মিষ্টির আয়োজন । ওর মা ছিলেন খুব হাসিখুশি আর স্নেহপ্রবণ। হাসতে হাসতে বলতেন : 'একেবারে নাড়ু গোপালের মতো চেহারা যে তোমার, একদম বামুনদের মতো। 'তারপর হঠাৎ সোমেনের দিকে তাকিয়ে বলেই উঠতেন : 'অবন্তীর সঙ্গে খুব মানাত, নারে সোমেন?'

বোধহয় বার দুয়েক বলেছিলেন উনি কথাটা হাসতে হাসতে—তারপর যথারীতি ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যত সহজে ভুলেছিলেন আমি অত সহজে ভুলতে পারি নি। অবন্তী আমার দিন-রাত্রির স্বপ্নের নায়িকা হয়ে গিয়েছিল।

সোমেনদের বাসার উল্টোদিকের ছোট্ট একচিলতে একটা মাঠে আমরা এক বয়সের ছেলেমেয়েরা বুড়ি-ছোঁয়া খেলতাম। একদিন খেলার ভেতর ওর হাত ছুঁয়ে আমার জীবনের নির্ভরশীলতার প্রথম অনুভূতিকে আমি স্পর্শ করেছিলাম। খেলার সময় ফ্রকপরা অবন্তী মাঝে মাঝে চুলগুলোকে মাথার একপাশ দিয়ে পেছন টেনে নিয়ে শাদামাটা একটা হাতখোঁপা করে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই সময় ওকে রানীর মতো লাগত। মনে আছে শাড়ি পরে কুমারীপূজায় কুমারী হয়েছিল সেবার, মণ্ডপে ওকে প্রতিমার মতো লেগেছিল। অবন্তীকে নিয়ে আমি একা একা স্বপ্ন দেখতাম। আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন অবন্তী।

শঙ্কুরা থাকত আমাদের বাসার কাছেই। একদিন সকালে আমাদের বাসায় এসে নিরুত্তাপভাবে খবর দিল : 'সোমেনরা কাল ইন্ডিয়া চলে গেছে।' বোকা হয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে হল যেন ওর কথাগুলো ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। উৎকণ্ঠিত গলায় বলে উঠলাম, 'কারা চলে গেছে?'

'আরে বাবা সোমেনরা। কাল রাতে গেছে। কেন, তোদের বলে নি কিছু আগে?'

ওর মুখে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসির রেখা।

বুকের ভেতরটা নিদারুণভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। শঙ্কু বিদায় হতেই সোমেনদের বাসার দিকে ছুট লাগালাম। কেবলই মনে হতে লাগল, কী করে সম্ভব এটা। পরশুর আগেরদিন বিকেলেও ওদের বাসায় অনেকক্ষণ ছিলাম। ওরা সবাই আন্তরিকভাবে কথা বলেছে। আচরণে-ব্যবহারে এতটুকু আলাদা মনে হয় নি কিছুই। যেন ঠিক আছে সবকিছুই, কোথাও ব্যতিক্রমের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। ফেরার সময় ওর মা আগের মতোই মিষ্টি হেসে বলেছেন, 'আবার এসো, কেমন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার কাছে আসতে বলেছিলেন তিনি তবে আমাকে? অভিমানে আমার ঠোঁট ফুলে কান্না উপচে এল। সবচেয়ে অভিমান হল সোমেনের ওপর। নিশ্চয় জানত ও সবকিছু। এত অন্তরঙ্গতা ছিল ওদের সঙ্গে—কিছু না হোক একদিন পর ওরা চলে যাচ্ছে, এই কথাটা আমাকে জানাল না!

আর চাঁপা ফুলের মতো অবন্তী—সেই বড় বড় চোখের অপরূপ মেয়ে—ইচ্ছেমতো যখন তখন যাকে দেখা যেতে পারত—হঠাৎ এক মুহূর্তে, অসম্ভব হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল—তাকে, তাদের কাউকে এই দেশে কোথাও কোনোদিন কোনোখানে আর দেখা যাবে না! ওদের এমন কেউ রইল না যাকে দেখে মনে করা যাবে অবন্তী তার ভেতরেও খানিকটা রয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা শূন্যতায় শোকে একেবারে পাথরের মতো হয়ে গেল।

ওদের চলে যাওয়া আমার পৃথিবীটাকে যে কতখানি খালি করে গেছে সেটা বুঝতে পারলাম যখন ওদের বাড়ির কাছে পৌঁছলাম তখন। রাস্তা দিয়ে আসার সময় মনের ভেতর কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশা ছিল : ওদের হয়তো দেখতে পাব বাড়িটায়, সেই জমজমাট মুখর জীবনযাত্রার প্রাণবন্ত দৃশ্য কিছু-না-কিছু চোখে পড়বেই। কিন্তু বাড়ির কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা খা খা করে উঠল। ওদের পরিত্যক্ত বাড়িটা সম্পূর্ণ হতশ্রী হয়ে পড়ে আছে। কেবল অবন্তীদের ফেলে-যাওয়া ছোটখাটো অদরকারি কিছু জিনিসপত্র, খেলনা, পুরনো বই, চুলের কাঁটা, ছেঁড়া কাগজ, এখানে সেখানে ছড়ানো-ছিটোনো। রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢোকার মুখে ওদের সেই বিরাট ড্রইংরুমটার দিকে তাকিয়ে কান্না এসে গেল। বিশাল ঘরটা ক্ষুধার্তের মতো হা করে আছে। ঘরটা খালি। ভেতরটা আবছা অন্ধকার। শোকেসে বুকশেল্‌ফে সোফায় জমজমাট ওদের সেই সরগরম ড্রইংরুমটার মিয়োনো অন্ধকারের ভেতর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা কাঠের চৌকির ওপর গেঞ্জি গায়ে মোটাসোটা কালোমতো একটা লোক চুপচাপ বসে আমাদের দেখছে। তার চোখমুখ দেখে বোঝা গেল হয়তো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে—সে-ই এখন এ বাড়ির নতুন মালিক।

হিন্দুরা চলে যেত এমনি নিঃশব্দে। সবার অজান্তে কারো কাছে জমিজমা বিক্রি করে, যাবার আগে গোপনে দখল বুঝিয়ে দিয়ে অলক্ষে চলে যেত। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলে-কয়ে অশ্রুজলে বিদায় নেয়ার বিলাসিতার ভেতর নানারকম ঝুঁকি ছিল। সোমেনরাও তাই এমনি চুপচাপ চলে গিয়েছিল।

পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি, বাসস্থান, আশৈশবের পরিচিত পৃথিবী, আত্মীয়-বন্ধু, কৈশোর-যৌবনের মধুরতম স্মৃতি-স্বপ্ন, তুলসীতলা—সবকিছু এইভাবে পেছনে ফেলে চলে যেত তারা। তারপর জীবনের সেই অশ্রুময় অপরূপ স্মৃতিগুলোকে একা একা বয়ে চলত, বুকের ভেতর। সন্তানদের কাছে পালতোলা নদী, কাশবন, আর সজীব মাটির স্বপ্নময় গল্প রূপকথার মতো শুনিয়ে যেত অবসর সময়ে, তারপর একসময় সবকিছুই নীরব হয়ে আসত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

আজ টের পাই সোমেনরা ব্রাহ্মণ হলেও খুব একট গোঁড়া ছিল না। না হলে ঘরের ভেতর মেঝেতে একটা নির্জলা মুসলমান ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যাপারে ওদের পরিবারের আপত্তি থাকার কথা ছিল। আমি ঠিক জানি না খাওয়াদাওয়ার পর আমার ব্যবহার করা থালাবাসনগুলোর ওপর কী পরিমাণ অত্যাচার-উৎপীড়ন চলত অবা সেই নিগ্রহের পর বিশুদ্ধ গোবরে লন্ড্রি-ধোলাই করে সেগুলোকে জাতে তোলার ব্যবস্থা কীভাবে হত। এসব কিছুই হওয়া অসম্ভব নয়, তবু সোমেনদের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ মানবিক উদারতা ছিল যা আমাকে সশ্রদ্ধ করত। আমি সবসময়ই দেখেছি মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা যতটা অর্থনৈতিক ততটা ধর্মীয় বা বর্ণগত নয়। সোমেনদের আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল প্রায় একই স্তরের। আমার মাঝে মাঝে মনে মনে প্রশ্ন জেগেছে, ধর্মীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও সোমেনরা আমাকে যতখানি ওদের ঘরের মানুষ করে নিতে পেরেছিল; কোনো গরিব হিন্দু পরিবারের ছেলেকে ততটা আপন করে নিতে পারত কিনা। তবু সোমেনের একটা ব্যবহার আমাকে ফিরে ফিরে কষ্ট দিত। আমি লক্ষ্য করতাম, আমাদের বাসায় পানি খাবার সময় সোমেন আমাদের গ্লাস মুখে ছোঁয়াত না, গ্লাসের পানি ওপর থেকে ঢেলে খেত। সোমেনকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতাম না, কিন্তু কোথায় যেন নিজেদের অসম্মানিত আর ছোট মনে হত। বড় হয়ে বুঝেছি দোষটা সোমেনের ছিল না, ছিল ওর ধর্মের। না, ঠিক ধর্মেরও নয়—সামাজিক সংস্কারের। মানুষের উপর মানুষের শোষণকে চিরস্থায়ী করে রাখার উদ্দেশ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আচরিত এক চতুর সুচিন্তিত চক্রান্তের—যার উদ্দেশ্য সোমেন নিজেও জানত না। ওরা চলে যাবার পর জেনেছিলাম কেবল আমাদের বাসাতেই নয়, ওর অন্যান্য হিন্দুবন্ধুদের বাড়িতেও, ব্রাহ্মণ না হলে, ও ওভাবেই পানি খেত।

১৫

রাধানগর স্কুলে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল অরুণ, অরুণকুমার ভট্টাচার্য। অরুণ ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। ওর চাচাত ভাই প্রবোধও ছিল আমার বন্ধু। প্রবোধও ভালো ছাত্র, আমাদের ক্লাসেই পড়ত। ফরসা স্নিগ্ধ চেহারার অরুণের প্রকৃতির মধ্যে কবিতার মতো, স্নিগ্ধ কিছু ছিল। ওর সারা অস্তিত্ব জুড়ে সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলোকের আনাগোনা অনুভব করতাম। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যে খুব ঘটা করে চলত তা নয়, কথা ছাড়াও আমরা দুজন দুজনকে বুঝতে পারতাম। যখন শীতকালের কনকনে উত্তুরে হাওয়া বাংলাদেশের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সারাটা প্রকৃতিকে উজ্জ্বল আর কমনীয় করে তুলত তখন আমরা শুকিয়ে-আসা ইছামতীর শীর্ণ রুপোলি স্রোত পার হয়ে নদীর ওধারের দারুচিনি গাছটার নিচে বসে গাছপালার রহস্যময় বিষণ্ন শব্দ শুনতে ভালোবাসতাম। অরুণের মধ্যে একটা সরল, প্রখর সত্যপ্রিয়তা ছিল। একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছাগল হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে। ছাগলটাকে দেখে স্যার সরব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যখন বলতে শুরু করলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখরে দেখ, তোদের বন্ধু এসে গেছে' তখন অরুণ রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুখে এই অবমাননার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ অরুণ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। ওর চোখের কোণায় পানি চিকচিক করছে। বললাম, 'কী ব্যাপার অরুণ?'

'আমরা ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছি।'

'কবে?

'কাউকে বোলো না, মাসখানেকের মধ্যে।'

অরুণ এমনিতেই কথা বলত কম, এরপরে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। একেক সময় অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকত, ওর চোখ তখন পানিতে টলমল করত।

সোমেনদের মতো অরুণরাও চলে গেল এক রাত্রে, সবার অজান্তে, কাউকে না বলে। ওদের জিনিসপত্র গোছাবার জন্যে আমি অরুণের সঙ্গে কয়েকদিন একটানা ব্যস্ত হয়ে ছিলাম। তারপরেই সব শূন্য হয়ে গেল। ট্রেনে দর্শনা বর্ডার হয়ে কোলকাতায় চলে গেল ওরা। বাগেরহাট আমাদের দেশ। ট্রেনে বাগেরহাট যেতে হলে এই দর্শনা হয়েই যেতে হত। দর্শনায় গিয়ে আমাদের ট্রেন কোলকাতার রাস্তা ছেড়ে খুলনার রাস্তা ধরত। কোলকাতামুখি রেললাইনটা একটা গাছপালার রহস্যময় সরু জগতের ভেতর দিয়ে ভারতের দিকে চলে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হত এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে অরুণ চিরকালের জন্য চলে গেছে। রেলরাস্তার দুপাশের সারবাঁধা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হত কী ভাগ্যবান ওরা। এই পথ দিয়ে অরুণকে চলে যেতে দেখেছে।

উনিশ শ পঞ্চাশ–একান্নর দিকে হিন্দুদের দেশত্যাগের হিড়িক যেন তুঙ্গে উঠল। চলে গেলেন আমাদের গৃহশিক্ষক সুরেশ লাহিড়ী। আমাদের কাছেই থাকতেন মহাদেব দা আর তাঁর বিধবা বোন কাত্যায়নীদি। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। একটা নমনীয় মাধুরী ছিল কাত্যায়নীদির মিষ্টি চেহারায়। মার্জিত শান্ত মানুষ ছিলেন মহাদেব দা। আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন তাঁরা। কাত্যায়নীদির রূপ আর রান্না দুই–ই ছিল অসামান্য। শাকসবজি থেকে শুরু করে এতরকম খাবার এমন সুস্বাদু করে রান্না করেছিলেন কাত্যায়ানীদি আর এমন সস্নেহে সবকিছু খাইয়েছিলেন যে সেই খাবার স্মৃতিটা আজও একইরকম মনের পটে ঝলমলে হয়ে আছে। একদিন তাঁরাও চলে গেলেন। চলে গেলেন প্রফুল্লবাবু, রাজীব উকিল, শ্রীশ অধিকারী।

আমাদের বাসার পেছনে বিরাট বাগানওয়ালা বাড়ির জটুবাবুর মেয়ে ছিলেন বীণাদি। সোনার প্রতিমার মতো বীণাদিরাও চলে গেলেন একদিন। চলে গেল প্রবোধরাও। দেখতে দেখতে গেলেন আরো অনেকে—যাদের মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য, মর্যাদা আর প্রেমের পৃথিবীকে খুঁজে পেয়েছিলাম একদিন। একটা নিঃস্ব নীরক্ত পৃথিবীর ভেতর নিজের শৈশবটাকে দেখতে পেলাম হঠাৎ করেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজো এঁদের কেউ কেউ জীবনের সায়াহ্নবেলায় শৈশবে ফেলে যাওয়া সেই স্বপ্নগুলোকে দেখে যাবার জন্যে তাদের ছেলেবেলার বসতবাড়ির ধারে ফিরে এসে একা একা ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় তাঁদের সন্তানদের কেউ–কেউ বাপমায়ের কাছে শোনা আম জাম ইলিশ আর পাল–তোলা নৌকোয় ভরা তাদের আদি পিতৃভূমিকে দেখার জন্যে চলে আসে। এমনি বেশকিছু স্বপ্নতাড়িত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার গত পনেরো–বিশ বছরে।

এইভাবে চলে গিয়েছিলেন সেকালের হিন্দুরা। চলে গিয়েছিলেন নিঃশব্দে; পরাজিতেরা যেমনিভাবে যায়, তেমনি। আমাদের স্বপ্নের প্রেমের পৃথিবীকে শূন্য করে তাদের সেই ভাষাহীন চলে যাওয়া আজও আমার জীবনের অন্যতম বিষাদময় ঘটনা।

১৯৯০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘নীরব সঙ্ঘ’ ও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

১

উনিশশ সাতান্ন থেকে আটান্ন সালের মাঝমাঝি সময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সময়কার নবাগত ছাত্রদের এলোমেলো ভিড়ের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ঝিকিয়ে উঠল উৎসুক তরুণ জনকয় ছাত্রের একটি ছোট্ট মেধাবী দল। দলের নাম খানিকটা ব্যতিক্রমী—হয়তো অদ্ভুতই কিছুটা—‘নীরব সঙ্ঘ’। দলের সদস্যদের সর্বসম্মত বক্তব্য একটিই :

> “যা পূর্ণ তার ভাষা নীরব ; অপূর্ণতাই নিজেকে পূর্ণ বলে প্রকাশ করার জন্যে অহেতুক কলরব তুলে থাকে। এই পূর্ণতাই আমাদের লক্ষ্য, তাই আমরা নীরব। তাই আমাদের সঙ্ঘের নাম নীরব সঙ্ঘ।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এসে জড়ো হওয়া গুটিকয় ছাত্রের একটি আকস্মিক দল এটি—সভ্যেরা পাঠ্যবিষয়ের দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে অসম্পর্কিত—কিন্তু দলীয় চেতনার একটি মৌলিক বিন্দুতে এক : কিছু আলোকোজ্জ্বলতা, কিছু দীপ্রতাকে ছুঁয়ে যেতেই হবে, ঋদ্ধতর কিছুকে পেতেই হবে খুঁজে।

দলের নামটিকে আপাতদৃষ্টিতে পরিহাস-চটুল মনে হলেও একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে নামটার হাল্‌কা ছদ্মাবরণের আড়ালে দলটি কীভাবে সে-সময়কার ছাত্রসম্প্রদায়ের রুচি-গভীরতাহীন অন্তসারশূন্যতার বিপরীতে তাদের আরাধ্য পূর্ণতার অবস্থানকে চিহ্নিত করে নিয়েছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক ছাত্রসম্প্রদায় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই ছোট্ট সপ্রতিভ দলটি সবার চোখে আলাদা উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অঙ্গন তখন পুরোদস্তুর অবক্ষয়ী। বায়ান্নর উদ্দীপ্ত আন্দোলন খুব দূরস্মৃতি নয়, কিন্তু চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট বিজয়ের পরবর্তী সময়ে প্রগতিশীল শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান বিরোধ এবং অন্তর্কলহ দেশের রাজনৈতিক উদ্যমকে সার্বিক আশাভঙ্গের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে তিন ধরনের ছাত্র তখন মোটামুটি রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় (বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে ছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ তখনো ঠিকমত শুরু হয় নি)। প্রথম দলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কিছু তথাকথিত উজ্জ্বল ও মেধাবী ছাত্র। এরা কেবলমাত্র বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচনের সময় নানান পদে প্রার্থী হবার জন্য মুখিয়ে উঠত একমাত্র এ কারণে যে, এই সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে সে-সময়কার সি.এস.এস. পরীক্ষায় (সি.এস.পি. হতে হলে যে পরীক্ষা দিতে হত)* বিশেষ মূল্য দিয়ে দেখা হত।

প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা একধরনের মার্জিত চেহারার ছিমছাম তরুণ-তরুণী (অধিকাংশই সে-সময়কার সুস্থিত মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে) যারা চুটিয়ে দু-চারটা গণসংগীত বা রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান করতে পারাকেই মোটামুটিভাবে বিপ্লব ভেবে আত্মতুষ্টি পেত। রাজনীতি বা সংস্কৃতি চর্চা দুটোই, যতদূর অনুভব করতাম, তাদের কাছে ছিল একধরনের উঁচুস্তরের বিনোদন। সাধারণভাবে এদের মধ্যে প্রকৃত আত্মোৎসর্গের অভাব ছিল—পরবর্তীতে আমাদের দেশের বিখ্যাত সুবিধাবাদীদের অনেকেই এই দলের সদস্য।

তৃতীয় দলে ছিল অর্ধধর্মাশ্রিত গ্রামীণ পটভূমি থেকে উত্থিত একধরনের উদ্যমশীল অকর্ষিত ছাত্রের দল—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, রুচিহীন এবং সাধারণভাবে নীতিবোধশূন্য। এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উন্নত সংস্কৃতিরও একটি ক্ষীণ ধারা দেখা গিয়েছিল—যারা পরবর্তীতে বাংলাদেশ আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়ে আরো পরে উপরোক্ত দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই তিনটি দলই সম্মিলিতভাবে (রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক) এখন এই জাতির ভাগ্যের ধারক।

নীরব সঙ্ঘের সদস্যদের ভাবনা-কামনার উজ্জ্বল বিন্দুটি চৈতন্যের যে সূক্ষ্ম শিখরে বিরাজ করত সেখান থেকে ছাত্ররাজনীতির এই অন্তসারশূন্য স্থূল পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এবং সংগতভাবেই সে উৎসাহ তাদের মধ্যে একরকম দেখাও যায়

---

* এই সময়টা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জল-মেশানো উত্তরসূরী পরাক্রান্ত সি. এস. পি.-দের মোটামুটি সুবর্ণযুগ। ইংরেজি ভাষার ঐ অক্ষর তিনটি তখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের সমস্ত মেধাবী উচ্চাশী ছাত্রদের তাবৎ ঐহিক কামনার ইপ্সিত মধ্যমণি—একমাত্র আরাধ্য ও মোক্ষ। রাতারাতি অযাচিত পদমর্যাদা, সবরকম জাগতিক সুযোগসুবিধা, নিরাপত্তা এবং বিপুল সামাজিক প্রতিপত্তির অপরিমেয় উৎস তখন এই রহস্যময় অক্ষর তিনটি। স্নিগ্ধ মাধুরী-রুচির চর্চার চেয়ে ঐ তিনটি অক্ষরের অধিকার যে জীবনের কাম্য গোলাপ শিকারের পক্ষে অনেক নিপুণ হাতিয়ার, তা সেই সময়কার বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের আকাশে-বাতাসে অনুরণিত কোনো অখ্যাত জীবন-রসিকের আত্মব্যঙ্গবিধুর পঙ্‌ক্তিমালায় বিধৃত :

ওগো কন্যে,
তোমার জন্যে
লিখব না আর কবিতা ;
মিথ্যা জানি সবই তা।
ওগো বড়লোকের ঝি
আমি হব সি. এস. পি. ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি। দলের সদস্যদের অবসর সময় প্রধানত সরগরম হয়ে থাকত নানান বিষয়ের ওপর উত্তেজিত বাক-বিতণ্ডায়। কাজটা সুস্থভাবে চালিয়ে যাবার জন্যে একটা নিরাপদ জায়গাও বেছে নিয়েছিল তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের একপ্রান্তে—শ্যাওলা-জমা এঁদো পুকুরটার উত্তর-পশ্চিমদিকের ছোট্ট একটা কোণে, আদর করে নিজেরাই এ জায়গাটার নাম রেখেছিল—ইডিয়টস কর্নার। রুচিগত কারণেই মধুর ক্যান্টিনের দিকে মন ছিল না—এই একচিলতে জায়গাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের একমাত্র নিজস্ব ভূখণ্ড। সহপাঠিনীদের মুখরোচক প্রসঙ্গ থেকে বিশ্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নির্জলা আড্ডা চলত সেখানে, কবিতা পড়া থেকে আরম্ভ করে দলের সর্বশেষ অভিযানের পরিকল্পনায় মুখর হয়ে থাকত জায়গাটা।

সঙ্ঘের সদস্যরা সময় কাটাত লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে, নিজেদের লেখার ওপর তুমুল প্রাণঘাতী আলোচনা চালিয়ে, বিভিন্ন হলের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঈর্ষাজনক সাফল্য লুটে এনে আর অসম্ভবের অশনাক্ত কোনো পিপাসায় প্রাণকোষের খাঁজে খাঁজে নিদ্রাহীন উন্মুখ থেকে।

২

মেধাবী কখনও ছিলাম না, 'পূর্ণতা'র ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ছিল না চরিত্রে, তবু নীরব সঙ্ঘের গড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রথম থেকেই সক্রিয় কাঁধ এগিয়ে দিয়েছিলাম।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ছিল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিশাল বাড়িটার দক্ষিণদিকের অংশটা জুড়ে—প্রকাণ্ড উঁচু আর চওড়া একটা প্রলম্বিত দোতলা দালান। সামনের দিকে দীন আয়োজনে এবং সাময়িক ভিত্তিতে তৈরি টিনের চাল-ছাওয়া বেশকিছু ক্লাসঘরের সারি, একটা এঁদো পুকুর এবং মধুর রেস্তোরাঁ—মোটামুটি এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের বাস্তব ঘর-সংসার। মূল দালানের সামনে একটা হতশ্রী চেহারার আমগাছের নিচেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতার উচ্চকিত প্রাণকেন্দ্র। অন্তত একটা কারণে গাছটা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। এই সেই আমতলা যে গাছের নিচে বায়ান্নর বিখ্যাত ভাষা আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। ফাল্গুন মাসে গাছটাতে অপর্যাপ্ত মুকুল আসত থরে থরে—সারাটা গাছ অপার্থিব সোনালি আভায় ভরে থাকত। মদির গন্ধে আমতলা মৌ মৌ করত কয়েকটা দিন। কিন্তু কোনোদিন ঐ গাছে আম দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বয়স্ক ছাত্রেরা তরুণ নবাগত ছাত্রদের জানাত : নেতা ফলাতে ফলাতেই গাছটার পরিত্রাহি অবস্থা, এর পর কী করে আর ফল দেয় বলো!

ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একটা আঙিনা নিয়ে ছোট্ট পরিপাটি আমাদের কলাভবন। নির্দয় স্মৃতি যখন পুরোনো দিনগুলোকে সামনে এনে দাঁড় করায় তখন ধারালো হাওয়ার মতো নিষ্ঠুর দুঃখগুলো বুকের ভেতর ছুরি চালাতে থাকে। মাঝখানের হারিয়ে-যাওয়া এই তিরিশটা বছরকে মনে হয় অবাস্তব একরাশ উড়ো খবরের মতো। মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো যেন ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছি কলাভবনের সেই বিশাল গাড়ি-বারান্দাটার নিচে। চোখের পাপড়ির ওপর কচি স্বপ্নগুলো তেমনি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা হেঁটে যাচ্ছেন, কার পায়ের শব্দ যেন পাশ থেকে চকিতে মিলিয়ে গেল, বন্ধুদের হল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে, কে আসবে বলে সেই কখন থেকে যেন একঠায় অর্থহীন দাঁড়িয়ে আছি, আচমকা কার শাড়ির খশখশ শব্দ বুকটাকে চমকে দিয়ে বিদায় নিল—এইসব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কলাভবন এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দখলে। যেখানে আমাদের সবচেয়ে মদির দিনগুলো মুখরিত হয়েছিল, আমাদের কামনার প্রিয়তমারা তাদের ছোট্ট সুন্দর পা ফেলে হেঁটেছিল করিডোরে, রাস্তায়—সেখানে, সেইসব মৃত আকাঙ্ক্ষার লাশের ওপর এখন হাসপাতালের নোংরা বিছানা, ওষুধের গন্ধ, রোগীর আর্তনাদ সবকিছুকে মিথ্যা করে দাঁড়িয়ে আছে।

৩

দেখতে দেখতে যার ব্যক্তিত্ব দলের মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে উঁচু হয়ে দেখা দিল সে মোশতাক—কাজী মোশতাক হোসেন। সহজেই আমরা যেন তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলাম। কেবল ব্যক্তিত্বে নয়, তার শালপ্রাংশু দীর্ঘ শরীর সবাইকে উচ্চতায়ও ছাড়িয়ে ছিল—যেন তাকে অতিক্রম করে কিছুই চোখে পড়া প্রত্যাশিত নয়। লম্বা ঝুলের শাদামাঠা পাঞ্জাবি-পরা মোশতাকের চোখে ছিল পুরু লেন্সের চশমা। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে ওর ভেতরকার সরল গভীর মানুষটাকে দেখা যেত।

যে ব্যাপারটার জন্য ও দলের সভ্যদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা হল ওর শান্ত পরিমিত ব্যক্তিত্ব। ও উৎসাহী হত শিশুদের মতো, কিন্তু কাজ করত বুঝে-চিন্তে। শ্রীকান্তের কাছে ইন্দ্রনাথ যা ছিল, মোশতাক আমাদের কাছে ছিল তা-ই। যৌবনের যেসব অসহায়তা, দুর্বলতা আমাদের প্রতিমুহূর্তে বিস্রস্ত করত—দুরপনেয় লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত—সেই মানবিক ভ্রান্তিগুলো থেকে ও ছিল আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত। দলের সদস্যদের অস্থির ও বালখিল্যতার রাজ্যে ও ছিল নির্ভরশীল আশ্রয়। সবার পতন অসহায়তাকে মোশতাক সতর্কভাবে দুহাতে আগলে রাখত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটা হলের সাংস্কৃতিক সপ্তাহের বিতর্ক আর উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতাগুলোয় ভূরি ভূরি পুরস্কার বাগিয়ে যে নিয়মিত ঘরে ফিরত সে মওলা—মনজুরে মওলা, নীরব সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান সদস্য।

মওলা মাঝে মাঝেই সুন্দর কবিতা পড়ে শোনাত আমাদের সাহিত্য আসরগুলোতে। প্রথম দিকে নীরব সঙ্ঘের একটা আসরে একটা চমৎকার কবিতা শুনিয়েছিল ও। কবিতাটায় ও বৃদ্ধ পিতার শুভ্র শ্মশ্রুর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিল—'বাতাসে ওড়া একখণ্ড শাদা কাগজ।' এখনো অদ্ভুত জ্বলজ্বলে হয়ে ছবিটা ভেসে আছে আমার মনে। বছর কয়েকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ওপর ওর একটা অনবদ্য কবিতা ওর কবিতার ভবিষ্যৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে তোলে।* পরবর্তীতেও অনেক অনবদ্য কবিতা লিখেছে ও, কিন্তু অল্প হলেও গদ্য লিখেছে অনবদ্যতর। সাম্প্রতিককালে ও একটা বিরল সাফল্য দেখিয়েছে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে। আঞ্চলিকতার স্থায়ী ছাপ-মারা একটা প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘদিনের গ্রাম্যতা থেকে বাঁচিয়ে, যে দীপ্র সাফল্যের সঙ্গে মওলা একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বলতায় একাডেমীকে তুলে এনেছে তা সবারই সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন পেয়েছে।

যাদের জীবনাবেগে নীরব সঙ্ঘের প্রাণধারা সজীব ছিল তাদের মধ্যে মনিরুজ্জামান একজন। প্রিয়দর্শন মনিরুজ্জামানের প্রকৃতির মধ্যেই কবিতার মতো একটা মাধুর্য ছিল। কবিতা-গল্প ছাড়াও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ও ফুটনোট আকীর্ণ দুরূহ সব প্রবন্ধ লিখত ও—পরবর্তীতে গবেষণায় ও যে অসাধারণ সাফল্য দেখাবে তা আগে থেকে আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবার জন্যেই হয়তো। ওর দেশের বাড়ি ছিল ঢাকার কাছেই—আদিয়াবাদে—ট্রেনে যেতে ঘণ্টা-দেড়েক লাগত। মনে পড়ে, প্রায় হঠাৎ করেই কেমনভাবে ওদের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই মিলে একদিন। প্রথমে ট্রেনে চড়ে, তারপর গাছপালার ভেতর দিয়ে পাখির ডাক শুনতে শুনতে হেঁটে বেড়ানো একটা ছায়াবহুল দিনের স্মৃতি এখনো চোখে ভাসে।

বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত পরিহাসপ্রিয়তা যার প্রায় প্রতিটা কথায় উপচে পড়ত সে আমাদের আতাউল—আতাউল হক। সে সময় যে চিহ্নিত দুচারজন ছাত্র নিজেদের গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত সেই ঈর্ষিত ভাগ্যবানদের মধ্যে আতাউল একজন।

---

* **রবীন্দ্রনাথ**

নিজেই তো গোরা তুমি। ছ'ফুট শরীর ছায়া ফ্যালে
ছড়িয়ে শালের বীথি, ফেলে শান্তিনিকেতন, ফেলে
জোড়াসাঁকো, পদ্মাতীর—ছায়া ফ্যালে বাংলার প্রাণে,
আমার হৃদয়ে দ্যাখো ছায়া কাঁপে, গলা শোনা যায়।
কত দূর দূরান্তর থেকে।

সব আছে, যথারীতি। লাবণ্য অমিত রায় রোজ
পাহাড়ে বেড়াতে যায়। সুচরিতা গান গায়। মিনি
সহসা বয়সে বাড়ে। কাবুলীওয়ালার মন কত
আশা নিরাশায় দোলে। দিন যায়।
ক্যামেলিয়া ফোটে।

সব আছে, যথারীতি। এবং তুমিও আছ, তুমি।
অথচ এখানে দ্যাখো জল নেই, একফোঁটা জল
পাবে না কোথাও খুঁজে। আকাশের বুক চিরে—নেই।
কেবল পাথর আর শূন্যতার খেলা, নদী নেই,
নেই, কিছু নেই।

সোনার তরীর গান লেখা আর হবে না কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে অন্যদের তুলনায় ওর ভাগ্যটা ছিল আর একটু দড়। ও কেবল গাড়ি চড়েই আসত না, চালাতও ও নিজেই। সে সময় অধ্যাপকদের কারোই প্রায় গাড়ি ছিল না। বাংলা বিভাগের বিখ্যাত মুনীর চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মতো বাঘা বাঘা অধ্যাপক নির্বিকার চিত্তে সাইকেলে 'প্যাডেল মেরেই' বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। বিখ্যাত অবিখ্যাত প্রায় সব অধ্যাপকই আসতেন পায়ে হেঁটে, কখনো সখনো রিকশায়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের ভাবমূর্তি নিয়ে দাঁড়াবার জন্যে সে সময় একজন শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য বা প্রতিভার ওপর নিঃসংশয়ভাবেই নির্ভর করতে পারতেন, এখনকার মতো অধ্যাপক মহলের উপদলীয় শঠতার হীন নায়ক কিংবা হাল মডেলের দামি গাড়ির গর্বিত মালিক হওয়ার দায়ভার ঘাড়ে নেবার প্রয়োজন হত না।

আতাউলের গাড়িটা ছিল একটা ছিমছাম মার্জিত চেহারার মরিস মাইনর। পারিবারিক গাড়ি হলেও প্রায় সব সময়েই ওর কাছেই থাকত গাড়িটা। দেখতে-না-দেখতে নীলাভ ছাই রঙের ঐ ছোটখাটো গাড়িটাই এই হৈ হৈ দলের প্রায় সর্বজনীন সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। নতুন কিছু-একটা মাথায় এসে পড়েছে কি মুহূর্তে গাড়িটাতে চেপে বেরিয়ে পড়ো অভিযানে—কেউ বাধা দেবার নেই। যেতে হবে কোথাও দলবেঁধে, ভয় নেই, অনুগত গাড়ি তার প্রসন্ন ভঙ্গি নিয়ে একইভাবে প্রস্তুত। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে পরস্পরের কাছে এনে একটা অভিন্ন আত্মায় পরিণত করার ব্যাপারে একটা নিরেট প্রাণহীন যন্ত্র যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, ঐ গাড়িটা তার প্রমাণ। নীরব সঙ্ঘের সবচেয়ে তৎপর ও উপকারী সভ্য হিসেবে ঐ গাড়িটাকে ভোলা উচিত হবে না আমাদের কারো।

আতাউলের মধ্যে সব সময়েই একটা নিঃশব্দ উৎসাহ কাজ করত। যা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করত তা হল ঐ বয়স থেকেই (হয়তো আরো আগে থেকেই) আতাউল এ্যাপয়েন্টমেন্ট খাতা রাখত, ঘড়ি ধরে চলত এবং কখনো কোথাও আগে থেকে যাবার কথা ঠিক থাকলে আমাদের সবচেয়ে উৎসাহী অভিযানে যোগ দেবার প্রস্তাবও নির্মমভাবে নাকচ করে দিতে পারত। ঠিক প্রবৃত্তি-তাড়িত বলতে যা বোঝায়, আতাউল তেমনটা ছিল না। এই আপাত নীরবতার আড়ালে ওর ভেতরকার নিঃশব্দ উষ্ণ মানুষটি, সহৃদয় বন্ধুটি, আমার ধারণা, এখনো অনেকের কাছেই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

কৈশোরিক স্নিগ্ধতা, উৎসাহ আর অজস্র প্রাণপ্রাচুর্যে মুখর ছিল আনোয়ার—নীরব সঙ্ঘের সব উদ্দীপনার অন্যতম সজীব উৎস। পুলকে, শুধু অকারণ পুলকে জেগে ওঠা একটা প্রাণ যে একটা গোটা দলকে কেমন মাতিয়ে রাখতে পারে আনোয়ার ছিল তার প্রমাণ। এছাড়াও ছিল মেধাবী হাসান ইমাম, উৎসাহী হাসান (মাহমুদুল হাসান), সূক্ষ্ম কৌতুকরসসম্পন্ন মাসুদ (নূরুউদ্দীন আহমদ আল মাসুদ), সাইফুদ্দিন (সাইফুদ্দিন আহমেদ) নীরব সঙ্ঘের প্রথম সদস্য যাকে কয়েকদিন আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিকভাবে আমরা হারিয়েছি—এমনি দলের চেতনাকে হালকাভাবে ছুঁয়ে-যাওয়া আরও অনেকে।

ছাত্র হিশেবে নীরব সঙ্ঘের সভ্যেরা প্রায় সবাই ছিল মেধাবী—সবাই প্রায় নিজ নিজ বিভাগের সেরা ছাত্র। এর স্বাভাবিক ফল ফলতে দেরি হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হতে-না-হতেই ছাত্রসম্প্রদায়ের সে যুগের সেই কাম্য গোলাপ—সেই ইংরেজি অক্ষর তিনটির পেছনে—অনিবার্যভাবে, প্রায় ভূতগ্রস্তের মতন, ছুটে গিয়েছিল সঙ্ঘের অধিকাংশ সভ্য আর তাদের সহযাত্রী বন্ধুরা। কেউ কেউ অধ্যাপনার খাতায় নাম লেখাতে ছুটেছিল। বাকিরা অন্যান্য দিকে। সভ্যদের মেধা বিফলে যায় নি—উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা জুটেছে প্রায় সবার জীবনে।

আতাউল ক্যাবিনেট সচিব; মওলা, আনোয়ার, সাইফুদ্দিন, মাসুদ হয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আমলা; মনিরুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; হাসান ব্যারিস্টার এবং একপর্যায়ে রাষ্ট্রদূত তারও পরে বিচারপতি; হাসান ইমাম আন্তর্জাতিক আমলা আর মোশতাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করে সেই যে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিল, এখন পর্যন্ত ওখানেই রয়ে গেছে।

আমাদের ছোট্ট সঙ্ঘটির উত্থান-পতনের বিত্তহীন ইতিহাসের মোটামুটি এখানেই সমাপ্তি। কয়েকটা দিনের কিছু বিচ্ছিন্ন স্মৃতি, চকিত কিছু মুহূর্তের সোনালি উদ্ভাস আর অন্ধকার। আর কিছু নয়, কোনো বৈভবই নয়। কিন্তু উদ্দীপিত তারুণ্যের সেই মদির দিনগুলোয় অসম্ভবের যে দুর্লভ স্বপ্ন সবাইকে উদগ্রীব করে আমাদের সামনে থেকে সে সময় মিলিয়ে গিয়েছিল তার আলোড়ন আজো থামল না।

৪

প্রায় প্রতিদিনই আশা করছিলাম অভাবনীয় কিছু ঘটবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটার আদৌ কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একবার সবাই মিলে ঠিক করলাম রেডিওতে যাব। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান করব সেখানে। এই অভাবিত দলের সরব পদপাতের খবরটা সবার কাছে জানাতেই হবে। পৌঁছাতেই হবে।

তখনও টেলিভিশন আসে নি এদেশে। সে সময় রেডিওই আমাদের কাছে টেলিভিশন। রেডিও তখন প্রতি ঘরে প্রতিটা আঙিনায় শব্দিত উচ্চকিত একটা সরগরম ব্যাপার। ওটা একবার দখল করে ফেলতে পারলে আর কী চাই—কে ঠেকায় আমাদের।

কিন্তু রেডিও অফিসে দু-চার দিন ঘোরাঘুরি করেই বুঝলাম ওটা হবার নয়। এর জন্যে যেসব প্রাণঘাতী পরীক্ষার কথা শোনা গেল তা শুনে বুক শুকিয়ে উঠল। অগত্যা দল বেঁধে লেগে গেলাম ফররুখ আহমদকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজনে। কিন্তু যাঁকে এই সংবর্ধনা তিনি নিজেই বেঁকে বসায় সে চেষ্টাও মোটামুটি মাঠেই মারা গেল। ফলে নিজেদের অভিমানী বিচ্ছিন্নতার জগতে হীন আত্মচর্চায় যখন অর্থহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় কাটাচ্ছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা সুযোগ—যোগ্য এবং বড়—দরোজায় এসে দাঁড়াল : রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী।

বড় এজন্যে যে, প্রচলিত ঢঙে, গতানুগতিক আয়োজনে দেশজোড়া যেসব নিম্নমানের রবীন্দ্রজয়ন্তী আয়োজিত হয়, কিংবা যেগুলো পালিত হয় আরও শ্রীহীন অমর্যাদার সঙ্গে—রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের মতো তিনজন ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতলের কবির জন্মবার্ষিকী একই সঙ্গে একই মঞ্চের ওপর তিনঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দিয়ে--প্রত্যেককে সমানভাবে অপমানিত করে—তেমন সাধারণ কিছু নয় এটি। এ হল শতবর্ষের ফুল। শত পাপড়িতে প্রসারিত, শত আলোকধারায় প্রোজ্জ্বল। হ্যাঁ, কাঁধ এগিয়ে দেবার মতো সত্যিসত্যি একটা বড় কাজ বটে। বড়, অনন্য এবং একক। আর যোগ্য এজন্যে যে, কাজটা যেমন দায়িত্ব আর দুঃসাহসে ভরা, তেমনি বিপজ্জনক। কেন এত বিপজ্জনক এখানে তার সামান্য ব্যাখ্যা দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সময়টা তখন ১৯৬০ সালের শেষের দিক। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী হবে একষট্টির মে মাসে। এটা সেই সময় যখন সমস্ত দেশ আইয়ুব খানের কঠোর সামরিক শাসনের কবলে নির্মমভাবে শৃঙ্খলিত। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে—প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা কারা, প্রাচীরের অন্তরালে। এককথায় স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সবরকম অধিকার তখন নিরুদ্ধ ও পদদলিত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সভাসমিতির চত্বরগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর শীতল নীরব স্থবিরতা। 'গান বন্ধ কর তোরা নর্তকী নাচের মুদ্রা ভোল' (শামসুর রাহমান)—এরকম একটা ক্রুদ্ধ আদেশে সমস্ত সাংস্কৃতিক অঙ্গন ভীত এবং সন্ত্রস্ত। জাতির হৃদয় শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'র কাফ্রি তাতারীর মতই মূক এবং স্থবির।

এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উদ্যোগ নিতে যাওয়া যে কতখানি ঝুঁকির ব্যাপার তা আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। বাঙালি সংস্কৃতির যে অবদমন তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উদযাপন যে সেই প্রচেষ্টার প্রতি একটা সরাসরি প্রত্যাঘাত, তা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন। কাজেই ব্যাপারটার পুরো দায়দায়িত্ব জেনেবুঝেই কাজে এগোতে হল।

মনে আছে একদিন সন্ধ্যার দিকে মোশতাকদের বাসা 'খেলাঘর'-এর সামনে এলিফ্যান্ট রোডের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক করলাম, ঝুঁকি যতই হোক, দায়িত্ব আমরা নেব। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার স্বভাবসুলভ ধারায়—স্বপ্নতাড়িতের মতন ; মোশতাক সিদ্ধান্ত নিল সম্পূর্ণ সুচিন্তিতভাবে। আগেই বলেছি, মোশতাকের মধ্যে যৌবনের বালখিল্য প্রগলভতা কম ছিল—ও যা-কিছু করত, বুঝে-শুনে ভেবেচিন্তেই করত। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে ও ছিল শিশুর মতন একরোখা। চিন্তাভাবনা দিয়ে ও যদি একবার কোনোকিছু ঠিক করত তবে তার জন্য যে-কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্য দিতে ও পিছপা হত না।

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মোশতাক আর আমি প্রথমেই তড়িঘড়ি দেখা করতে ছুটলাম বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সঙ্গে। সবার আগে তাঁর কথা মনে হয়েছিল দুটো কারণে। এক, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ। দুই, সে সময় ঢাকার সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কাজেই তাঁর কাছে আশ্রয়ের প্রত্যাশাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ যে তখন কী গভীর আতঙ্কের নিচে কুঁকড়ে আছে তা বুঝলাম অধ্যক্ষ হাইয়ের কাছে গিয়ে। আমাদের বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন প্রচণ্ড ধমকে উঠলেন যে আমরা হঠাৎ হকচকিয়েই গেলাম। তারপর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ক্রুদ্ধ আদেশ দিতে দিতে এই বলে আমাদের শাসিয়ে দিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর নাম যেন কোনোভাবেই ব্যবহারের অপচেষ্টা আমরা না করি। সেদিন তাঁর এই রূঢ় আচরণে যারপরনাই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু আজ যখন অনেক দূর থেকে সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করি আর মনে পড়ে প্রস্তাবটি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক হাইয়ের মুখের উপর ভীত আশঙ্কার আর্ত ছায়ারা কীভাবে নড়েচড়ে ফিরছিল তখন তাঁর সেই ব্যবহারকে আর অস্বাভাবিক মনে হয় না।

অধ্যক্ষ হাই-এর ঘর থেকে বের হয়ে মনে হল এভাবে হবে না। সময়টা সত্যিই খারাপ। কোনো একজন মানুষের কাছে গিয়ে লাভ নেই। মানুষ একা দুর্বল, একসঙ্গে হলেই তার শক্তি। সংঘবদ্ধ মানুষই দুর্লঙ্ঘ মানুষ। এখন যা কাজ তা হল সবাইকে নিয়ে সভা ডাকা। এমন বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা যেখানে মিলিত মানুষের বিপুল কণ্ঠ একসঙ্গে এমন উচ্চণ্ড হুঙ্কার তুলবে যা শুনে ভীত আতঙ্কগ্রস্ত শত্রুর দল লেজ তুলে পালিয়ে যাবে—'সিংহের হুঙ্কার উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো'।

কিন্তু কোথায় হবে সভা, কার কাছ থেকে সাহায্য পাব? ডুবন্ত মানুষ প্রাণের জন্য খড়কুটোও আঁকড়ে ধরে। ছাঁৎ করে একজনের নাম আচমকাই মনে পড়ে গেল—ড. জি. সি. দেব (গোবিন্দ চন্দ্র দেব)।* তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ, সেই সঙ্গে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ। বড় মাপের ব্যক্তিত্ব তিনি, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে। দেরি করলাম না, সোজা ছুটলাম তাঁর বাড়ির দিকে।

---

* মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত সুরসিক এবং প্রজ্ঞাবান ড. দেবের মধ্যে দার্শনিকতার একটা শরীরী রূপ চোখে পড়ত। চেহারায়, চলাফেরায়, জীবনযাপনে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক দার্শনিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের রাখীবন্ধনের মধ্যেই দর্শনের সামগ্রিকতা—রাধাকৃষ্ণণের এই ভাবধারার সর্বশেষ একাগ্র উত্তরসাধকদের তিনি ছিলেন একজন। সেকালের এই ছোট্ট শহরটার আলোকপ্রত্যাশী মানুষদের মধ্যে দর্শনোৎসাহী গুটিকয় প্রখর নাস্তিককেও দেখেছি আমরা। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক সাইদুর রহমান, জনাব আবুল হাসনাৎ, ড. ওয়াদুদ অন্যতম। বিশ্বাসকে জীবনের প্রতিটা কাজে, আচরণে বক্তব্যে সততার সঙ্গে মূর্ত করে বেঁচে গিয়েছেন এঁরা। আমাদের জাতীয় চৈতন্যে মুক্তবুদ্ধির পতন ঘটে যাবার পর, মোটামুটি সত্তরের দশক থেকেই এই প্রোজ্জ্বল প্রজন্মের উত্তরসূরীরা বিলুপ্ত হয়ে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. দেব তাঁর বাসায় সভা ডাকার ব্যাপারে মত দিলেন। উনি থাকতেন হলের প্রাধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত একটা পুরোনো একতলা গাছপালা-ঢাকা বাড়িতে। গেট দিয়ে ঢুকলেই হাতের বাঁ পাশে একটা কাঁঠালিচাঁপা গাছ—একটু খুঁজলেই কাঠালের তীব্র মিষ্টি গন্ধে ভরা দুয়েকটা ফোটা-আধফোটা ফুল পাওয়া যেত। বাড়িটা এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে—এর অবস্থানটা ছিল জগন্নাথ হলের ঠিক বিপরীত দিকে মাঠের ওপাশটার চৌরাস্তার ধারেই—এখনকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডেট কোর অফিসের পাশেই। এই বাড়িতেই উনিশ শ একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

আমরা দেরি করলাম না। বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পদ ও পেশার সব বিখ্যাত লোকদের নামের একটা লম্বা ফর্দ বানিয়ে তাদের আমন্ত্রণ করার জন্য লেগে গেলাম। সভার উদ্দেশ্য : রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা। কয়েকদিন একটানা ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে প্রায় সকলকেই যোগাযোগ করা হল। স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও দিলেন প্রায় সবাই। ঘন ঘন মাথা নেড়ে সমর্থনও করলেন এই মহৎ উদ্যোগের। ফলে বিরাট করে সভার আয়োজনে নেমে পড়তে হল। স্পষ্ট বোঝা গেল ড. দেবের ড্রয়িংরুমে এত বিপুলসংখ্যক অভ্যাগতের স্থান সংকুলান হবে না—বাসার সামনের সবুজ লনটার ওপরেই সভার আয়োজন করা উচিত হবে। নানান জায়গা থেকে সাধ্যমতো চেয়ার চেয়ে এনে গাদা করে রাখা হল লনের একপাশে। কিছু চেয়ার ডেকোরেটারের দোকান থেকেও এল। সবাই এসে পড়লে লনটাতেও জায়গা দেয়া যাবে কিনা এ নিয়েও দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে উঠল অনেকে। কিন্তু সভার সময় দেখা গেল নিমন্ত্রিতদের প্রায় সকলেই—একটা সফল চক্রান্তের নীরব অংশ হিশেবেই যেন—অনুপস্থিত। অভ্যাগতদের মধ্যে কিছু কলেজী ছাত্রছাত্রী এবং গৃহবধূকে দেখা গেল। সভাপতি ড. দেবকে দেখলাম অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে ঐ অর্থহীন শ্রোতাদের কাছেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সভার শেষে মাথা নিচু করে চশমার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি এমন নিঃশব্দে বিদ্রূপমধুর হাসলেন যার অর্থ একটাই : কেমন, হল তো? আমরা শ্রান্ত মনে ভারী শরীরটাকে কোনোমতে টেনে দাঁড় করিয়ে চেয়ারগুলোকে জায়গামতো ফেরত দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

দু'দুবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ঠিক হল যে এভাবে চলবে না—আরও চতুরভাবে এগোতে হবে। কাজ করতে হবে বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে, সুস্থির পা ফেলে। এর জন্যে যদি মিথ্যা বা অন্যায়ের আশ্রয়ও নিতে হয়, তবে তাই সই।

ঠিক হল, প্রথমেই যেটা চটপট গঠন করে ফেলা দরকার সেটা হচ্ছে শতবর্ষ উদযাপনের আহ্বায়ক কমিটি। কিন্তু এই ত্রাসের রাজ্যে, এই সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার ভেতর কে রাজি হবেন এই কমিটির সভাপতি হতে? কে স্বেচ্ছায় মাথায় নিতে চাইবেন এই বিপজ্জনক ঝুঁকি আর দায়িত্ব? কে হতে চাইবেন সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদক? কারা কাঁধ এগিয়ে দেবেন সহ-সভাপতি বা অন্যান্য পদ গ্রহণের জন্য? সারাদেশ এখন অসুস্থ, স্তব্ধ। চারপাশে সবকিছু মৃত, নিষ্পত্র, ঊষর।

হঠাৎ আশার একটা ক্ষীণ আলো যেন ঝলকে উঠল দলের সদস্যদের সামনে। না, আছে। আছে কেউ কেউ এখনো এদেশে। সর্বজয়ী ত্রাস এখনো সবাইকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে নি। অনেকের মধ্যে অন্তত একজন এমন মানুষের কথা ভাবা যায়—অত্যন্ত দ্বিধাহীনভাবেই ভাবা যেতে পারে—তিনি বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ। হ্যাঁ, সুযোগ্য, সর্বজনস্বীকৃতভাবেই তিনি অলংকৃত করতে পারেন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সভাপতির পদ। গতানুগতিক বুদ্ধিজীবীদের থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের মানুষ তিনি—বিচারপতি হিশেবেও নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিগত গুণপনা অনেক। সাহিত্য-দর্শনসহ জ্ঞানের অনেক শাখায় সুপণ্ডিত—সৎ এবং নিরাপোষ বক্তব্যের জন্য সর্বমহলে সম্মানিত। সম্পর্কসূত্রে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ভাগনে তিনি এবং বিখ্যাত স্যার জাকারিয়ার জামাতা। বিচারপতি মোর্শেদ পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে পাকিস্তানি শাসকদের কাছেও শ্রদ্ধেয়। ব্যস, আর দেরি নয়। এখন যা করণীয় তা হল ঐ পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করানো। যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক, সম্মত করাতেই হবে তাঁকে। স্বাভাবিক পথে না হলে ধূর্ততা বা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে হলেও তা করতে হবে। তাঁকে ছাড়া চলবে না কিছুতেই। কমিটিকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে না। শতবার্ষিকী ভেঙে যাবে।

কমিটির সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাঁর নাম চট করেই মনে এসে গিয়েছিল তিনি ড. খান সারওয়ার মুরশিদ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সুদর্শন অধ্যাপক। পরিচ্ছন্ন শিল্পরুচি, বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত মননের অধিকারী ড. মুরশিদ চারুভাষিতা এবং সুস্মিত ব্যক্তিত্বের জন্য সবার প্রিয়। কিছুদিন আগেই তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং নিরলস পরিশ্রমে পূর্ব পাকিস্তানের দশ বছরের সাহিত্যের ওপর কয়েকদিনব্যাপী এক বহুতলস্পর্শী সেমিনার-ক্রম আয়োজিত হয়ে গেছে। একবাক্যে তাঁর ব্যাপারে সবাই সমর্থন জানাল। সহ-সভাপতি হিসেবে ড. জি. সি দেবের নাম মুহূর্তে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়ে গেল।

কিন্তু দেশের এই পরিস্থিতিতে এই কমিটির সভ্য হবার জন্যে তাঁরা কি সহজভাবে এগিয়ে আসবেন? আর কেনই বা আসবেন তাঁরা। কিন্তু ওসব ভাবলে আর চলবে না এখন। রাজি তাঁদেরকে করাতেই হবে। আগেই তো ঠিক করে নিয়েছি এর জন্যে প্রয়োজনে ছল-চাতুরি, মিথ্যা, কূটকৌশল—কোনোকিছুর আশ্রয় গ্রহণেই পিছপা হওয়া যাবে না।

আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম এই ভেবে যে, এই তিনজনকে যদি আমরা শতবার্ষিকী কমিটির ঐ তিনটি প্রধান পদে পেয়ে যাই তবে অন্য পদগুলো পূরণ করে নিতে কষ্ট হবে না। সুতরাং এখন যা করণীয় তা হল বুঝে-শুনে সতর্কতার সঙ্গে প্রকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দেশ্যের দিকে পা ফেলা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারপতি মোর্শেদের কাছে পৌছানো যায় কীভাবে? উনি একেই বড় মানুষ—তাতে বিচারপতি অর্থাৎ খানিকটা জনবিচ্ছিন্ন। হঠাৎ দলের কে একজন বলে উঠল, বিচারপতি মোর্শেদের একজন আত্মীয় তার চেনা—তাঁর মাধ্যমে চেষ্টা করে দেখা অসম্ভব হবে না। একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম সবাই : ইউরেকা! তাহলে আমাদের ঠেকায় কে? হ্যাঁ, আশার আলো আছে বৈকি! কাজে নামলে, চেষ্টায় সৎ থাকলে, পথ একটা খুলে যায়ই।

চাতুরির প্রথম শিকার হলেন ড. খান সারওয়ার মুরশিদ। পরের দিন প্রথমেই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। পুরো চক্রান্তের নীল-নকশা আগে থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, এখন দরকার এর সতর্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ।

তাঁর সঙ্গে কথা বললাম মোশতাক আর আমি। প্রতিনিধি দলের মধ্যে মওলা আর আতাউলও ছিল। ওরা ইংরেজির ছাত্র। সুতরাং বিভাগীয় অধ্যাপকের প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ উপস্থিতির দ্বারা সমর্থন যুগিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের সঙ্গে শুরু হল আমাদের সরাসরি হটকারিতার পর্ব। সোজা বললাম, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজের প্রাথমিক পর্ব চলছে। উদযাপন কমিটি গঠনের কাজও খানিকটা এগিয়েছে। বিচরাপতি মোর্শেদ সভাপতি হতে রাজি হয়েছেন। আপনি সাধারণ সম্পাদক হতে রাজি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করা যায়।

বিচারপতি মোর্শেদের রাজি হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে দেখা যে কবে হবে তারই কিছু ঠিক নেই, আদৌ দেখা হবে কিনা তাও সন্দেহজনক, অথচ অকপটে ড. মুরশিদকে বলে ফেললাম কথাগুলো। মানুষ এমনি করে। এভাবেই ডুবন্ত মানুষ বেঁচে থাকতে চায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, নির্বোধও এমন জায়গায় অনায়াসে চলে যায় যেখানে দেবদূতেরা যেতে ভয় পায়। কোনো আশাই নেই, তবু বুকের ভেতর কে যেন আশ্বাস দিয়ে যায় : হবেই।

প্রস্তাব শুনে ড. মুরশিদ হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, একটু ভেবে নিতে চাই। কাল উত্তর দেব।

দায়িত্বের বিপজ্জনক দিকটা কারো অজানা ছিল না। দেশের এমন অবস্থায় তাঁর সময় নেবার এই ব্যাপারটা নেহাত স্বাভাবিক। তাছাড়া একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে সবদিক না-ভেবে কোনোকিছুতে রাজি হয়ে যাওয়াও সঙ্গত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা মুহূর্তে আমাদের ভীত করে তুলল। যদি এই একদিনের মধ্যে ড. মুরশিদ বিচারপতি মোর্শেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বসেন? ফোনে কথা বলে সবকিছু জেনে যান? ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলাম। ভরসা কেবল এই, আমরা সবাই তাঁর প্রিয় ছাত্র। এতটা সন্দেহ আমাদের হয়তো তিনি করবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি, ঘটনাটা যদি আজকে ঘটত তবে নিশ্চয়ই তিনি এই ন্যূনতম যোগাযোগটুকু করতেন। ছাত্র হিসেবে যত প্রিয়ই আমরা হই, ঘটনার সত্যতা–যথার্থতা যাচিয়ে–খতিয়ে না দেখে কিছুতেই তিনি এগোতেন না। নিজের বিপদের দিকটা নিয়ে ভাবতে চাইতেন। কিন্তু ড. মুরশিদ আমাদের প্রত্যেকটা কথাকে অকপটে বিশ্বাস করে নিলেন। আজকের তুলনায় সেটা ছিল অনেক বেশি বিশ্বাসের যুগ। অন্যের কাছে প্রতিনিয়ত ঘা খেয়ে প্রতারিত হয়ে মানুষের হৃদয় তখনো আজকের মতো এতটা মুখ পুড়িয়ে ফেলে নি।

পরের দিন ড. মুরশিদ সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণে তার সম্মতির কথা আমাদের জানালেন। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ড. মুরশিদকে যেদিন প্রস্তাব করেছিলাম সেদিন বিকেলেই একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করে ড. দেবকে কমিটির সহ–সভাপতি হবার অনুরোধ জানালাম। তিনি আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে মিথ্যাটা হল আরও এক প্রস্থ বড়। তাঁকে বলতে হল বিচারপতি মোর্শেদ এবং ড. খান সারওয়ার মুরশিদ যথাক্রমে কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হতে রাজি। তিনি সহ–সভাপতি হলে ভালো হয়। প্রস্তাবমাত্র তিনি সম্মতি দিলেন। আমাদের বুকের ভার আরও নেমে গেল।

এখন আমাদের শেষ ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু বিচারপতি মোর্শেদ। কেবল প্রধান নয়, অনিবার্য। রাজি তাঁকে করাতেই হবে। কিন্তু না হলে? তার সম্ভাবনাই তো শতকরা নিরানব্বই ভাগ। নাহ্, আর ভাবা যায় না। আমাদের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যাবে—মুখোশ খুলে পড়বে—আর সব্বার সামনে আমাদের সাকুল্যে যে সুনামটুকু আছে, তা? ... থাক সে সব কথা!

সৌভাগ্যবশত বিচরাপতি মোর্শেদ দুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় দিলেন আমাদের। উৎসাহে লাফিয়ে উঠলাম। একটা আশার ঝলক দিয়ে গেল চোখের সামনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'জীবনের পিছে মরণ ছুটিছে আশার পিছনে ভয়'–এর মতোই আমাদের অবস্থা একই সঙ্গে শোচনীয়। যদি তিনি রাজি না হন, আমাদের কথাবার্তাকে বালখিল্যের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেন, আমাদের মতো নামগোত্রহীন অপরিচিত গুটিকয় ছাত্র কতটুকুই বা প্রভাব খাটাতে পারবে তাঁর ওপর। তীরে এসে তরী ডুবে যাবে।

নিজেদের বুকের ভেতরকার ঢিপঢিপ শব্দ শুনতে শুনতে একদিন দল বেঁধে বিচারপতি মোর্শেদের বাসায় হাজির হলাম।

ড. মুরশিদ এবং ড. দেবের কাছে আমাদের মিথ্যাকথা বলতে হয়েছিল বিচরাপতি মোর্শেদের কাছে মিথ্যাকথা বলার হাত থেকে বাঁচার জন্য। ড. মুরশিদ বা ড. দেব দুজনের কারো সঙ্গেই মিথ্যা বলার মতো সম্পর্ক নয়—দুজনকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। তবু তাঁদের সঙ্গে যে মিথ্যাচার আমরা করতে পেরেছিলাম, তার কারণ, হৃদয়ের ভেতর আমরা জানতাম তাঁরা আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের শিক্ষক। অপরাধ করে ক্ষমা চাইলে, তাঁরা ফিরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে পারবেন না। কিন্তু বিচরাপতি দূরের মানুষ, তাঁর সঙ্গে মিথ্যার অবকাশ নেই।

বিচারপতি মোর্শেদ থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই একটা পুরোনো লাল দোতলা বাড়িতে—সলিমুল্লাহ হল, বৃটিশ কাউন্সিল আর জগন্নাথ হলের মাঝখানটায় একটা সবুজ তিনকোণা জায়গার ওপর ছিল বাড়িটা। (বাড়িটা সম্প্রতি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।) বিরাট এলাকা জুড়ে সবুজ গাছপালায় ছাওয়া একটা বাড়ি—চারপাশে বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত পাখি-ডাকা সবুজ গাছপালার জগৎ। ১৯০৫ সালে ঢাকা রাজধানী হয়ে যাবার পর মন্ত্রীদের থাকার জন্য রমনার সবুজ এলাকায় বিরাট বিরাট জায়গা জুড়ে যেসব লাল রঙের দোতলা বাড়ি তৈরি হয়েছিল, এটি তারই একটি।

গেট দিয়ে ঢুকেই বাড়ির বসার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম আমরা। বাড়িটার পরিচ্ছন্নতা এবং পারিপাট্য চোখে পড়ার মতো। দোতলায় বিচরাপতি মোর্শেদের ঘরে ডাক পড়ল আমাদের। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেয়ালে বিচরাপতি মোর্শেদের স্ত্রীর ছবি দেখলাম। রূপের খ্যাতিতে তাঁর স্ত্রী তখন ঢাকা শহরের কিংবদন্তি। কলকাতার স্যার জাকারিয়ার একমাত্র মেয়ে তিনি।

বিচারপতি মোর্শেদের সঙ্গে অনেক কথা হল। আলোচনার মাঝামাঝি সময়ে মোর্শেদ-গৃহিণীও এদিক ঘুরে গেলেন। মিষ্টি হেসে দুয়েকটা কথাও বললেন আমাদের সঙ্গে। সত্যি, অসামান্য রূপসী তিনি।

বিচারপতির কাছে মিথ্যা বলার কিছু ছিল না। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটির প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে জানালাম যে ড. মুরশিদ এবং ড. দেব যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি হতে রাজি আছেন—তিনি সভাপতি হতে রাজি হলে কমিটি গঠিত হয়ে যেতে পারে। কথাগুলো বললাম শান্তভাবেই, কিন্তু বুকের ভেতর তখন আমাদের উত্তেজনার উথালপাতাল। তিনি রাজি না হলে আমরা কী করব। প্রস্তাব শুনে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। হয়তো ভেবে নিলেন আদ্যোপান্ত। আমাদের হৃস্পন্দন দ্রুততর হল। একসময় তিনি মুখ খুললেন। হ্যাঁ, তিনি রাজি। স্বস্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল আমাদের। না, আর কোনো ভয় নেই। সব বাধা অনিশ্চয়তার সমাধান হয়ে গেছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী হবে। এই উৎকট দম-আটকানো বিজাতীয় পরিবেশের ভেতর আবার নিজস্ব সংস্কৃতির সজীব আলো-হাওয়াকে প্রাণভরে ছুঁতে পারব আমরা। মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারব কিছুদিনের জন্য।

কমিটির বাকি পদগুলো পূরণ হয়ে গেল অতি সহজেই। যারা আগে সাড়া দেন নি কিংবা বাদ পড়ে গিয়েছিলেন তাঁরাও এবার সাহস পেয়ে মহাউৎসাহে যোগ দেবার জন্যে তড়িঘড়ি ধেয়ে আসতে লাগলেন। বিপুল উত্তাল নিষ্কৃতিহীন সে জোয়ার। প্রার্থীর প্রচণ্ড চাপে কমিটির আসনসংখ্যা বাড়াতে হল ব্যাপকভাবে। একসময় অধ্যক্ষ হাইকেও দেখা গেল প্রার্থীর বিনীত ভঙ্গিতে। প্রথমদিন অনুকূল হলে তিনি এই কমিটির সভাপতি হতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে দেখতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর জাতীয় কমিটি গঠিত হয়ে গেল। কমিটি যত ব্যাপক আর দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে লাগল, আমরাও ঠিক সেই পরিমাণেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে শুরু করলাম। কমিটির কাজ পুরোদমে আরম্ভ হবার পর প্রায় হারিয়ে গেলাম আমরা। আমরা যে একদিন এই আয়োজনের পুরোভাগে ছিলাম, মূল উদ্যোক্তা ছিলাম, এর প্রথম অস্ফুট চালিকাশক্তি ছিলাম—সে-কথাটা কারো কাছে আর প্রায় জানাই রইল না।

নির্ঝরিণীর গান শেষ হল, হে নদী, এখন তোমার বিরতিহীন বিশাল গল্পের শুরু : "আমি রাত্রি, তুমি ফুল ; যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি/ জাগিয়া চাহিয়াছিনু উদার আকাশ জুড়ি ;/ যখন ফুটিলে তুমি ফুরাল কাল,/ আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল ;/ এখন বিশ্বের তুমি।'

৫

মোশতাক আর আমার কাজ কিন্তু শেষ হল না। দুটো উপ-কমিটিতে ছিলাম আমরা। এমনিতেই অনেক কাজ ছিল আমাদের কাঁধে। এ ছাড়াও যখন যেখানে যে-কাজের দরকার এসে পড়তে লাগল কুণ্ঠাহীনভাবে এবং নিঃশব্দে তা-ই করে যেতে লাগলাম। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের আমরা এখন কেউ নই—কিন্তু এর প্রথম স্বপ্ন আমরাই তো দেখেছিলাম। এই শতবার্ষিকী তো আমাদেরই রক্তের সন্তান। কোনো কাজের দরকার এসে পড়লে আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি। আমাদের নীরব স্বেদে-ভালোবাসায় এর বর্ণিল আলোক উজ্জ্বলিত হোক।

ড. মুরশিদ এবং ড. দেবের কথা মনে হলে এখনো সংকোচ লাগে। তাঁরা ছিলেন আমাদের শিক্ষক, আমরা তাঁদের ছাত্র। আশা করি আমাদের মিথ্যাচারকে তাঁরা না-জেনেই ক্ষমা করে রেখেছেন। আমি উদ্দেশ্যের স্বার্থে উপায়ের গুণগত মানকে বিসর্জন দেবার পক্ষে নই। কিন্তু একটা ছোট্ট মিথ্যা যখন তার লক্ষগুণ সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন কী করা যেতে পারে?

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। সাতদিনব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন বিচারপতি মোর্শেদ। উনি ভাষণটা ইংরেজিতে দিচ্ছেন শুনে প্রথমটায় দমে গিয়েছিলাম। আর যাই হোক রবীন্দ্রনাথের নিজের জাতি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছে ইংরেজি বক্তৃতা দিয়ে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। বাংলাভাষার ওপর জনাব মোর্শেদের অধিকারের অপ্রতুলতার কারণে, তাঁর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই, তাঁকে এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানের শুরুতে যখন তিনি সুচারু উচ্চারণে তাঁর অনবদ্য ভাষণ শুরু করলেন তখন আমাদের সমস্ত ক্ষোভ যেন একমুহূর্তে ধুয়ে গেল। অসাধারণ বক্তৃতা করলেন বিচারপতি--আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক সুন্দর। ভাষণটা শুধু গভীরই নয়, তলদেশস্পর্শী এবং সুব্যাপ্ত। সবাই একবাক্যে এই অনন্য উদ্বোধনকে স্বাগত জানালেন। অভূতপূর্ব উদ্দীপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যদিয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী শুরু হল।

অনুষ্ঠানে বক্তা এলেন, আলোচক এলেন, নানান অঙ্গন থেকে জ্ঞানীগুণীরা এসে ভিড় জমালেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-বাদক, নতর্ক-নর্তকীদের কলকণ্ঠ আর নূপুর নিক্বণে উৎসবমুখর হয়ে উঠল চারদিক। বাঙালি সংস্কৃতির উত্তাল আলো-হাওয়াকে ফিরে পেল সারা দেশ। কেবল নীরব সঙ্ঘের নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া সদস্যরাই সেই আলোবর্ণিল মঞ্চ থেকে বাইরে রয়ে গেল।

কয়েকটা মাসের একটানা কাজে আমাদের পড়াশোনা বেদম ক্ষতিগ্রস্ত হল। তবু আমি সামলে উঠলাম—এম. এ. পরীক্ষার খানিকটা প্রস্তুতি আগেই সেরে রেখেছিলাম বলে। কিন্তু মোশতাক কিছুতেই শেষরক্ষা করতে পারল না। ও এমনিতেই ছিল ভালো ছাত্র। এম. এ.- তেও ভালো করতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত একটা বছর নষ্ট করতে হল ওকে।

তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ঘটনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। যে যৌবন প্রতিনিয়ত শ্রেয়কে স্পর্শের স্পর্ধায় জীবনকে প্রাণিত করে দুঃসাধ্যের রাস্তায়, আত্মবিস্মৃতের মতো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই যৌবনই ছিল সেদিন আমাদের একমাত্র এবং ক্ষমাহীন প্ররোচক। আর কেউ নয়। কিছু নয়। তবু আজ প্রায় তিরিশ বছর পর যখন পুরো ব্যাপারটার দিকে ফিরে তাকাই, তখন ঘটনাটার আর একটা অপঠিত পৃষ্ঠা খুলে যায় আমাদের সামনে। পুরো রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপন ব্যাপারটাকেই আমি তখন আর সাধারণ অর্থে দেখি না ; দেখি একটা ব্যতিক্রমী অর্থে। এই দেখাটা ঐতিহাসিক ; এর দৃষ্টি আমাদের সমাজের বিবর্তনের দিকে নিবদ্ধ। আমার মনে হয়, পাকিস্তানি যুগে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাকে স্তব্ধ করে দেবার পর, দীর্ঘ একদশকের ব্যবধানে, পরোক্ষ ও অঘোষিত হলেও, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন ছিল ঐ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিত্বের দ্বিতীয় প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।

১৯৮৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা ভারি অদ্ভুত। যেমন এ স্নিগ্ধ আর পবিত্র, তেমনি মধুর আর চিরদিনের। একবার ছাত্র মানে চিরদিনের জন্যে ছাত্র, একবার শিক্ষক মানেও চিরকালের জন্যে শিক্ষক। এই সম্পর্কের কোনোদিন মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ছাত্র-শিক্ষকের দেখা হোক-না কেন, সেই মুহূর্তটিতে তারা দুজন দুজনের কাছে প্রথমদিনের মতোই উজ্জ্বল আর আলোময়। এর কারণ সোজা। স্কুল,কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষকদের সামনে পায় তাদের জীবনের সবচেয়ে প্রাথমিক ও অনুভূতিময় দিনগুলোয়, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় ভরা জীবনের মহত্তম লগ্নে। অমলিন বিস্ময় আর স্বপ্নের অঞ্জন চোখে মেখে এইসময় তারা তাদের শিক্ষকদের দিকে তাকায়, শিক্ষক তাদের চোখে প্রতিভাত হয় স্বর্গের দুর্লভতম দেবতার চেহারায়। তাদের নিষ্পাপ চোখের পাতায় শিক্ষকের এই-যে দেবদুর্লভ ছবি একবার গাঁথা হয়ে যায়, সেই জ্যোতির্ময় ছবিটির কোনোদিন আর মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ঐ শিক্ষকের সাথে দেখা হোক সে তার সামনে অল্প বয়সের ঐ ছাত্র বা ছাত্রীটি হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের একটা ছোট গল্প মনে পড়ছে।

একদিন মীরপুর থেকে বাংলামোটরের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৮২ সাল। দেশে তখন সদ্য-আসা মার্শাল ল' চলছে, সেই সাথে ট্র্যাফিক সপ্তাহের কড়াকড়ি। যেখানে-সেখানে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র চেক করছে, শাস্তিও দিচ্ছে এলোপাতাড়ি। আমার গাড়িতে দুয়েকটা কাগজপত্রের গোলমাল ছিল—রোড ট্যাক্স বা ফিটনেস এমনি কিছু একটা বাকি। এমনিতে ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে কোথায় ট্র্যাফিক পুলিশ ধরে বসে, লজ্জায় পড়তে হয়। দেখে বুঝে এগোচ্ছি, সামনে সার্জেন্ট-আকীর্ণ চৌমাথা দেখলে সাবধানে এড়িয়ে চলছি, কোনোমতে বাসায় পৌঁছোতে পারলে বাঁচি। ফার্মগেট দিয়ে শহরে আসার পথে খুব একটা ট্র্যাফিকের ঝামেলা নেই, তাই সেই পথ ধরলাম। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত্রি হয়। ফার্মগেটের কাছাকাছি হতেই দেখি সেখানেও ট্র্যাফিক সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কপাল এমনি খারাপ যে মোড়ের কাছে আসতেই লাল বাতি জ্বলে উঠল। সব মিলে সোনায় সোহাগা। টিপটিপ করা বুকে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার উল্টোদিক থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যমদূতের মতো দেখতে একটা সার্জেন্ট আমার গাড়ি তাক করে এগিয়ে আসছে। অত কালো বিশাল দানবীয় সাইজের সার্জেন্ট আমি বাংলাদেশে আর দেখিনি। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তবু এসব নিয়ে আমার যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই সেটা দেখানোর জন্য মুখে নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একসময় টের পেলাম দৈত্যটা মচমচ করে ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে । আমি কাঁধের ওপর তার নিশ্বাসের শব্দ যেন টের পাচ্ছি। এবার আর তার দিকে না-তাকিয়ে উপায় নেই। ভয়ে ভয়ে একটু একটু করে তার দিকে যেই মুখ ফেরাতে গেছি, অমনি ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সেই বিশাল অভ্রভেদী দৈত্যটা যেন হঠাৎ একতাল কাদার মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেল সামনে। পুলিশি কায়দায় নয়, উপচানো খুশিতে দাঁতগুলো যথাসম্ভব উদ্ভাসিত করে, আকর্ণ হাসিতে বিস্ফারিত আনন্দ-বিকৃত গলায় কপালে হাত ঠেকিয়ে চিঁ হিহি করে উঠল: 'স্লামালইকুম স্যার' ! হ্যাঁ, বিশ-পঁচিশ বছর আগে গ্রাম থেকে পড়তে আসা কলেজের একাদশ শ্রেণীর অসহায় অপ্রস্তুত চেহারার অবিকল সেই ছেলেটি।

কিন্তু কেন এমনভাবে এলিয়ে পড়ল সে? কারণ সোজা। যেদিন সে কলেজে পড়তে এসেছিল সেদিন সে কৈশোর-অতিক্রান্ত একজন অনুভূতি-কাঁপা তরুণ। তার দুই চোখে সেদিন শুধু আবেগ আর বিস্ময় ! একটা নতুন, অপরিমেয় আর ঐশ্বর্যময় জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে সে তখন। সেদিন তার তুচ্ছ জীবনের সামনে আমরা, এই শিক্ষকরা, ছিলাম দেবতার আসনে আসীন। তার স্বপ্ন আর বিস্ময়ভরা জীবনের সবচেয়ে দেবদুর্লভ মানুষ। আজ অনেকদিন পর তার সামনে পড়তেই মাঝখানের এতগুলো দিন মুহূর্তে তার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে। সেই অসহায় করুণ ছেলেটি ভেঙে ভেঙেচুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবনের সূচনালগ্নের সেই পরাক্রান্ত কিংবদন্তিটির সামনে। সে যে আজ একজন ডাঁটপাট-ওয়ালা অফিসার,অনেক দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তা একমুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেছে তার কাছ থেকে। এর মধ্যেকার তার সব অগ্রগতি আর সাফল্য সব মিথ্যা হয়ে গেছে। বিশালকায় একটা দৈত্য একতাল কাদা হয়ে গেছে । এই হল শিক্ষকের সামনে একজন ছাত্র। শৈশবের অনুভূতিময় দিনগুলোয় যে-চোখে সে একবার শিক্ষককে দেখেছে এবং শিক্ষকের সামনে নিজেকে যা বলে অনুভব করেছে, তাঁর সামনে চিরদিন সে তাই। পরিণত বয়সের বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে সে তার চিন্তা-ভাবনার জগতে অনেক পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু কিশোর-তরুণ বয়সের এই নায়কদের ব্যাপারে তার অনুভূতির খুব একটা পরিবর্তন হয় না। হাইকোর্টের জজ বা সরকারের সচিব যে ছেলেবেলার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দেখলে আচমকা পায়ে হাত দিয়ে বসেন, এর কারণ এই। এ হল জীবনের প্রথম বিস্ময়ের সামনে মানুষের চিরকালের প্রণতি, জীবনের প্রগাঢ়তম প্রাপ্তির কাছে মানুষের সকৃতজ্ঞ ঋণস্বীকার।

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা সত্যি ভারি অদ্ভুত। আগেই বলেছি ছাত্রদের জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম নায়ক শিক্ষকেরা। কিন্তু ছাত্রও কি শিক্ষকের জীবনে এমনি অর্থময় হয়ে বেঁচে থাকেন? একজন ছাত্র তাঁর জীবনের গুটিকয় শিক্ষককে হৃদয়ের ভেতর যতবড় জায়গা দেয় একজন শিক্ষক কি তার একটিমাত্র হৃদয়ে তাঁর সারাজীবনের এত ছাত্রকে আলাদা আলাদা করে সেই জায়গা দিতে পারেন? উত্তরটা কঠিন, তবু বলতে চাই : পারেন—সুহৃদয়সম্পন্ন শিক্ষক পারেন। হয়ত একটু আলাদাভাবে, আলাদা অর্থে পারেন, তবু পারেন। একজন সত্যিকার শিক্ষকের কাছে ছাত্র কী? ছাত্র তো তাঁর আত্মার সন্তান—অচেনা, অপরিচিত, রক্তসম্পর্কহীন—দূরদূরান্ত থেকে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে তাঁরই জীবন শোষণ করে বেড়ে ওঠা তারই অনিবার্য উত্তরাধিকারী। এই ছাত্রই তো তাঁর সম্ভাবনা, বিকাশ, পরিণতি—তাঁর জীবন, জীবনের অর্থময়তা ; জন্ম এবং জন্মান্তর। তবু এটা ঠিক যে, শিক্ষক এবং ছাত্রের অবস্থান এক নয়। একজন ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি নয়, হৃদয়ের ওপর উজ্জ্বল আলো-ফেলা শিক্ষকের সংখ্যা আরও কম, কিন্তু শিক্ষকের জীবনে ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। লেখকের যেমন পাঠক, গায়কের যেমন শ্রোতা, টিভি উপস্থাপকের যেমন দর্শক, রাজনীতিবিদের যেমন জনতা, শিক্ষকের তেমনি ছাত্র। একজন শিক্ষক আজীবন দাঁড়িয়ে থাকেন ছাত্র নামের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে। লেখক, গায়ক, রাজনীতিবিদ বা টিভি উপস্থাপকের পক্ষে যেমন তার শ্রোতা-দর্শকদের আলাদাভাবে চিনে রাখা সম্ভব নয়, শিক্ষকের বেলায়ও প্রায় তাই। তবু কী করে যেন আমরা শিক্ষকেরা তাদের চিনে ফেলি। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্ক আছে তা টের পাই। ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে কোথাও একজন ছাত্র থাকলে মুহূর্তেই আমরা তাকে শনাক্ত করে ফেলি। কী করে যেন একটা গোপন অতিন্দ্রিয় ও রহস্যময় যোগাযোগ ঘটে যায়। বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে হলেও দেখামাত্র আমরা তাকে অব্যর্থভাবেই টের পাই। মায়ের মতো তার গায়ের গন্ধ চিনে ফেলি। নিজের অজান্তে, চেতনার অগোচরে ফেলি। শিশু যেমন মাকে, পাখিরা যেমন শত্রুকে, মানুষ যেমন মৃত্যুকে—আমরা শিক্ষকরা তেমনি ছাত্রকে চিনি। এই চেনা জীবনের এক গভীর তলের চেনা। এই চেনা রহস্যময় আর অলীক। কেবল মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে এর পরিমাপ করা কঠিন।

না, একজন শিক্ষক সারাজীবনের সব ছাত্রকে চেনেন না। তবু-যে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের এমন একটা সুগভীর হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার কারণ শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে আলাদাভাবে না চিনলেও তাঁর সারাজীবনের ছাত্র-পরিমণ্ডলটিকে চেনেন। এই ছাত্র-জগৎই তাঁর ঘর, তাঁর বসতবাড়ি, তাঁর দৈনন্দিন ঘরকন্নার আঙিনা। এইখানে আলোক-ভরা নীল আকাশের নিচে সুখে-দুঃখে,শীতে-গ্রীষ্মে তিনি বেড়ে ওঠেন, পূর্ণ হন। এই ছাত্র-জগৎ তার প্রথম জন্মস্থান এবং সর্বশেষ দেবালয়। এইখানে দিনের পর দিনের প্রার্থনা আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়ে তিনি পূত হন, পাপহীন হন। এইখানে ঘটে তাঁর দ্বিজত্ব ও নির্বাণ। চারপাশে জড়ো হওয়া ছাত্রদের ভেতর সারাজীবন থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে তাদের নিশ্বাস তাঁর চেনা হয়ে যায়; তাদের বুকের উত্থান-পতন, রক্তধারায় ছুটে চলা তাঁর নিজের প্রতিটি জীবকোষে তিনি অনুভব করেন।

তবে একজন সৎ শিক্ষকই কেবল এটা পারেন, অশিক্ষক নন। ছাত্ররাও সব শিক্ষককে মনে চিরজাগরূক করে রাখে না। মানুষ অত বোকা নয়। শিক্ষকের খাতায় নাম লেখালেই কেউ একজন শিক্ষক হয়ে যান না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন : সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। শিক্ষকদের বেলাতেও কথাটা একই রকম খাটে। সকলেই শিক্ষক নয়, কেউ কেউ শিক্ষক। যে-মানুষ ছাত্রদের বিকাশের ভেতর নিজের নিয়তিকে রক্তমাখা ভবিতব্য হিশেবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ছাত্রদের জীবনের ভেতর শবেবরাত রাত্রের কোটি কোটি প্রদীপের মতো জ্বলে উঠতে পারেন, তিনিই তো শিক্ষক। তাঁর স্মৃতিই তো ছাত্রের আমৃত্যু স্মরণ, তাঁর ক্বাবার দিকেই তো ছাত্রের মর্ত্যকালের নিদ্রাহীন যাত্রা।

১৯৯৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

যাকে বলে নিখাদ একেশ্বরবাদী আমি ঠিক তাই। একের বেশি প্রেম, একের বেশি ঈশ্বর, এমনকি একের বেশি কলম, জুতো, চশমা কোনোকিছুই আমার ধাতে সয় না। একের বেশি হলেই এদের নিয়ে বিপদে পড়ি আমি, কখন যে হারিয়ে যায় বুঝতে পারিনা । এই একেশ্বরবাদিতার কারণেই হয়ত সবকিছুর মতো আমার সারাজীবনের পোশাকও একটা—পাজামা-পাঞ্জাবি। অনেকদিন একটানা পরার ফলে পোশাকটা আমার চেহারার সঙ্গে এমন একাকার হয়ে গেছে যে আজ অনেকেরই হয়ত সন্দেহ হয় যে ঐ পোশাক-পরা অবস্থায় আমি এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলাম কিনা। আমার ছাত্রেরা আমার এই পোশাক দেখে সারাজীবনই অবাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে :

'আপনি কি সারাজীবনই পাজামা-পাঞ্জাবি পরেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর কোনো পোশাকই পরেন নি? প্যান্ট-শার্ট-স্যুট কিছুই না?'

'না।'

'বিদেশে গিয়েও না?'

এমনি অসংখ্য প্রশ্ন। বাইরের মানুষদের প্রশ্নও কম শুনতে হয় নি।

আমি পাজামা-পাঞ্জাবি ধরেছিলাম কলেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। ধরেছিলাম ঝোঁকের মাথায়। যে-আকাশস্পর্শী স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে বোকা যৌবন অহেতুক আত্মবিসর্জন করে নিঃশেষ হয়ে যায় সেই ধরনেরই ঝোঁকের মাথায়। কলেজে ওঠার উপহার হিসেবে আব্বা আমাকে প্যান্ট-শার্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন, আমি সেটা পরিনি। এর বদলে আমি পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে শুরু করেছিলাম । আমি দেখেছিলাম সেকালে জাতীয় বীরেরা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা, বন্দিত পূজনীয় ব্যক্তিরা পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন। সুতরাং এটাই যে এ-জাতির শ্রেষ্ঠ পোশাক তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। প্যান্ট-শার্টকে আমার কাছে সে-সময় স্বার্থলিপ্সু মানুষের সুবিধাবাদী পোশাক মনে হত। পাজামা-পাঞ্জাবিকে মনে হত সরল অনাড়ম্বর, আত্মত্যাগী মানুষের প্রতীক। কাজেই একজন আদর্শ-মনোভাবাপন্ন তরুণ-যে ওদিকেই কিছুটা ঝুঁকে পড়বে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কেবল আমি নই, আমাদের সময়কার সংস্কৃতি-জগতের প্রায় সবার গায়ে ছিল এই

পোশাক। যে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী জলবায়ুতে এই সনাতন পোশাকটি সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল, ব্রিটিশরা চলে যাবার পর, সেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে পাঞ্জাবির জনপ্রিয়তাও কমে এসেছে। দৈনন্দিন পোশাক হিসেবে পাঞ্জাবি এখন প্রায় লুপ্ত। আমাদের সংস্কৃতি-জগতেও চার-পাঁচজনের বেশি মানুষ এখন আর পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন না। দৃষ্টিনন্দন রূপে কারুকাজ-করা পাজামা-পাঞ্জাবি এখন কেবলই একটি আনুষ্ঠানিক পোশাক—জমজমাট সান্ধ্য আসর, মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,পয়লা বৈশাখ বা একুশে ফেব্রুয়ারির মতো বিভিন্ন উৎসবে ফ্যাশান-দুরস্তদের দেশপ্রেম আর সৌন্দর্যবোধ প্রদর্শনের সৌকর্যময় নামাবলি কেবল।

আবেগের মাথায় আমি পাঞ্জাবি পরতে শুরু করলেও ঐ ঝোঁকের বশেই যে আজও আমি পাঞ্জাবি পরে চলেছি তা নয়। এটা ঠিক যে পাজামা-পাঞ্জাবি পোশাকটা মনের মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গ আর শাদামাঠা একটা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে যা আমার ভালো লাগে। পৃথিবীর সব সহজ মানুষই চিরকাল শাদামাঠা পোশাক পছন্দ করেছেন। সরল জীবনের মতো আমার কাছেও সরল পোশাকই ভালো লাগে। শাদামাঠা শার্ট-প্যান্টও এমন কোনো অসরল পোশাক নয়। অনয়াসেই ওটা আমি পরতে পারতাম। কিন্তু পাঞ্জাবি ছাড়া কখনো আমি যে সারাজীবন আর কিছু পরতে পারিনি তার কারণও আমার এই শিক্ষক-জীবন। কেন, সেটা বলার জন্যেই এত কথা।

ছাত্রছাত্রীরা যখন স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে থাকে—বিশেষ করে স্কুল কলেজ পর্যায়ে—তখন তারা থাকে জীবন-বিকাশের সবচেয়ে প্রাথমিক অনুভূতি-কাঁপা, করুণ ও অসহায় পর্যায়ে। ক্ষণিক,অনিত্য ও পরিবর্তনশীল মানবজীবনের অর্থহীনতা এই সময় তাদের উৎকণ্ঠিত ও অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার ভেতর ফেলে। পায়ের নিচে মাটি না পাওয়ায় এই অপসৃয়মাণ পৃথিবীটার ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা এই সময় হয়ে ওঠে মরিয়া। এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে তারা এমন কিছুকে খুঁজতে থাকে যা স্থায়ী ও ধ্রুব—এই বিশাল ঝঞ্ঝাসঙ্কুল জীবনপারাবারে যা তাদের অন্য তীরে পৌঁছে দিতে পারবে। এইজন্যে এইসময় তারা খুঁজে বেড়ায় ন্যায় ও অপরাজিত সত্যকে, স্থির ও অপরিবর্তনীয়তার নির্ভরযোগ্য নোঙরকে, এককথায় চিরকালীনতার সত্য পৃথিবীকে। চিরন্তনকে না পেলে সে ভেঙে পড়ে, অসহায় আর বিপন্ন বোধ করে। মুরশিদি গানে আছে :

ও মন গুরু ভজ রে
ওরে সোনার চান
নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান
কে দিবে আসান।

আধ্যাত্মিক শিশুর মতো মানবশিশুও একইরকম—নীল দরিয়ার উত্তাল তুফানের আসানকারীকে সে খুঁজে বেড়ায়, তাঁর হাতে হাত রেখে নিজের অস্তিত্বের ধ্রুবত্বকে নিরঙ্কুশ করতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা আধ্যাত্মিক গুরুর চেয়ে খুব একটা কম নয় এবং বাপ-মার চেয়ে অনেকখানিই বেশি। এ যে কতটা বেশি একটা গল্প বলে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি। আমার বড়মেয়ে তখন ক্লাস ফোরে পড়ে। একদিন ওর খাতায় একটা ভুল বানান চোখে পড়ল। বললাম, বানানে ভুল কেন? ও বলল, কই দেখি তো? বলে খাতাটা ভালোভাবে নেড়েচেড়ে বলল, ঠিকই তো আছে। বললাম, কীভাবে বুঝলে ঠিক আছে? ও নির্বিকারভাবে বলল, স্যার বলেছে। স্যার ওকে কিছু বলেন নি, স্যার যে ওর বানান কাটেন নি এটুকু দেখেই ও নিশ্চত হয়েছে যে ওর বানান নির্ভুল।

খানিকটা চটে গিয়ে বললাম, তুমি কি জানো তোমার স্যার আমার ছাত্র । আমিই ওকে শিখিয়েছি। আমি বলছি ওর ভুল হয়েছে।

আমার কথা লুফে নিয়ে ও বলল : তুমি তাঁর স্যার হতে পার, আমার তো স্যার না!

একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে 'স্যার' এতখানিই গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক শিশুদের কাছে মুর্শিদ যেমন শিক্ষকও তার কাছে তেমনি—তার আশ্রয়, উদ্ধার,পথনির্দেশদাতা এবং তার মনোজগতের চিরন্তনতার প্রতীক। চারপাশের সবকিছুর মধ্যেই ঐ সময় সে তার ঐ আকাঙ্ক্ষিত ধ্রুবকে প্রত্যাশা করে, শিক্ষকের কাছে এই দাবি তার সবচেয়ে বেশি। শিক্ষককে সে একটা অবিচল অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসেবে দেখতে চায়, এতে তার আত্মায় জোর আসে। এইজন্যে উক্তিতে, কাজে, আদর্শে, মূল্যবোধে শিক্ষক যদি কথায় কথায় পাল্টাতে থাকেন, ডিগবাজি খেতে থাকেন, তাহলে সে অসহায় বোধ করে, তার ভেতরটা ঝাঁকি খেয়ে এলোমেলো হয়ে যায়, যেমন আমাদের এলোমেলো হয়ে যায় রাজনীতিবিদদের কথায় কথায় ডিগবাজি খেতে দেখলে। শিক্ষক আদর্শ পাল্টাতে থাকলেই কেবল এমন হয় তা নয়, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ সবকিছু নিয়েই তার ভেতরে এটা ঘটে। একজন শিক্ষকের বাইরের চেহারাটা যদি ঘন ঘন পাল্টাতে থাকে,—আজ তিনি স্যুট পরলেন তো কাল পরলেন পাজামা-পাঞ্জাবি,আবার পরশু দুটোকেই বাদ দিয়ে ধুতি পরেই চলে এলেন ইশকুলে, একদিন দাড়ি রাখলেন তো আরেকদিন পুরো ক্লিনশেভ হয়ে এলেন, আবার আরেকদিন স্কুলে এলেন শুধু একগালে দাড়ি রেখে—তবে তা ছাত্রের মনকে মহা গোলমালে ফেলে। ছাত্র তখন শিক্ষককে ঠিকমতো চিনে উঠতে পারে না, তার আকাঙ্ক্ষিত ধ্রুব জগতের প্রতীক হিসেবে তাঁকে খুজে পায় না, শিক্ষককে নির্ভর করে শক্তিমন্ত ও চিরন্তন জগৎ রচনার তার যাবতীয় উদ্যোগের ওপর নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসে।

শিক্ষকদের এইসব ছোটখাটো পরিবর্তন ছাত্রদের মনোজগতকে যে কতখানি ওলটপালট করে দেয় আমার জীবনের একটা গল্প দিয়ে তার উদাহরণ দিই। ১৯৭৫ সাল। একটা জমজমাট বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান শুরু করেছি টেলিভিশনে। টেলিভিশনের বৈভবের জগতে আমি সবসময়েই চালচুলোহীন ভিখিরি, শাদামাঠা পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই আজীবন অনুষ্ঠান করেছি। কিন্তু অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে সেবার সত্যি সত্যি জমকালো পোশাক পরার দরকার হল। কিছু না হোক, নিদেনপক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা আকর্ষণীয় পাঞ্জাবি না হলে যেন আর চলেই না। ফ্লোরের বর্ণাঢ্য জগৎ, বড়বড় তারকা আর সুন্দরীর পদপাতে চমকানো পৃথিবীতে নিজেকে সত্যি সত্যি নিষ্প্রভ মনে হবে। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কারুকাজ-করা পাঞ্জাবি পরার সিদ্ধান্ত নিলাম। না, এমন কিছু কারুকাজ নয়; নেহাতই বুক আর হাতের দুপাশে দেখা-যায় কি না-যায় এমনি কিছুটা হালকা নকশার অল্প আঁকিবুকি, যাতে শিক্ষকতার মানও বজায় থাকে, আবার টেলিভিশনও বেঁচে যায়। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটা-যে ছাত্রের হৃদয়কে কতটা অসহায় করে তুলতে পারে তা বোঝা গেল পরের দিন কলেজে পা দিয়ে। কলেজের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, একটা নিরীহ গোছের ছেলে আমার কাছে এসে বিনীত স্বরে বলল, আমার সঙ্গে সে কিছু কথা বলতে চায়। আমি তাকে কিছুটা দূরে, একটা নিরালা জায়গায় নিয়ে তার কথা বলতে বললাম। সে সরাসরি আমাকে বলল, 'গতকাল টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে আপনি একটা রঙচঙা পাঞ্জাবি পরেছিলেন'—বলেই সে চুপ করে রইল। আমি তার গলার স্বর থেকে টের পেলাম ব্যাপারটা তাকে ব্যথিত করেছে। আমি অপরাধীর মতো তার অভিযোগ স্বীকার করে কৈফিয়তের সুরে বললাম, 'টেলিভিশনের ব্যাপার তো, একটু পড়তে হয়েছে আর কি।' সে খানিকটা চুপ করে থেকে ধরা-গলায় বলল, টেলিভিশন আপনার কাছে অত জরুরি হলে টেলিভিশনেই থেকে যাবেন, কলেজে আসবেন না।' আমি তার কথায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। সে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার জন্য আমাদের সবার একটা শ্রদ্ধার অনুভূতি আছে। সেটাকে অপমান করার অধিকার আপনার নেই।' দেখলাম সে কথা বলতে পারছে না, তার গলার স্বর আটকে আসছে।

আজ বুঝি শ্রদ্ধার অনুভূতি বলতে সে ধ্রুবত্বের অনুভূতি বুঝিয়েছিল—সেই ধ্রুবত্ব যাকে সে গভীরভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। এসব থেকেই বোঝা যায় শিক্ষকের ভাবমূর্তিগত অপরিবর্তনীয়তার ব্যাপারে ছাত্রেরা কতখানি অনমনীয়। মায়ের প্রেমিকের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের যে-মনোভাব, শিক্ষকের ওলটপালট খাওয়ার ব্যাপারেও ছাত্রদের মনোভাব তাই। এটা তারা সহ্য করতে পারে না। এর ভেতর তারা তাদের অস্তিত্বের আশঙ্কাজনক বিপর্যয় দেখতে পায়।

১৯৯৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতির পিতার মৃত্যু

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্টের ভোর। ঘুম ভাঙি-ভাঙি করলেও ঘুমের আমেজ তখনো শরীরকে অসার করে রেখেছে। চারপাশের সবকিছু টের পাচ্ছি, তবু জেগে উঠিনি ঠিকমতো। গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টাসে আমার বাসা। রাতে ঘুমোতে দেরি হয়েছিল, তাই এমন আড়ষ্টতা শরীরকে অসার করে রেখেছ। সেই আধো-ঘুম আধো-জাগরণের ভেতর, হঠাৎ, মোহাম্মদপুরের দিক থেকেই বোধহয়, কিছু অস্ফুট গোলাগুলির শব্দ কানে এল। না, সংঘর্ষ বা যুদ্ধজাতের কিছু নয়, নেহাতই পিটপিট জাতের কিছু শব্দ, নেহাতই নিরাপদ ধরনের কিছু গোলাগুলির আওয়াজ। একটানা নয়, থেকে থেকে, মাঝেমধ্যে। উনসত্তুর থেকে শুরু করে একটানা ছ-সাত বছর ধরে এমনি গোলাগুলির শব্দ আমরা শুনে আসছি। এতে আমরা অভ্যস্ত। যুদ্ধের শব্দ থেকে শুরু করে সংঘর্ষ, সন্ত্রাস, এসবের কোনোকিছুর শব্দেই আমরা আর বিস্মিত হই না। সব চেনা, সবই সয়ে যাওয়া। মুহূর্তের জন্যে সজাগ হয়ে আবার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভাঙল সবার হৈ চৈ-য়ে। শুনলাম জাতির পিতা নিহত হয়েছেন। রেডিওতে খবর বলছে। ছুটে গিয়ে রেডিও খুললাম। মেজর ডালিমের কণ্ঠ ভেসে এল : খুনি মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

সেই সামান্য গোলাগুলির শব্দগুলো ফিরে ফিরে কানে বাজতে লাগল। সেই সামান্য কটা পিটপিট আওয়াজ, শুনে যাকে একেকবার মনে হয়েছিল খেলনা পিস্তলের শব্দ, এমন সুবিশাল মহীরুহের পতন ঘটিয়ে দিয়েছে! দুঃখ-শোক, জেল, সংগ্রাম, পাকিস্তানের দুর্জয় সেনাবাহনী ও তাদের দুর্ধর্ষ অস্ত্রশক্তি যাঁকে ধ্বংস করতে পারেনি, কয়েকটা তুচ্ছ বুলেট তাকে স্তব্ধ করে দিল? বুলেট কি এতই শক্তিশালী? যে-মানুষটিকে একেকবার মনে হয়েছে সেনাবাহিনীর চাইতে দুর্জয়, বাংলাদেশের চাইতে বড়, সে এত অসহায়? হায়, মানুষের শরীর এত নশ্বর, এত সামান্য!

কটা গুলির শব্দ শুনেছিলাম সকালে? হয়তো বিশ, হয়তো পঞ্চাশ, হয়তো একশ। যতগুলোই হোক, তার মধ্যে মুজিব-হত্যার গুলির শব্দটিও নিশ্চয়ই ছিল। আমি জানি না ঠিক কোন্‌টা, কিন্তু জানি, যে-গুলিটি তাঁকে হত্যা করেছিল তার শব্দটি আমি শুনেছিলাম। অনেক শব্দের সঙ্গে সে-শব্দটি আজও আমার কানে রয়ে গেছে। কান দিয়ে যদি দেখা যেত তবে আমি মুজিব-হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী হতাম। এখন আমি সেই হত্যার প্রত্যক্ষ শ্রোতা।

সামান্য একটা বুলেট এমন বজ্রকণ্ঠ স্তব্ধ করে দিল, কী করে এ–কথা বিশ্বাস করা যায়? যে–মানুষটি সারা বাংলাদেশ ঢেকে পর্বতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন তিনি আজ নেই। রক্তাক্ত হয়ে তিনি পড়ে আছেন মেঝেতে, সিঁড়িতে? কী করে এ–কথা মানা যায়? থেকে–থেকে কেবলই মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের বিলাপ মনে এল :

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা!
রে দূত, অমরবৃন্দ যার ভূজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধর বীরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

হায়, ফুলদল দিয়ে বিধাতা কি শালগাছ ছেদন করলেন? রাবণের সব খেদোক্তিই এখানে সত্যি, কেবল একটা কথা ছাড়া। না, সম্মুখসমরে এ বধ হয়নি, হয়েছে চোরের মতো, লুকিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে। সম্মুখ নয়, অন্যায় সমরে, কাপুরুষের মতো।

যারা হন্তদন্ত হয়ে আমার বাসায় ছুটে এসেছিল তাদের সাথে কথা বলতে বলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তার দুপাশ ধরে অনেক মানুষের ভিড়। সবখানেই ছোট–বড় জটলা, সবার ভেতর সঠিক তথ্য যাচিয়ে নেবার উৎসাহ। জনতার অনেকের মধ্যে কৌতূহল আর বিস্ময়, কারো কারো মধ্যে আতঙ্ক, হতাশা আর উৎকণ্ঠা। এরই পাশাপাশি আবার উল্লাস আর জয়ধ্বনি। রাহুমুক্ত হওয়ার আনন্দ। চার–চারটা বছরের কুশাসন আর আরাজকতা থেকে মুক্তির আনন্দ। সামনে কী আছে জানা নেই, কিন্তু আপাতত যে এই অসহনীয় দুঃখ– দুর্দশা আর দম–আটকানো পরিবেশ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল তাতেই তাদের উল্লাস। না, হত্যাকীরদের তারা কেউ নয়। চিন্তাহীন সাধারণ জনগণ তারা। দেশের খেটে–খাওয়া মানুষ। গত চার বছরের ঐ সময়টা তাদের জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে। দ্রব্যমূল্য দাম বেড়ে গেছে ভয়াবহভাবে, তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে গেছে। দেশজুড়ে জমে উঠেছে কালোবাজারি, ফটকাবাজ আর মুনাফাখোরদের রাজত্ব। সবখানে সন্ত্রাস, অবিচার, অন্যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এ–দৃশ্য যে প্রায় অনিবার্য তা তাদের জানা নেই। রাস্তার দুধারের এই জটলায় আজ তাদের সংখ্যাই বেশি। তাদের গলার স্বরই ওপরে। যারা এই হত্যাকাণ্ডে হতচকিত, তারা এখন স্তব্ধ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্বপ্নেরও অগোচর এই ঘটনা তাদের যেন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পুরোপুরি বাকশূন্য আর অসার তারা। নিঃশব্দ বিস্ফারিত নিষ্ফল চোখে তারা সবার কথা শুনে যাচ্ছে।

আগের পাঁচ–সাত বছরে অনেক সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। অনেক দুঃখ, মৃত্যু, উত্থান আর আশাভঙ্গ টর্নেডোর মতো বয়ে গেছে আমাদের ওপর দিয়ে। অনেক শোক, প্রত্যাঘাত, স্বজন হারানোর কষ্ট, জাতীয় বিপর্যয় আর হতাশা আমাদের স্নায়ুশিরাকে পঙ্গু করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভোঁতা, ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে গেছি আমরা। কোনোকিছুতে উৎকর্ণ হয়ে সাড়া দেবার শক্তিও যেন নেই আর ভেতরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোকিছুই যেন আর অপ্রত্যাশিত, অভাবিত বা বিস্ময়কর নয়। থাকলেও সেই বিস্ময়ে জেগে ওঠার ক্ষমতা যেন শেষ হয়ে গেছে। না হলে এমন ভয়ংকর একটা মত্যু, এতে তো জীবন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবার কথা! কী করে সহ্য করছি সব? কেন একে এভাবে মেনে নিচ্ছি, যেন এইটেই নিয়তি? কেন ঘুরে দাঁড়াতে পারছি না, জেগে উঠতে পারছি না? দীর্ঘদিনের ক্লান্তি কি আমাদের এতটাই নিঃশেষ করে দিয়েছে? এতটাই নিঃশেষ যে এত বিশাল একটা কষ্টকে দুহাতে ধরতে গিয়ে হাত অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ছে? নাকি ঘটেছে অন্যকিছু? অতিকায় দুঃখের অপ্রত্যাশিত আঘাত বোধশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। অথবা হয়তো আরও অন্যকিছু : এমন বিশাল অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধ ব্যর্থ জেনে কি ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পিত হয়ে গেছি?

শেখ মুজিব নেই, বিশ্বাস হতে চায় না। একেকবার মনে হয় সব আছে যথারীতি, বাংলাদেশ তেমনি আগের মতো চলছে, সব দলকে একখানে করে তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন হয়তো নতুন শক্তি পেতে যাচ্ছে। তারপরই আবার সম্বিৎ আসে : তিনি নেই, আর কিছুতেই কোনোদিনই আসবেন না। নিঃস্ব বাংলাদেশ তার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে ছাড়া এখন থেকে একাই বেঁচে থাকবে।

রাস্তায় ভিড় আস্তে আস্তে আরও বেড়ে যায়। প্রাথমিক আঘাতে হকচকিয়ে যাওয়া লোকজন এখন বেশ স্বাভাবিক। মৃত্যু ছাড়াও অনেক ব্যাপার নিয়ে এখন কথাবার্তা চলছে। জীবন বড় গতিশীল। যতবড় ব্যাপারই হোক, তা নিয়ে মানুষ বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে অনেকে, ভারতীয় বিমান হামলার সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা ছড়াচ্ছে। নিরুপায়ভাবে অনেক কথা তোলপাড় করছে নিজের ভেতর। কী করছে এখন সবাই? কী করণীয়? কাদের সিদ্দিকী কোথায়? সে তো বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ অনুগত। অস্ত্রসমর্পণের সময় সে কি সব অস্ত্র জমা দিয়ে দিয়েছে, নাকি কিছু অস্ত্র এখনো আছে তার কাছে? সে কি দাঁড়াবে এদের বিরুদ্ধে? রক্ষীবাহিনীর প্রধানই বা কোথায়? এক ডিভিশন সৈন্য তার হাতে। হয়তো সে এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে। সারাদেশের সবখানে আওয়ামী লীগারদের হাতে অস্ত্র। নিশ্চয়ই প্রতিটা জেলায়, প্রতিটা মহকুমায়, প্রতিটা থানায় তারা দলবেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে। চারপাশ থেকে ঘিরে এই পশুদের খুঁজে খুঁজে উৎখাত করবে এই মাটি থেকে।

এর পরের ইতিহাস সবারই জানা। জাতির পিতার এতবড় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের নিকট বা প্রত্যন্ত অঞ্চল কোনোখান থেকে একটা গুলির শব্দও সেদিন শোনা যায়নি এই বাংলাদেশে। একটা হাতও মুষ্টিবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করেনি। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক ঘণ্টাও পার হয়নি, তাঁর রক্তের ওপর দিয়ে তাঁরই মন্ত্রিসভার সদস্যরা যাদের আজীবন তিনি ভাইয়ের মতো, সন্তানের মতো ভালোবেসেছেন, লালন করেছেন—নতুন মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়ে তারা সরকার গঠন করেছে। তখনো শেখ মুজিবের লাশ ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রাস্তার বাড়ির সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। যে খন্দকার মোশতাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল তাঁর চিরসঙ্গী, যার জন্যে তিনি তাজউদ্দীন আহমদের মতো দেশপ্রেমিককে পরিত্যাগ করেছিলেন; যে তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে তিনি নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করেছেন; তারাও তাঁর মৃত্যুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

Ingratitude, thy marble hearted fiend!

অনেকদিন পরে এক জনসভায় এক মুজিবভক্তকে একবার এ নিয়ে দুঃখ করতে শুনেছিলাম। তিনি বলছিলেন :

"শুনেছি শেখ মুজিব একজন বড় সংগঠক ছিলেন—চল্লিশ লক্ষ কর্মী তৈরি করেছিলেন তিনি বাংলাদেশে।

চল্লিশ লক্ষ না করুন, চল্লিশ হাজার করেছিলেন।

চল্লিশ হাজার যদি নাও পেরে থাকেন অন্তত চল্লিশজনকে করেছিলেন।

কিন্তু যেদিন তাঁকে হত্যা করা হয় সেদিন সারাদেশে একটি প্রতিবাদও ওঠেনি কোনোখানে।

সারাদেশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় সেই দৃশ্য উদযাপন করেছে।

শেখ মুজিব যদি চল্লিশলাখ কর্মী তৈরি না করে চল্লিশটা অ্যালসেশিয়ানও পুষতেন, তাহলেও হয়তো কিছুটা প্রতিরোধ হত। অবোধ জন্তুগুলো প্রভুর মৃত্যুর আগে অন্তত চল্লিশটা ঘাতকের টুঁটি ছিঁড়ে মরে পড়ে থাকত রাস্তার ওপর।"

হায় বাংলাদেশ, তুমি এত শক্তিহীন, এতবড় একটা জাতীয় যুদ্ধ পার করেও এমন নিষ্ফলা?

থেকে–থেকে ভাবতে ইচ্ছা করেছে, কে গুলি করল শেখ মুজিবকে? এই দেশের কোন্ মানুষ? কী করে সম্ভব হয়েছে? মনে মনে তাঁর হত্যার দৃশ্যটা চোখের সামনে আনতে চেষ্টা করেছি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কে তাকে গুলি করতে পারল? এমন সুন্দর, জ্যোতির্ময় একজন মানুষকে, এমন পরিপূর্ণ একটা সমৃদ্ধিকে, এমন একটা বৈভবময় ইতিহাসকে কী করে হত্যা করতে পারে মানুষ? এ তো তাজমহল ধ্বংসের চেয়েও পৈশাচিক। কতটা জড়বুদ্ধি, বিকৃত মস্তিষ্ক আর পশুসুলভ হলে মানুষ এমনটা পারে। ন্যূনতম সৌন্দর্যের বোধ বা মানবিক বিকাশ থাকলেও তো কারো পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এই মানুষটি তো একজনের পিতা, একজনের সন্তান হয়তো কারো স্বামী মানবসভ্যতা এত জ্যোতির্ময় পথ পার হয়ে এসেছে, তবু অনেক এমন আজও রয়ে গেছে এই পৃথিবীতে যাদের হৃদয় সৃষ্টির আদিম অন্ধকারের মতোই কালো আর জন্তুসুলভ। না হলে এই মূঢ় বর্বরতা কী করে সম্ভব হল?

শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন কোনো বাঙালি তাকে হত্যা করতে পারবে না। তাই প্রায় নিরাপত্তাহীনভাবে সবখানে যাতায়াত করতেন, সুরক্ষিত গণভবন ছেড়ে পাড়ার ভেতর নিজের শাদামাঠা বাড়িটাতে থেকে দেশের মাটি আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে চাইতেন। ধূর্ত শত্রু তাঁর এই প্রেম আর বিশ্বাসের জায়গাটাকে ঠিকমতোই শনাক্ত করেছিল। তাই ঐ পেছনের দরজা দিয়ে তাঁকে ছুরিকাঘাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। এই আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তাই হয়েছিল এত কঠিন।

ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে গ্রিনরোড প্রায় ভরে উঠল। রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই। কেবল মানুষ আর জটলা। হঠাৎ দেখলাম বিশাল একটা মার্সিডিজ গাড়ি উদভ্রান্তের মতো রাস্তার বিপুল লোকজনকে প্রায় দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়িতে ভারতীয় পতাকা। ভেতরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে দেখলাম; বসে আছেন বিভ্রান্ত, বিস্ফারিত; সম্ভবত ঘটনার আকস্মিক আঘাতে ও আতঙ্কে মুহ্যমান।

সন্দেহ নেই তাঁর শাসনকালের দিনগুলো জনগণের জন্যে খুব একটা সুখকর হয়নি। কিন্তু তাঁর কতটা তাঁর নিজের দোষে, কতটা পরিস্থিতির জন্যে? তাঁর কিছু দোষত্রুটি ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ভুললে চলবে না-গড়ে তোলার জন্যে কী দেশ তিনি পেয়েছিলেন। একটা দেশ তিনি পেয়েছিলেন যার রাস্তাঘাট ভাঙা, রেলপথ বিধ্বস্ত, যোগাযোগব্যবস্থা বিনষ্ট। যেখানে পুলিশ নেই, থানা নেই, সামরিকবাহিনী অপর্যাপ্ত, প্রশাসন অস্তিত্বহীন। যার কোষাগার শূন্য, ব্যাঙ্ক নিঃশেষিত, ব্যবসাবাণিজ্য বিপর্যস্ত। যেখানে শিল্প-কারখানাগুলো মালিকহীন ও পঙ্গু, বন্দর অচল। লক্ষ লক্ষ মানুষ সশস্ত্র, এবং ভারতীয় খবরদারির আশঙ্কাও অমূলক নয়। এমন একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে তিনি দেশের সার্বভৌমত্বের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছিলেন, যেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেভাবে রাজনীতির জগৎ থেকে শুরু করে যোগাযোগব্যবস্থা, শিল্পাঙ্গন, প্রশাসন সবকিছুকে গুছিয়ে এনেছিলেন, এদেশে সেদিন আর কার পক্ষে তা সম্ভব হত? এর ভেতর অল্পকিছু এমনকি বেশকিছু ভুলত্রুটি হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে-মানুষ অনাদিকাল ধরে পরাধীন-থাকা এই জাতিকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন, এইটুকু ভুলত্রুটির ঋণ তাকে কি শুধতে হবে নিজের আর পরিবার-পরিজনের এমন বীভৎস আর অসম্মানের মৃত্যু দিয়ে? ইন্দোনেশিয়ায়ও তো এমনি ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেখানকার মানুষ তো তার জাতির পিতাকে এভাবে অমর্যাদার কাদার ভেতর টেনে নামায়নি?

কী জন্তুসুলভ একটা জাতি রয়ে গেছে আমাদের এই জাতির ভেতর আজও!

দেখতে দেখতে আকাশে রোদ চড়ে চারপাশ তাতিয়ে তুলল। প্রচণ্ড গরমের দিন। গলা শুকিয়ে উঠছিল। যে-যার মতো বাড়িতে ফিরে যেতে লাগল। আমিও ফেরার উদ্যোগ নিলাম। শেখ মুজিব নিহত, এ-কথা এখন সন্দেহমুক্ত। একটা হ্যালিকপ্টার উড়ছিল আকাশে। বোধহয় বঙ্গভবন থেকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। কেবল মনে হচ্ছিল, এই হ্যালিকপ্টারের শব্দ তিনি আর কোনোদিন শুনবেন না। এইসব কিছু আজ আজ অর্থহীন তাঁর কাছে। নিঃশব্দ বিষণ্ন পায়ে বাসার দিকে ফিরে এলাম।

১৯৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোদালা চা-বাগান

১

গত ১৬ নভেম্বর জাহেদ ভাইয়ের (নজমুল হাসান জাহেদ) সঙ্গে চলে এলাম তাঁদের কোদালা চা-বাগানে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথমদিকে আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিপুল সহযোগিতা দিয়ে জাহেদ ভাই যেভাবে আমাদের ঋণী করেছেন তা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে। এমন একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে এসে আর একবার, আমাদের নয়, আমাকে ঋণী করলেন তিনি। বাগানটা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানায়, কর্ণফুলি পেপার মিলের গা-ঘেঁষে। কর্ণফুলি নদীর ঠিক ধারেই উঁচু টিলার ওপর এর আশ্চর্য সুন্দর বাংলো—সুন্দর এবং বিশাল। কর্ণফুলির ওধারে অনেক দূর থেকে বাংলোর দর্পিত অভিজাত মাথাটা চোখে পড়ে। বাংলোর সামনে প্রথমে কপ্তাইয়ের, তারপরে রাঙামাটির সার-সার পাহাড়। চারধার পাহাড়ে ঘেরা।

বিশাল এই বাংলোয় আমি আছি কয়েকদিন থেকে, একা। লিখতে চেষ্টা করছি, সঙ্গে সঙ্গে পড়তে। ঢাকায় এটা হওয়া খুব কঠিন। কাজ আর দুশ্চিন্তার কোটি কোটি হিংস্র বোলতা পুরো স্নায়ুতন্ত্রীকে এমনভাবে কামড়ে ধরে থাকে যে সবকিছুই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আশ্চর্যভাবে এখানে মনটা বসেছে গভীর সুস্থিরতার ভেতর। আমার পরিচিত পৃথিবী থেকে দূরে একটা বিচ্ছন্ন সজীব দ্বীপের মতো জেগে আছি এখানে। পৃথিবীটা দূর থেকে দূরে গিয়ে কোথাও যেন পুরোপুরি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি আর আমার সামনে এই নীল আকাশ আর শেষ নভেম্বরের মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া আর বাংলোর চারপাশের আশ্চর্য প্রাকৃতিক জগৎ—সবকিছুকে মনে হচ্ছে আমার আজন্মকালের নিয়তি বলে। চারপাশের প্রকৃতির সৌন্দর্যে, বিশালতায় অপরূপতায় আমার সারাটা মন ভরে আছে। যেন এক গভীর নিমগ্ন উচ্ছল স্নান।

সারাদিন এখানে আমার চারপাশে এক অদ্ভুত নৈসর্গিক জগৎ। থেকে-থেকে ডুকরে-ওঠা ঘুঘুর ডাকে নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন। কী যেন একটা সুদূর বেদনা আছে ঘুঘুগুলোর ডাকের ভেতর। বাংলাদেশের সমতল প্রান্তরের ঘুঘুর ডাকেও আছে একই নিঃসঙ্গতার সুর। চারপাশে সেগুন, মেহগনি, শিশু আর নাম-না-জানা সুদৃশ্য গাছে সারাদিন কতগুলো বানর আর হনুমান ঘুরে বেড়ায়। গাছগুলোর ডালে প্রকট শব্দ তুলে এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে লাফিয়ে খাবার খোঁজে, ফল খায়—জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মম সংগ্রামের ভেতর বেঁচে থাকে। একটা বন্যপ্রাণীকে প্রকৃতির জগতে স্বাধীন আর নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কেমন যেন একটু অবাকই লাগে। এদের এই চেহারাটা আমাদের যেন চেনা নয়। আমাদের বাড়িঘরের জন্তুদের মতো ভয়-পাওয়া মিয়োনো ভাব তাদের চেহারায় নেই। সবাই স্বেচ্ছাচারী, বলীয়ান, স্বতঃস্ফূর্ত। সভ্য পৃথিবীটাকে তোয়াক্কা করার কোনো দরকার নেই তাদের। গাছের ডালে, মাটিতে ফল আর কচিপাতা খেয়ে বেড়ানোর উচ্ছল নিটোল সংসারে এরা আলোর মতন লুটোপটি খায়। মাঝে মাঝে নিজেদের ভেতর মর্যাদা বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হিংস্র লড়াইয়ে খেঁকিয়ে ওঠে। মানুষের মতো সমাজের দায় বইতে গিয়ে মূঢ় আত্মঘাতে নিজেকে অসুস্থ করে রাখার কষ্ট নেই এদের। এখানে গাছের মতো মাটির মতো আলোর মতো এরা স্বাধীন। পরিপূর্ণ স্বাধীন।

পরশুদিন হঠাৎ একঝাঁক অদ্ভুত পাখি এসেছিল এই বাংলোর বাগানগুলোয়। তাদের গলার স্বর হুবহু মানব-শিশুর কান্নার মতো। সেই শব্দে সারা পরিপার্শ্ব থমথমে হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতি শুধু আনন্দের শব্দ দিয়ে রচিত নয়। ভয়, প্রেম, কান্না, ঈর্ষা, রিরংসা, বিস্ময় সব শব্দই এখানকার আরণ্যক জীবনের ভেতর থেকে গাছগাছালির মতো উঠে আসে। হেমিংওয়ে লিখেছেন, সমুদ্রে কেউ নিঃসঙ্গ নয়। আমার মনে হয় জঙ্গলের ভেতরকার এমনি নিমগ্ন জায়গাতেও কারো নিঃসঙ্গ হবার উপায় নেই। কান খাড়া করলেই জন্তুতে শ্বাপদে গাছে গাছে অবিরাম রক্তাক্ত সংগ্রামের আর বেঁচে থাকার উচ্চকিত স্বর মানুষের পৃথিবীর মতোই এখানেও শোনা যাবে।

জঙ্গলের ভেতর একটা বানর কালকে থেকে অনেকবার থেকে-থেকে কেঁদে উঠেছে। হয়তো কোনো কষ্টকর অসুখে ভুগছে। প্রকৃতির ভেতর এমনিভাবে প্রতিটা পশুপাখিই অসুস্থ হয়ে এভাবে কাঁদে। কেঁদে-কেঁদে এই প্রকৃতির ভেতরেই মিশে যায়। আমরা মানুষেরা এইসব জীবজন্তুর শক্তিমত্তার চেহারাটাই কেবল চিনি। তাদের প্রাচুর্যময় প্রবল বলীয়ান জীবন নিয়েই কেবল কথা বলি। তাদের একাকিত্বের কথাটা একেবারেই ভাবি না। মানুষের মতো তাদের কান্নায় সমবেদনা জানানোর কেউ নেই। আমরা মানুষেরা আমাদের দুর্দম ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকুকে বিকিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছি সভ্যতা। এই সভ্যতা আমাদের বন্ধু দিয়েছে—আমাদের দুঃখের পাশে দাঁড়াবার মতো দোসর। কিন্তু জন্মে, মৃত্যুতে বা বেঁচে থাকায় জন্তুজগৎ একেবারেই নিঃসঙ্গ। তাদের কান্না তাই এমন আদিম এবং অতিজাগতিক।

আজকে সকাল থেকে একটা হলুদ পাখি বাংলোটাকে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। চারপাশে ঘুঘুরা ডাকছে। দুদিন ধরে সন্ধ্যার সময় একটা বাগডাশা আচ্ছন্ন- চোখে লনটার ওপর দিয়ে বার-দুয়েক হেঁটে তার নিজের রাজ্যে চলে গেছে। সামনের কাঞ্চনগাছের ডালে একটা বিশ্রী প্যাচা রাগী ভয়ংকর চোখে কটমটিয়ে চেয়ে থেকেছে। কয়েকটা সেগুন আর পাইনগাছ অদ্ভুত রূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আমার ডাইনে কৃষ্ণচূড়া লিচু এমনি আরো অনেক ধরনের গাছে ভরা অপরূপের দেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা অনাদিকাল যেন বয়ে যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। সময়কে মনে হচ্ছে অনন্ত। কোনো অশান্তি নেই মনের ভেতর। দৈনন্দিনতার যন্ত্রণা কষ্ট থেকে যেন পুরো অব্যাহতি পাওয়া। প্রতিমুহূর্তে একটা নিশ্চিন্ত সমুদ্রস্নানের অনুভব আমাকে ভরে রেখেছে।

এখানে আমি আবার আসতে চাই, চারপাশের এই প্রকৃতির ভেতর আবার চোখ মেলে তাকাতে চাই, জীবনের অসহ্য বৈভবকে স্পর্শ করতে চাই। জীবনের অত্যাচারে ছিঁড়ে যাওয়া অনুভূতির তন্ত্রীগুলোকে প্রকৃতির চিকিৎসায় আরোগ্য করে ঘরে ফিরতে চাই। লেখা সারাটা জীবনের ভেতর একটা আনন্দময় পরিভ্রমণ। এখানে এসে সেই পরিভ্রমণের তীর্থযাত্রী হতে ইচ্ছে করে।

বিকেলে গিয়েছিলাম এই চা-বাগানেরই একটা এলাকা ঘুরতে। এলাকাটার নাম জমিলাবাদ। বছর কয়েক হল এখানকার টিলায় নতুন চা-বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। টিলার পর টিলার গা-বেয়ে নেমে-আসা ঢেউ-খেলানো এই বাগান চোখকে জুড়িয়ে দেয়। নতুন বাগানের পাতাগুলোর মধ্যে একটা কচি স্নিগ্ধ আর অপরূপ ব্যাপার আছে। সুদৃশ্য বাগানগুলোকে মনে হয় সতেজ গুল্মের সবুজ গালিচা। মাঝে মাঝে নানান ধরনের ছায়াতরু বাগানের রূপকে গাঢ় করে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু দূর থেকে তাকালে চা-বাগানগুলোকে আশ্চর্য সুন্দর লাগে। কচিপাতাগুলো শিশিরভেজা—সূর্যের আলোয় ঝলমল করে। ওপরে রহস্যময় ছায়াতরুরা দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন ওখানে গেলে জীবন উপচে উঠবে কানায় কানায়। যেন কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে। ভালোবাসা হবে। আমরা যা স্বপ্ন দেখছি, যা খুঁজছি, ওখানে গেলে তা পাব।

বিশাল বাংলোটায় আমি এখন একমাত্র মানুষ। দারোয়ান, বেয়ারা, পাচক, ঝাড়ুদাররা থাকে বাংলোর পেছনদিকে। ওদের কোয়ার্টারে। বাংলোটা সাজানো-গোছানো, পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে। আগাগোড়া পরিপাটি আর আভিজাত্যের ছোঁয়া লাগানো। তারপিন-মোছা ঝকঝকে বাংলোর সুবিশাল বারান্দার সঙ্গে বিরাট বিরাট ঘরের মেঝেগুলো একই সমতলে প্রসারিত হয়ে আছে। সামনের বিরাট বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় একসেট শাদা বেতের সোফা—চারপাশের প্রকৃতির পটভূমিতে যেন শান্তির প্রতীক হয়ে একঠায় বসে আছে।

এখানে এসে আমার ব্যক্তিত্বের ভেতরেও কোথায় যেন একটা বিরাটতা আর আভিজাত্য অনুভব করছি। এই বিশাল চা-বাগান, এর বৈভবময় বাংলো, এখানকার সামন্তবাদী পরিবেশ, সবকিছুর মধ্যেই সেই রাজকীয়তা। সারাদিন বারান্দার এককোণে আমি চুপচাপ কাজ করছি। বাংলোর বেয়ারা বাবুর্চি ঝাড়ুদার যে-যার কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে। ওরা থাকে বাংলোর পেছনদিকে। সময়মতো ঘড়ি ধরে সবকিছু চলছে। সকালে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ, বিকেলের দিকে চা, রাতে ডিনার, সবকিছুই ঠিকঠাক ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। সময়মতো বেয়ারা টেবিল লাগাচ্ছে, বিদেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় কায়দায়। তারপর নিচুগলায় টেবিল লাগাবার কথা জানিয়ে চারপাশের অসীম নীরবতার ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার আপ্লুত শান্তির ভেতর থেকে উঠে সেখানে গিয়ে বসছি। খাওয়াদাওয়া সেরে আবার ফিরে আসছি। সারাটা বাড়ির আভিজাত্য এবং বৈভব যেন আমাকেও ভর করছে। আমি চিরকাল বেহিসেবি, বাউন্ডুলে। পরিপাটি ধোপদুরস্ত ভালো কাপড়চোপড় পরে সারাক্ষণ কাটানো আমার স্বভাবের বাইরে। এসব করতে গেলে আমি হাঁপিয়ে উঠি। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। অথচ তাই আমি এখন করছি। সময়মতো কাজ সেরে সময়মতো শুয়ে পড়ছি। হয়তো এই বাড়িটার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই হবার মতো প্রবণতা আমার মধ্যে কাজ করছে।

২

চা-বাগানটা বিশাল, তিন হাজার একর জুড়ে এর এলাকা। গত কয়েকদিনে অন্তত চারবার আমি বাগানের নানান দিক ঘুরে দেখেছি। বাংলোর পাহাড় থেকে দক্ষিণদিকে তাকালে অনেক দূরে ঝাপসা হয়ে আসা যে-টিলাগুলো চোখে পড়ে সেগুলোই এই চা-বাগানের শেষ সীমানা। সেদিকে তাকালে একটা আদিম আরণ্যক অনুভূতি মনটাকে আচ্ছন্ন করে। অনেক ঘোরাঘুরির পরও চা-বাগানটা আজঅব্দি ঘুরে শেষ করতে পেরেছি এমন বলা যাবে না। প্রথমদিন জিপে করে বেরিয়েছিলাম, জিপ এগিয়ে চলেছিল পাহাড়গুলোর আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে, কখনো খাদের ধার দিয়ে জঙ্গল উজিয়ে, কখনো চকচকে স্রোতস্বিনী আড়াআড়ি পার হয়ে, কখনো বৃষ্টিতে কাদা-জমা পিচ্ছিল সরুপথের ওপর দিয়ে। একেক সময় রাস্তা এমন বিপজ্জনক যে থেকে-থেকেই একটা ভয়ের শিহরন শরীরের ভেতর দিয়ে শিরশির করে নেমে গেছে। মাঝে-মাঝেই চোখে পড়েছিল পাহাড়ের ঢালে চা-বাগানের মেয়েদের সার বেঁধে পাতা-তোলার পরিচিত দৃশ্য। সেই দুটি পাতা একটি কুঁড়ির জগৎ। কাঁধে তাদের ঝুড়ি। রঙ বেরঙের শাড়িতে পরিপাটি চা-বাগানের এইসব কুলি-মেয়েদের প্রপিতামহ- প্রপিতামহীরা বৃটিশ-ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় একদিন এইসব চা-বাগানে এসেছিল, দক্ষিণ বা মধ্যভারত থেকে। এদের অনেকেরই গায়ের কুচকুচে কালো রঙ, যৌবনময় সুঠাম শরীর রক্তে মাদকতা জাগায়।

দলবেঁধে মেয়েরা চা-পাতা তুলছে, তারপর পিঠের ঝুড়ি বোঝাই হয়ে গেলে লাইন ধরে অফিসে গিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে—এ দৃশ্য যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি কল্পনা করতে। কিন্তু বাইরের এই রোমান্টিক দৃশ্য দেখে এর আড়ালের বাস্তবতা ঠাহর করা সত্যি সত্যি কঠিন। এখানে দুঃখের ক্রূর কালো ফণা জীবনের প্রতিটা সম্ভাব্য ভিতের আড়াল থেকেই মাথা জাগিয়ে আছে। সে ফণা দারিদ্র্যের, অভাবের, নিঃস্বতার। এই লিকলিকে কালো কুটিল ফণাটাকে বাইরের পৃথিবী দেখতে পায় না, কল্পনাও করে না। বাংলোর বেয়ারার নাম সিধু। কথায় কথায় শুনলাম বছর-দুই আগে ওর স্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগানে পাতা তোলার সময় পাতার আড়ালে লুকোনো সাপের কামড়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। শুনে শিউরে উঠলাম। এমন স্বপ্ন আর রূপেভরা চা-বাগানের নেপথ্যের এই আদিম হিংস্রতা আর মানবিক দুর্ভাগ্যের কথা কী করেই বা ভাবা যায়? এই প্রথম জানলাম, চা-গাছগুলোর ভেতরে ঐ পাতারই রঙের একজাতের সাপ থাকে। এমনি একটা সাপ ওর বউয়ের ডানহাতে মরণ কামড় বসিয়েছিল। কামড়টা এমনই সাংঘাতিক ছিল যে সাপটা জ্যান্ত থাকা পর্যন্ত সে কামড় ছোটানো যায়নি। সিধুর বউ বিষের যন্ত্রণায় কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল; পরে হাসপাতালে চিকিৎসায় কোনোমতে ভালো হলেও হাতে পচন ধরে যাওয়ায় শরীর থেকে ওটাকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এখন ও টিলার কুলিদের পানি এগিয়ে দেবার কাজ করে। এই হল পৃথিবীর স্বপ্ন আর বাস্তবের ব্যবধান, প্রতিভাবান ক্যামেরাম্যানের স্বপ্নরঙিন ছবির সঙ্গে তার পেছনের পটভূমির, সামনের আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের সঙ্গে পেছনের অব্যবস্থ মঞ্চের ব্যবধান।

এমনি অনেক দুঃখ, দুর্ভাগ্য দিয়ে তৈরি এখানকার কুলিকামিনদের জীবন। পুরুষানুক্রমে এই কুলিরা আছে এই চা-বাগানে। বস্তির ভেতর দিয়ে যাবার সময় রাস্তার দুপাশে এদের আলোবাতাসহীন অন্ধকার খুপরিগুলো ভালো করে খতিয়ে দেখেছি। ঘরের ভেতরকার দম-আটকানো, গুমোট আর আঠালো পরিবেশটা অমানুষিক—এদের স্বাস্থ্যহীন চেহারগুলোর সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা। মানুষ কী করে বাঁচে এখানে? কী হয় এভাবে বেঁচে থেকে! তবু এখানে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, উৎসব-পার্বণ, দোল-হোলির মাদকতা আছে। উৎসব না থাকলে এই দুঃসহ একঘেয়েমির জীবনে এরা বাঁচবে কী করে? এক বোতল দোচোয়ান্নির উদ্দামতায় নারীপুরুষেরা নির্বিশেষে সব ভুলে গান গাইবে কী করে?

এদের কুলি-সর্দারের সঙ্গে নার্সারির সামনে দেখা হয়ে গেল কাল। লোকটা লম্বা, ফরসা, সুদর্শন। দেখে বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর ঘড়েল মনে হল। তাগড়া শরীর তাকে সর্দারির কাজে যোগ্যতা দিয়েছে। হয়তো বিহার বা উত্তর প্রদেশ থেকে কোনোকালে এসেছিল এর পূর্বপুরুষ। এখানকার কুলিদের রক্ষক হতে গিয়ে সে, দেশের নেতাদের মতো, এখন তাদের ভক্ষক।

বহুকাল আগে কুলিদের পূর্বপুরুষেরা এখানে এসেছিল। তাদের জীবন ছিল পুরোপুরি ক্রীতদাসদের মতো। প্রভুদের সেবায় সমর্পিত সেই জীবনের আজো যে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছে, তা মনে হয় না। তবু এখন তারা আগের তুলনায় স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। নিজের ইচ্ছায় জীবনকে গড়ে তোলার কিছু সুযোগও এরই মধ্যে পেয়েছে। অনেকে লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে। মেয়েরা এখন শাড়ি ছেড়ে সালওয়ার কামিজ ধরছে, বাইরেও বিয়ে করছে।

চা-বাগানের ম্যানেজার নিঃসঙ্গ মানুষ, বয়স চল্লিশের মতো, থাকেন পাহাড়ের ঢালে ম্যানেজারের বিরাট বাংলোয়। বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সংসার করা হয়নি। সুঠাম দীর্ঘদেহী মানুষ, ব্রাহ্মণ-সন্তান, গায়ের রং কালো। সারাদিন এমনকি বাসাতেও তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক একটাই, শাদা ধবধবে হাফপ্যান্ট আর টি-শার্টের সঙ্গে শাদা কেডস। মনে হয় দিনরাতের সবটা সময় ম্যানেজার হয়েই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর কাছে এই চা-বাগানের অবক্ষয়ের গল্প শুনলাম। কীভাবে ক্রমাগত অযত্নে অবহেলায় চা-বাগানের বর্ধিষ্ণু ভাঁড়ারে দারিদ্র্যের হাত পড়েছে সেইসব কাহিনী। কীভাবে এর আগের মালিক, একটা বিবেকবর্জিত জানোয়ার, কুলিদের ভাঁওতা দিয়ে বাগানের ছায়াতরুগুলো কেটে এই বাগান থেকে আটকোটি টাকা লুঠ করে নিয়ে গেছে—দগদগে খাঁ খাঁ রোদের তাপে সারাটা বাগান কীভাবে শুকিয়ে মিইয়ে এসেছে। একটু একটু করে তাঁর কাছ থেকে শুনলাম বাগানের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলোয় নিয়মিত হরিণের আসা-যাওয়ার আর সেইসব হরিণ শিকারের গা-শিউরোনো গল্প। তাঁর অদম্য আগ্রহে আজ সকালের দিকে ঐ পাহাড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়িয়েও কোনোকিছুর দেখা পেলাম না।

আজ দুপুরের দিকে ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে দেয়ালে টানানো চা-বাগানের একটা বিরাট ম্যাপ চোখে পড়ল। ম্যানেজার গর্বের সঙ্গে জানালেন এই কোদালা চা বাগানই বাংলাদেশের প্রথম চা-বাগান। ১৮৬৭ সালে এক ইংরেজ প্ল্যান্টার এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকায় তিন হাজার একরের এই এলাকা লিজ নিয়ে বাগানটা গড়ে তোলেন। কথাটা কতদূর নির্ভরযোগ্য জানি না, তবে তিনি বেশ নিশ্চয়তার সঙ্গেই বললেন : আসাম, দার্জিলিং বা সিলেটে চা-বাগানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার আগে পরীক্ষামূলকভাবে এ বাগানটির পত্তন করা হয়েছিল। ম্যানেজারদের নামের তালিকা থেকে বোঝা যায় উনিশ শ-ষাট সাল পর্যন্ত বৃটিশ-ম্যানেজাররাই এখানে ছিলেন। তাদের সেই কেতাদুরস্ত ঔপনিবেশিক আইনকানুন—শ্রমিক-মালিক ম্যানেজার-কুলির সম্পর্ক থেকে আরম্ভ করে বাংলোর আদব-কায়দা চলন-বলনের ভেতর এখনও অনেকখানি টিকে আছে।

প্রথমদিন সকালেই জাহেদ ভাই-এর সঙ্গে বাংলোর পেছনদিকটায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাংলোটার মুখ কর্ণফুলি নদীর দিকে ফেরানো। নদীর পরেই সমতল ভূমির বিস্তৃত জগৎ। আমরা সমতল জায়গার মানুষ, পাহাড় দেখতে ভালোবাসি। তাই মনে হয়েছিল বাংলোটার মুখ উত্তরদিকে ঘোরানো না হয়ে পূর্ব বা দক্ষিণদিকে ঘোরানো থাকলে সামনে বিশাল পাহাড়ি জগৎটা সারাক্ষণ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। পাহাড়ের ঢালের ম্যানেজারবাবুও হয়তো তাঁর বাড়িতে বাতাসের অভাবের প্রসঙ্গ টেনে অভিযোগ তুলতে পারতেন না। আমার ধারণা বাংলোর নদীমুখো হওয়ার দুটো কারণ ছিল। এক, অনুর্বর নদীবিহীন পাহাড়ি দেশ থেকে আসা এই বাংলোর বৃটিশ-পত্তনকারীরা সামনের বিশাল নদীটার ভেতর প্রকৃতির অপর্যাপ্ত বৈভব খুঁজে পেয়ে এর দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশি। দ্বিতীয়ত কাপ্তাই বাঁধ দেবার পর মরে-আসা এককালের অমিততেজা কর্ণফুলির নির্জীব স্রোতধারা আজ কিছুতেই হয়তো বোঝাতে পারবে না একদিন তার প্রমত্ত ঢেউয়ে কী বলীয়ান শোভা ধরত সে, কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দিকে মুখ করা ছাড়া এই বাংলো তৈরি হওয়াই সম্ভব ছিল না।

জাহেদ ভাই তাঁর স্বপ্নের কথা বলছিলেন। বলছিলেন, চট্টগ্রামে আর সিলেটে তাঁর আরো দুটো চা-বাগান আছে, সেগুলো নেহাতই ব্যবসার জন্য। কিন্তু এই বিশাল বাগান, এর সুন্দর বাংলো, এই আরণ্যক ভুবন—এসব তাঁর স্বপ্নের জন্য, খেয়ালের জন্য। এ থেকে লাভ চান না তিনি। এটা তাঁর লোকসানের বাংলো, লোকসানের বাগান। এর জন্যে বছরে দশ-বিশ লাখ ঢালতেও আপত্তি নেই তাঁর। পৃথিবীতে সবকিছু নিয়ে ব্যবসা হয় না। করতেও চান না তিনি।

জাহেদ ভাই বলে চললেন, এই বাংলোকে ঘিরে অনেক ভাবনা আছে তাঁর। এখানে একটা পর্যটন স্পট গড়ে তুলতে চান তিনি। ছোট্ট মোটেলের মতো কিছু, যেখানে এসে টুরিস্টরা থাকবে, জঙ্গলের গভীরে ঘুরে বেড়াবে, এর আরণ্যক জীবনের মাদকতা পান করে সময় কাটাবার সুযোগ পাবে।

তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরে যাব ঢাকায়। আবার আগের মতো শুরু হবে সেই কাজ আর ছোটাছুটির যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তার বৃশ্চিকদংশ। তবু এই অরণ্যজগৎ হয়তো তখনো কিছুটা বেঁচে থাকবে বুকের ভেতর, সব ব্যস্ততা আর অস্থিরতার ভেতর শিশিরভেজা সবুজ চা-বাগানের অনবদ্য রূপটুকু মেলে রাখবে।

১৯৯৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শৈশব

১

আমার স্মৃতিশক্তি খুবই কম। এখনও তো কমই, শৈশবেও কম ছিল। চার-পাঁচ বছর বয়সের আগের কোনো ঘটনাই প্রায় মনে নেই। কাজেই একেবারে দূর-শৈশবের কথা আমি আদৌ শোনাতে পারব বলে মনে হয় না।

কেবল দু-তিনটা স্মৃতির কথা মনে পড়ে। তখন আমরা থাকতাম করটিয়ায়। আব্বা ছিলেন করটিয়া কলেজের অধ্যপক। ওই কলেজে তখন একটা চমৎকার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। বাংলার আলীগড় বানানোর স্বপ্ন নিয়ে করটিয়ার জমিদার চাঁদমিয়া এ কলেজটা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এটা তৈরির দায়িত্ব পড়ে সুসাহিত্যিক ইব্রাহীম খাঁর ওপর। তিনি যান ওখানে প্রিন্সিপাল হয়ে। একই সঙ্গে আমার আব্বাও ওখানে ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে যান। তখন ঐ কলেজে যিনি যে-বিষয়ের অধ্যাপক তাঁকে সেই বিষয়ের নাম ধরেই ডাকা হত। যেমন উনি হচ্ছেন ইংলিশ সাহেব, উনি হচ্ছেন আরবি সাহেব, উনি হিস্ট্রি সাহেব, এরকম। কিন্তু কেন জানি, ফিলসফির অধ্যাপক কেতাবউদ্দিন সাহবকে সবাই কেতাব সাহেব বলেই ডাকতেন। হয়তো ফিলসফি সাহেব বা দর্শন সাহবের মতো ওজনদার শব্দে যখন-তখন ডাকাডাকি করা বাঙালির করুণ স্বাস্থ্যে কুলিয়ে উঠত না।

এ কলেজে তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল খুব কম। সদ্য কলেজ শুরু হয়েছে। চারপাশ থেকে ছাত্ররা এসে ভিড় করছে এক দুই করে। এদের অনেকেরই লজিং-এর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে নানাজনের বাড়িতে বাড়িতে। অধ্যাপকরা চারপাশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে লজিং-এর ব্যবস্থা করতেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকজনকে বোঝাতেন : আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করবে। তারা বড় হবে। মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা নেই। তারা শিক্ষার আলো পাবে। দুনিয়ার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আপনারা বাড়িতে তাদের লজিং না রাখলে, তারা এসব পারবে কী করে।

তো, এই করে ধীরে ধীরে কলেজে কিছু ছাত্র সংগ্রহ করা হল। তাদের দেওয়া বেতনে টেনেটুনে কলেজের মাস্টারদের মাসোহারা কোনোমতে মেটানো হতে লাগল। শুনেছি সপ্তাহ-শেষে ইব্রাহীম খাঁ বসতেন বেতনের টাকা নিয়ে, শিক্ষকদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেবার জন্যে। বলতেন : 'তাইলে আরবি সাবেরে সাতটা টাকাই দেই।'

আরবি সাহেব কাউমাউ করে উঠতেন—'বাড়িতে মেহবান আছাল আর কিছু না বাড়াইলে যে হয় না।' আরবি সাহেবের বরাদ্দ বেড়ে হয়ে যেত সাত টাকা থেকে দশ টাকা। ইব্রাহীম খাঁর দৃষ্টি এরপর ঘুরে যেত ইংলিশ সাহবের দিকে। 'ইংলিশ সাহেবের তো পাঁচ টাকা হইলেই হয়। খালি বিবি সাহেব আর আপনে।'

ইব্রাহীম খাঁ খুব রসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর মুখে সব সময় স্মিত হাসি লেগে থাকত। এভাবে ছাত্রবেতন থেকে পাওয়া সামান্য টাকা ভাগাভাগি করে তাঁরা চলতেন তখন!

আমার জন্ম করটিয়া কলেজের এই অবস্থা পেরিয়ে যাবার পর। আব্বা করটিয়া কলেজে যান '২৯ সালে, আমার জন্ম হয় '৩৯ সালে। ততদিনে কলেজের অধ্যাপকদের বেতন সুনিয়মিত হয়েছে এবং আব্বা ও অন্য শিক্ষকরা মোটামুটি চলতে পারছেন।

২

করটিয়া কলেজের পাশ দিয় ছিল একটা খুব সুন্দর, শান্ত নদী। নদীও ঠিক না আসলে, শীর্ণ খালের মতো। একটা ধারা—ঝিরঝির করে বয়ে যাওয়া একটা স্বচ্ছ পানির স্রোতরেখা। শীতকালে তাতে পানি কমে যেত। একটা রুপালি শীর্ণধারা তিরতির করে বয়ে যেত সে নদীতে। 'পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাঁড়ি'র সাথে আমাদের শৈশব নিয়েও ওই নদী আমরা পারাপার করতাম। কিন্তু বর্ষায় অন্যরূপ দেখা দিত তার। রবীন্দ্রনাথের ছোটনদীর বর্ষাকালের প্রমত্ত রূপের মতো তীব্র উত্তাল স্রোতে সে নদী তখন উচ্ছ্বল হয়ে যেত।

ওই নদীটা আমার ছেলেবেলার স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি ওই নদীকে নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছি। ওই নদী কোথায় কোন্‌দিকে যায়, এসেছে কোথা থেকে, আমি কিছুই জানতাম না। হাটের ওপাশে একটা বড় নদী ছিল, সেখান থেকেই হয়তো এসেছিল ছোটনদীটা। ধীরে ধীরে এগিয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তার ওপরকার ব্রিজটার নিচ দিয়ে (ব্রিজটা তখন কাঠের ছিল) এ নদী জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে, মাদ্রাসা-স্কুল পিছনে ফেলে আঁকাবাঁকা হতে হতে গ্রামের গাছপালার ভেতর দিয়ে কোন্‌খানে যেন হারিয়ে গিয়েছে। ওই নদীটার দিকে তাকিয়ে আমার কেবলি মনে হত : আহা, ওই নদীটা গিয়েছে কোথায়? নদীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ঐ নদীর শেষ দেখতে ইচ্ছে করত আমার।

ঐ সময় একটা গান শুনেছিলাম আমি, খুব সম্ভবত আব্বার মুখে। গানটা এরকম : 'বংশাই নদীর কূলেরে ভাই মস্ত একখান বাড়ি/ওরে, কর্তা তার ঐ রামকানাইরে ভারি জমিদার/ নাগর আয় আয়রে।' হয়তো কোনো পাগলাগানের ধুয়া। গানটা শুনলেই আমার মনটা কেন যেন ছলছল করে উঠত। জমিদার রামকানাইয়ের কোনো দুঃখময় ভালোবাসার করুণ পরিণতির আশঙ্কায় কেন যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম। এই গানটা শুনে আমার মনে হত ওই নদীটাই সেই বংশাই নদী। আর এই নদীরই ধারে একাট মস্তবাড়িতে কর্তা রামকানাই বিরাট জমিদারির ধনসম্পদ সাজিয়ে বসে আছেন। আমি যুবক-জমিদার রামকানাইকে চোখে দেখতে পেতাম। নদীটাকে ঘিরে এক অদ্ভুত রহস্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভেতর ঘোরাফেরা করত। কেবলই ফিরে ফিরে পাশের গাছপালা প্রকৃতিকে সেই গান মনে হত গাছপালার ভেতর দিয়ে কোন্‌দিকে গেছে এই নদী! কোথায়!

ছোটবেলায় আমি একটা গান শুনেছিলাম। গানটাতে সামান্য পরিমাণে যৌনরস ছিল। আমি একটু বড় হলে আব্বা একবার এ গানের দুটো লাইন দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন শিল্প জিনিসটি কী। গানের কথাগুলো হল : 'গোসল কইর‍্যা বইদ্যার ছেড়ি ফিরে নিজে ঘরে/ ভিজা কাপড়ে সোনার যৈবন বাইয়া বাইয়া পড়ে।' আমি যৌনতার ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু সেই যৌবন বেয়ে-পড়া পরিপূর্ণ মেয়েটাকে নদীর ধারে থেকে কলসি-কাঁখে বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে দেখতে পেতাম। আমি ওই মেয়েটিকে মনে মনে কল্পনা করতাম আর একটা অদ্ভুত কামনায় আমার সারাটা মন ভরে উঠত। যা হোক আব্বা বলেছিলেন : 'দেখ, এটা একটা নারীশরীরের দৈহিক বর্ণনা। কিন্তু 'যৌবন' শব্দটার আগে সোনা শব্দটা বসিয়ে দিতেই যৌনতার মাথায় যেন সৌন্দর্যের টোপর পড়িয়ে দেওয়া হল। যৌবনও যেন অপরূপ আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। শিল্প এটাই করে। স্থূলজীবনের মাথার ওপর সৌন্দর্যের টোপর পরিয়ে তাকে এভাবে সুস্মিত করে দেয়।'

এসব নান্দনিক কথাবার্তার সঙ্গে ঐ নদীর কিন্তু কোনো যোগাযোগ ছিল না, নদীটা আমার এসব কল্পনা বা অনুভূতির কোনো কথাই জানত না। এগুলো সবই আমার নিজের মনের স্বপ্নে আর মাধুরীতে তৈরি। তখন করটিয়ার মতো এদেশের সুদূর গ্রামগুলোতে গ্রামোফোন ছিল না, রেডিও ছিল না, থাকলেও খুবই কম। ক্যাসেটপ্লেয়ার, লংপ্লে সিডি কিছুই ছিল না। ছিল না আজকের মতো সান্ধ্যকালীন গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন। এক-একটা গানের টুকরো কিংবা গানের লাইন হঠাৎ করেই এখান-ওখান থেকে আমাদের কানে ভেসে আসত। ওটুকুই ছিল আমাদের সঙ্গীত শোনার সাকুল্য সুযোগ। হঠাৎ স্বর্গ থেকে ভেসে-আসা গানের সেই দুর্লভ কলিগুলো আমাদের উতলা করে আবার হারিয়ে যেত।

এমনি একটা লাইন আমার মনে আছে। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি সেই নদীটির ধার দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ শুনলাম সেই অস্ফুট অন্ধকারের ভেতর দূরে কোনখান থেকে কে যেন গেয়ে উঠল—'দাদা আর যাব না ওই ইশকুলে লিখতে।' খুব সম্ভব গুনাইবিবি যাত্রার গান। গানটার কথার মধ্যে কিছুই ছিল না, কিন্তু সুরের মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য বিমর্ষতা ছিল যে, সন্ধ্যার অন্ধকারের ভেতর অচেনা গায়ক গানটা গেয়ে চলে যাবার পরও আমার মনে হল নদীর পাশের গাছপালা প্রকৃতিকে সেই গান যেন বিষাদাচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বুকের ভেতরটা অকারণ শোকে মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা মানুষের করুণ হৃদয় নদীর দুধারের নির্জনতা ছাপিয়ে কেঁপে কেঁপে, ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল অনেকক্ষণ। আমার মনের ভেতর সে গানটা তেমনি হৃদয়কে কষ্ট দিয়ে আজও কেঁদে বেড়ায়। ঐ নদীটি নিয়ে এমনি সব অদ্ভুত স্মৃতি আছে আমার ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

আরেকটা স্মৃতি মনে আছে ছেলেবেলার। একবার বাসা থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম আমাদের ঠিক পাশের গ্রামে, গ্রামটার নাম করাতিপাড়া। করাতি শব্দটার মানে আমি জানতাম না। কিন্তু এই করাতিপাড়া নামটা শুনলেই একটা অদ্ভুত ভয়ের অকারণ অনুভূতিতে আমার মন ছমছম করত। একবার সেই করাতিপাড়ায় গিয়েছিলাম একটা বিয়েতে। তখন গরমের রাত। দশটা–এগারোটা বেজে গেছে। সবার খাওয়া–দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। চারপাশ শান্ত, অসাড়। লোকজনের কথাবার্তা নেই। আঙিনার ওপর কেউ কেউ ঘুমিয়ে আছে এখানে–ওখানে। আধো ঘুমের মধ্যে টের পেলাম বাড়ির কোথাও কে যেন একটা গ্রামোফোনে গান বাজানোর চেষ্টা করছে থেকে–থেকে। মাঝে মাঝে এক–একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিচ্ছে আর সেই গানের মিষ্টি শব্দে রাতের হৃদয়টা সোনালি হয়ে উঠছে। একসময় সেই গ্রামোফোন থেকে একটা গান আমার কানে ভেসে এল : 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।' আমি ওই গানের সুরের ভেতর একটা বিরাট পাহাড়কে আকাশের গায় হেলান দিয়ে নিবিড় পরিতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে দেখতে পেলাম যেন, অথবা একজন গভীর পুরুষের বুকে মাথা নিমগ্ন রেখে একজন নারীকে। চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন ছবিটা। সুদূর ছেলেবেলার এই ছবিটা আজও আমি ভুলিনি।

৪

আরেকদিনের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে। প্রায় গল্পের মতো অভিজ্ঞতাটা। একদিন আমি, আমার ছোটভাই, ছোটবোন আর সেইসাথে আরো দু–একটি ছেলে, হয়তো আমার চাইতেও ছোট তারা, কেন যেন করটিয়া কলেজের মাঠ পার হয়ে ক্ষেতের মধ্যদিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। কীভাবে কেন হাঁটতে শুরু করেছিলাম কিছুই মনে নেই, কেবল মনে আছে বেশ ক'জন মিলে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি তো চলেইছি। চারপাশে মটরশুঁটির ক্ষেত। ঠিক বড় মটরশুঁটি নয়, ছোট একধরনের মটরশুঁটি, আমরা ছেই না কী বলতাম যেন সেগুলোকে—তার ক্ষেত। এগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে খেতে খুব মজা লাগত আমাদের।

তো, সেইসব ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা রহস্যময় জগতের মধ্যে এসে পড়লাম যেন একসময়। শীতকাল সবে বিদায় নিয়েছে। শিশির পড়েছিল সারা মাঠজুড়ে, সবখানে। দূরে চারপাশে সবুজ গ্রাম। তার গায়ে শিশিরের স্নিগ্ধতা। তার এপাশে–ওপাশে গন্ধক হলুদ রঙের ফুলে ভরা শর্ষেক্ষেতের জগৎ। মিষ্টি একটা শান্ত সকাল। এসবের মধ্যদিয়ে, যেন প্রায় একটা প্রায় রূপকথার দেশের ভেতর দিয়ে––আমরা হেঁটে চললাম।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক মাঠ–ঘাট–প্রান্তর পেরিয়ে যেন একটা গ্রাম এল একসময়। সে গ্রামে একজায়গায় চোখে পড়ল একটা অবস্থাসম্পন্ন বাড়ি। ছেলেবেলায় রূপকথার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পে রাজবাড়ির যে বর্ণনা শুনতাম মার কাছে, ঠিক যেন সে ধরনের। বিশাল এলাকা নিয়ে সে বাড়ি—তার সামনের দিকে দালান, পেছনে অনেক দূরে ছোট ছোট বেশকিছু ঘর। শুনলাম মুকুন্দ সাহা নামে একজনের বাড়ি সেটা। বুঝলাম খুবই অবস্থাসম্পন্ন আর বিত্তবান মানুষ এঁরা। হয়তো এদেশের রাজাই হবেন তারা। আমরা যেতেই তাঁরা খুব খাতির করলেন আমাদের। সে-সময় সম্ভবত কোনো পুজো বা ঐ ধরনের কিছু চলছিল ওদের বাড়িতে। নানান রকম মিষ্টি, পায়েস, নারকেলের নাড়ু, বরফি এ সমস্ত খেতে দিলেন আমাদের। বিশাল অবস্থাসম্পন্ন বাড়ি, সেখানকার মুখরোচক খাবার, তার সঙ্গে আশ্চর্য স্নিগ্ধ সুন্দর সকাল। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়েছিল আমি যেন সত্যি সত্যিই রূপকথার জগতের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি আর সে জগতের মতোই না-চাইতেই অভাবিত কিছু কেবলি পেয়ে চলেছি একের পর এক। বড় হয়ে 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' পড়তে গিয়ে দেখছিলাম অ্যালিস রূপকথার দেশে চলে গিয়েছিল বাস্তব ঘুমের ভেতর থেকে আর সেখানকার দেশে চলে গিয়েছিল পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে মনের সুখে ঘুরেফিরে বেড়িয়েছিল। বোধহয় সব মানুষের জীবনের কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে এমনিভাবে রূপকথার দেশে পাড়ি জমানোর সময় আসে। হঠাৎ করেই আমাদের চারপাশের এই বাস্তব পৃথিবীটা অবাস্তব আর অচেনা হয়ে ওঠে আমাদের চোখে। অলীক জগতের গাছের ছায়ায় ছায়ায় আমরা এমনি অবলীলায় হেঁটে বেড়াতে থাকি।

তো, খাওয়াদাওয়ার পরে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। অনেকদূর হাঁটার পর আমরা একটা বড়রাস্তা পেলাম। বড় মানে পিচঢালা রাস্তা নয়। কী করে পিচঢালা হবে? আমরা তখন পিচঢালা রাস্তা তো দেখিই নি। একটা বড় মাটির রাস্তা, সেটা একটা নদীর ধার ঘেঁষে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একটা পানসি বা লঞ্চ—লঞ্চ কী করে হবে, কারণ সেকালে লঞ্চ তো ঐ এলাকায় প্রায় ছিলই না। আচ্ছা নাহয় লঞ্চই ধরলাম—তো, রাস্তা থেকে দেখলাম লঞ্চটা নদীর অল্পপানিতে আধোডোবা হয়ে ভেঙে জাবুথবু হয়ে পড়ে আছে। লঞ্চটার ভাঙা-কাঠামোর কিছু কিছু চোখে পড়ছে, কিছুটা দেখা যাচ্ছে না। লঞ্চটাকে এভাবে নদীর স্থির জলে জরাগ্রস্তের মতো পড়ে থাকতে দেখে আমার মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে গেল। কেবলি মনে হতে লাগল একটা কোনো বড়ধরনের জাহাজডুবির দুঃখময় স্মৃতি যেন ওটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেন একটা বড় বেদনাদায়ক কিছু ঘটে গিয়েছিল কোনো একসময়, সেই অব্যাহতিহীন দুঃখটা যেন সেখানকার আকাশে আজও বাতাস ভারী করে কেঁদে চলেছে।

তো, ওটা দেখতে দেখতে বিমর্ষ মনে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখি আমাদের পাশেই একটা রহস্যজনক সবজির ক্ষেত। সে ক্ষেতের মধ্যে বড় বড় সবুজ সতেজ পাতাওয়ালা লতাজাতীয় একধরনের সার-সার গাছ। গাছগুলো ছোট ছোট আর নিবিড়। যে-কোনো গাছের পাতা একটু ফাঁক করলেই দেখা যায় ছোট-বড় কচি কচি খিরাই ধরে আছে সেগুলোয়। খিরাই এর আগে আমি দেখিনি। তখনো এদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিরাই ছিল বিরল। এর ছোট ছোট নরম কাঁটাওয়ালা সবজিগুলোর সবুজ গড়ন দেখে সেগুলোকে রূপকথার ফলের মতোই কেমন যেন মনে হল আমার। অদ্ভুত লাগল সেগুলোকে। ক্ষেতের আশপাশে কেউ ছিল না, বারণ করারও কেউ ছিল না, কাজেই ইচ্ছা করে তুলে নিলেই খাওয়া যেতে পারে। আমরা খুশিমতো গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলাম সেগুলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে গলাও শুকিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে সেই ঠাণ্ডা খিরাইগুলো প্রাণটাকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল। স্বপ্নের জিনিসকে এমন অপর্যাপ্তভাবে এর আগে কখনো এমনভাবে পাইনি। নিষ্পাপ শিশুসুলভ খুশি তখন আমাদের। সত্যি, এসব অদ্ভুত স্মৃতিঘেরা দৃশ্য মনের মধ্যে যে কী অবাক-করা অনুভূতি জাগিয়েছিল সেদিন এখন আর তা বলে বোঝাতে পারব না।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা একসময় চলে গিয়েছিলাম আরও অনেকদূরে। একসময় এসে হাজির হয়েছিলাম আমাদের বাসার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই নদীটার ধারে। কী করে এল নদীটা এখানে? আমরা দুধের সাগর ক্ষীরের সাগর ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর দেশ সব ঘুরে হঠাৎ আবার বাসার কাছের নদীটার ধারে ফিরে এলাম কী করে? সেই নদীর পাড় ধরে অনেক দূর হেঁটে এসে পৌঁছেছিলাম আমাদের বাসায়। এভাবে এলিসের মতো স্বপ্নের ভেতর না গিয়েও একটা আশ্চর্য রূপকথার জগতের ভেতর ঘুরে এসেছিলাম আমরা সেদিন।

আমি বড় হয়ে বছর তিরিশেক পরে করটিয়াতে গিয়েছিলাম। গিয়ে হেঁটে হেঁটে দেখার চেষ্টা করেছিলাম কোন্ পথ ধরে হেঁটেছিলাম আমরা সেদিন, যে জায়গাটায় আমরা গিয়েছিলাম তা আমাদের বাসা থেকে কত দূরে, আর কতদূর আমরা হেঁটেছিলাম। খুঁজতে গিয়ে দেখেছিলাম, আমরা সব মিলে আসলে সেদিন হয়তো মাইলখানেকের বেশি হাঁটিনি। কয়েকটা ক্ষেত পার হয়েছিলাম মাত্র। আমাদের পাশের গ্রামেই ছিল মুকুন্দ সাহার বাড়ি। কাজেই আদৌ বেশিদূরে যেতে হয়নি আমাদের। আসলে আমরা তখন কেবলই কয়েকটি শিশু মাত্র, দুটো ছোট ছোট অক্ষম অসহায় পা আমাদের, কয়েকটা অবোধ করুণ প্রাণী আমরা। কতদূরেই বা যেতে পারি? খুবই সামান্য জায়গা ঘুরে এসে আরা পৃথিবীর শেষপ্রান্তে হেঁটে আসার বিস্ময় ও মুগ্ধতা অনুভব করেছিলাম সেদিন। ছেলেবেলায় বিশ্বাস করার, অবাক হবার এই অপরিমেয় শক্তি থাকে মানুষের। আজ তা আমাদের আর নেই।

১৯৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বাড়ি

ক

আশ্চর্য সুন্দর জায়গায়—প্রকৃতির একেবারে কোলের ভেতর—লেকের ধারে আমাদের বাড়ি। ইংরেজিতে যাকে কর্নার প্লট বলে আমাদের প্লটটাও তাই। বাড়ির পুব–দক্ষিণ দুটো দিকেই রাস্তা। দুটো দিকই খোলা, আলো–উপচানো। বাড়ির সামনে দিয়ে লেকের ধারঘেঁষে উত্তর দক্ষিণ বরাবর দীর্ঘ সোজা রাস্তাটা সরাসরি চলে গেছে। বাড়ির পাশের রাস্তাটা ওই রাস্তা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দক্ষিণ ঘেঁষে গাছপালার নিবিড় জগতের ভেতর সরু হতে হতে হারিয়ে গেছে। সামনের রাস্তার ধার বরাবর ইউক্যালিপটাসের রহস্যময় দীর্ঘ সারি। দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা উত্তাল হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসগুলোর বেণির মতো দীর্ঘ ঝোলানো সবুজ পাতাগুলো সারাদিন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে আর গাছের কচি পাতাওয়ালা মাথাগুলো এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে দিনরাত কেবলই নড়ে.....কেবলই নড়ে....। এই চির–তারুণ্যের চির–রহস্যের যেন শেষ নেই।

উত্তরার সবচেয়ে শান্ত আর নির্জন জায়গায় এই বাড়ি। শহরের ভেতরকার একটা জায়গা যতটা জনবিরল হতে পারে এই জায়গাটা ঠিক তাই। বাসার ঠিক সামনেই উত্তর–দক্ষিণে প্রসারিত দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ বিরাট উত্তরা লেক। দক্ষিণে বিমানবন্দরের পাঁচ মাইল ফাঁকা জায়গার পর ক্যান্টনমেন্ট আর গলফ ক্লাবের সবুজ নিরবচ্ছিন্ন পৃথিবী। সারা বছর অফুরন্ত হাওয়া ওই বিস্তীর্ণ খালি জায়গাটার উপর দিয়ে বয়ে এসে আমাদের ঘরগুলোর পরদায়, চাদরে বিরতিহীন খেলা করে। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সবুজ জীবনের মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

বিংশ শতাব্দীর নাগরিক যান্ত্রিকতার ভেতর কবি রফিক আজাদ এক নিরীহ সবুজ অর্কেডিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। গাছপালায় ঢাকা ওই ছোট্ট গ্রামটির নাম চুনিয়া। আমাদের উত্তরার বাড়ি আমার কাছে ঢাকা শহরের সেই চুনিয়া। আমাদের বাসার চারপাশের সতেজ হাওয়া ওই চুনিয়ার মতো বিশুদ্ধ আর নিরীহ।

শহরের দম–বন্ধ–করা ভারী বাতাস পেছনে ফেলে উত্তরার দিকে এগিয়ে আসার প্রতি মুহূর্তে বাতাসের এই সজীবতাকে টের পেতে থাকি আমি, মনে হয়, প্রতি পলে যেন একটা মুক্ত জগতের অবারিত শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। জ্যৈষ্ঠ কিংবা ভাদ্র মাসে যখন সমস্ত ঢাকা মহানগরী দুঃসহ গরমে গুমট আর ভাপসা, গাছে একটা পাতাও নড়ছে না, ঘামে গরমে জনজীবন দুর্বিষহ, তখনো আমাদের এই জায়গাটায় নির্মল হাওয়ার

পর্যাপ্ত ছড়াছড়ি। কুর্মিটোলা স্টেশন পেরোলেই টের পাই মিষ্টি হাওয়ায় গাছের চিরোল চিরোল পাতাগুলো সবার অজান্তে ঝিরঝির করে একটু একটু কাঁপছে। যখন আমাদের লেক পার হয়ে বাসার কাছে পৌঁছি তখন দেখি ইউক্যালিপটাসের দীর্ঘ রহস্যময় পাতাগুলো ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে অবিশ্রান্ত নড়ে চলেছে।

খ

রূপে বিস্ময়ে সচকিত আমাদের ছোট্ট বাড়িটা। সন্ধ্যার পর দোতলার দক্ষিণ-পুবের ঘরটায় যখন আলো থাকে না, কেবল দক্ষিণের উত্তাল হাওয়া আর রাস্তার আলোর অস্ফুট আলেয়া রহস্যলোক তৈরি করে, তখন আমি স্পষ্ট চোখে ঘরের ভেতর রূপের পরীদের চকিত পায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখি। এই দেখা একান্তই আমার নিজের। পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিত আর কোনো মানুষের সঙ্গে এসব অতিপ্রাকৃতিক বিষয়-আশয়ে আমার মিল হবে না।

বাড়িটার আর্কিটেক্ট উত্তম উত্তম কুমার সাহা। ঢাকার তরুণ স্থপতিদের মধ্যে ও এখন অন্যতম খ্যাতিমান। এটাই ছিল ওর প্ল্যানের প্রথম বাড়ি। বাড়িটা করার আগে উত্তমকে একটা অনুরোধ করেছিলাম আমি। বলেছিলাম, আমাদের এই জায়গাটায় প্রকৃতি তার সব অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য অবারিত হাতে ঢেলে দিয়েছে : এই উত্তাল হাওয়া, লেকের পানি, রোদ, উজ্জ্বলতা। বাড়ি করার সময়, এসো, আদিম মানুষদের মতো প্রকৃতির এই অপরিমেয় দানকে আমরা সম্মান জানাই। প্ল্যান করার সময় আমার একটা অনুরোধ অন্তত রেখো, কোনো দেয়াল রেখো না বাড়িটাতে। চারপাশের প্রকৃতি যেন আমাদের বিরতিহীন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সারা বছর আমাদের ঘরের অতিথি হয়ে উপস্থিত থাকতে পারে। উত্তম আমার অনুরোধটা রেখেছিল। কথাটা ওর শিল্পরুচির সপক্ষে মনে হয়েছিল বলেই রেখেছিল। একটা অবারিত জানালাওয়ালা বাড়ি বানিয়েছিল উত্তম। রোদের পড়ন্ত আঁচ থেকে বাঁচানোর জন্যই হয়তো পশ্চিম দিকে সামান্য একটু দেয়ালের বরাদ্দ—না হলে বাকি সারাটা বাড়ি শুধুই জানালা।

পাড়ার লোকেরা রসিকতা করে এই বাড়িটাকে তাই বলে পিকনিক-বাড়ি।

এইসব খুলে রাখা জানালা বাইরের জগতের প্রতি এ বাড়ির প্রসারিত অবারিত আহ্বান। দিনরাত উত্তাল হাওয়া ছোট্ট বলের মতো সারাটা বাড়ি জুড়ে দুষ্টুমি করে লাফিয়ে বেড়ায়। রাত্রিবেলা লেকের উল্টোদিক থেকে তাকালে আলো-জ্বালানো বাড়িটাকে দেখতে একটা সোনালি মৌচাকের মতো লাগে।

এত বড় জানালাওয়ালা বাড়ি রোশনা পছন্দ করে না। বাড়ির ভেতরকার নিভৃত, নিজের মতো করে বাঁচার ছোট্ট জগৎটুকুকে পৃথিবীর কাছে বেআবরুভাবে বিকিয়ে দিতে সে নারাজ। বাড়ির জানালাগুলোকে ও বলে 'রাক্ষুসে জানালা'। কিন্তু আমাদের চারপাশের লিলুয়া প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি কেবলই বলি, 'হে অবাধ্য হাওয়া, হে মেঘ, হে রৌদ্র, হে লেকের জল আর উজ্জ্বল আকাশ, আমাদের এই অবারিত জানালাগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে তোমাদের প্রতি আমাদের সাংবাৎসরিক ভালোবাসার উদার আহ্বান। আমাদের পরিবারের স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের মতো আমৃত্যু সদস্য হয়ে তোমরা এর ভেতর ইচ্ছামতো আস-যাও, এইসব পাথুরে দেয়াল সরিয়ে আমরা দুই ভেদাভেদরহিত পড়শী একই পৃথিবীতে শরতের বৃষ্টিচপল উৎসবে বেঁচে থাকি।

গ

আমাদের বাসার সামনের লেকটা একসময় ছিল আদি তুরাগ নদী। টঙ্গী থেকে খানিকটা ভাঁটিতে নেমে বাঁক ঘুরে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বিমানবন্দরের কাছে মোড় নিয়ে মিরপুরের দিকে বয়ে চলত এককালে। পরে একসময় গতিধারা পাল্টে সরাসরি মিরপুরের দিকে বইতে শুরু করলে নদীর এই আদি ধারাটি আস্তে আস্তে মরে আসে। এখনো এই লেকের দুই পাড়ের ভূগঠন-স্বভাবে সেই জীবন্ত নদীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নীলনকশা অনুসারে মাটি ফেলে লেকের দুই ধার সমান্তরাল করার কাজ বছরখানেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। এই কর্মসূচি শেষ হবার সাথে সাথে এককালের এই শক্তিমন্ত স্রোতোধারার শেষ পরিচয়টুকুও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

লেকের ধারগুলো কোথাও খাড়া, কোথাও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। এককালে এই লেক যখন বর্ষার ঢলনামা পানিতে উপচে উঠত তখন সে এক বিশাল নদীর রূপ নিয়ে দেখা দিত। উত্তাল হাওয়ায় পাল তুলে শত শত নৌকার বহর এগিয়ে যেত এর উপর দিয়ে। অনেক আনন্দ আর কলরবে ভরে থাকত এর জলজ-জগৎ। একদিনকার সেই বেগবান নদী এখন কেবলই একটা ভেদাভেদহীন দীর্ঘ নিটোল জলা, একটা সমৃদ্ধিশালী জলধারার নির্জীব নীরক্ত মৃতদেহ। এখন লেকের তিরতির করে কাঁপা পানিতে রাস্তার ধারের বিদ্যুতের আলোরা রাতভর কেবল সার সার তরল সোনার জ্বলন্ত মিনার তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখানকার প্রকৃতির মতো এই লেকটাও আশ্চর্যসুন্দর। লেকের ওপর দিয়ে সারাক্ষণ হাওয়া আর কুয়াশার রহস্যময় ছোটাছুটি। ফাল্গুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত দক্ষিণে হাওয়ায় পদ্ম-বনের মতো ঢেউ তুলে সারাদিন সে কেবলই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে। আর ঝড় হেঁকে উঠলে যখন লেকের পানিতে কালো অজগরের মতো বিশাল ঢেউ চারধার তোলপাড় করে তোলে তখন আমাদের বাড়ির দোতলার জানালায় বসে মনে হয় আমি যেন লেকের ভেতরকার ওই ঝড়ের সংক্ষুব্ধ উত্তাল মাঝখানটায় বসে আছি। আমাকে ঘিরেই ওইসব ভয়াল গোক্ষুরের কোটি কোটি সংক্ষুব্ধ ফণার উন্মাদনা। যখন ঠিক ঝড় ওঠে না কিন্তু বলদৃপ্ত হাওয়ায় লেকের পানিতে সাদা মাথাওয়ালা কোটি কোটি কালো ঢেউ জেগে ওঠে তখন এই মৃত অসহায় জলাশয়ের সঙ্গে অনেকদিন আগের সেই উদ্ধত নদীর রক্তসম্পর্ক ধরা পড়ে যায়।

আমাদের লেকের হাওয়াদের মতিগতিও এই জায়গাটার মতোই, অদ্ভুত। ঢাকা শহরে অন্যসব জায়গার হাওয়াদের থেকে এ একেবারেই আলাদা। ফাল্গুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পুবের অবিশ্রান্ত হাওয়ারা আমাদের সারা বাড়িটায় হল্লা করে বেড়ালেও ভাদ্র আশ্বিন আসতে না আসতেই একটা অলক্ষ্য পট পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। তখন অনেক আগের পালিয়ে যাওয়া উত্তুরে হাওয়ারা আগের জায়গা দখল নেবার জন্যে বর্শা উঁচিয়ে লেকের উত্তর দিকে দল বেঁধে এসে দাঁড়ায়। তখন আমাদের লেকের শিশু হাওয়ারা কোন দলে যাবে ঠিক করতে না পেরে গালে হাত দিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত গুম হয়ে বসে ভাবে। ওই দিনগুলো আমাদের জন্য সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে বিমর্ষ সময়। গুমট গরমে আমাদের এই ছোট্ট এলাকার কোথাও নিশ্বাস নেওয়ার মতো এতটুকু হাওয়া থাকে না—ইউক্যালিপটাসের পাতাগুলোও যেন নড়াচড়া করতে ভুলে যায়। রাতে লেকের নিশ্চল অপলক পানিতে রাস্তার আলোগুলো আয়নার মতো নিটোল অবয়বে ধরা পড়ে। এরপর বেশ কিছুদিন উত্তুরে আর দক্ষিণে হাওয়ার মধ্যে একটা বিবাদ চলার সময়। প্রথমে উত্তুরে হাওয়া দক্ষিণের বাতাসকে বিমানবন্দরের ওধার পর্যন্ত পিছু হটিয়ে লেকের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে। কিন্তু সে নেহাতই দিন কয়েকের জন্য। দক্ষিণে হাওয়ারা তাদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের ডেকে জড়ো করে ফের বড় আকারের আক্রমণ চালালে উত্তুরে হাওয়ারা পিছু হটে তুরাগ নদীর ওধারের বিশাল বিলটার পদ্মবনে, পরাজিত দুর্যোধনের মতো, লুকিয়ে থাকে। এমনিভাবে বারকয়েক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর দক্ষিণে হাওয়ারা পশ্চাদপসরণ করে একসময় লেক থেকে চার পাঁচ মাসের জন্যে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অনেকদিন আর তাদের কোনো খবরই থাকে না। উত্তুরে হাওয়ারা তখন একপাখায় শীত আর অন্য পাখায় শিশির কণা নিয়ে আমাদের এই বসতিতে অতিথি পাখিদের সঙ্গে সারা শীতের জন্য বাসা বাঁধে।

যদি বৃষ্টির অবিশ্বাস্যরূপ দেখতে চাও তবে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটায় এসো। দেখবে কীভাবে দিগন্তকে ঝাপসা করে অপরূপ বৃষ্টিপরীরা হালকা খুশিতে তোমাকে পার হয়ে চলে যাচ্ছে। এখানকার বৃষ্টি আসাটা যেমন অপরূপ তেমনি অদ্ভুত। এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি দেখবে বৃষ্টির বিপুল কালো মেঘ, এখানে এসে পৌঁছোবার আগে, আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বিশাল প্রান্তরটার ওপর আনত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহুক্ষণ। তারপর হঠাৎ চোখের এক ফোঁটা পানি তোমার কপোলের ওপর টুপ করে ঝরিয়ে গাঢ় অভিমানে চুপ করে আছে আরো খানিকটা সময়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে দেখবে অনেকক্ষণ পর ঝরবে আরেক ফোঁটা। তারপর একসময় শালুক, পানিফল আর রক্তপদ্মের ঠোঁট ভিজিয়ে সারা পৃথিবীর ওপর বিরতিহীন ঝরতে থাকবে। এইসময় যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য, রিকশাওয়ালারা একটানা অনেকক্ষণ ভেজার পর হাল ছেড়ে বিমর্ষ মুখে বিদায় নিয়েছে কিংবা রাস্তার পাশে গাছের নিচে কাকের মতো অঝোরে ভিজছে, জরুরি কাজে অগত্যা বের হওয়া দু'এক জন নিঃসঙ্গ পথচারীর আচমকা তীক্ষ্ণ চিৎকার আর ক্ষিপ্র গাড়িগুলোর পানি ছিটিয়ে চলে যাবার বিরস শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসছে না, তখন তুমি এখানে, এই ঢাকা শহরের মাঝখানে বসেই মধ্যযুগের বাংলাদেশের আর্ত আক্রান্ত জগৎকে দেখতে পাবে—সেই জগৎ যেখানে এমনি অবিরল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষণধারার নিচে সমাজ সভ্যতা লুপ্ত, জনজীবন বিপর্যস্ত, রাস্তাঘাটে মানুষের দেখা নেই, কেবল সেই একটানা বিচ্ছিন্নতার ভেতর প্রেমিকার নিঃসঙ্গ একাকিত্বের গুমরে ওঠা বিরহবেদনার সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে :

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

যদি সোনালি দৃষ্টি দেখতে চাও, রাতে এসো। আমাদের নির্জন বারান্দায় বসে চারপাশের ছড়িয়ে-থাকা স্নিগ্ধ বিদ্যুৎবাতির আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা সোনালি বৃষ্টির অঝোর নারীকে দেখতে পাবে। দেখবে আশপাশের প্রতিটি লাইটপোস্টের বিচূর্ণিত আলোর ভেতর, প্রতিটা বাড়ির গেট আর দরজা বা জানালা দিয়ে ছিটকে-পড়া স্নিগ্ধ আভার সৌন্দর্যলোকে, পানি থেকে উঠে আসা বিচ্ছুরিত আলোক-কণার ভেতর সেই বৃষ্টি অবিরাম ঝরে ঝরে সমস্ত রাতটাকে কেমন রোদনরূপসী করে রেখেছে।

ঘ

একেকদিন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় আমাদের বাসার ঠিক সামনে, পুব আকাশে, ডাকাতের মতো বিশাল গোল চাঁদ ওঠে। সোনার থালার মতো তার বিরাট শরীর গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে একসময় জোরালো আলোয় সবটা উত্তরাকে উপচে দেয়। আমি তখন বড় বড় গাছের ছায়ায় অস্ফুট রূপের পরীদের সারাটা এলাকা জুড়ে হেঁটে বেড়াতে দেখি। পাতাদের খসখস আওয়াজের সাথে তাদের অপার্থিব কথাবার্তার শব্দ টের পাই। এইসব রাত্রিতে একেক সময় লেখার কথা পুরোপুরি ভুলে ছাদের উত্তাল হাওয়ায় আপ্লুত জ্যোৎস্নাধারার নিচে আমি সারারাত শুয়ে থাকি। সারারাত জ্যোৎস্না আমার শরীর প্রত্যঙ্গ প্রাণকোষ ভিজিয়ে নির্জনে ঝরে ঝরে আমার সারা অস্তিত্বকে জোছনাস্নাত করে তোলে। একেকদিন ঘুম বেশি হয়ে গেলে আকাশ থেকে চাঁদ লুকিয়ে ডুবে যায়। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে চারপাশের সেই চন্দ্রালোকিত রাতটাকে তখন আর দেখতে পাই না। টের পাই আমার জোছনাভেজা শরীর সেই স্নিগ্ধ ফুটফুটে রাতটি হয়ে যেন ছাদের আকাশে শুয়ে আছে।

প্রকৃতির নিচে এই বাড়িতে এমনি শুয়ে থাকাটা সত্যি অদ্ভুত। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের নিচের তলার সিঁড়ির ধারে বোগেনভেনিয়ার একটা চারা বুনেছিলাম ছ' সাত বছর আগে—গাছটা দোতলার বারান্দার ধারঘেঁষে ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। সারা বছর অফুরন্ত ফুল থাকত গাছটায়। ফুলের মরশুমে সারাটা গাছ ফুলে ফুলে এমনি ভরে যেত যে গাছের পাতাই আর দেখা যেত না। গাছটাকে তখন ফুলে ফুলে ভরে-থাকা কোনো অপরূপ মেয়ের মতো লাগত। গাছটা থেকে একটা দুটো ফুল, চুপে, নিজেদের এতটুকু টের পেতে না দিয়ে, কেবলই ঝরে যেত, বারান্দার ওপর। একদিন রাতে ঘটেছিল সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা। আকাশে সোনার থালার মতো পূর্ণিমার বিশাল গোল চাঁদটাকে উঠে আসতে দেখে গাছের পাশের ছোট্ট বারান্দাটুকুতে আমি নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একসময় ঘুম ভাঙতেই দেখি সারারাত ধরে ছোট ছোট অজস্র গোলাপি ফুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ওপর টুপ টুপ করে ঝরে আমার সারাটা শরীরকে ফুলের নরম ভালোবাসায় ঢেকে রেখেছে। আমার মৃত্যুর দিনেও যেন ফুলেরা ঝরে ঝরে আমার শরীরটাকে এমনি অপলক আদরে ভরিয়ে রাখে।

বছর দেড়েক হল শহর থেকে বাস উঠিয়ে এ বাড়িতে আমরা এসেছি। এরই মধ্যে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে বাড়িটায়। ফুলগাছের মধ্যে আছে ম্যাগনোলিয়া, শেফালি, বটল ব্রাশ, কাঁঠালিচাপা, নাগেশ্বর, অশোক, রাধাচূড়া, রঙ্গন, স্থলপদ্ম, দোলনচাঁপা, বেলি, জুঁই, হাসনাহেনা। লতাজাতের ফুলগাছও লাগিয়েছি বেশ কয়েকটা। গোল্ডেন শাওয়ার, মাধবীলতা, ঝুমকোলতা, বোগেনভেলিয়া এইসব। বাড়িতে জায়গা কম বলে ফলগাছ বেশি নেই—দু তিনটা কামরাঙা, ডালিম আর গোটা দুই সাদা করমচা। সবুজ করমচার গায়ে পাক ধরলে তাদের বাইরের দিকটা লালচে-কালো আর ভেতরটা তাজা রক্তের মতো লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে। আমি তাদের ফলের দলেই ফেলি। কিন্তু সাদা করমচার বেলায় এ কথা খাটবে না। থোকায় থোকায় ফলে-থাকা এইসব দুধসাদা করমচাগুলোর গায়ে যখন পেকে ওঠার রক্ত-রং ছড়িয়ে পড়ে, তখন থোকাগুলো কোথাও দুধ আর কোথাও আলতার ছোপ লেগে এমন রঙিন আর অপরূপ হয়ে ওঠে যে সেগুলোকে তখন ফল না বলে ফুল বলতেই আমার বেশি ভালো লাগে। ফল নেই এমন গাছ গোটা চারেক। চার পাশে না-ছড়িয়ে নিচের দিকে নুয়ে-পড়া ডালপাতাওয়ালা দেবদারু—একটা আরেকটা থেকে হাত দশেক দূরে দূরে—বাসার ঠিক সামনেটায় সার বেঁধে লাগিয়েছিলাম বছর পাঁচেক আগে—এখন বেশ গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে তারা।

বছর দশেক হল এই প্রজাতির দেবদারু ঢাকায় এসেছে। গতবার বাসার পেছনদিকে লাগিয়েছিলাম একটা সেগুনগাছ। নিচের দিকে ডালপালা ছেঁটে দেওয়ায় সম্রাটের মতো সবার ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে এক বছরের মধ্যে। একটা গাছ নিয়ে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। বছরখানেক হল একটা কাঠমালতী লাগিয়েছি বাসার সামনে—দেয়ালের বাঁ দিকটা ঘেঁষে—দেবদারুগুলোর একই সারিতে। ঢাকায় দু-তিনটের বেশি জায়গায় এই জাতের কাঠমালতী আমার চোখে পড়ে নি। যখন ফোটে তখন দুধের মতো রাশ রাশ ফুলের সাদা বড় থোকাগুলো গাছের ভেতর থেকে মুখ জাগিয়ে কালচে সবুজ পাতার জগৎকে আলো করে রাখে।

আমাদের বাড়ির প্লটটা ছোট—মাত্র সাড়ে তিন কাঠার। এরই ওপর মাত্র এক কাঠার ওপর আমাদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। এই বাড়ি সম্বন্ধে এত উদ্বেলিত কথা শোনার পর এর আয়তনের অসম্মানজনক তুচ্ছতা হয়তো অনেকের কাছে করুণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু আগেই তো বলেছি এতক্ষণ বাড়ির যে বৈভবের কথা আমি তুলে ধরেছি সে তো নেহাতই আমার নিজস্ব ভালোবাসার কথা। আমার একক স্বপ্নের গল্প। এই রূপ দেখতে পাওয়ার জন্য রাজপ্রাসাদ, নহর আর গোলাপজলের ফোয়ারার দরকার নেই। ভাঙা কুঁড়েঘরে থেকেও অনেকে এমনি অপার্থিব কিছু দেখতে পারে। আমার নিজের চোখ দিয়ে বাড়িটার যে অনবদ্য রূপ দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম এ তারই কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর আর কারো সাথে তো এর মিল হবে না।

আমাদের বাড়ির সবচেয়ে রাজকীয় বৈভবটির কথা দেখছি গল্পের ফাঁকে বাদই পড়ে গেছে। হ্যাঁ, সেই বিশাল বটগাছ। বটগাছটা আমাদের জমির ওপরে নয়। এমন বিশাল একটা বটগাছ কী করেই-বা আমাদের এই ছোট্ট জায়গাটুকুর ভেতর থাকতে পারে।

আমাদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি লেকের উল্টো ধার জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটা। দিনেরবেলায় যতবারই আমরা নিচতলা থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাই ততবারই সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই লেকের উজ্জ্বল জলে ছায়া-ফেলা স্নিগ্ধ সবুজ বিশাল বটগাছটাকে দেখতে পাই। গাছটাকে এতবার দেখেছি তবু সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই যখন গাছটার সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আর পরাক্রান্ত চেহারাটা জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় তখন মনে হয় কী সামান্য ব্যবধানে কত অপরিমেয় একটা পৃথিবী এতক্ষণ অপচয় করে চলছিলাম। গাছটাকে দেখলেই জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হতে ইচ্ছে করে।

আমাদের বাড়িটা ছোট। তবু এর ভেতর রয়ে গেছে এক বিরাট চরাচরের উপস্থিতি। বাড়িটার যেকোনো জায়গা থেকে উত্তরে দক্ষিণে কয়েক মাইলের এক প্রাকৃতিক লীলাজগৎ দেখতে পাই আমি। বটগাছটার মতো এ জগৎটাও আমাদের নয়। তবু ওই গাছের মতো একেও আমি আমাদেরই মনে করি। এ বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত আমরা যা দেখতে পাই, ভালোবাসতে পাই, দেখে অবাক হবার অধিকার পাই সে তো আমাদেরই সম্পত্তি। মালিকানার দাবি করে তাকে কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

AMARBOI.COM

ঙ

আমাদের চেয়ে হাজারগুণ ধনী মানুষ আছে আজ ঢাকা শহরে, প্রাসাদের মতো উঁচু বিশাল বৈভবদীপ্ত সব ঘরবাড়ি তাঁদের। এক-একটা বাড়ির চোখ ধাঁধানো জলুসের বহর এমন অবিশ্বাস্য যে মনে হয় ট্যাকের পয়সা খরচ করে অযথা তাজমহল দেখতে আগ্রায় না গেলেও চলবে। কিন্তু ঢাকা শহরের মতো এমন জায়গায় প্রকৃতির এমন মনোরম স্নিগ্ধ বুকের ভেতর এমন নিবিড় একটা বাড়ির ভাগ্য তাদের কজনারই-বা হয়েছে। আমরা কপর্দকশূন্য মানুষ, কিন্তু ও' হেনরির 'উপহার' গল্পের যে গরিব নায়িকা বিবাহবার্ষিকীতে উপহার দেবার জন্যে তার দীর্ঘ সোনালি অলকগুচ্ছ বিক্রি করে তরুণ স্বামীর সোনার ঘড়ির জন্যে সোনার চেন কিনে এনেছিল আর একই সময়ে যে কপর্দকশূন্য স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নিজের ঘড়িটা বিক্রি করে স্ত্রীর সেই ঘন কেশদামের জন্যে একটা সোনার চিরুনি কিনেছিল তাদের চেয়ে আমাদের পরিতৃপ্তি কম কিসের! নিয়তি আর সব জায়গায় আমাদের প্রতারিত করেছে কেবল এই জায়গাটুকু ছাড়া। ভালোবাসার দুই হাত উজাড় করে, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' আমাদের আকণ্ঠ দিয়েছে সে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ধন নয় মান নয় একটুকু বাসা/করেছিনু আশা'। আমাদের বাড়িটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের সেই একটুকু বাসা।

আগেই বলেছি আমাদের প্লট ছোট। বাড়ি আরো ছোট। তবু এতেই আমি কৃতার্থ। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আমি পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি বাড়ির ব্যাপারে ভাগ্য আমাকে সত্যি সত্যি আনুকূল্য দেখিয়েছে। আমরা যারা সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনাদরে অবহেলায়' গান গেয়ে যাই, তাদেরকে রক্তাক্ত বর্শায় ক্ষতবিক্ষত করার মানুষের যেমন অভাব হয় না তেমনি আবার ভালোবাসার মানুষও বেশ কিছু থাকে। যারা অপর্যাপ্ত বিত্তশালী তাদের সঙ্গে আমাদের—পাথেয়হীন নিঃস্ব এইসব মানুষের—পার্থক্য এখানটাতেই। টি এস এলিয়ট হয়তো সঠিকভাবেই লিখেছিলেন এই পার্থক্যের কথা। ওদের খানসামা আছে বন্ধু নেই, আমাদের বন্ধু আছে খানসামা নেই (They have butlers and no firends, we have friends and no butlers.)। এই বন্ধুরাই আমার পাথেয়। এরাই সাহায্য যুগিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ঠেলে, ধাক্কিয়ে প্রায় গায়ের জোরেই শেষ করে দিয়েছিল বাড়িটা। সেদিক থেকে প্রকৃতপক্ষে বাড়িটা তাদেরই। আমি তাদের ভালোবাসার দখলদার কেবল।

আমি বাড়ি বানিয়েছি শুনে আমার পরিচিতেরা চমকে উঠেছিল। আমার কাছ থেকে তারা সবরকম সাফল্য প্রত্যাশা করেছে, কিন্তু এটা করে নি। আমারও মনে হয় সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল বানানোর চাইতেও আমার বাড়ি তৈরির ব্যাপারটা হয়তো বিস্ময়কর। শাহজাহানের পূর্বপুরুষের অর্জিত মণিমাণিক্যের রাজকোষ ছিল, স্ত্রী আর নিজের স্মৃতিকে 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' করে রাখার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আমার? না উৎসাহ, না সাশ্রয়, না সাধ্য। উপরন্তু আমি ছাড়া পরিবারের সবাই ছিল এর বিপক্ষে। বন্ধুবান্ধবদের সবার ভালোবাসাতেই এ সম্ভব হয়েছে। যে যা চায় পৃথিবীতে তা-ই সে পায়। আমি পৃথিবীর কাছে বিত্ত চাই নি। রাজ্য সাম্রাজ্য রাজদণ্ড প্রতিপত্তি প্রত্যাশা করি নি, আমি সবার হৃদয়ের কাছে ছোট একমুঠো ভালোবাসার মতো এতটুকু জায়গা চেয়েছিলাম। আমি তা পেয়েছি। সে ভালোবাসা খুশি হয়ে এই বাড়ি আমাকে উপহার দিয়েছে। একে তাই আমি বাড়ি না বলে ভালোবাসাই বলি। তবু আমি জানি এ বাড়ি নিয়ে আমার বিপদ আছে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন মনে পড়ে : 'চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা।' কথাটা আমার জীবনেরও সত্য। পথের নেশায় চিরদিন পাথেয় উপেক্ষা করেছি আমি। অবহেলিত পাথেয় আজ হোক কাল হোক তার প্রতিশোধ নেবে। আমি জানি আমাদের দেশে যারা আনন্দের অহংকারে বাস্তবকে তাচ্ছিল্য করেছে তাদের জীবনের দুঃখময় বিপর্যয়ের চেয়ে আমার পরিণতি এতটুকু আলাদা হবে না।

বাড়ি তৈরির আগের আর পরের বারোটা বছর কেন্দ্রের কাজে আত্মবিস্মৃতের মতো কেটেছে আমার। সেই স্বপ্নস্রস্ত পৃথিবীতে এই বাড়ির অস্তিত্ব আমার চেতনা থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভাড়াটেদের অনেকেই এই অভাবিত সুযোগ হারাবার মতো নির্বুদ্ধিতা দেখায় নি। সবাই মিলে প্রায় কয়েক বছরের ভাড়া অদেয় রেখে বিভিন্ন সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বাড়ির প্রতিটা ইট বন্ধকের। ঋণদান সংস্থা আর ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা টাকায় তৈরি। ব্যক্তিগত ঋণও কম করতে হয় নি। বাড়ি ভাড়া না পাওয়ায় ঋণের পরিমাণ সুদে আসলে বেড়ে কয়েকগুণ হয়েছে। সুস্থভাবে বছরপাঁচেক বেঁচে থেকে ভালো রোজগার করে এই টাকা দিতে না পারলে বাড়ি বেহাত হয়ে যাবে। কিন্তু আমার রোজগার কোথায়? বছরের ওপর হল আমি চাকরি ছেড়ে বসে আছি। স্বাধীন আনন্দে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে কমবেশি রোজগার করতে আমার আপত্তি নেই। তাকে আমি ভাগ্যের উপহার বলেই মনে করি। আমি জানি, টাকা জীবনের জন্যে খুব দরকারি। কিন্তু কেবল টাকার জন্যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোথায় যেন অস্তিত্বের একটা গভীর অমর্যাদা আছে। নিজেকে অসম্ভব ছোট মনে হয়। আমার হাত-পা ভেঙে শরীর ঘুলিয়ে আসে, ভেতরটা মা-মরা শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

আমি জানি, টাকা রোজগার আমাকে দিয়ে হবে না। এ পৃথিবীতে জীবন মাত্র একবার। টাকার পায়ে একে অশ্লীল উৎসর্গের কোনো মানে নেই। পাথেয়কে আমি তাচ্ছিল্য করে অপমান করেছি, তার প্রতিশোধ আমি এড়িয়ে যেতে পারব না। আজ হোক, কাল হোক, এই বাড়ি ক্রোক হয়ে যাবে। আমার চেয়ে অনেক বিত্তশালী কোনো মানুষ এসে কিনে নেবে আমাদের এই শব্দময় বাড়ি, যাকে দূর থেকে সোনালি মৌচাক বলে ভুল হয় আমার। সে কিনে নেবে দোতলার সব নিসর্গবেষ্টিত ঘর—এর হাওয়ায়-ওড়া বেপরোয়া বারান্দা, দোতলায় ওঠার প্রিয় কাঠের সিঁড়ি, পূর্ণিমা রাতের হত্যাকারীর মতো বিশাল গোল চাঁদ, সবকিছু। কিন্তু যে অলৌকিক রূপের জগৎকে প্রতি পলে আমি এখানে প্রত্যক্ষ করেছি, তা সে কোনোদিন কিনতে পারবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর দেওয়া নোটের ক্রয়ক্ষমতার তা বাইরে।

আমাদের বাড়ির এই রূপের জগৎ যদি দেখতে চাও, আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাবার আগেই এখানে এসো। না হলে, পরে, আমার এইসব বর্ণনা পড়ে তুমি এসে এখানকার বাসিন্দাদের কোনোদিন জিজ্ঞেস কর, 'এমন একটা জায়গা এখানে কোথায় আছে বলতে পারেন'—তখন তারা তোমার প্রশ্ন শুনে হয়তো প্রথমে কিছুক্ষণ ভাববে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আশপাশের এলাকা হয়তো খুঁজে দেখতেও চেষ্টা করবে এক-আধটু, তারপর হতাশার স্বরে একসময় বলবে, আপনি কোন জায়গার কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না তো। এ এলাকায় এমন কোনো জায়গার কথা তো কখনো শুনি নি।

যা কেবল আমার একলা ভালোবাসা আর স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তোলা তার ঠিকানা অন্য মানুষের তো জানা থাকবার কথা নয়।*

১৯৯৫

* এই রচনাটা লেখার দু বছর পর বাড়িটা বিক্রি হয়ে যায়। এখন সেটা আর 'আমাদের বাড়ি' নেই। এখন সেটা 'তাহাদের বাড়ি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ ন্যা ন্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউইয়র্কের আড্ডায়

হাসান ফেরদৌসের লেখা 'নিউইয়র্কের আড্ডায়' পড়লাম। লেখাটা সুলিখিত, চিত্তাকর্ষক। নিউইয়র্কে হাসান ফেরদৌসের বাসায় রাতভর আড্ডার যে স্মৃতিটা মাথা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিল, লেখাটা পড়ে সেই রাতটাকে আবার চারপাশে সজীবভাবে অনুভব করলাম। আড্ডার আনন্দময় ঝগড়াঝাঁটির প্রতিটা সপ্রাণ কণ্ঠস্বর যেন কানে এল ।

পরপর দু-রাত ধরে চলেছিল আড্ডাটা, প্রতি রাতে কম-সে-কম সাত ঘণ্টা ধরে। এর পরেও অনেকের অনেক কথা না-বলা থেকে গেছে। চাইলে আড্ডা চলতে পারত আরও দুই কি তিন রাত, তাতেও শেষ হত কিনা কে জানে। একটা ব্যাপার নিয়ে এভাবে চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টা ভ্যাজোর ভ্যাজোর করে যাওয়া সোজা নয়। কিন্তু আমাদের কাছে ব্যাপারটা আদৌ কষ্টকর মনে হয়নি, বরং খুবই তাজা আর উত্তেজনামধুর মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল উৎসবরাত্রির মতো উপভোগ্য। যেন, দরকার হলে, এই আনন্দ আর উত্তেজনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমরা এমনি আরও অনেক রাত জেগে কাটাতে পারি।

কেন মনে হয়েছিল? সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক বাধলে হয়তো এতখানি উত্তেজনা জাগত না। কিন্তু বিষয়টা ছিল আমাদের সবার জন্যে এক জীবন-মরণের ব্যাপার । তা হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। বিষয়টার সঙ্গে আমাদের এই বিশাল জাতিটার বাঁচা না-বাঁচা, বিকাশ বা লুপ্ত-হওয়া—এসব এমন নিয়তির মতো সম্পৃক্ত যে এই তর্কে রণে ভঙ্গ দেবার অবকাশ নেই।

দু-রাত ধরে উত্তেজিত তর্ক হয়েছে, কিন্তু এর পরিবেশের সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গতা এক মুহূর্তের জন্যেও নষ্ট হয়নি। প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে কথা বলেছে সবাই, কিন্তু তা বলেছে আবেগময় ও যুক্তিপূর্ণভাবে, উত্তেজনাকে সুবিন্যস্ত করে, গুছিয়ে গুছিয়ে। হাসান ফেরদৌস 'নিউইয়র্কের আড্ডায়' লেখাটাও লিখেছে একইরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ রম্যভঙ্গিতে। দু-রাতের মধ্যে একবার তাকেই বরং একটুখানি খেপে উঠতে

দেখেছিলাম, এছাড়া তেমন আর কোনো অঘটন ঘটেনি। এতগুলো উত্তেজিত বাঙালি এমন পরিপাটিভাবে ঝগড়া কী করে করল অনেকবার তা ভেবেছি। দেশে থাকলে পারত কি? এ কি আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রভাব, নাকি বক্তাদের বয়স চল্লিশ থেকে ষাটোর্ধ্ব হওয়ার ফল, বলা কঠিন।

প্রথম রাতেই রীতিমতো জমজমাট হয়ে উঠেছিল আড্ডাটা। বিকেলের দিকে হাসান ফেরদৌস আমাকে ব্রডওয়েতে নিয়ে গিয়েছিল নাটক দেখাতে। ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড। নাটক ভাঙলে প্রেক্ষাগৃহের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় আমাকে ড. আতিউর রহমান আর নিউইয়র্কের সোনালী ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মোশাররফ হোসেনের হাতে আমাকে সোপর্দ করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। কথা ছিল আমরা তিনজন হাডসন নদীতে নৌ-বিহার সেরে চলে আসব ওর বাসায়। সেখানে খানিকক্ষণ গেঁজিয়ে আমি আর মোশাররফ হোসেন চলে যাব যে-যার আস্তানায়, আতিউর থেকে যাবে হাসানের বাসায়। ওখানেই ও উঠেছে।

এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে হাসান, মোশাররফ এবং আতিউর তিনজনই বলতে গেলে আমার ছাত্র। হাসান আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ছাত্রদের একজন, উনিশশ উনসত্তুর-সত্তুরের দিকে ঢাকা কলেজে ও আমার কাছে পড়েছে। অসাধারণ মেধাবী ও অকালপ্রয়াত খান মোহাম্মদ ফারাবী এবং হায়দার আলী খান ছিল ওর সহপাঠী ও বন্ধু। হাসানের তীক্ষ্ণ মেধা আর প্রাণখোলা উদ্দাম হাসি এখনও ছাত্রবয়সের মতোই প্রাণবন্ত। মোশাররফ আরও আগের, উনিশশ একষট্টি সালে আমার মুন্সীগঞ্জ কলেজের ছাত্র। মোশাররফের বয়স হয়েছে, আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বেশি ছোট নয়, কিন্তু উৎসাহে আর উদ্যমে ভরপুর। মনের এই তারুণ্য দিয়ে জীবনকে ও গভীরভাবে ভালোবাসে বলেই জীবনের ক্ষয়ের দিকে তাকিয়ে ও তলে তলে কষ্ট পায়। ওর ক্রমবর্ধমানভাবে কেশবিমুখ মাথা, মুখের খাঁজে খাঁজে বয়সের কুটিল রেখাগুলোর ঘাতক আদল হয়ত ওকে বিমর্ষ করে তোলে।

এই নিঃশব্দ কষ্টটা যে কত গভীর তা বুঝেছিলাম নৌ-বিহারের সময়। বোটে ওঠার আগে আমাদের তিনজনের একটা গ্রুপ-ছবি তুলেছিল বোটেরই একটা মেয়ে; শর্ত ছিল ছবিটা ভালো লাগলে তবেই আমরা নেব, না লাগলে না, এতে কারো কিছু বলার নেই। ছবি প্রিন্ট হলে মেয়েটি ছবিটাকে আমাদের দেখাতে নিয়ে এল। ছবিটা ভালো ওঠেনি এমনকিছু। আমার বুড়োটে মুখ আরও একদফা বুড়ো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে, আতিউরের চকচকে মাথাটা চুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, মোশাররফের অবস্থাও আলাদা কিছু নয়। তবু আমি আর আতিউর নতজানুচিত্তে ছবিটার কপি নিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই নিল না। ছবিটা দেখে ও কেমন যেন আঁৎকে উঠল, অসুস্থ হয়ে পড়ল। বারবার বলতে লাগল, 'না না একদমই আমার মতো হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদমই না।' আমি টিপ্পনী কেটে বললাম, 'জানো আতিউর, ও নিতে চাচ্ছে না কেন? ওকে উত্তমকুমারের মতো লাগছে না বলে।' বলেই সশব্দে হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার চেষ্টা করলাম।

বছর চারেক ধরে সোনালী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমেরিকার বাঙালিদের দেশে টাকা পাঠাতে বিপুলভাবে উৎসাহী করে তুলেছে মোশাররফ, গত ছয় মাসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে একশ পঁচিশ মিলিয়ন ডলারে।

আতিউর আমার সাক্ষাৎ-ছাত্র নয়, ছাত্রপ্রতিম, ছাত্রবয়স থেকেই আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই সূত্রে প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই স্যার বলে ডাকে। বলিষ্ঠ, ইতিবাচক, আবেগময় প্রকৃতির আতিউর বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে ।

আমরা হাসানের বাসায় ফিরে আসতেই টুকিটাকি বিষয় নিয়ে গল্পের আসর জমে উঠল। বিশেষ করে নৌ-বিহারের সময় আমাদের পাশের টেবিলের মেয়ে দুটোকে লেসবিয়ান বুঝতে না পেরে আমাদের একজন তাদের মন জয় করার জন্যে কীভাবে ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে উঠেছিল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, লেসবিয়ান জানার পর চুপসে গিয়ে বেলুনের মতো কাৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিল নিজের চেয়ারের একপাশে—সেইসব সত্যি-মিথ্যা গল্প নিয়ে থেকে-থেকে হাসির হুল্লোড় উঠতে লাগল।

অবস্থা যখন রীতিমতো জমজমাট ঠিক তখন গাড়িতে করে হাজির হল বুলবুল, ওর স্ত্রী মাহফুজা আর জাসির। ওরা এসেছিল আমাকে নিয়ে যেতে। জাসির বেশ কয়েক বছর আমেরিকার সবচেয়ে বহুল-প্রচারিত বাংলা পত্রিকা 'ঠিকানা'য় সাংবাদিকতা করেছে, কিছুদিন থেকে আহসানিয়া মিশনের হয়ে কাজ করছে। অসম্ভব উদ্যমশীল জাসির। মৃদুভাষী, মুখের ওপর নিষ্পাপ হাসি বিছিয়ে-রাখা, কৌতূহলী চোখের জাসিরের ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যা আশা ও আস্থা জাগায়। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে ওর ভেতরকার আশাবাদ নিরঙ্কুশ। নিউইয়র্কে আমি ছিলাম জাসিরের অতিথি, কাজেই ওখানকার স্বল্পকালীন প্রবাসের দিনগুলোয় ওই ছিল আমার আসল বস, আমার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। আমি কখন কোথায় যাব, কী খাব, কার সঙ্গে কতক্ষণ থাকব তা ওর ধমকেই নির্ধারিত। ওকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছিল বুলবুল, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আবৃত্তি কর্মসূচিতে একসময় অংশ নেয়া আমার একান্ত প্রীতিভাজন ছাত্র। অনেক বছর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নারায়ণগঞ্জ শাখার সংগঠক হিশেবেও দায়িত্ব পালন করেছে সে। কর্মঠ আর অফুরন্তরকমে উদ্যমশীল বুলবুলের সদাপ্রফুল্ল আনন্দময় চেহারা মনের ওপর স্নিগ্ধতা ছড়ায়। মাহফুজাকে আগে দেখিনি, কিন্তু ভালো লেগেছিল প্রথম দেখাতেই। চটপটে, উৎসাহী মেয়ে মাহফুজা, সবকিছুর ভেতরেই একটা সহজ আনন্দ খুঁজে পাবার ক্ষমতা আছে ওর ভেতরে।

আড্ডা চলছিল বেশ ভালোভাবেই, হঠাৎ বাংলাদেশ সম্বন্ধে হাসান কী একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁচা–দেওয়া কথা বলতেই সবাই যেন দপ করে জ্বলে উঠল। আমি কেন হাসানের বিপক্ষে গেলাম, তার একটা ছোট্ট ভূমিকা প্রথমে দিয়ে নিতে চাই। না হলে কেন সেদিন ঐ বিষয় নিয়ে অমন শিশুর মতো ঝগড়া করেছিলাম তা বোঝানো যাবে না।

খতিয়ে দেখতে গেলে বলতেই হয় যে হতাশ হবার মতো বহু দুঃখজনক ব্যাপার ঘটে চলেছে আজকের বাংলাদেশে। অবিরত এবং প্রতিকারহীনভাবেই ঘটছে। দেশের ভেতরে যাঁরা আছেন, এই নারকীয় কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে তাঁদের পক্ষেও আশাবাদী থাকা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের বাইরের বাঙালিদেরও একই অবস্থা। আজ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি চল্লিশোত্তর মানুষই কমবেশি নৈরাশ্যের শিকার। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ওপর আজ প্রতিমুহূর্তে যেসব মানবেতর নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেসবকে যৌবনের স্বপ্নচারিতা এবং দর্পিত শক্তি উপেক্ষা করা গেলেও, খুব বেশিদিন সহ্য করা যায় না। চল্লিশ পেরোতে–না–পেরোতেই সেইসব নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ এখানে ক্ষয়ে যায়, তার স্নায়ুক্ষমতা নিষ্ক্রিয় আর অবসন্ন হয়ে পড়ে। মুখে জেগে ওঠে নৈরাশ্য আর নেতির সুর : 'হবে না হবে না সাহেব, কিছুই হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারেন, একসময় নিজে থেকেই সটকে পড়বেন। এদেশের আর কোনো আশা নেই, বুঝলেন, এখানে এমনি করেই সব চলবে, চিরকাল এমনি করেই ...।' এভাবেই জীবনের পরবর্তী দিনগুলোয় মানবজন্ম এবং মাতৃভূমিকে অভিশাপে ক্লেদাক্ত করে জীবন শেষ হয়ে যায় সবার। দাউদ হায়দারের 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'—এই হীনমন্যতাবোধক উক্তির মধ্যে আমাদের দেশের মানুষ আজ জীবনের এইসব অর্থহীনতার সর্বজনীন প্রতীক খোঁজে।

দেশের সবখানে সারাক্ষণ যেভাবে অপ্রতিহত দস্যুবৃত্তির মহোৎসব চলছে, সবরকম শ্রেয়োবোধ ধুলোয় একাকার, রাজনীতিসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি অঙ্গন পুরোপুরি অরাজক, কোথাও কোনোরকম আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; এতে হতাশা আসতেই পারে। তবু চারপাশে নৈরাশ্যের এতসব জ্বলজ্বলে ছবি চোখের সামনে রেখেও, হতাশার কোটি কোটি দীর্ঘশ্বাস কানের পর্দায় গেঁথে নিয়েও আজও আমি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী। যে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস, গত পঞ্চাশবছরের বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক চিত্র আসলে এক অপ্রতিহত বিশাল অগ্রযাত্রার চিত্র এবং এই যাত্রা অবারিতভাবেই এগোচ্ছে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাংলাদেশ ছিল অনাহার, অশিক্ষা, রোগ–শোক–দারিদ্র্যে দীর্ঘশ্বাসবিধুর এক অসহায় বিশাল পল্লিগ্রামের নাম। গাছপালা–ঘেরা সবুজ গাঢ় পরিকীর্ণ স্থবিরতার ভেতর পৃথিবীর আদিম অন্ধকার যেন চিরকালীন পাখা বিস্তার করে এই দেশকে নিষ্কৃতিহীন বিমর্ষতার নিচে ঢেকে রাখত। সেই প্রাকৃতিক অসহায়তার ভেতর মানুষের জীবনযাত্রা ছিল চলৎশক্তিহীন, নিষ্ক্রিয় ও জড়। গতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা নতুনত্বের কোনো উৎসাহ কোনোখানে লক্ষণীয় ছিল না। জীবন ছিল পরিচিত গতের মন্থর একতারায় গাঁথা। গত দুই সহস্রাব্দের ভারতীয় সভ্যতার নিশ্চল একঘেয়ে জীবনধারার সঙ্গে এই একাকার জীবন ছিল প্রায় পার্থক্যরহিত। মফস্বল শহরগুলো ছিল এই বিস্তীর্ণ সবুজের ভেতর থেকে ছোট্ট ছুঁচোলো মুখ উঁচিয়ে থাকা একেকটা অস্ফুট জনপদের মতো যা রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল পারিপার্শ্বিক অন্ধকারের নিচে একাকার হয়ে পড়ত।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত আমি ছিলাম পাবনায়। আমাদের বাসা ছিল শহরের গা ঘেঁষে গড়ে-ওঠা পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ভেতরে। পৌষের ঠাণ্ডা গভীর রাত কনকনে হয়ে জেঁকে বসলে আমরা প্রায়ই ঘুমের ভেতর ফেউয়ের ডাকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতাম। তড়িঘড়ি ছাদে গিয়ে দেখতাম কলেজের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শীর্ণতোয়া ইছামতীর ওধারের বিস্তীর্ণ জঙ্গল থেকে জলজ্যান্ত বাঘ হাঁটতে হাঁটতে আমাদের চোখের ওপর দিয়ে এসে পুকুরের পানি খেয়ে মন্থর গতিতে হেঁটে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে। এতটাই ছিল সেকালের শহর আর গ্রামাঞ্চলের অভিন্নতা। ঢাকা শহরের শেষ বাঘ মারা পড়েছিল প্রায় একই সময়ে, উনিশ-শ সাতচল্লিশ সালের দিকে, আজকের বিজয়-সরণীয় পাশে, ঢাকার পুরোনো এয়ারপোর্ট এলাকায়। এখন যে এককোটি মানুষ-অধ্যুষিত বাংলাদেশের রাজধানী মহানগরী ঢাকা, ১৯৫২ সালে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়, তারও জনসংখ্যা ছিল মাত্র আড়াই লক্ষ।

আমি যখন স্কুলের ওপরের দিকের ছাত্র, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা তখন ছিল একটা বড় সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে তার ওপর দিয়ে অপ্রশস্ত কিছু রাস্তা। সেই মাঠে আমরা ফুটবল খেলতাম। হঠাৎ মাঠের মাঝখানটায় বড় বড় জানালাওয়ালা একটা তিনতলা আধুনিক ধাঁচের দালান উঠল। আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম : ঢাকা মহানগরী হয়ে যাচ্ছে। সেই তিনতলা দালান মতিঝিল মীরপুর সাভার হয়ে আজ সারা বাংলাদেশকে কী মাথা উঁচু করেই না ছেয়ে ফেলেছে! সেই ছোট্ট শহর ঢাকা আজ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল নগরী। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশের দূরদূরান্তেও আজ শহুরে জীবনের পায়ের শব্দ। গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের এই বিপুল বিকাশ চোখে দেখার পরেও যদি কেউ বলে বাংলাদেশের উন্নতি হয়নি তবে কি অন্যায় বলা হবে না?

এটা ঠিক যে জাপান, সিঙ্গাপুর বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করলে একে কেউ উন্নতি বলবে না। কিন্তু কেন ঐসব দেশের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের উন্নতিকে আমরা বুঝতে যাব? অবস্থানগতভাবে পুরোপুরি আলাদা দুটি দেশের তুলনা করে একটির অনগ্রসরতাকে মাপার চেষ্টা কি ঠিক? দালানবাড়ির সঙ্গে কি পুকুরের তুলনা চলে? আমাদের দেশের উন্নতিকে যদি বুঝতেই হয় তবে তা বুঝতে হবে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীতের সঙ্গে বর্তমান অবস্থাকে তুলনা করে, আমরা কী ছিলাম আর এখন কী অবস্থায় আছি, তারই নিরিখে; আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র ও শ্রীহীন এই দেশটির সঙ্গে আমাদের আজকের বিত্তের বিকাশ কতটুকু হয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করেই।

গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে বিত্তের যে সার্বিক বিকাশ ঘটেছে তাকে হতাশাজনক ভাবাটা, আমার মতে, সত্যিই একটা ভুল। সবাই জানেন আমাদের সমাজে বিত্তের প্রথম পদপাত ঘটেছিল ষাটের দশকে, আইয়ুবি উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে। আমাদের অন্নবস্ত্রহীন অনাহারক্লিষ্ট জাতির জীবনে বিত্তের আগমন সেই প্রথম। বিত্তের এই অগ্রযাত্রা, পাকিস্তানি বৈষম্যনীতির মুখে, ষাটের দশকে খুব একটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে একে পূর্ণতা দেবার প্রয়োজনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারটি আনিবার্য হয়ে পড়েছিল। আমাদের আসল বিকাশ তাই শুরু হয় স্বাধীনতা-উত্তর কালেই। স্বাধীনতার পর জাতির সামনে এক ঝটকায় খুলে যায় কোটি কোটি সুযোগের দরোজা, ষাটের প্রাথমিক বুর্জোয়া যাত্রার কাছে যা ছিল স্বপ্নের অতীত। সমগ্র জাতি সেই অন্তহীন সুযোগযজ্ঞের ওপর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হংকং, ব্যাংকক, দুবাই, প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক—কোনোকিছুই অসম্ভব নেই এখন আর। দেশব্যাপী লুণ্ঠনের সাম্রাজ্য পড়ে রয়েছে সামনে। শুধু গায়ে জোর থাকলে, মওকামতো লুটে নিতে পারলে, ন্যায়নীতি আর বিবেকশূন্য হতে পারলে জীবনের সব কাম্যগোলাপ ধরা দেবে হাতের মুঠোয়। এ সুযোগ হারালে চলবে না। আর পাওয়া যাবে না। যেভাবেই হোক পায়ের নিচে শক্তমতো একটা ভিত্তি তৈরি করে নিতে হবে। অনাদিকালের অনাহার, দারিদ্র্য আর নিঃস্বতার প্রতিকার খুঁজে নিতেই হবে তাকে প্রথম সুযোগে।

এভাবেই আমাদের জাতির জীবনে প্রথম পুঁজির সূচনা। কোনো জাতির জীবনেই প্রথম পুঁজি সৎপথে অর্জিত হয় না। আমাদেরও তা হয়নি। আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম বৈভবময় ঐশ্বর্য, আমাদের বহুকালের সযত্নলালিত মূল্যবোধের বিনিময়েই আমরা এই বিত্তের অধিকারী হয়েছি। নির্বিচার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে এই সম্পদ অর্জিত হয়েছে বলে এখানে মূল্যবোধের ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নবাবী আমলে জমিদাররা নবাবের দরবারে খাজনা পাঠানোর সময় রাস্তার পাশে ওঁৎ পেতে থাকা দস্যুরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই খাজনা লুঠে নিত, ঠিক সেভাবেই আমাদের জাতীয় দস্যুরা গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমাদের দেশের গরিব মানুষদের জন্যে আসা সারাপৃথিবীর ভিক্ষা—যার অন্য নাম বৈদেশিক সাহায্য—নির্বিবেকভাবে লুট করে এই সম্পদের পাহাড় গড়েছে। তবু মনে রাখতে হবে, যেভাবেই হোক, এইসময় ওভাবে পুঁজির সূচনা ঘটেছে বলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমাদের জাতির জীবনে একটা বুর্জোয়া বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত তিন দশকে জাতীয় জীবনে অনুষ্ঠিত এই নির্বিচার দস্যুতাকে আমি তাই এ জাতির জন্যে একটা বড় ধরনের প্রগতিশীল ঘটনা বলে মনে করি। একটি জাতির প্রথম পুঁজিগঠনের যুগে এই দস্যুতা অনিবার্য, প্রায় বিকল্পহীন বাস্তবতা। ইয়োরোপ এই বিত্তের বিকাশ ঘটিয়েছিল সারা পৃথিবীকে লুণ্ঠন করে। আমরা ঘটিয়েছি নিজেদের লুণ্ঠন করে। একটা জাতির জীবনে প্রথম পুঁজির এই সূচনা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । এ না হলে একটা জাতির শুরুটাই হয় না। এই পুঁজি দিয়ে একটা দেশ মালিকের দেশ হয়। যত ছোট আকারেই হোক আমাদের এখানে আজ একটা মালিকের দেশের সূচনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ আজও এই পুঁজি গড়ে তুলতে পারেনি। গত দু-শ বছরে পশ্চিমবঙ্গে যে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছে, তা ছিল অবাঙালিদের পুঁজি। আজও তাই রয়ে গেছে। বাঙালির কলকাতা আজও তাই বাঙালি কেরানিদের সেই চিরকালীন কলকাতা।

গতবছর চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম একটা সভায় বক্তৃতা করতে। বক্তৃতাটা ছিল বইমেলায়। ঠিক বক্তৃতা নয়, প্রশ্নোত্তর ধরনের ব্যাপার। শ্রোতারা একজন একজন করে প্রশ্ন করবে আর আমাকে তার উত্তর দিতে হবে, এমনি একটা ব্যবস্থা। তো, প্রশ্নের পর প্রশ্ন হচ্ছে আর আমি একের পর এক উত্তর দিয়ে চলেছি। হঠাৎ বলদৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল এক বলিষ্ঠ রাগী তরুণ, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই ক্ষোভ এবং তাচ্ছিল্য। আমাদের প্রজন্মকে ধিক্কার দিয়ে উঁচুগলায় সে বলতে লাগল : আপনারা জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, একাত্তুরের বিশ্বাসঘাতক রাজাকারদের ছেড়ে দিয়েছেন, আমাদের পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার কথা শুনে একেকবার আশঙ্কা হচ্ছিল যেন আমিই ঐসব রাজাকারদের ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনুনয়ের সঙ্গে বললাম : মানছি আমরা খুব খারাপ, অনেক জঘন্য আর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজের নায়ক। তবু দুয়েকটা ভালো কাজও কিন্তু আমরা এরই মধ্যে করে ফেলেছি। যেমন প্রথমে ধর, বাংলাদেশের এই-যে স্বাধীনতা (যে স্বাধীনতার শক্তিতে আজ এত জোরগলায় আমাদের গাল দিচ্ছ), দুঃখজনক হলেও এটা কিন্তু আমরাই এনেছি। তোমার ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, এর জন্যে যে দুঃখ, কষ্ট, জীবনদান, যে নিগ্রহ, যে রক্তাক্ত জনযুদ্ধ সবই কিন্তু আমাদেরই করতে হয়েছে। কেবল এটিই নয়, আরও একটা বড় কাজ করেছি আমরা। আমরাই প্রথমবারের মতো এই জাতির বিত্তের একটা শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছি। এমন ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে এই জাতি এখন একটা বড় ধরনের বিকাশের স্বপ্ন দেখতে পারে। না, খুব একটা সুসভ্যভাবে যে সেটা করেছি তা নয়। চুরি, ঘুষ, খুন, দস্যুতা, রাষ্ট্রীয় দস্যুতা—এমনি সব পথেই অর্জিত হয়েছে সেই প্রাসাদ। তবু আমরা তা করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী প্রজন্ম হিশেবে তোমাদের কাজ হবে এই বিত্তের একটা সম্ভাবনাময় বিকাশ ঘটানো। আমাদের প্রজন্মে আমরা দু-দুটো বড় কাজ করেছি। তোমরা অন্তত একটা কাজও ঠিকমতো কোরো।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে এই বিত্তের আশাব্যঞ্জক বিকাশ ঘটবে। মূল্যবোধবর্জিতভাবে বিত্ত অর্জন সম্ভব, কিন্তু ঐ পথে বিত্তের বিকাশ বা স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়। ওর জন্যে আস্থাশীল, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ দরকার। আমাদের ধারণা আমাদের পুঁজিবাদের বিকাশ-পিপাসা নিজের বাঁচার গরজেই ঐ মূল্যবোধকে কঠোর হাতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া আসলে একটি নিশ্ছিদ্ররকম সৎ ও নির্মম ব্যাপার। সামরিক প্রক্রিয়ার চাইতেও এ নির্মম এবং নিরঙ্কুশ। এই সততার মধ্যে কোথাও একচুল চির ধরলেও এ নিজের ভেতরেই আত্মঘাতী হয়ে পড়ে। ভেঙে যায়। আমাদের পুঁজিবাদী বিকাশও মূল্যবোধহীনতার বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত বিলুপ্তি ঘটাবে, এমন না-ভাবাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ষাটের দশক থেকে আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিত্তের বিকাশ শুরু হয়েছিল, সেই ধারা গত তিন দশক ধরে ক্রমাগতভাবে বলীয়ান হয়েছে। আগেই বলেছি, আমাদের জাতির জীবনে এই বিকাশ ঘটেছিল আমাদের বহুকালের সম্পন্ন মূল্যবোধ বিসর্জন দেবার বিনিময়ে। ফলে আজ আমাদের জাতি তার ঈপ্সিত প্রাথমিক পুঁজি গড়ে তুলতে পারলেও, সততা, আদর্শ বা ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। আজ দেশ যে বসবাসের পুরোপুরিরকমে অযোগ্য হয়ে পড়েছে তার কারণ এ নয় যে আমরা আগের চেয়ে গরিব হয়েছি; এর কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অন্তহীন পাপ, অনাচার, নৈরাজ্য ও আবিলতা প্রবেশ করেছে তাকে আমরা আর স্নায়বিকভাবে সহ্য করতে পারছি না। আজ দেশের কোটি কোটি মানুষ যে-কোনো উপায়ে দেশ থেকে পালাবার জন্যে উন্মত্ত আর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছে। আমরা, এদেশের মানুষেরা, যে এমন অসুস্থ ও আতঙ্কগ্রস্ত জীবন কাটাচ্ছি তা ঘটছে ন্যায়বিচার আর নিরাপত্তাহীনতার কারণে। দেশের অভিভাবকদের মূল্যবোধবর্জিত অলজ্জ স্বার্থলিপ্সা, রক্ষকদের ভক্ষকের ভূমিকা, নীতিবোধশূন্য অনাচার, প্রায় প্রতিটা মানুষের আপাদমস্তক পচন আমাদের অসহায় আর দিশাহারা করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি আতঙ্কজনক। তবু আমি মনে করি এ ঘটনা সাময়িক, উদ্দাম শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রথম বর্ষার ক্লেদাক্ত হিংস্র জলধারার মতোই। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই এই হিংস্রতা শমিত হয়ে আসবে, যেভাবে প্রথম বর্ষার প্রমত্ততা শমিত হয়ে একসময় ভাদ্রের শান্ত পরিপূর্ণ নদীকে আমরা ফিরে পাই। আজকের দস্যুতা নিজের লুণ্ঠিত হবার আশঙ্কাতেই একসময় দস্যুতাকে উৎখাত করতে বাধ্য হবে। আইনের শাসনের সূচনা ঘটাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের যে বিকাশ আমার চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি তা দেখার পর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহের কথা শুনলে আমার অবাকই লাগে। আড্ডা প্রসঙ্গে আমি এই মুহূর্তে আরও খানিকটা ছেদ টেনে এই ব্যাপারে আরও কিছু কথা বলে নিতে চাই। এটা চাই এজন্যে যে, এই কথাগুলোই ছিল সেদিনকার আড্ডায় আমার মূল বক্তব্য।

আমাদের দেশের কোন্ অঙ্গনে এই অগ্রগতির ছাপ পড়ে নি? আমাদের দেশে ষাটের দশকে যে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল, গত তিন দশকে তা বিশাল আকার নিয়েছে। দেশের ভেতরকার দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর মতো হাজার হাজার ছোট বড় কলকারখানা তো গড়ে উঠেছেই, উপরন্তু মাছ ও পোশাকশিল্পের পথ ধরে আমরা বিশ্ববাজারে প্রবেশ করেছি। আমাদের আড্ডার দ্বিতীয় দিনে আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছিলেন বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাক দেখলে মনটা গর্বে ভরে ওঠে ঠিকই, কিন্তু তারপরেই মনটা ছোট হয়ে যায় যখন দেখি এইসব পোশাকগুলোর বোতাম থেকে কাপড় সুতো সবকিছুই বিদেশি। আমি তাঁর সব কথাই মানি। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে বলি, সুতো বোতাম কাপড় সবকিছু বিদেশি হলেও ঐসব শিল্পের ব্যবস্থাপনা কিন্তু বাঙালির। এসব পোশাকের দক্ষ সেলাই, আন্তর্জাতিক বাজারে এদের মার্কেটিং, ক্ষিপ্র সরবরাহ—এসব কিন্তু বাঙালির। বাঙালির শিল্পসাফল্য আজ ঐটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে (এর আগে যেটুকুও ছিল না) এবং যেহেতু পৌঁছেছে তখন কেন পরেরটুকুতে, মানে সুতো বোতাম কাপড়ে পৌঁছোতে পারবে না তা বোধগম্য নয়। রফতানি-বাণিজ্যে পোশাকশিল্প যে বাংলাদেশের জন্যে মোটা মুনাফা বয়ে আনছে সেদিকটাকে আমি অত বড় করে দেখছি না, এই শিল্প নিয়ে আমার উৎসাহ এজন্যে যে এই শিল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিল্পক্ষেত্রে বাঙালির প্রথম সাফল্য ঘটেছে। এই সাফল্য প্রমাণ করেছে শিল্পক্ষেত্রে বাঙালির পক্ষে বড় সাফল্য দেখানো অসম্ভব নয়। গত দু-শ বছরে যে বাঙালির ব্যবসায়িক সাফল্য মানে ছিল ধর্মতলা স্ট্রিটে কমলালয় মার্কা একটা বড় গোছের কাপড়ের দোকান, সেই বাঙালির পক্ষে বিশ্ববাজারে এই সাফল্য কি খুব একটা খেলো জিনিশ ? তবে আমার ধারণা, আমাদের পোশাকশিল্পের যেসব সাফল্য আপাতভাবে চোখে পড়ছে আমাদের জাতীয় জীবনে তারও চেয়ে অনেক বড় একটা সাফল্য ঘটেছে এই শিল্পের মাধ্যমে। এই শিল্পের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো জন্ম নিয়েছে একটি নতুন বড় ও আত্মপ্রত্যয়ী শিল্পোদ্যক্তাগোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্নিপরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ। আগামীদিনে এদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে আশা করা যেতে পারে।

মানি, আমাদের শিক্ষাঙ্গনের দিকে তাকালে আপাতভাবে আশান্বিত হবার মতো কিছু চোখে পড়ে না—সেই শিক্ষাঙ্গনের যা অন্ধকার আর দিকনির্দেশহীনতায় আজ প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুলোর সাথে মিশে গেছে। তবু গত চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে হাজার হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়ে যে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে, এটা তো সত্য। অবকাঠামোগতভাবে শিক্ষাঙ্গনের যে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে তাকে কি উড়িয়ে দিতে পারব?

আজ দেশের উন্নয়ন-বাজেটে বিদেশি-নির্ভরতা শতকরা ৯০ ভাগ থেকে শতকরা ৫০ ভাগে নেমে এসেছে, সারাদেশে যোগাযোগব্যবস্থার অচিন্তনীয় উন্নতি ঘটেছে, ব্যবসাবাণিজ্য বেড়েছে বিপুলভাবে, দেশে এমন গ্রাম কমই আছে যেখানে রাস্তা দিয়ে হাজির হওয়া যাচ্ছে না, খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, গাছপালা আর হাইরাইজড় দালান গজিয়ে উঠছে পাল্লা দিয়ে, দেশজুড়ে বড় ছোট হাজার হাজার বেসরকারি সংস্থা গড়ে উঠে দারিদ্র্য কমানোর চেষ্টা করছে এবং চোখে পড়ার মতো সাফল্য দেখাচ্ছে, গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য কমছে—এসব খবর কি মিথ্যা? আজ থেকে তিরিশ বছর আগে দেশ কি এই অবস্থায় ছিল? নাকি এর চেয়ে ভালো? না, আমি এ-কথা বলছি না যে বাংলাদেশ আমেরিকা হয়ে গেছে। আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে। সে নড়ছে, এগোচ্ছে, ১৯৪৭ থেকে খানিকটা সরে এসেছে। এখন এই গতি বাড়বে।

এটুকু আমার মনে হয় বলেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোথাও অবিশ্বাস দেখলে আমি রণে ভঙ্গ দিই না। বলতে চেষ্টা করি কোনো জাতির জীবনে অগ্রগতি অত তাড়াতাড়ি হয় না। অনেক রক্তসংকুল উত্থান-পতনের চড়াই-উৎরাইয়ের পথে তার অনিশ্চিত যাত্রা। তার রাষ্ট্রকাঠামো, মূল্যবোধ, উত্তরাধিকার, কর্মযজ্ঞ, স্বপ্ন আর সংগ্রামের দাঁতাল জঠর থেকে তার উত্থান। জাতির জীবন ব্যক্তির জীবন নয়। এ এক বিশাল ব্যাপার। একটা জাতির পাশ ফিরে শুতেও অনেকসময় অনেক মানুষের জীবনের পরিধি পার হয়ে যেতে পারে। আমাদের একটি জীবনকালের মধ্যে একটা জাতির পরিপূর্ণ নিয়তি দেখে যাবার চিন্তাটাই ভুল। কোনো জাতিই তার জনগণকে সেই অভাবিত উপহার দিতে পারেনি। আমাদের জাতিও পারবে না। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। জাতিকে তার নিজস্ব বিকাশের নির্ধারিত সময় দিতে হবে। বিশেষ করে আমাদের মতো ভীতিকররকমে জনসংখ্যা-অধ্যুষিত, যুগযুগের অন্তহীন সমস্যায় আকীর্ণ অসহায়তম এই জাতিকে।

সেদিন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা উঠতেই যে ওভাবে তর্ক জমে উঠেছিল তার কারণ এই। আমার আর আতিউর-এর বক্তব্য ছিল বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বেশকিছু দিয়েছে। তার কাছে প্রত্যাশা করা মূঢ়তা নয়। আমি বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম সামাজিক আর ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে, আতিউর বলছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে। হাসানকে খুব একটা বেশি বলতে হচ্ছিল না, কারণ ও ছিল আক্রমণকারী। মাঝেমধ্যে এক-আধটা কথায় ওর কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তা খণ্ডন করতে গিয়ে গলাবাজি করে মরতে হচ্ছিল আমাদের। জাসির আর বুলবুল আমাদের সমর্থনে মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ করে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের চোখেমুখের অকথিত উষ্ণ আশাবাদ কারো চোখ এড়াচ্ছিল না। হাসানের স্ত্রী রাণু ধীরস্থির চেহারার মেধাবী মেয়ে, আমাদের উত্তেজিত বাকবিতণ্ডার মধ্যে থেকে–থেকে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নানান সুচিন্তিত মন্তব্যে বিতর্কের মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করছিল।

আড্ডা যে বেশ ভালোই জমে উঠছে তা বুঝতে পারছিলাম সময়ের ব্যাপারে আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব দেখে। রাত দুটো তিনটে চারটা হয়ে পাঁচটা ছটা এমনকি সাতটা বেজে যাচ্ছে অথচ আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সকাল আটটার দিকে গিয়ে আড্ডা থামল। পৃথিবীর কোনো তর্কে কেউ কোনোদিন হারে না, আমরাও কোনো পক্ষ হারলাম না। আতিউরের সেদিনই প্লেন, ওকে দৌড়োতে হবে এয়ারপোর্টে, সে ব্যাপারে ওর গোছগাছের তাড়া আছে। হাসানেরও কাজ আছে, আতিউরের জন্যে কেনাকাটার ব্যাপারে ওদের স্বামীস্ত্রীকে যেতে হবে বাইরে। তাছাড়া আমাদের সবারই আর কিছু না হলেও খানিকটা ঘুম দরকার। কাজেই অনেক উত্তেজনা মনের ভেতর দাপাদাপি করলেও এর পর আর আড্ডা চলে না।

মরেই গিয়েছিল আড্ডা, কিন্তু হাসান হঠাৎ গাফফার ভাইকে ফোন করতেই নতুন করে আড্ডার গন্ধে যেন নড়েচড়ে উঠলাম আমরা।

আবদুল গাফফার চৌধুরী এই সময় ছিলেন নিউইয়র্কে। ছাত্রবয়স থেকে আমি তাঁর ভক্ত এবং অনুরাগী। পঁচিশ বছর ধরে গাফফার ভাই লন্ডনে বসবাস করছেন, ডালাসের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন আমেরিকায়। আমারও আমেরিকায় আসা ঐ উপলক্ষেই। ডালাসে থাকতে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে বেশ কটা আনন্দময় দিন কাটিয়েছি। ফোনে গাফফার ভাই আছেন বুঝে হাসানকে বললাম : গাফফার ভাইকে রাতে আসতে বল।

তর্কটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় মনের মধ্যে একটা অসমাপ্তির কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল। মনে হচ্ছিল গাফফার ভাই সামনে থাকলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এভাবে সংশয়ের কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হতে পারত না। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের বেদনা বুঝতেন, আমাদের কথার সমর্থন দিতেন। বাংলাদেশের অনেক মানুষের মতো আতিউর বা আমিও অনেকদিন ধরে এই দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে আসছি। আমার দেশের ভবিষ্যৎ নেই, এ–কথা বিশ্বাস করে বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গাফফার ভাই আসতে রাজি হলেন। আতিউরকে বললাম, 'আজকের ফ্লাইটটা বাতিল করতে পার কি না দেখ তো; রাত্রে ব্যাপারটা নিয়ে আর এক দফা হয়ে যাক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতিউরের হাসি আর আত্মবিশ্বাসে ভরা চোখ এমনিতেই জ্বলজ্বল করে, আমার প্রস্তাব শুনে তা আরও খুশি হয়ে উঠল। বলল : 'আমি একপায় খাড়া। তারেকের সঙ্গে কথা বলে দেখি ও ব্যবস্থা করতে পারে কি না।' বলে ফোন নিয়ে বসে গেল। তারেক মাহবুব ট্র্যাভেল ব্যবসায়ী। আতিউরের থাকা সম্ভব কিনা তার শেষ ভরসা তারেক। তারেকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই আতিউর উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল : হ্যাঁ, আমি থাকছি ।

রাত্রে ধীরে ধীরে আসর আবার জমে উঠতে লাগল। আমি গিয়েছিলাম বাইরে, আসতে একটু দেরি করে ফেললাম। এসে অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। গাফফার ভাইয়ের সঙ্গে এসেছেন মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব, আমেরিকার প্রথম বাংলা পত্রিকা 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এসেছেন মাহবুব তালুকদার, লেখক ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন আমলা। এসেছে তারেক আর তার স্ত্রী, লাবু, আর গতকালের আমরা সবাই। সব মিলে চৌদ্দ–পনেরো জন। দিনে রাণু খুব একটা বেশি সময় না–পেলেও এরই মধ্যে রান্না করেছিল অনেক কিছু। খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই তর্ক জমে উঠল।

তর্ক শুরু হতেই গভীর নৈরাশ্যে মনের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। আমার ভাবনা ভুল। গাফফার ভাই আমাদের দলে নন। নিরপেক্ষও নন। বিপক্ষ। পুরোপুরি হাসানের দলে। এত শক্তিমান প্রতিপক্ষ সামনে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকার অবকাশ নেই। সুতরাং কোমর বাঁধতে হল।

হাসানের মতো গাফফার ভাইও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। না–হওয়ার কথা নয়। এতবড় একটা দেশ, এত বিশাল একটা জাতি, অথচ নিজের অযোগ্যতা আর আবর্জনার ওজনে কেবলই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে; কোথাও কোনো 'উন্নতির উৎসাহ' বা সম্ভাবনার আলো নেই, সব জায়গায় বিশৃঙ্খলতা, নৈরাজ্য আর সন্ত্রাস; কাগজ খুললেই খুন, দুর্ঘটনা, ধর্ষণ আর নারীনির্যাতনের কাহিনী—এসব পড়ে শুনে কারই বা আর আস্থা থাকতে চায়। সবাই যেখানে দেশকে নিয়ে হতাশ আর ক্লান্ত সেখানে কারই বা তার সম্ভাবনা নিয়ে ধুয়া গাইবার ধৈর্য থাকে।

তবু হয়তো আমাদের প্রবল আশাবাদের কারণেই জমে উঠল আড্ডাটা। আড্ডার একপর্যায়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মনে হল, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশ্বাসী–অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিবাদ চলছে। পরে মনে হয়েছে : না, আমাদের বিরুদ্ধপক্ষকে 'অবিশ্বাসী' বলা ঠিক হবে না। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের জন্যে ভালোবাসা আমাদের চেয়ে কম নয়, নানান সংগত কারণে হয়তো সাময়িকভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদেরকে বলা যেতে পারে 'সন্দিহান'। হাসান নিজেদেরকে এই নামই দিয়েছে। আরও ভেবেচিন্তে মনে হয়েছে, ঐ শব্দটাও হয়তো একটু বেশি নির্মম। বাংলাদেশের প্রতিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা সংকট নিয়ে তাঁরা যেভাবে ভাবনাচিন্তা করেন এবং সেসবের সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন, তাতে ঐ শব্দও তাদের জন্যে বেমানান। আসলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা 'চিন্তিত'। সুতরাং আমাদের যুক্তি-পাল্টাযুক্তি আসলে প্রেমিকে-অপ্রেমিকে নয়, প্রেমিকে-প্রেমিকে—একই বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত দুটি ধারার মধ্যে। আমি জানি এই দুই ধারার মধ্যে আজ বাংলাদেশে আমাদের দলটিই সংখ্যালঘু। হয়তো বেদনাদায়কভাবেই সংখ্যালঘু। বাংলাদেশের সমৃদ্ধি দেখতে পেলে খুশি হবে, এমন বাঙালি আজ বাংলাদেশে অনেক কিন্তু বাংলাদেশ একদিন সত্যিসত্যিই 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' হবে এ-কথায় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন এমন মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে কতজন? আজ যদি বারো কোটি লোকের ঠাঁই হবার মতো বিশাল একটা জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে এসে ভেড়ে আর ঘোষণা দেয় : যারাই এই জাহাজে উঠতে পারবে তারাই আমেরিকার নাগরিক হয়ে যাবে, তবে বাংলাদেশের কতজন মানুষ ঐ ডাকে লেজ তুলে দৌড় না দিয়ে পারবে? যারা যেতে চাইবে তাদের সংখ্যা দশভাগের শতকরা পঁচানব্বই কম কি? সুতরাং দুজনের সাথে ঝগড়া করলেও আমরা আসলে তর্ক করছিলাম আমাদের তুলনায় বিপুলরকমে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে, বাংলাদেশের ভেতরে যাদের সংখ্যা আজ অগণিত এবং জাতির ভবিষৎহীনতার ব্যাপারে যাদের সন্দেহ আজ নিরঙ্কুশ।

আগেই বলেছি এই সন্দেহ অকারণে হয়নি। আজ শাদা চোখে দেখলে বাংলাদেশের যে অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা আর নিঃস্বতার ছবি চোখের সামনে দেখি তা দেখে এর উন্নতিতে আশান্বিত হওয়া সত্যিসত্যি কঠিন। তবু আমার ধারণা, তার পরিমাণ আসলে যা আমাদের কাছে তা তার চেয়ে অনেক বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। কয়েকটা কারণে এটা হয়। এক, আমাদের সংবাদপত্রের কারণে; দুই, দীর্ঘদিন বিভিন্ন উন্নত দেশে বসবাসের বা আসা-যাওয়ার কারণে। তিন, আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমাদের মাত্রাতিরিক্ত মুগ্ধতার কারণে।

আমাদের সংবাদপত্রের কারণে কী করে হয় সে-কথাটা সবাই জানেন। দেশের এইসব দুর্দশার ছবি যেসব সূত্র থেকে আমরা পাই তার প্রধানটির নাম সংবাদপত্র। বাংলাদেশ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়ার মতো ছবি যে সংবাদপত্রে থাকে না তা নয়, তবে নৈরাশ্যে তলিয়ে যাবার মতো ছবি থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি। বিরাট বড় আকারে আয়তনে থাকে সেসব। আমাদের সংবাদপত্র দেশের ভেতরকার ধর্ষণ, খুন, হত্যা, দুর্ঘটনা বা পাশবিকতার খবরে যত বিভীষিকাময়; দেশের ইতিবাচক খবরে ততটা আশাজনক নয়। অবশ্যি এজন্যে সংবাদপত্রের দায়িত্ব যতটা তার চেয়ে অনেকবেশি দায়িত্ব পাঠকসমাজের। সব দেশের মতো আমাদের পাঠকসাধারণও প্রতিদিন খবরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাগজ পড়ে ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতার রোমহর্ষক খবরে শিউরে উঠতে ভালোবাসে। জাতীয় জীবনের প্রধান দুঃসংবাদগুলো দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের নাটকীয়তাহীন একঘেয়েমি ও অসহায়তার ক্ষতিপূরণ করতে চায়। তাই পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের লালাঝরানো রগরগে খবর না পেলে তাদের জীবন ঠিকমতো বসবাসযোগ্য হয় না। এতেই পাঠকদের কাছে বিক্রির জন্যে খবরের কাগজের পাতাকে ভরিয়ে তুলতে হয় বীভৎস, নিষ্ঠুর আর উত্তেজক সব খবরে। স্বাভাবিক বা জীবনপ্রদ খবরে পাঠকের মন ভরানো যায় না বলে অস্বাভাবিকতার রগরগে লালায় তাকে রসালো করে তুলতে হয়। এইজন্যে একটা কুকুর কোনো মানুষকে কামড়ে দিয়েছে তা খবরের কাগজে স্থান পায় না কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড় দিয়েছে তা অনায়াসেই কাগজের শিরোনাম হয়ে বসে। এই সমস্যার কারণেই আমাদের সংবাদপত্রগুলোকে দেশের দুর্ভাগ্য নিয়ে দিনের পর দিন বিবেকবর্জিত ব্যবসা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই দুর্ভাগ্য–দুঃসংবাদ, মৃত্যু বা ধ্বংস সেখানে যতটা জায়গা পাচ্ছে দেশের উন্নতির চিত্র সে তুলনায় প্রায় কোনো জায়গাই করে নিতে পারছে না। আমাদের পত্রিকাগুলোর সংবাদ–পরিবেশনের এই রীতি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানার ব্যাপারে একটা বড় ধরণের অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বিদেশের উন্নতদেশগুলোতে বসবাস করছেন, কেন তাঁদের কাছে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে জড় ও চলৎশক্তিহীন মনে হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাঁরা যেসব দেশের বাসিন্দা সেসব দেশের উন্নয়নের গতি এমনই ঊর্ধ্বশ্বাস যে তার পাশে আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশের যে–কোনো উন্নয়নকে এমনিতেই নিস্পন্দ ও গতিহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক। যে জাতি হাজার বছরের ঘুম থেকে একটু একটু করে জেগে উঠছে তার সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত একটি দেশ–যে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়; ঐসব দেশের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, আর নিরাপত্তার মধ্যে অনেকদিন থাকার ফলে অনেকেরই তা মনে থাকতে চায় না। যে–সব বিত্ত–স্বাচ্ছন্দ্য আর সুযোগসুবিধা ঐ সমাজের কাছ থেকে তাঁরা না–চাইতে পেয়ে চলেছেন, আমাদের দেশ তা কেন দিতে পারছে না–এ নিয়ে তাঁরা তিক্ততা অনুভব করেন। দেশের এই অপদার্থতায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। অনেকের সমস্যা আবার হয় একটু অন্য রকমের। দেশকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন বলে নিজের দেশের কাছে ঐসব দেশের সমমানের অগ্রগতি তাঁরা আশা করতে শুরু করেন এবং রাতারাতি তা না–পাওয়ায় দেশের ব্যাপারে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটে এবং এ নিয়ে তাঁরা ক্রমাগত দেশকে গালি দিতে থাকেন। তাঁদের অনেকেরই মনে থাকতে চায় না যে ঐসব উন্নতদেশে বাস করার ফলে উন্নতজীবনের যেসব সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম–আয়েশ তাঁরা ভোগ করছেন; যেসব জ্যাম, জেলি, রুটি, মাখন, পনির তাঁদের কপালে অবলীলায় জুটে যাচ্ছে; তা ঐসব দেশের মানুষের বহু শতাব্দীর সংগ্রাম, রক্ত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মদানের ফল—যে দুঃখময় সংগ্রামের তাঁরা কেউ নন। তাঁরা ঐ ধনসম্পদের বহিরাগত উঞ্ছবৃত্তিকারী মাত্র। প্লেন থেকে নেমে ঐদেশের মানুষের বহুকালের স্বেদে শ্রমে আহরিত ভোগের জিনিশগুলো সরের মতো হাতিয়ে নিয়েছেন এবং এখন নিজের বলে ভাবতে শুরু করেছেন। এবং ভাবছেন বলেই ঐদেশের মানুষের মতো বড়ভাইসুলভভাবে আমাদের সবকিছুকে করুণার চোখে দেখাটা তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে পড়ছে। তাঁরা যে এদেশেরই মানুষ এবং এখানে থাকলে তাঁরা যে আমাদের মতো এমনি অর্থহীন থাকতেন, এ-কথা তাঁরা অনায়াসেই ভুলে যান।

এসব কথা শুনে কেউ যেন না-ভেবে বসেন গাফফার ভাই বা হাসান ফেরদৌসের কথা আমি এখানে বলছি। তাঁদের অবস্থান আলাদা। তবে এ-ধরনের লোক আমি অনেক দেখেছি। দেশের প্রতি ওগরানো ঘৃণাকে পাত্রস্থ করতে তাঁরা বছরে একবার গাঁটের পয়সা খরচ করে দেশে এসে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখে যান। ঐ টাকায় তাঁরা দেশে না এসে কোনো দূর দ্বীপের সমুদ্রসৈকতে মনোরম সময় উপভোগ করতে পারতেন। তা না করে তাঁরা কেন যে দেশকে উপহাস আর অপমান করতে ও আমাদের বিষণ্ন ছোট্ট জীবনটুকুকে বিষণ্নতর করতে এদেশে আসেন, কিছুতেই বুঝতে পারি না।

গাফফার ভাই আর হাসান ফেরদৌসের ব্যাপারটা কী তা আমি কমবেশি আঁচ করতে পারি। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থান করলেও দেশপ্রেমিক মানুষ এঁরা। তবু আমি মনে করি তাঁদের মধ্যে যে সন্দেহের সুর তা যে এতটা কড়াপাকের তা কমবেশি দেশের তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কারণেই। দেশের বাস্তব সংগ্রামের সঙ্গে তাঁরা পুরোপুরি সংযুক্ত নন, অথচ দেশের কাছে প্রত্যাশাও তাঁরা ছাড়তে পারছেন না। আবার যে-পরিমাণে তাঁরা প্রত্যাশা করছেন দেশ সে-পরিমাণে তাঁদের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পারছে না। হয়তো এজন্যেই তাদের এই উৎকণ্ঠা। মাঝে মাঝে গলায় এমনি হতাশার সুর।

তৃতীয় যে-কারণে বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনকে অনেকে যোগ্যমূল্য দিতে পারেন না, সে হল মাত্রাতিরিক্ত অতীতপ্রীতি। সত্যযুগ বলতে হিন্দুদের চোখের সামনে যেমন শান্তি-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ দূর-অতীতের একটি মহান ন্যায়রাজ্যের ছবি ভেসে ওঠে, তেমনি বাংলাদেশের অতীতের কথা মনে হতে আমাদের অনেকের চোখের সামনেও এক 'ধনধান্যপুষ্পে ভরা' সমৃদ্ধ জন্মভূমির ছবি ভেসে ওঠে। অন্তহীন বৈভবে ঐশ্বর্যে ভরা সে এক শান্তিময় রূপময় দেশ। সেখানে গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই, এই ধারণা প্রায় কুসংস্কারের মতো। কিন্তু যাঁরা মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের পাতা উল্টিয়েছেন তাঁরা জানেন কী অপরিসীম দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্টের ছবিতে আকীর্ণ এর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। সমস্ত দেশের মধ্যযুগের সাহিত্যের মতো এই সাহিত্যেরও অধিকাংশ কাহিনী আবর্তিত হয়েছে বিত্তশালী মানুষকে কেন্দ্র করে, ফলে দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র সেখানে আঁকা হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকুচিত পরিসরে। তবু যেখানেই সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী এতটুকু মুখ দেখাবার সুযোগ পেয়েছে সেখানেই সেই মানুষের সাথে তার দারিদ্র্যের ছায়া পরিপার্শ্বকে বিমর্ষ ও রুগ্ণ করে তুলেছে। বাংলাসাহিত্যের প্রথম কবিতার বই *চর্যাপদ* খুললেই দেখা যায় ঢেন্টণ পা'র কবিতা :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসি।

হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেষি।

হাঁড়িতে ভাত নেই তাই কবিকে নিত্য উপবাসী থাকতে হচ্ছে—এই দারিদ্র্যের ছবি আছে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে। বারমাস্যার প্রতিটা মাস ফুল্লরাকে যে নিদারুণ আর্থিক কষ্টে পার করতে হয় তা সহনীয়তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনি দুঃখ-আক্রান্ত আর্থিক কষ্টের চিত্র রয়েছে *ময়মনসিংহ গীতিকা* আর *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরতে পরতে। এ ছবি সারা বাংলার ছবি। যাঁরা বিত্তশালী তাঁদের অবস্থাটাই বা এমন আহামরি কী ছিল তখন? ছোটরানীর চক্রান্তে রূপকথায় সুয়োরানি দুয়োরানি রাজার আনুকূল্য হারালে তাদের হয়ে যেতে হয় সরাসরি ঘুঁটেকুড়োনি, প্রাসাদের শেষপ্রান্তে কুঁড়েঘর তুলে জীবন কাটাতে হয় দুঃখক্লেশের ভেতরে। কী আর্থিক সঙ্গতি এই নিপতিত রানীদের ! কোথাও যাবার একটা জায়গা পর্যন্ত নেই। রাজার আনুকূল্য হারানো মানে সোজা কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়া আর ঘুঁটে বানিয়ে জীবন ধারণ। গ্রামের মোড়লদের বাড়ির ছবি আর কী। কিংবা কী দেখি মানিকচন্দ্র রাজার গানে? রাজা মানিকচন্দ্রের যে স্ত্রী (অদুনা) সোনার খাটে শোয় আর রূপোর খাটে পা রাখে, সেও পরের দৃশ্যে মশলা কিনতে মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হয়।

সেদিন আড্ডা দেবার সময় টের পেলাম অতীতের বাংলাদেশ নিয়ে গাফফার ভাইয়েরও হয়তো এমনি একটা স্বপ্নমধুর ও অবাস্তব ধারণা রয়েছে। যদিও ইবনে বতুতার বইয়ে লেখা নেই তবু আমার কথা ধরে তিনি জানালেন, ইবনে বতুতা লিখেছেন বাংলাদেশে যখন দুই দিরহামে একজন বাঁদী পাওয়া যেত তখন বাগদাদে পাওয়া যেত এক দিরহামে। (বইটা অনেক আগে পড়া ছিল বলে আমি তথ্যটাও সামান্য ভুল দিয়েছিলাম। ওটা দুই দিরহাম হবে না, হবে এক দিনার। এতে অবশ্যি কোনো অসুবিধা নেই। কারণ আমি জানি আমি এক দিনার বললে তিনি নিশ্চয়ই বাগদাদের বেলায় আধা দিনারই বলতেন।) কিন্তু কথাটা কী করে বললেন তিনি? অতীত বাংলার ধনসম্পদের কিংবদন্তির ভেতর তিনি কি এতটাই নিমজ্জিত? ইবনে বতুতা যখন এদেশে এসেছেন, বাগদাদ তো তখন বিশ্বের রাজধানী। বর্তমান বিশ্বে নিউইয়র্ক, টোকিও, লন্ডন বা প্যারিস যা, তখন বাগদাদ তো তাই। কেবল তাই নয়, একমাত্র। কী করে সেই বাগদাদ আমাদের চাইতে শস্তা হতে পারে? টোকিও বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউইয়র্ক কি আমাদের চেয়ে শস্তা? যে দেশের বিত্ত-বৈভব পর্বতপ্রমাণ সে দেশ কি বিত্তহীন দেশের চাইতে শস্তা হতে পারে? 'শস্তা' শব্দটাই তো একটা দারিদ্র্যবোধক শব্দ। স্কুলে এক স্যার একদিন ইতিহাস পড়াতে পড়াতে আমাদের বলেছিলেন : 'জানিস রে, শায়েস্তা খানের সময় এদেশে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত, বুঝে দেখ কী ধনী ছিলাম আমরা!' কিন্তু টাকায় আট মণ চাল কি কোনো সম্পদশালী দেশের চিত্র? আজ আমেরিকা তো এত সম্পদশালী, সেখানে কি কেউ টাকায় আট মণ চাল বিক্রি করবে? মাত্র এক দিনারে একজন বাঁদী পাওয়া যায়, এটা ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছিলেন আসলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের পরিমাণ বোঝাবার জন্য—বাগদাদের চেয়ে বাংলাদেশের ধনসম্পদ বেশি এটা প্রমাণ করার জন্যে নয়। এটা বলছি এ কারণে যে, কথাটা তোলার আগে তিনি (বতুতা) বলে নিয়েছিলেন : 'সারা পৃথিবীতে আমি এমন কোনো দেশ দেখিনি যেখানে জিনিশপত্রের মূল্য বাংলার চেয়ে কম।' আর সেটার উদাহরণ হিশেবেই বলেছিলেন : 'এখানে মাত্র এক দিনারে একজন দাসী পাওয়া যায়' বা 'এক দিরহামে সাত দিনের খাবার ও থাকার ব্যবস্থা হয়।'

আজকে বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন আর প্রযুক্তির এই অচিন্তিত অগ্রগতির যুগেও যে-দেশ এখনও এর অধিবাসীদের মুখে দু-বেলা দু-মুঠো সামান্য ভাত তুলে দিতে পারছে না, মধ্যযুগের সেই নিঃসীম অন্ধকার আর অসহায়তার দিনগুলোয় সে-দেশ কোন্ জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় সেই সমৃদ্ধি কুড়িয়ে পেয়েছিল তা বুঝে ওঠা মুশকিল।

আড্ডায় গাফফার ভাইয়ের একটা বক্তব্য হাসান তুলে ধরেছে এভাবে (সম্ভবত এই জবানির সবটাই সঠিক কেননা হাসান আড্ডার একটা বড় অংশ সেদিন ভিডিও টেপ করে রেখেছিল) :

> *'বাংলার দারিদ্র্যকে মানতে তিনি (গাফফার ভাই) একদম রাজি নন। নিঃস্ব হলে বেনিয়া ইংরেজ সাত সমুদ্র পেরিয়ে বাংলায় ঘাঁটি গাড়তে আসত না। ইবনে বতুতাও বাংলার সমৃদ্ধির কথা লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইবনে বতুতা বাংলার ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সবচেয়ে অবাক হয়েছিলেন এদেশের বস্ত্রশিল্প দেখে। বাণিজ্যেও বাংলার সাফল্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। ইবনে বতুতারও অনেক আগে, সেই দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে বিদেশি পরিব্রাজকেরা বাংলার ঐশ্বর্যের বিবরণ দিয়েছেন। সুকুমার সেন পেরিপুসের একটি রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সে-কথা প্রমাণের জন্য। পেরিপুস মিশরীয় নাবিক, গ্রিক ভাষায় তিনি বাংলা সম্বন্ধে যা লেখেন তার মোদ্দা কথা হল : গঙ্গার তীরবর্তী এই এলাকাটি খুবই সমৃদ্ধ। এইখান দিয়ে আসে তেজপাতা, গাঙ্গেয় সুগন্ধি তৈল ও মুক্তা এবং সর্বাধিক উৎকৃষ্ট প্রকারের মসলিন যাকে বলা হয় গাঙ্গেয়। শোনা যায় যে এসব স্থানের নিকটে সোনার খনি আছে এবং একরকম সোনার মোহর চলে যাকে বলে কলতিস।'*

আমি বক্তব্যগুলোর উত্তর এক এক করে দিতে চেষ্টা করি। প্রথমত, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ইংরেজ যে-বাংলায় ঘাঁটি গাড়তে এসেছিল তা ভারতের (হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলারও) সম্পত্তির লোভে সন্দেহ নেই, কিন্তু একান্তভাবে বা মূলত বাংলার সম্পত্তির লোভে কিনা এ-কথা বলা কঠিন। ভারতের সবখানেই তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল। বাংলার মাটিতে তারা যে প্রথম সাফল্য পেয়েছিল তার কারণ সেকালের ভারতে আর সব জায়গার চেয়ে বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে বিশৃঙ্খল আর অরাজক। সেই ষড়যন্ত্রমূলক পরিবেশের ঘোলা জলে মাছ শিকার তাদের পক্ষে সবচেয়ে সোজা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই বাংলার ঐশ্বর্যের জন্যে যে ইংরেজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বাংলায় ঘাঁটি গাড়তে এসেছিল তার চেয়ে আমার যুক্তিটাই ধোপে বেশি টিকবে বলে আমার ধারণা। দ্বিতীয়ত, ইবনে বতুতা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, যথা বাংলার ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হওয়া বা এদেশের বস্ত্রশিল্প দেখে অবাক হওয়া—এসব কোনো কথাই ইবনে বতুতার সফরনামায় নেই। ঐ সফরনামা ছাড়া ইবনে বতুতার আর কোনো বইও নেই। কাজেই তথ্যগুলো গাফফার ভাই কোথা থেকে পেলেন, আমি তা বুঝতে পারছি না। তৃতীয়ত, তেজপাতা, গাঙ্গেয় সুগন্ধি তেল, মুক্তা বা মসলিনের কথা তিনি যে বলেছেন, তার মধ্যে মসলিন বা মুক্তার প্রসঙ্গটা খুবই খাঁটি। এই দুটো পণ্যের বিশেষ করে মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। বহির্বিশ্বে এই মসলিন একসময় এতটাই রফতানি হতে শুরু করেছিল যে সপ্তম-অষ্টম শতকের দিকে কিছুদিনের জন্যে দিনার এদেশের ব্যবসার মাধ্যম হিশেবে চালু হয়ে গিয়েছিল। না-হলে গত দু-হাজার বছরের মধ্যে বাংলাদেশের বিনিময়-মাধ্যম প্রায় কখনোই দিরহামের ওপর ওঠেনি। কড়ি দিয়েই চলেছে এদেশের সনাতনকালের সবরকম কেনাবেচা। তবু প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পড়ে আমার ধারণা, মসলিনের উৎপাদন বাংলার কিছু নির্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল; সারা বাংলা কখনোই এতে অংশগ্রহণ করেনি। (যার অর্থ মসলিনের ব্যবসার উন্নতি কখনোই সারা বাংলাকে সমৃদ্ধি দেবার কারণ হয় নি।) এছাড়া যেসব ব্যবসার কথা বলা হয়েছে, যেমন মুক্তার ব্যবসা, গন্ধযুক্ত তৈল বা তেজপাতার ব্যবসা—এগুলো এমন কোনো বিরাট ব্যবসা ছিল না (যেহেতু এসবের উৎপাদন আরও অনেক দেশে ছিল) যা এই দেশকে বড় ধরনের সমৃদ্ধি দিতে পারে বা 'গোয়াল ভরা গরু আর গোলা ভরা ধানের' দেশে পরিণত করতে পারে।

বাংলাদেশের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় কিংবদন্তি গাফফার ভাইয়ের চোখের ওপর যে কী পরিমাণ মুগ্ধতা ছড়িয়ে রেখেছে তা বোঝা গিয়েছিল তাঁর আর একটি কথায়। (কথাটা অংশত মাহবুব তালুকদারেরও)। বাংলাদেশের পশ্চাৎপদতার সম্ভাব্য কারণ তুলে ধরতে গিয়ে আমি আড্ডার একপর্যায়ে বাঙালির চিরকালীন পরাধীনতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম, এই জাতির সূচনার দিন থেকেই আমরা পরাধীন। কখনো পালেরা আমাদের শাসন করেছে, কখনো করেছে সেনেরা, কখনো পাঠানেরা শাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছ, কখনো মোগলেরা, কখনো ব্রিটিশ, কখনো পাকিস্তানি। এই যুগযুগের দাসত্ব আমাদেরকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এতটাই গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের মধ্যে হীনমন্যতা আর স্বার্থপরতার প্রবনতাকে এমন অনপনেয় ওস্থায়ী করে দিয়েছে যা আমাদের আজকের অগ্রগতিতে একটা বড় বাধা। এর উত্তরে তাঁরা যা বলেছিলেন তা এই :

'বাংলা কখনো স্বাধীন ছিল না এ–কথা ঠিক নয়। প্রকৃত বাংলা স্বাধীন ছিল বৈকি। ইংরেজ আসার আগে যেসব বিদেশি ভারত ও বাংলা শাসন করেছে তাদের অধিকাংশই এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে, ধনসম্পদ লুট করে অন্যত্র যায়নি। বাংলা বলতেন না, তাই বলে তাঁদের কি কেউ বিদেশি বলবেন?'

মানলাম তাঁরা ধনসম্পদ লুট করে অন্যত্র যাননি, স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস করেছেন। তাই বলে কি আমরা বলতে পারব তাদের শাসন বাঙালির শাসন, আমাদের শাসন? এদেশের সমৃদ্ধি বা কল্যাণের কতটুকু বাস্তব কাজ তাঁরা করেছেন? তারা কি আমরা এদেশের প্রজারঞ্জক রাজার মর্যাদা পেতে পারেন? জনগণের কাছ থেকে খাজনা লুটে তা ভোগ–দখল করার অতিরিক্ত কী করেছেন তারা এতগুলো দিন? তাদের আমলে বাঙালির জীবনে কতটুকু সমৃদ্ধি ঘটেছে। যদি বিকাশ কিছু ঘটেই থাকে তবে তা তো হয়েছে বৃটিশ আমলে, যে সময়টাকে গাফফার ভাই সম্ভবত বাঙালির পরাধীনতার সময় বলে মনে করেন। যারা যুগের পর যুগ এদেশে থেকেও এই ভাষায় কথা বলে নি, ক্ষমতাকে কেবল প্রাসাদবাসী মুষ্টিমেয় বিদেশি চক্রান্তকারীর মধ্যে কুক্ষিগত রেখেছে; শিক্ষা, সংস্কৃতি বা জীবনাচরণে হয়ে থেকেছে বহিরাগত,এদেশকে শোষণ করা ছাড়া প্রায় কিছু করেনি; সেই যুগে 'প্রকৃত বাংলা স্বাধীন ছিল' বলাটা কি কিছুটা মোহমুগ্ধতা নয়? এবং এর দ্বারা সেকালের ঐশ্বর্যময় আর 'স্বাধীন' বাংলাদেশের ভাবমূর্তির খাতিরে বিদেশি দখলদারদের প্রতি কি অন্যায়রকম মহানুভবতা দেখানো হয়ে যায় না?

আমাদের অতীত একদিন অসামান্য সমৃদ্ধশালী ছিল, এখানে সোনার গাছে থরে থরে হীরেফল ধরে থাকত—এই বৈভবময় কিংবদন্তি কী করে গড়ে উঠল জানি না। হয়তো আমাদের জাতির যুগযুগের নিঃস্বতা থেকেই। হয়তো অতীতের একটা বর্ণাঢ্য স্বপ্নজগৎ রচনা করে তার আড়ালে নিজেদের বর্তমান শূন্যতাকে চাপা দেবার করুণ ও বেদনাময় প্রয়াস থেকেই। কিন্তু স্বপ্নেগড়া সেই কিংবদন্তির ইন্দ্রজালচ্ছটার ভেতর আমুণ্ডুপদনখ আটকে থাকার ব্যাপারটা আমাদের একটা ক্ষতি করে দিচ্ছে। সেই মহিমান্বিত মিথ্যাকে ধ্রুব ও নিরঙ্কুশ বলে ধরে নেয়ায় আমাদের বর্তমানের অর্জনকে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। বুঝতে পারছি না যে দেশ চলছে। চারপাশের সব গাছে কোটি কোটি হীরেফল খুঁজে পাচ্ছি না বলে আমরা কেবলি হতাশার অতলে তলিয়ে যাচ্ছি, জাতির ভবিষ্যৎকে কিছুতেই বিশ্বাস করছি না। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না যে সোনার বাংলা কথাটা আসলেই অতীতকাল সম্বন্ধে একালের মানুষের তৈরি একটা বানোয়াট গালগল্প ছাড়া কিছু নয়; এবং অতীতকালের দারিদ্র্য, অনাহার রোগ-শোক অধ্যুষিত নিরন্ন বাংলাদেশে এর বাস্তব অস্তিত্ব কোনোভাবেই কল্পনা করা সম্ভব নয়। আমরা ভাবতেই চাই না যে আজকের মতো অতীতেও এদেশ এমনি মাটি দিয়েই তৈরি ছিল এবং যদি আজ সোনার বাংলাকে নির্মাণ করতে হয় তবে এই মাটিকে আমাদের স্বেদ, রক্ত আর আত্মোৎসর্গের মূল্যে সোনায় পরিণত করেই তা করতে হবে ।

হাসান ফেরদৌসের কাছে আমার কিছু কথা আছে। আড্ডাতে ও ছিল আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ। এ তো থাকতেই পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যখন পত্রিকায় ও ব্যাপারটা নিয়ে লিখবে তখন ওর অবস্থান হবে নিরপেক্ষ। কিন্তু ও তা করেনি। ওর আচরণে আমাদের রাজনীতিবিদদের দলীয়করণের ছোঁয়া লেগেছে। রিপোর্টেও ও খানিকটা ওদের পক্ষ টেনে লিখেছে। মাঝে মাঝেই আমাদের কথার পর নিজের বিরুদ্ধ-যুক্তি তুলে ধরেছে । এমন কিছু মন্তব্য করেছে যাতে আমাদের অনেক কথা কখনো অসার কখনো হাস্যকর হয়ে পড়েছে। যেমন আমার কথার মাঝে মাঝে : 'সায়ীদ স্যার রণে ভঙ্গ না দিয়ে কৌশল বদলান' (যার মানে আসল অবস্থাটা রণে ভঙ্গ দেওয়ার মতোই হয়ে গিয়েছিল, তবু কৌশল বদলে কোনোরকম বাঁচার চেষ্টা করলেন), 'সায়ীদ স্যার এবার অর্থনীতির পথ ধরেন' (যার মানে ওদিকে সুবিধা না করতে পেরে এবার অর্থনীতি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা, ইত্যাদি); কিংবা আতিউরের বক্তব্যের মাঝে মাঝে : 'কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এ-কথা বললেন বোঝা গেল না। রণে ভঙ্গ দিলেন না আতিউর' (যেন রণে ভঙ্গ দেবার মতো অবস্থাতে পড়ে গিয়েছিলেন)। 'আশায় আত্মবিশ্বাসে আতিউরের চোখ জ্বলে ওঠে। আমি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনি কিন্তু তার আশাবাদের ভিত্তি কতটা শক্ত মাটির ওপর দাঁড়ানো তা বুঝতে পারি না'। মোটামুটিভাবে আড্ডার দিনে যে-পক্ষ সে নিয়েছিল সে-পক্ষ নিয়েই সে লেখাটা লিখেছে। এতে আমরা কিছুটা ভুলভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়েছি। লেখাটা পড়ার সময় কিছু করার ছিল না। আড্ডার দিন ওর ঘরে যেভাবে আমরা ওর প্রতিবাদ করতে পেরেছিলাম, ওর লেখার ভেতরে ঢুকে সেভাবে প্রতিবাদের উপায় নেই। তবে ভালোই হয়েছে। এই উছিলায় লেখাটা হয়ে গেল।

হাসান যেমন ওর লেখায় ওর অবস্থান ছাড়েনি, আমিও এই লেখায় আমার জায়গা ছাড়িনি। আমি চিরকাল আশায় বিশ্বাস করি। ব্যর্থ হলেও বিশ্বাস করতে চাই। কারণ, আশা লাভজনক। আজ মানুষের সভ্যতার যে আকাশস্পর্শী বিজয়, এর সবকিছুই তো আশা দিয়ে তৈরি। একটি ইঁটও নৈরাশ্যের নির্মাণ নয়। তাহলে আশার পক্ষে থাকাই তো সুবিধাজনক। তাহলে কেন নৈরাশ্য? কেন করুণ বিলাপ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেকজান্ডারের একটা গল্প দিয়ে এই লেখা শেষ করতে চাই। গল্পটি রয়েছে প্লুটার্কের জীবনীমালাতে। গল্পটা এরকম : মধ্যপ্রাচ্যের অন্তহীন মরুভূমিতে ছয় বছর ধরে আলেকজান্ডার আর পারস্যসম্রাট দারাউস পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দুজনারই লক্ষ্য সামরিকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থানে শত্রুকে হাতের মুঠোয় পাওয়া। শেষপর্যন্ত একদিন সন্ধ্যার পর সত্যি সত্যিই দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হল। দাবাউসের বাহিনী অবস্থান নিল পাহাড়ের ওপর, আলেকজান্ডারের বাহিনী সমভূমিতে। পরদিন রণক্ষেত্রে দুদলের দেখা হবে। আলেকজান্ডারের সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজার, দারাউসের ১০ লক্ষ (পরবর্তী হিসাবে বেরিয়েছে এই সংখ্যা ৬ লক্ষ)। সন্ধ্যার পর আলেকজান্ডারের সেনাধ্যক্ষেরা সৈন্য পরিদর্শনে বেরিয়েই সামনের অন্ধকার পাহাড়ে শত্রুবাহিনীর বিপুল জীবনস্পন্দন টের পেলেন। তাদের কথাবার্তা, চিৎকার, চলাফেরা, হ্রেষারব সবকিছুকে মনে হচ্ছিল অন্ধকারের ভেতর বিপুল সমুদ্রগর্জনের মতো। শত্রুর পরাক্রম দেখে তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। আলেকজান্ডারের কাছে গিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন : 'আদিগন্তহীন এই বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আমরা হয়তো হেরে যাব।' আলেকজান্ডার হেসে বললেন : 'হারব কী? আমরা তো জিতে গেছি। এই আদিগন্তহীন মরুভূমির মধ্যে এতদিন ছুটে ছুটে আমরা যে আজ এতবড় পরাক্রান্ত শত্রুকে সামনে পেয়েছি এতেই তো আমাদের জয় হয়ে গেছে। এখন শুধু যুদ্ধটুকু বাকি।' সবাই জানেন পরের দিনের যুদ্ধে আলেকজান্ডারের হাতে কীভাবে দারাউসের সেই বিশাল সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। আমারও তেমনি মনে হয়, পাল–সেন–পাঠান–মোগল–ব্রিটিশ–পাকিস্তানিদের দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের শাসনের নির্মম পরাধীনতাকে পিছে ফেলে একাত্তুর সালে আমরা যে স্বাধীন হতে পেরেছি—এতেই তো আমাদের সবকিছু পাওয়া হয়ে গেছে। এখন যা দরকার তা হল করণীয় কাজগুলো শক্তি আর যোগ্যতার সঙ্গে করে যাওয়া।

আজ বাংলাদেশে যে বিপুল নির্মাণযজ্ঞ চলছে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আমিও তাতে অংশ নিয়ে চলেছি। এত মানুষের এত উদ্যম, স্বপ্ন, আর আত্মাহুতি—এর সবকিছু শুধু মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমি এটা ভাবতে পারি না। আড্ডার শেষে যা বলে শেষ করেছিলাম এখনও তাই বলি। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেই—কথাটা আমার জন্যে অতি ভয়াবহ, কেননা এ আমার আত্মবিনাশের সমান। যদি বুঝি আশার সব আলো নিভে গেছে, তবু বোকার মতো, প্রেমিকের মতো অন্ধের মতো ঐ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে; যেহেতু এর ব্যত্যয় আমার বিলোপ ছাড়া কিছু নয়।

৫.৯.৯৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই সাহিত্যের আড্ডা

আমাদের লেখকেরা আজকাল বড় ব্যস্ত। সবাই যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। যেন দণ্ডকারণ্যের মায়াহরিণ অলৌকিকের বিভ্রম জাগিয়ে উধাও হচ্ছে সামনে থেকে আর তাকে পাবার জন্যে জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটে যাচ্ছে সবাই। কবি, লেখক, গল্পকার, প্রবন্ধলেখক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, বুদ্ধিজীবী— সমস্ত সমাজ, সমস্ত দেশ সবাই দৌড়োচ্ছে আজ। দেশজুড়েই ঘটছে ব্যাপারটা। সারাটা দেশই যেন সেই একই সোনার হরিণের অভিন্ন হাতছানিতে উন্মত্ত, দিশেহারা। উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আমলা, প্রকৌশলী, মুদি, অধ্যাপক, শিক্ষক সবাই সেই ভেদাভেদহীন রূপসীর হোমানলে আত্মহত্যার জন্যে মরিয়া, অসহায়! সারাজাতির এই ক্রমবর্ধমান উন্মাদনা লেখকদের রক্তেও সংক্রমিত হয়ে গেছে আজ। অবনীকে বাড়িতে পাবে না আজ কেউ আর। সকাল দুপুর রাত কখনোই সে আর আজ বাড়িতে থাকে না। না-থাকার মতো হয়ে কীভাবে যেন থাকার কৌশল শিখে নিয়েছে সে। বন্ধুদের হুল্লোড়ে, প্রেমের যন্ত্রণায়, বিকেলের আড্ডায় সে নেই এখন। কেউ তাকে কোনোখানে আর দেখে না। মাথায় খুন চড়ে যাওয়া মানুষের মতো বাণিজ্যপাড়ায়, প্রাপ্তির করিডোরে, সুযোগের ঈপ্সিত স্বর্গের পথ ধরে সে কেবলি ছুটছে। এখন তার সঙ্গে দেখা কেবল একজনের, তার নিয়তির। তারই রমণীয় আহ্বানের পেছনে ছুটে বেড়ানোই এখন তার একমাত্র কাজ।

একটা উজ্জ্বল ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আজ তার জন্যে বড় জরুরি। না হলে কেন যেন স্বস্তি পাচ্ছে না সে। নিজেকে পর্যাপ্ত ভাবতে পারছে না। না, কেবল ভালো নয়, নিশ্ছিদ্র আর বিত্তশালী একাট ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার নেশাই পেয়ে বসেছে তাকে। শহরের সম্ভ্রান্ত জায়গায় একটা সুপরিসর ফ্ল্যাট, সেইসঙ্গে সম্ভব হলে নিজস্ব আর একটা বাড়ি, ব্যাংক ব্যালান্স, ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশোনার ব্যবস্থা— এইসব করতে গিয়ে 'ভারতীরে ছাড়ি' 'লক্ষ্মীর উপাসনাতে'ই আমুণ্ডু নিমজ্জিত হয়ে আছে সে। তার অনেককালের লেখকজীবন আজ গড়ে উঠছে সমাজের বিত্তবানদের আদলে। বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঝাঁঝালো উন্মাদনা তার মানসিক শান্তিকে বিস্রস্ত করে দিয়েছে আজ, শিল্পের শান্ত অপলক জগৎ নির্মাণের জন্যে যা জরুরি। তার শিল্পীসুলভ স্থৈর্য ছিন্নভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেছে। বিত্তের স্থূল প্রয়োজন অনৈতিকতার সঙ্গে আপোষকে অনিবার্য করে তার মূল্যবোধের উঁচু মাথাকে অবনত করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণের অহংকারী মূল্যবোধ বৈশ্যের সমর্পিত দাসত্বের পায়ে অশ্রুপাত করছে। বিত্তকে অনৈতিক বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে খ্রিস্টধর্মে। বাইবেলে বলা আছে, একজন ধনী বা বিত্তশালীর পক্ষে বেহেশতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা ততটাই সোজা, যতটা সোজা সূঁচের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে উটের প্রবেশ করা। আজ আমাদের লেখকদের অনেকেই বিত্তের এই মোহের পেছনে জীবন উৎসর্গ করে নিজের আকাঙ্ক্ষার স্বর্গটি হারিয়েছেন। এই স্বর্গ শিল্পের স্বর্গ।

আমাদের ছেলেবেলাকার চিত্র এ থেকে অনেকটাই আলাদা। সে-সময় একজন মধ্যবিত্ত লেখকের বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আজকের তুলনায় অনেক সীমিত। সে-সময়কার সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনও ছিল এমনি, লেখকদের জীবনে ছিল তারই সম্প্রসারণ। মধ্যবিত্ত জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনগুলো এমন সাধ্যাতীত বা সংখ্যাহীন হয়ে উঠে যন্ত্রণাময় অশান্তির ভেতর জীবনকে তখনো নিষ্পেষিত করে তোলে নি। টিভি, ফ্রিজ, ভিসিআর, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, ওভেন, কিংবা দামি আসবাবপত্র আর জাঁকালো পোশাকের জবরজং জগৎ একজন মধ্যবিত্তের জীবনকে অসহনীয় চাপের ভেতর অনর্থক কষ্ট দিত না।

মোটামুটি একটা কাঠের টেবিলের চারধারে গোটা চার-পাঁচ চেয়ারের একটা চলনসই 'বৈঠকখানা', শাদামাটা কাঠের এক বা একাধিক চৌকি বিছানো শোবার ঘর, বাড়িতে সবার জন্য একটা আলনা, একটা বড় গোছের আয়না, গোটা কয় টিনের তোরঙ্গ, একটা বড় সাইজের লেপতোশক রাখার কাঠের বাক্স এবং একটা চলনসই রেডিও সেট— এই ছিল সেকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের সাকুল্য আয়োজন। এরপর যা, তা ছিল জীবনের উচ্চতর অভীপ্সা নিয়ে সাধ্যমতো চিন্তাভাবনা, বইপত্রের পড়াশোনা, খেলাধুলা, তাস, পাশা, গ্রাম্যমেলা, ঈদ আর পালাপার্বণের গতানুগতিকতা। শান্ত সুস্থিত গতানুগতিক সেই জীবনযাত্রা এদেশের যুগযুগান্তরের অনড় জীবনধারাই অনুরূপ।

পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে ষাট দশকের মাঝামাঝির চিত্রটি মোটামুটি এই। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকেই বৈষয়িক সম্ভাবনার সোনার হরিণ এক-দুই করে হঠাৎ দেখা দিয়ে মধ্যবিত্তের জীবনের আঙিনাকে উতলা করে তুলতে শুরু করে। ঐহিক প্রাপ্তির হঠাৎ-ঝলকানিতে মধ্যবিত্ত জীবন এই সময় বেশখানিকটা নড়েচড়ে বসে। কিন্তু এই বিকাশ তখনো এমন প্রমত্ত বা বল্গাছাড়া নয় যে তা অনেক যুগের সুস্থির চেতনালোককে ভেঙে তছনছ করে দেবে, সৃজনশীলতার একাগ্র জগতকে বিস্রস্ত করবে।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের দিকে আমাদের মধ্যবিত্তের সামনে সুযোগসুবিধা একেবারে কম আসে নি, কিন্তু তা হল সেই মাইল্ড টেনশন, মৃদু উৎকণ্ঠা—জীবনকে যা সুস্থ রাখে, উত্তাপে-উষ্ণতায় প্রাণবন্ত করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবিত্তের সামনে যে সুযোগ এসে দাঁড়াল, তা অকল্পনীয়। হ্যামেলিনের দুর্বিনীত কোটি কোটি উৎসুক ইঁদুরের মতো তা অরাজক ও অগণিত। সুযোগ—অন্তহীন, উচ্ছ্বত, সর্বগ্রাসী; অপ্রতিরোধ্য, বিশাল, ধ্বংসাত্মক। এই সুযোগ আমাদের মধ্যবিত্তের সামনে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার অন্তহীন দরজা। পুরোপুরি দিশেহারার মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই সুযোগ-যজ্ঞের ওপর, এতে আত্মাহুতি দিয়ে মোক্ষসন্ধানে উন্মত্ত হয়েছে।

না, কেবল সুযোগ নয়, সুযোগের হাত ধরে আরেকটা দুরপনেয় জিনিস এসেছে স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্তের জীবনে। তা হল প্রকট অর্থনৈতিক সংকট। ষাটের দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ছিল মোটামুটি বেঁচে থাকার মতো একটা অবস্থায়। সচ্ছলতা এমন কিছু ছিল তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক অচেনা ছিল দারিদ্র্যের নির্মমতা। কিন্তু সত্তুরের দশকে দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ায়, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তার যে-প্রভাব পড়ল তা মর্মান্তিক। উৎপাদনহীন সেই দেশে টাকার দাম কমতে লাগল পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের মতো। রাজনৈতিক জগতের অরাজকতা এবং মূল্যবোধহীনতা এতে ইন্ধন জোগাল। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে লাগল তরতর করে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটতে লাগল মুদ্রাস্ফীতি। চারধার যেন শুকিয়ে উঠতে লাগল কারবালার মতো। সেই তৃষ্ণার্ত জলহীনতার জগতে মধ্যবিত্তের জীবনের সুস্থিরতা, স্বস্তি, শান্তি পুরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করল। আরও টাকা চাই, রোজগার চাই, না হলে সংসারের হা-করা নিষ্ঠুর জঠরের নিবৃত্তি নেই কোনোমতে। এ থেকে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। এর ভেতর বেঁচে থাকার মর্যাদা নেই। এই অক্ষমতা এই অসম্মান এই নিঃস্বতা ভয়ংকর ও অচেনা। বৈশাখ-দুপুরের চিতার আগুনের মতো রুক্ষ কঠোর আর দাউদাউ করা। পঞ্চাশ-ষাট দশকে একজন চাকুরিজীবী যে বেতন পেত তাতে কোনোভাবে টেনে-হেঁচড়ে মাসের পঁচশিটা দিন চলে যেত। বাকি পাঁচটি দিন ধারকর্জে, কষ্ট-টানাটানিতে কাটিয়ে দিতে পারলে— আবার অভিনন্দনমুখর সেই মাস-পয়লা, বেতনের টাকার ঝকঝক-করা উজ্জ্বল তেজী জীবন, শান্ত ছোট্ট নিরাপদ ঢাকা শহরে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়ায় উষ্ণ মুখর দিনরাত্রি।

কিন্তু কয়েক বছরের ভেতর মধ্যবিত্তের জীবনের এই গোটা মানচিত্রটাই পুরো পাল্টে গেল, বিশেষ করে চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের, যারা শিল্প-সাহিত্যের সজীব স্রোতকে প্রবাহিত করে রেখেছিল। এখন যে বেতন পাওয়া যায় তা দিয়ে দশটা দিনও কুলিয়ে ওঠা যায় না। সামনের বিশটা দিনের হা-করা ভয়াল তপ্ত মরুভূমিটা পার হবার উপায় কী? কাজেই, রোজগার চাই, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো চাই, নতুন নতুন অর্থাগমের উৎস চাই। না হলে সব অন্ধকার। হয় অপমানে হীনতায় শেষ হও, নয় আত্মহত্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে জ্বালা জুড়াও। কিন্তু সেকালের সীমিত সুযোগসুবিধার ভেতর সৎপথে থেকে টাকা কোথায়? কিন্তু অস্তিত্বের জন্যে রোজগারের জন্যে টাকার বিকল্প কী? বৈধ পথে সম্ভব না হলে অবৈধ পথেই তা করতে হবে। ঘুষ, অন্যায়, অনৈতিকতা যে-পথে পারা যায় তা চাই। চাকুরেদের পক্ষে এটা কঠিন হয় নি। রাষ্ট্রের স্বার্থের পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত তাদের ওপর। সেই স্বার্থকে সামান্য ঢিলে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে গেছে তারা। বাঁচাতে গিয়ে আরও লোভের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়েছে, নির্বিবেক কুৎসিত হয়ে গেছে। এটা তারা হতে চায় নি। অসহায় অবস্থার হাতে জিম্মি হয়েই এমনটা করতে হয়েছে তাদের। মানুষ স্বভাবত মর্যাদার জীবনই কামনা করে। সে জানে অনৈতিকতার জিভ বড় শক্তিশালী। কোনোকিছুই সে গোপন থাকতে দেয় না। সমস্ত গর্বিত মাথাকে ক্রেন দিয়ে টেনে সে ধূলায় মিশিয়ে দেয়। তার দুর্নীতিও কিছুতেই ঢাকা থাকবে না। হালফ্যাশনের গাড়িতে চড়ে, দামি স্যুট গায়ে চাপিয়ে দামি সিগারেট যত চৌকশভাবে টেনেই সে ধোঁয়া ওড়াক, তার স্ত্রী জানে তার স্বামী একজন অবৈধ মানুষ, সে একজন চোরের স্ত্রী। তার ছেলেমেয়েরা জানে তারা চোরের ছেলেমেয়ে। তার আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবেরা জানে তারা একজন চোরের আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব। এমন মানুষের শান্তি কোথায়? নিজের ছাই হওয়া বিবেকের কাছেই বা তার জবাবদিহিতা কী, সান্ত্বনা কী?

না, এটা কেউ চায় না। তবু এই অবারিত অনৈতিকতা শুরু হয়ে গেল আমাদের সমাজে, নিরুপায়ভাবেই শুরু হল। এভাবে শুরু হল আমাদের জাতির আজকের পতন আর অনৈতিকতার যুগ। ষাটের দশকে একটা অফিসের অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছিল চিহ্নিত, হাতেগোনা। তারা ছিল সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত। বলা যেত এই অফিসের এই কটা মানুষ অসৎ। আজ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আজ একাট অফিসের দিকে তাকিয়ে বলতে হয় উল্টোকথা। বলতে হয় এই অফিসের এই হাতেগোনা কটা মানুষ সৎ। সৎমানুষেরা আজ চিহ্নিত, উপহাস্য, করুণা আর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু—অবাঞ্ছিত আর নিপিষ্ট।

সত্তুরের দশকের এই অনটন থেকে বাঁচতে গিয়ে অস্তিত্বের নিষ্ঠুর সংগ্রামে নেমে পড়েছিল আমাদের মধ্যবিত্তের বৈষয়িক ধারা— ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেকালের অপ্রত্যাশিত বিশাল সুযোগ-যজ্ঞের ওপর। অনৈতিকতা করে হোক, অবৈধতার পথে হোক, ডাকাতি দস্যুতা যেভাবেই হোক, পায়ের নিচের ভিতটাকে স্থায়ীভাবে পাকা আর মজবুত করে তুলতে হবে তাদের। নিজেদের ভাগ্যকে নিরঙ্কুশ করে নিতে হবে। এই নৈতিকতা ও আর দস্যুতার ভেতর দিয়ে আমাদের আজকের বাংলাদেশের এই অভাবিত বিত্তের বিকাশ।

অস্তিত্বের এই সংকটের মুখে টাকা আর বৈষয়িকতার ধান্দায় আমুণ্ডু জড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যবিত্ত। লেখকরাও এই বাইরে নয়। যারা ঐ সংকট কাটিয়ে বিত্তের জগতে সাফল্য পেয়েছিলেন, তারা উচ্চতর প্রলোভনের হাতে বন্দি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলেন। মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল তাদের। রজত সাফল্যের জ্বলজ্বলে জগতে সমর্পিত হয়ে পড়ায় তাদের চেতনার ধার এমনিতেই কমে এসেছিল। এভাবে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে এসেছিল আমাদের লেখকসমাজের একটি অংশ। বাকিদের অনেকেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তীব্র আর্থিক সংকটের হাতে মার খেতে-খেতে। অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টায় ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে এসেছিল তারা একসময়।

আমাদের আজকের লেখকদের ভেতর শিল্পযাপনের নিশ্চিন্ত অবকাশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বললেই চলে। আগেই বলেছি তাদের সবার জীবন আজ স্পষ্টতই দুইভাবে বিভক্ত যা একভাগে রয়েছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা— দুবেলা দু'মুঠো খেয়ে পরে বাঁচার জন্যে, ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্যে অর্থহীন জীবনপাত। ধান্দার পর ধান্দা, কাজের পর কাজের ঊর্ধ্বশ্বাস উদ্ধারহীন শ্রম। এমন উত্তেজনাপূর্ণ, অস্থির অবকাশহীন জীবনের ভেতর থেকে কী করে শিল্পের অপার্থিব ফুল ফুটবে? মনে আছে, ষাটের দশকে আমাদের মতো গড়পড়তা চাকরিজীবীদের একটা চাকরিতেই মোটামুটি সংসার চলে যেত। খুব ভালোভাবে না হলেও যেত। কিন্তু আজ একজন ডাক্তার, আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা প্রকৌশলীরও একটা চাকরির বেতন দিয়ে সংসার চলে না। বেতনের টাকা দিয়ে টেনেটুনে সংসার খরচ চলে গেলেও বাড়িভাড়ার জন্যে বিকেলের দিকে আর একটা ধান্দার দরকার হয়ে পড়ে। টুকিটাকি শখ মেটানোর জন্যে স্ত্রীর চাকরি করার দরকার হয়। এমনি নির্মম উদ্বৃত্তহীন অসম্ভব সমাজে সত্তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে লেখক কীভাবে লেখার ভেতর পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবেন? লেখা থেকে সামান্য যা পাওয়া যায় তা দিয়ে তো জীবন বাঁচে না। আর সবাই যে কাঁড়ি কাঁড়ি লিখতে পারবেন এরও তো কোনো কথা নেই।

আমাদের লেখকরা আজ কেবলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, কেউ নেহাত বেঁচে থাকার তাগিদে, কেউ উচ্চতর সম্ভাবনার হাতছানিতে। কারো সাথে কারো দেখা নেই। যদিও বা একআধটু দেখা হয়, তাও হয় সেই ব্যস্ততার মধ্যে। একচিলতে অপসৃয়মান অস্ফুট অবাস্তব ছায়ার মতো আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখি, তারপর পরস্পরের কাছ থেকে হারিয়ে যাই, কেউ কাউকে শনাক্ত করতে পারি না। চিনতে পারলেও দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে কেউ কাউকে স্পর্শ করি না। বলতে পারি না : এক পরিবারের ভাই আমরা হে ইটিওক্লিস, প্রাকৃতিক বৈরিতায় অগ্রহণযোগ্যভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের দিকেই তবু আমাদের চিরদিনের রক্তযাত্রা।

আমাদের ভেতর দেখাসাক্ষাৎ নেই, দেখা হলেও কথা নেই, প্রেম ঘৃণা ঈর্ষা কিছুই নেই। কারো লেখার জন্যে কারো মমতা নেই, সাহায্য নেই, করণীয় নেই। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লেখাটি যেমন উপেক্ষিত তেমনি অবহেলিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট লেখাটি। সবাই আমরা একা, আলাদা আর অবসিত। এ কেমন কামক্ষুধাহীন জগতে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের দশকের যৌবনের দিনগুলো আজো চোখের সামনে ভাসে। কী গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমাদের ভেতর! একজোট হয়ে কীভাবে দলবেঁধে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াতাম দিনরাত। সাহিত্য-শিল্পের জন্যে কামানের গোলায় জীবন উড়িয়ে দিয়ে শহীদ হতে চাইতাম। আমরা আড্ডা দিতাম, ভালোবাসতাম আর অপচয়ের ভেতর জীবনের বৈভবময় সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতাম। সে অবকাশ আমাদের ছিল। কোটি কোটি এককভাগে ভাগ-হওয়া সাহিত্য তখনও বিচ্ছিন্ন অপরিচিত মানুষের আলাদা পৃথিবী হয়ে ওঠে নি।

আজ বাংলাদেশ সত্তর দশকের অস্থিরতা উৎরে একটু-একটু করে আবার সুস্থির হয়ে উঠছে। গত আড়াই দশকের নির্বিচার দস্যুতা আর অনৈতিকতার ভেতর থেকে অর্জিত বিত্তই আজকের এই সুস্থিরতার ভিত্তি। আমাদের জীবনে অবসরের জানালায় আবার একটু-একটু করে বুলবুলিরা ওড়াউড়ি শুরু করেছে। আজ আমাদের লেখকদেরও আবার কাছাকাছি হওয়া দরকার। সবাইকে খুঁজে পেতে আবার একখানে হওয়া দরকার। এ দেখা কাজের ভেতরকার দেখা নয়, পথচলতি মানুষের অবয়বহীন চকিত অস্ফুট দেখা নয়; এ দেখা অবকাশের দেখা, যে অবকাশের ভেতর শিল্পীমন রচিত হবার জন্যে গ্রীবা বাড়ায়, স্বপ্ন দেখে, হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে। একটা সৌকর্যময় মদের বোতলকে ঘিরে যেমন পাঁচজন মানুষ 'ইয়ার' হয়ে ওঠে তেমনি শিল্পসাহিত্যের অলীক জগৎকে মাঝখানে রেখে আমরাও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠব। সবার একটু-একটু উত্তাপ দিয়ে আমরা আবার জীবন পাব। পরস্পরের উষ্ণতায় সকলের গা তাতাব।

বড় উদ্দেশে বেরোনোর আগে সবাইকে তো মিলতে হয়, সেই যূথবদ্ধতা আমাদের কই? অবকাশের ভেতর অদরকারের ভেতর আমাদের নির্জলা উত্তাপের বিনিময় কই? সব দেশের সারস্বত-সমাজে তো এই সংঘচরিত্রের রেওয়াজ থাকে, আমাদের কেন মরে গেল? কলকাতায় কফি হাউসে, বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকার অফিসে, লেখকদের বাসায়-বাসায় সবসময়ই তো এই আড্ডা চলেছে। আড্ডা, মিত্রতা, সাহিত্যানুরাগের উষ্ণতা, বড়কিছুর আসন্নতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া— কোথায় নেই এসব? মালার্মের বাসায় শনিবার সন্ধ্যার সাহিত্য আসরে সারা ইয়োরোপ থেকে কবি শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা আসতেন। আড্ডায়, আলোচনায়, পানাহারের উষ্ণতায় শিল্পসাহিত্যের সম্পন্ন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন।

আজ আমাদের সেই আড্ডা চাই। আড্ডা—নির্জলা, রক্তিম, আকারণ। প্রশস্ত অবারিত চালের নিচে নির্ঝঞ্ঝাট হৃদয়ের একটুখানি উষ্ণতা। এতে বড় শিল্পসাহিত্যের ভিত তৈরি না হোক, অন্তত আমরা আবার বন্ধু হব, সুস্থ হব, হালকা হব—এটুকু ভাবতে দোষ কী?

১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই লেখকে-লেখকে সহযোগ

আমাদের বন্ধু শহীদ কাদরী ছিল ষাটের দশকের সবচেয়ে প্রখর লেখকদের একজন। কবি হিসাবে ক্ষুরধার তো ছিলই, তারও চেয়ে বেশি ছিল আড্ডাবাজ আর রসিক। ওর গলার ভরাট স্বরের মতো ওর হৃদয়টাও গমগম করত। উদ্দাম আড্ডা আর ছাদ-কাঁপানো হাসিতে ও সে-সময়কার ঢাকা শহরের বেশকিছু রেস্তোরাঁকে সপ্রাণ করে রেখেছিল। পুরোনো ঢাকার বিউটি বোর্ডিংকে ও করে তুলেছিল পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের জমজমাট মিলনকেন্দ্র। যে রেস্তোরাঁয় ও বসত সেটাই সরগরম হয়ে উঠত, লেখক কবি-বুদ্ধিজীবীদের শব্দিত আনাগোনায় বিখ্যাত হয়ে যেত। সেকালের গুলিস্তান এলাকার রেক্স, গুলসিতান, লা-সানি ওর সুবাদে লেখকদের দৈনন্দিন গন্তব্য হয়ে উঠেছিল।

ওর শরীরের গড়ন ছিল চওড়া দোহারা। ক্ষিপ্র, বুদ্ধিদীপ্ত, আমুদে আর ফুর্তিবাজ শহীদ ছিল আমাদের যৌবনের দিনগুলোর সবচেয়ে জমকালো মানুষ। কীভাবে যেন আমাদের মনের ভেতর সহজেই ওকে আমাদের চেয়ে বড় জায়গা দিয়ে দিয়েছিলাম আমরা, সব দিক থেকে আমাদের ওপরে বলে ওকে মেনে নিয়েছিলাম। কেবল আমরা নই, আমাদের চেয়ে দশ বছরের বড় শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমানও ওকে আমাদের সমবয়েসী মনে না করে নিজেদের সমবয়েসী ধরে নিয়েই যেন কথা বলতেন। যেন তাঁদেরই অন্তরঙ্গ ইয়ার কেউ। বয়সের তুলনায় ব্যক্তিত্বের পরিণতি ওর ছিল এতটাই উজ্জ্বল। লেখাপড়ায়, চিন্তায়, বিচার-বিবেচনায়, কবিত্বে ও ব্যঙ্গে ও ছিল সবাইকে ছাড়ানো। সে-সময়কার তরুণ লেখকদের অনেকেরই কাজ হয়ে উঠেছিল ওর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আর ওকে অনুকরণ করে যাওয়া। ওর ঢাকাইয়া কুট্টি ধাঁচের উর্দু-মেশানো বাংলা থেকে আরম্ভ করে কথাবার্তার ঢং, শব্দের ব্যবহার, রাত থেকে রাতে ঢাকার রাস্তাকে সচকিত করে হেঁটে বেড়ানো, ওর নিঃসঙ্গতা, বোহেমিয়ান জীবন, বেদনা, ব্যর্থতা—সবকিছুই যেন সেই সময়কার তরুণ লেখকদের অলিখিত নিয়তি হয়ে উঠেছিল।

এমন যে অসাধারণ শহীদ, সে একদিন আমাকে একটা নিগূঢ় কথা বলেছিল। একদিন কথায় কথায় বলল : 'ধর তুই আর আমি দুইজনেই কবি, একেবারে জানের দোস্ত। অহন কাগজে তোর একটা কবিতা বাইরইছে, আমি সেইডা পড়ছি। বিকালে তোর সঙ্গে দেখা। তুই কইলি একটা কবিতা বাইরইছে 'সংবাদে', দেখছস? বেশ ভালোই হইছে কবিতাটা। তখন তোরো আমি কী কমু ক' দেহি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শহীদ বলল : 'কবিতাডা পড়ার কথা বেমালুম চাইপা যামু? য্যান তোর কবিতা পড়ার জন্য ছাতি ফাইটা যাইতাছে এমনি ভাব দেখাইয়া কমু, 'কস কী! 'সংবাদে' ছাপা হইছে? আরে সকালবেলাই তো পড়লাম কাগজটা? ক্যান দ্যাখলাম না ক' দেহি? বাসায় যাইয়াই পড়মু।'... তাও কমুনা যে পড়ছি। ক্যান কমুনা জানস? কইলে যে তুই খুশি হইবি, মনটা একটু ভালো লাগব, নিজের ওপর বিশ্বাস আইব, এই শান্তি আমি তোরে পাইতে দিমু না!'

এটা–যে আড্ডাবাজ শহীদের একটা বানানো গল্প তা নয়, ওর জীবনেই ঘটেছিল ঘটনাটা। ওর এক বন্ধু একবার ওকে এসে বলেছিল যে, ওদেরই আরেকজন বন্ধু ওর (শহীদের) একটা কবিতা পড়ে নাকি তার কাছে দারুণ প্রশংসা করেছে। দিন কয়েক পর সেই পাঠকবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আশান্বিত শহীদ যখন ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে কবিতাটা কেমন লেগেছে জানতে চাইল, বন্ধুটি নির্মল হেসে (যেন কবিতাটার কথা এই প্রথম শুনল), সলজ্জ ভঙ্গিতে বলেছিল : কী বললি, ঐ নামে তোর কবিতা বেরিয়েছে?... না তো ভাই, কবিতাটা চোখে পড়ে নি। আচ্ছা, আজই পড়ে ফেলব।

শহীদের কবিতা নিয়ে ওর বন্ধুর ব্যবহারের সঙ্গে আজ আমাদের অধিকাংশ লেখকের আচরেণেরই হয়তো খুব–একটা পার্থক্য করা যাবে না। এদেশে আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যেসব লেখা বেরোচ্ছে, সেসবের ব্যাপারে কার্যত আমাদের কোনো উৎসাহ নেই। উৎসাহ থাকলেও আমাদের কথায় বা লেখায় সে উৎসাহের কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের বন্ধু বা লেখকেরা চারপাশে কী লিখছে আমরা মন দিয়ে তা পড়ছি না। পড়লেও মনের ভেতর যে উদ্দীপনা জাগল তা নিয়ে ভুল করেও দু–পৃষ্ঠা লিখে ফেলা বা লেখককে দুটো উৎসাহের কথা বলে তাকে কিছুটা অনুপ্রেরণা দেওয়া—এধরনের কোনো কিছু করতে চাই না। বরং বন্ধুর লেখাটি প্রশংসা পাচ্ছে, অভিনন্দিত হচ্ছে দেখলে কোথায় যেন আমরা ত্রস্ত আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমাদের মুখ শুকিয়ে ওঠে। মনে হয় যেন হারিয়ে যাচ্ছি। অস্তিত্ব হারানোর ভয় আমাদের অধিকার করে।

সুতরাং আমাদের তখন করণীয় একটাই থাকে—ঐ তৃপ্তি, খ্যাতি, আত্মবিশ্বাস, উদ্দীপনা থেকে তাকে নিঃস্ব করে নামহীন আলোহীন ধূলার ভেতর নামিয়ে আনা। যে 'অনাদরে অবহেলায়' গান গেয়ে যেতে হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে গিয়েছিলেন সেই অনাদর আর অবহেলার রিক্ততায় তাকে মিথ্যা করে দেওয়া। না, সরাসরি তার খ্যাতি বা জনপ্রিয়তার বিরোধিতা আমরা করি না। অত নির্বোধ আমরা নই। ওতে ঝুঁকি আছে। বিরোধিতার কারণে উল্টো তার খ্যাতি বেড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। ঈর্ষাকাতরতার দায়ে নিজের নিন্দিত হবার ভয় আছে। তাই আরও ধূর্ততা আর নিঃশব্দতার সঙ্গে এগোতে হয় আমাদের। তার ভাবমূর্তিকে ব্যর্থ করতে আমরা আরও অনেক সূক্ষ্ম কৌশলের আশ্রয় নিই। নির্বিকার ও দার্শনিকসুলভ এক শীতল কঠিন উদাসীনতার আড়ালে তার ভালো বা উজ্জ্বল সাফল্যগুলোকে মিথ্যা করে বিদায় করে দিই। এ–কথা সত্যি যে আমাদের ধারেকাছে একজন লেখক সত্যিকার ভালো বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনন্দনযোগ্য কিছু লিখে ফেললে তা সাময়িকভাবে আমাদের খানিকটা বিমর্ষ করে ফেলতে পারে। তার খ্যাতি বা সাফল্যের পাশে নিজেদের অস্তিত্বকে ক্ষণিকের জন্যে নিষ্ফল বা ক্ষুদ্র মনে হতে পারে। এসব মুহূর্তে অস্তিত্ব হারানোর ভয় কমবেশি মনের ভেতর এসে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এই ভেঙে-পড়া পরিস্থিতি থেকে সৃষ্টিশীল মানুষেরা কীভাবে নিজেদের বাঁচান? সেই বিমর্ষতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়, বরং উল্টো উপায়ে। নতুন অনুপ্রেরণায় জেগে উঠে, জীবন্ত টগবগে লেখা নিত্যনতুন উপহার দিয়ে, কাজের জগতে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটাই তো সেই বিখ্যাত পেশাগত ঈর্ষা যা মানুষকে আলসেমি আর জড়তার শৈত্য থেকে সক্রিয়তা আর উদ্দীপনার জগতে বাঁচিয়ে তোলে। উদ্যম আর শক্তির দিকে এগিয়ে দেয়। এই আতঙ্ক আর ঈর্ষা তো চিরকালই স্বাস্থ্যপ্রদ। আমাদের সম্ভাবনাময় কর্মপ্রেরণার একটা বড় উৎসই তো এই ঈর্ষা। সমস্ত মানবিক সাফল্যের অন্যতম প্রধান প্ররোচক। কিন্তু আমাদের ঈর্ষা কেন এমনটা হয় না? কেন ইতিবাচক না হয়ে এ হয়ে পড়ে নেতিবাচক। আশেপাশের কেউ ভালো একটা কিছু লিখে ফেললে কেন দশটা 'আরো ভালো লেখা' লিখে আমরা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিই না। কেন নীরব নিস্পৃহ উদাসীনতার ভেতর অর্থহীন করে আমরা তাকে কেবলি পিষ্ট করে শেষ করে দিতে চাই।

এর কারণ স্পষ্ট। আমাদের ঈর্ষা অক্ষমের ঈর্ষা। শক্তিহীন সংকীর্ণ মানুষের অসূয়া। তাই এ এমন অস্থিহীন, মেরুদণ্ডহীন, স্নায়ুবর্জিত। কেন আমরা অদ্ভুতভাবে এমনটা ভাবি যে আমার পাশের কেউ উজ্জ্বল বা অনিন্দ্য কিছু লিখলেই আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে? আমি বিলুপ্ত হয়ে যাব? মাইকেল বা বঙ্কিম ভালো লিখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, মানিক কি মিথ্যা হয়ে গিয়েছিলেন? শেক্সপিয়ারের পর মিল্টন কি জন্মাননি বা টলস্টয়ের পাশাপাশি দস্তয়েভস্কি বা চেখভ? কোথায় কার জন্যে কার উত্থান বাধাগ্রস্ত? তবে কেন আমাদের এইসব অলীক ভয়? কেন চারপাশের লেখকদের অভিনন্দন জানানোর ব্যাপারে এমন সীমাহীন কার্পণ্য আর অনুদারতা?

আমাদের এই মানসিক ক্ষুদ্রতার চেহারা যেসব জায়গায় সবচেয়ে উৎকটভাবে দৃশ্যমান হয়, আমাদের দেশের কবিতাপাঠের আসরগুলো তার একটা। সেইসব আসর যেগুলো আয়োজিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি বা বিজয় দিবস উপলক্ষে, বড় আয়োজনে। পঞ্চাশ একশ বা দু-শ কবি সেখানে জড়ো হয় শ্রোতাদের সামনে নিজেদের একটি বা দুটি প্রিয় কবিতা পড়ে শুনিয়ে তাদের হৃদয়ে একটুখানি জায়গা করে নেবার আকুতিতে। এমন অবস্থায় সেখানে মঞ্চ ঘিরে বসে থাকা কবিদের কাছ থেকে কী ব্যবহার আশা করতে পারি আমরা? নিশ্চয়ই ভাবতে পারি একেকজন কবি আশা-কম্পিত বুকে যখন এক পা দু-পা করে মঞ্চের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কবিতাগুলো সহকবিদের সামনে পড়তে শুরু করবে তখন সামনে-বসে-থাকা কবিরা তাদেরই একজন সহকর্মীর এই দুরাশার উচ্চারণগুলোকে হয়তো উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে একটু শুনবে, মুহূর্তের জন্যে একটু আর্দ্র হবে। কবিতাপড়া শেষ হলে সপ্রশংস করতালিতে তাকে অভিনন্দিত করবে। এইটাই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুশীল সমাজের রীতি বা পরিচিত দৃশ্য। এইটুকুও কি দেব না আমরা একজন সহযাত্রীকে? কিন্তু কী দেখি আমরা এই আসরগুলোয়? একজন কবি মঞ্চে উঠছে তো তার প্রতি অনাস্থা, উপহাস আর প্রত্যাখ্যানে যেন রিরি করে উঠছে সারাটা আসর। এককথায় কবিকূলের সমবেত বিরক্তি আর অননুমোদনের অভিশাপ নিয়েই যেন সে মঞ্চে কবিতা পড়তে উঠল, যেন মঞ্চে ওঠাটাই তার অপরাধ হয়েছে। কবিতাপড়া শুরু হলে যেখানে তার স্বজাতির সদস্যরা তার কবিতার আবেগের ভেতর একটু একটু করে গাঢ় হয়ে উঠবে সেখানে তখন দেখা যায় প্রায় উল্টো দৃশ্য। সারাটা আসর জুড়ে কবিতা ছাড়া পৃথিবীর আর সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা আর গালগল্পের ইচ্ছামতো খিস্তিখেউড় শুরু হয়ে যায়। মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো কবির কবিতা-যে বিশেষভাবেই শোনা হচ্ছে না সেটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই যেন সবার গল্পরত চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিকে ছড়ানো—একমাত্র মঞ্চের দিক ছাড়া। এছাড়াও একেক সময় একেক কবির উচ্চারণের কোনো মুদ্রাদোষ, পড়ার কোনো ভঙ্গি বা অশোভন শব্দ ব্যবহার নিয়ে কোথাও হয়তো হাসির রোল উঠে তাকে জানিয়ে দেয় সবাই তার মঞ্চের ওপর অবস্থানের ব্যাপারে কী পরিমাণ অনুমোদনহীন। কেউ চিনাবাদাম খাচ্ছে, কেউ চানাচুর চিবোচ্ছে, কেউ হুল্লোড়ে মত্ত— এমনি এক আপাদমস্তক অনাস্থার দৃশ্য সবখানে। সব ব্যাপারে তারা মনোযাগী, শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। কখন মঞ্চ থেকে তার নিজের ডাক আসবে, সেই ঈপ্সিত কামনায় কেবল তারা উৎকর্ণ। সবার ভেতর সবসময়ই কেমন যেন একটা অসুস্থ আশঙ্কা : একের পর এক কবিকে ডাকা হচ্ছে, অথচ তাকে ডাকার কোনো নামগন্ধ নেই। একেকজন নাম-সাকিন-ছাড়া কবি যাচ্ছেতাই কবিতা পড়ে কবিতার আসরের পরিবেশটাকেই বিষাক্ত করে তুলল, অথচ তার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'টি আবৃত্তির জন্য তাকে ডাকার ব্যাপারে কারো যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। সে যখন মঞ্চে উঠবে তখন কবিতা শোনার মতো মনটাই যে বেঁচে থাকবে না এই শ্রোতাদের ভেতর—কী লাভ হবে তখন কবিতা পড়ে—এমনি সব উদ্বেগে প্রায় সবাই সুস্থতা হারিয়ে বসে আছে। এই মন নিয়ে কী করেই বা অন্যের কবিতা অনুভব করা, শোনা বা ভালোবাসা সম্ভব? কী করে সম্ভব প্রেম বা অনুরাগ।

যে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ছিল, সে এই বিপুল কবিকুলের কাকে কতটুকু শোনাতে পারল জানি না। হয়তো শেষপর্যন্ত নিজেকেই শুনিয়ে নেমে এল মঞ্চ থেকে। তবে এই কবির দুর্ভাগ্য নিয়েও আবার অতশত দুঃখ করার কিছু নেই। কেননা অন্য কবিদের কবিতা পাঠের সময় সে যখন মঞ্চের সামনে কবিদের ভিড়ে বসেছিল তখন সে-ও ঠিক তাদের প্রতি এমনি আচরণই করছিল।

ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হতে পারত, কিছুক্ষণ আগে যেমনটা বলেছি সেরকম। সবাই একটু সহনশীলতায়, মমতায় পরস্পরের কবিতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারত, সপ্রশংস শুভেচ্ছায় সবাই সবাইকে সম্মানিত করতে পারত। এতে কোনো ক্ষতি বা খরচ হত না। কিন্তু তাতে সবার আত্মবিশ্বাস বাড়ত, সবাই কবিতা লেখার প্রেরণায় আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বেশি জেগে উঠত, নিজেদের ভেতর ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করত, নিজেকে একটা সপ্রেম সহৃদয় গোষ্ঠীর সভ্য হিসেবে ভাবতে পারত।

একজন লেখক নিজেকে নিয়ে সবচেয়ে অসহায় বোধ করেন কখন? যখন তিনি কোনো একটা লেখা শেষ করেন। তার শিউরে ওঠা অপার্থিব অস্তিত্বকে মথিত করে যে নতুন লেখাটি উঠে এল, তা তাকে পুরোপুরি একটা বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। কী হল এটা? সেই বহুপুরোনো প্রশ্ন। 'ইহা কী?' 'কীমিদম?' হল কি সত্যিসত্যি কিছু? কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি? সাহিত্য সাফল্যের কোন্‌খানে? লেখাটির সঙ্গে পুরোপুরি ওতপ্রোত বলে এই দুর্বোধ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এই উৎকণ্ঠিত অস্বস্ত মুহূর্তে তাকে অসহায়ভাবে তাকাতে হয় তার আশেপাশের লেখকদের দিকে, যাঁরা দূরত্বের কারণে ঐ লেখাটির অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ও নিখাদ মূল্যায়ন তাকে উপহার দিতে পারে। এই মুহূর্তে বন্ধুদের সাহায্য তার ভারি প্রয়োজন হয়ে পড়ে—নির্ভরযোগ্য নিকটতম মানুষদের সাহায্য। না হলে নিজের সত্য অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা বড়বেশি অন্ধকারে থেকে যায় তার। আত্মবীক্ষণ বড়বেশি গোলমেলে হয়ে পড়ে।

কিন্তু এটুকু আমরা করি না। লেখকদের জন্য তো নয়ই, সাহিত্যকর্মীদের জন্যেও নয়। কিছুদিন আগে চোখের সামনে দেখা একটা ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছি। দশবছর পূর্তি উপলক্ষে কোনো একটা কবিতাপত্রিকার পক্ষ থেকে একটা বড়সড় অনুষ্ঠান করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনসটিটিউটে। সবাই জানেন এ ধরনের অনুষ্ঠান মূলত শুভেচ্ছা বক্তব্য বা অভিনন্দন জানানোরই অনুষ্ঠান; পত্রিকার কর্মীদের অনেক দিনের চেষ্টা, উদ্যম আর আত্মক্ষয়কে স্বীকৃতি দেবারই অনুষ্ঠান। কিন্তু একজন গুরুত্বপূর্ণ বক্তা উঠে দাঁড়িয়েই যা বললেন তা আমাদের জাতীয় স্বভাবের সঙ্গে অনেকটাই সঙ্গতিপূর্ণ। দীর্ঘ বক্তৃতায় পত্রিকার যাবতীয় কৃতিত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বললেন: 'সব দিক থেকে ব্যর্থ হলেও পত্রিকার অন্তত একটি ভালো দিকের উল্লেখ না করে পারছি না, সেটা এর ছাপার দিক। হ্যাঁ ঝকঝকে নির্ভুল ছাপায় বেশকিছু ভালো সংখ্যা অন্তত উপহার দিয়েছে পত্রিকাটি এই দশ বছরে। এইজন্যে সম্পাদককে ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।'

এসব কথা নির্বিকারভাবে বলে যেতে লাগলেন তিনি ঐ পত্রিকার সেইসব উদ্যোক্তার সামনে যাঁরা কবিতাঙ্গনকে স্বাস্থ্যবন্ত করে রাখার জন্য দশ–দশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম আর আত্মক্ষয়ে ঐ পত্রিকাটি বের করে গিয়েছেন, এবং দশ বছর পর একটি সভার মাধ্যমে তাদের দুঃখযাত্রার ইতিহাস তুলে ধরে আগামী দিনগুলোয় শ্রোতাদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা চাচ্ছেন। ঐ পত্রিকার যিনি সম্পাদক, তিনি নিজে একজন কবি ও অধ্যাপক। পত্রিকাটির দুরূহ কষ্ট কাঁধে নেওয়ার কোনো জরুরি দায় তার ছিল না। তবু স্বেচ্ছায় ঐ দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলে তিনি। তুলে নিয়েছিলেন না বলে, বলা যায় তুলে নিতে হয়েছিল তাঁকে। দেশের কাব্যাঙ্গনের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি তাঁকে এই দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছিল। ঐ হতাশার চিত্র তার মতো অন্যদের চোখেও যে পড়ে নি তা নয়, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদের তুলনায় তাঁর চৈতন্য অপেক্ষাকৃত সক্রিয় ও হৃদয়ক্ষমতা প্রখর ছিল বলে প্রকৃতি তাঁকে দিয়ে ঐ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের এই সাহিত্যপ্রেম আর উদ্যম—এসব কি অপরাধের ব্যাপার? না হলে কেন এত অসম্মান! দশ-দশটা বছরের শ্রান্তিহীন সাহিত্য-যুদ্ধের শেষে ঝকঝকে নির্ভুল ছাপার মতো সাফল্যের এই মর্মান্তিক পরিহাস কেন?

একজন মানুষ কখন একটি সাহিত্য-পত্রিকা বের করতে উদ্বুদ্ধ হন? যখন চারপাশের হতাশাজনক ও অরাজক সাহিত্য পরিবেশের নিঃস্বতা, অনিশ্চিতি ও বিশৃঙ্খলতার ভেতর সম্পন্নসাহিত্যের বিলুপ্তির আশঙ্কা তাকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। তিনি চান তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে চারপাশের লেখকদের যূথবদ্ধ করে তাদের একটি আদর্শের দিকে প্রজ্বলিত করে তুলতে, সাহিত্যযাত্রার নতুন অর্থময়তা আবিষ্কার করতে। এদিক থেকে দেখতে গেলে একটি পত্রিকা বের হওয়াটাই তো একটা অভিনন্দনযোগ্য ব্যাপার। চারপাশের লেখক আর লেখার জগতের প্রতি অসীম বেদনা ও কল্যাণ-কামনা ছাড়া একটি সাহিত্যপত্রিকার জন্মই তো সম্ভব নয়। সাধ্যমতো ভালোবাসায় ও যত্নে চারপাশের লেখকদের ধারণ করা, লালন করা, তাদের ফুটে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া, নতুন সাহিত্য-পিপাসার দিকে একটি কালপর্বকে উন্মুখ করে তোলা—সবই তো একটা সাহিত্যপত্রিকার কাজ। আর যে নির্মম আর্থিক কষ্ট, শ্রম আর হতাশার সঙ্গে যুদ্ধ করে এই কাজটিকে সফল করতে হয় তাও তো সবার জানা। এই কাজকে বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্য করার অবকাশ কোথায়? তবু আমরা করি। 'অবৈধ সঙ্গম ছাড়া' সুখ, পরের মুখকে মলিন করে দেওয়া ছাড়া আনন্দ, আজ আর নেই।

সেই বক্তৃতার এক পর্বে বক্তা বিদ্রূপ করে একজন প্রাক্তন সম্পাদকের কথা জানালেন যিনি অতীতে নিজের পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি করে চব্বিশ পৃষ্ঠার বই সমালোচনা লিখতেন। কথাটা কিছুটা ঠিক। তাঁর পত্রিকায় নিজেদের গোষ্ঠীর লেখকদের বই নিয়ে বড়সড় সমালোচনা তিনি লিখতেন। সহজেই প্রশ্ন আসে, কেন করতেন তিনি তা? এত পৃষ্ঠা সমালোচনা লেখা তো সোজা কথা নয়। তাঁদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতেন বলে? না, তা নয়। তাহলে কেন করতেন? তিনি এটা করতেন তাঁদের তিনি ভালোবাসতেন বলে, তাঁদের জন্যে সাহিত্যিক উৎকণ্ঠা অনুভব করতেন বলে। তাঁদের বড় জায়গায় দেখতে চাইতেন বলে। যে অভাবিত সাহিত্য-যুগ তখন আসন্ন হচ্ছিল তাঁদেরকে সেই উচ্চতায় তুলে ধরতে চাইতেন বলে। ওটা ছিল স্বগোত্রের তরুণ-লেখকদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে তাঁদের একজন তরুণ-সহযাত্রীর সহজাত উৎকণ্ঠা।

কেবল যে সচেতনভাবেই আমরা একে অপরকে অবহেলা করি তা নয়, নিজেদের অক্ষমতা, অযোগ্যতা, আলসেমি দিয়েও অনেক সময় একে অপরকে নিজের অজান্তে উপেক্ষা করে চলি। এমন তো কতবারই জীবনে ঘটেছে যে খবরের কাগজে অসহনীয় কোনো মন্তব্য পড়ার পর পত্রিকায় তার দাঁতভাঙা জবাব দেবার জন্যে রীতিমতো মরিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠেছি। অনেক রাত পর্যন্ত নির্ঘুমভাবে তা নিয়ে অস্বস্ত পায়চারি করেছি। অনেক গনগনে শব্দে মস্তিষ্ক ঝাঁ ঝাঁ করেছে। কিন্তু লেখার কষ্ট, দুরূহতা আর পরিশ্রমের কথা ভেবে শেষপর্যন্ত আর কলম নিয়ে বসা হয়ে ওঠেনি। কিংবা শুরু হলেও শেষ হয় নি। এমন কত হাজার হাজার জ্বলজ্বলে অনিন্দ্য অসমাপ্ত চিঠি বুকের ভেতর নিয়েই তো আমরা কবরে যাই একসময়। কত দিন কত অনবদ্য বই পড়ার পর মন প্রশংসা আর শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। মনে হয়েছে ভালোভাবে ভেবেচিন্তে কিছু লিখে লেখকের এই সুপ্রভ শক্তিকে সম্মান জানাই। কিন্তু খাটনির ভয়ে একসময় তা আর হয়ে ওঠে নি। পোস্টমাস্টার গল্পের নায়কের মতো নিজের নাছোড়বান্দা বিবেককে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছি এই বলে যে : মনে সারাক্ষণ এমনি কত সাধারণ-অসাধারণ ঘটনাই তো মনকে নাড়া দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এসবের কটা নিয়েই বা লেখা চলে শেষপর্যন্ত। কটা লেখারই বা সময় হয়ে ওঠে জীবনে।

একেক সময় মনে হয়, কেন এমন হয়ে গেল আমাদের সাহিত্য পরিবেশ? আমাদের সাহিত্যজগতে শক্তিমান মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে? অসম্ভব নয়। একেক যুগে একেক ধরনের বিষয় সে-যুগের মেধাবী মানুষদের স্বপ্নকে প্রজ্বলিত করে। একসময় শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের চেতনাকে দুর্বারভাবে আকৃষ্ট করেছে দর্শন-ভাবনা। কখনো তাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে ধর্ম, কখনো বিজ্ঞান, কখনো শিল্প-সাহিত্য। গত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সবচেয়ে মেধাবী মানুষেরা ঘরছাড়া হয়েছে জীবন ও পৃথিবীর অপরিচিত অজানা পথের হাতছানিতে। সেখানে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকে নি। কিন্তু আজ বস্তুতান্ত্রিকতা আর প্রযুক্তির উৎভূমিক বিকাশের যুগে, মানবীয় হৃদয়ানুভূতির এই পতনের কালে, শিল্প-সাহিত্যের প্রতি মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। পাঁচ-সাত দশক আগে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরা গণিত, দর্শন আর সাহিত্যের দিকে যে দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছে, আজ সেই জায়গা অধিকার করে নিয়েছে কম্পিউটার প্রযুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা। বৈষয়িকতার রম্য-গোলাপের হাতছানি সবাইকে উন্মাতালভাবে আকর্ষণ করে টেনে নিচ্ছে আজ। বিষয়ের এই ঘোড়দৌড়ে সাহিত্যের খুব একটা সুবিধা করার কথা নয়। আর করেও নি সে তা। দিনের পর দিন সাহিত্যের অঙ্গনে মেধাবী মানুষের পদপাত বিরল হয়ে এসেছে।

এ-যুগে পত্র-পত্রিকার বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি এই মেধাহীনতার আগুনে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করেছে। এই শতকের প্রথম কয়েক দশকে পত্রপত্রিকার সংখ্যা ছিল আজকের একশ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। তখন পত্রপত্রিকার সেই অভাবের যুগে জাত-লেখকদের ভাগ্যেই কেবল পত্রস্থ হয়ে লেখক হবার বিরল সুযোগ মিলত। বাকিরা পাঠক-পরিচয়ের সসম্মান নামহীনতার ভেতর নিঃশব্দে ফুলের মতো ফুটে থাকাকেই পর্যাপ্ত মনে করতেন। সেদিন সেটুকুই তাদের ছিল চরম পাওয়া। আজ অবস্থা পাল্টে গেছে। সে-যুগে পত্রপত্রিকার অভাবে যারা পাঠক হবার দুর্ভাগ্য মেনে নিতে কুণ্ঠিত হতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আজ লেখা প্রকাশের অবারিত সুযোগ পেয়ে তারা সবাই লেখক হিসেবে নিজেদের দর্পিত অস্তিত্ব ঘোষণায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন। সাহিত্যের অঙ্গনে অক্ষমদের এই ক্রমবর্ধমান ভিড়ের দম-আটকানো চাপে গোটা সাহিত্য-পরিবেশই দূষিত হয়ে যাচ্ছে। খারাপ টাকা ভালো টাকাকে খেদিয়ে দিচ্ছে। সংকীর্ণতা, হীন স্বার্থ, অক্ষম ঈর্ষা এবং অন্তর্গত হীনতায় সাহিত্যজগৎ এখন বিপুলভাবে আক্রান্ত। অযোগ্যের এই অবাঞ্ছিত ভিড়ের ভেতর আসল শক্তিমানদের মুখও যেন ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে।

আজকের অধিকাংশ লেখকের প্রেম ততখানি সাহিত্যের জন্যে নয়, যতখানি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে। ফলে মেধাবী মানুষদের কাছ থেকে যে মর্যাদাসম্পন্ন আচরণ, উৎকণ্ঠা বা মমতা দেখা যেত, এদের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। কোনো অলজ্জ অশোভন অমর্যাদার আচরণের ব্যাপারে অনেকের মধ্যেই কোনো বিকার নেই। অনেকে আবার এসবকেই মোক্ষসাধনের একমাত্র হাতিয়ার মনে করে। অক্ষম ক্ষুদ্র লেখকপরিচয়ের সংকীর্ণ টর্চটাকে উঁচু করে রাখার নিদ্রাহীন চেষ্টা ও আতঙ্কে অনেকেই কমবেশি অসুস্থ। অনেক সময় শক্তিমান লেখকদের হৃদয়ও এইসব পরিবেশগত হীনতায় কলুষিত হয়ে যায়।

সাহিত্যজগতে সুযোগ্য মানুষদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে কমে আসার পাশাপাশি অক্ষম অলেখকদের আবিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপ আমাদের লেখকসমাজের সুস্থতাকে খুবই বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আমাদের লেখকদের ভেতর সপ্রেম উদার, মহৎ প্রবণতাগুলো ধীরে ধীরে দুর্লভ হয়ে উঠছে।

আমরা পরস্পরের প্রতি আর একটু অনাক্রমণ নীতি গ্রহণ করতে পারি, তাতে কারো এমন কোনো ক্ষতি হবে না। ভাবতে পারি একটা সৌহার্দ্যময় দলের সভ্য আমরা। আমাদের ভাগ্য এই দলের ভেতর একসঙ্গে থেকেই; এর বাইরে গিয়ে নয়, আলাদা হয়েও নয়। সহযাত্রী লেখককে বন্ধু ভেবে তার সমৃদ্ধির কামনা এমন কোনো অপরাধ নয়। তার অবস্থান দৃঢ় করা তো শেষ অব্দি আমার নিজের শক্তিকেই বাড়িয়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন। এতে শেষপর্যন্ত লাভ তো আমাদের সকলেরই। আজ আমাদের সাহিত্যজগতের নিকৃষ্ট লেখাটির মতো শ্রেষ্ঠ লেখাটিও একই রকম উপেক্ষা ও উদাসীনতার শিকার হয়ে রয়েছে। এই বেদনা মর্মান্তিক। আমার পাশের লেখকের প্রতি আর একটু মনোযোগী তো আমরা হতে পারি। আরেকটু আগ্রহে যত্নে পরস্পরের লেখাগুলোকে পড়াশোনার ব্যাপারে উদার আর আন্তরিক হতে পারি। কারও লেখা পড়তে বসে কোনোখানে আনন্দ পেলে তা তার কাছে অকুণ্ঠভাবে তুলে ধরতে পারি। সংশোধনের পরামর্শ থাকলে তার কাছে তা তুলে ধরতে পারি। এতে সে খুশি হবে, তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, লেখার ব্যাপারে সে আরও অনুপ্রেরণা পাবে। আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার সম্পন্ন হবে। ব্যক্তিগত খুশির সঙ্গে সঙ্গে সমবেতভাবে আমরা খুশি হয়ে উঠতে পারব।

একজন লেখকের চেয়ে প্রিয় আমাদের কাছে আর কে? আমাদের পরস্পরের দেখা হওয়ার দরকার। একজন লেখককে দেখার আনন্দে আরেকজন লেখকের মন অপার্থিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠবে। আমাদের দরকার বাড়িতে বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসানো, আড্ডা জমানো, এক টেবিলে একসঙ্গে সবাই মিলে বসে খাবারের সংস্কৃতির সূচনা করা। এতে জীবন সুস্থ হয়। পাপ কমে।

আজ আমাদের রাস্তাঘাটের গাড়ির চালকদের যেমন ভাবতে হবে যে রাস্তায় কোথাও জট দেখা দিলে সামনের গাড়ির পাশে গিয়ে নয়, পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—কেননা আপাতদৃষ্টিতে এটিকে লাভজনক মনে না হলেও আখেরে লাভজনক এটাই— যানজটের হাত থেকে বাঁচার এটাই পথ; তেমনি নিজেদেরই স্বার্থে মিলিত মানুষের একটি হৃদয়বান প্রবল গোষ্ঠী হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্যে আজ আমাদের সবাইকে পরস্পরের পাশে দাঁড়াবার কথা ভাবতে হবে।

ঈর্ষা আমাদের মধ্যে থাকুক, কিন্তু তা যেন নিজের ক্ষুদ্রতা দিয়ে আমাদের সবাইকে পিষে মারতে না পারে। আমাদের চাই পোশাজীবীর ঈর্ষা যা সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা আর উত্তরণের বলীয়ান আনন্দে দিগ্বিজয়ী—প্রবল, ইতিবাচক ও জঙ্গম। সে হোক নৌকাবাইচের খুশি হয়ে ওঠা নদীর মতো—প্রতিযোগীদের দাঁড়ের শব্দ আর ঢোলের আওয়াজে উদ্দাম আর কলকণ্ঠপূর্ণ। আমাদের ভেতর জন্ম হোক শক্তির—সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও রাজকীয় শক্তির—যাতে হীনতা উৎরে একটা সম্পন্ন গোত্রের মতো বল্লম হাতে আমরা দাঁড়িয়ে যেতে পারি গভীর আকাশের নিচে, সারবদ্ধ।

১৯৯৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা

আমার বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই বলে, 'কী বানালে তোমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রটাকে এভাবে বাংলামোটরের এই ছোট্ট গলির ভেতর? এমন একটা জিনিস এরকম জায়গায় মানায় নাকি? দূরে কোথাও বানাও না—সাভার কিংবা আরো দূরে—প্রকৃতির নির্জন পরিবেশের ভেতর—জ্ঞানচর্চার উপযোগী শান্ত নিভৃত কোনো জায়গায়—অনেক বড়সড় কোনো এলাকা নিয়ে—দেখবে, স্বপ্নের মতো একটা জিনিস হবে।'

আমি জবাবে বলি, 'সাভারে যাওয়া তো দূরের কথা, রাজধানীর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে না হয়ে এতদূরে এই বাংলামোটরে যে বানাতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানকে এজন্যেই আমি দুঃখিত।' অনেকদিন পর্যন্ত আমি সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার কোথাও এটার অফিস নিতে—জাতির কর্মমুখর বাস্তবতা এবং হিংস্র উদ্যমের মূল প্রাণকেন্দ্রে। সচিবালয়ের ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই হয়তো ওই জায়গাটার কথা ভাবি নি। এই কেন্দ্র থেকে পাঠ নিয়ে একদিন যাদের এই জাতিকে পরিচালনা করতে হবে, আমি বিশ্বাস করি, তাদের উত্থিত হতে হবে এই জাতির সর্বময় রাষ্ট্র প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তিমূল থেকে। না, হাসির কথা নয়, আমার ওইসব বন্ধুবান্ধবকে অনেকবার সকাতরে আমি বলেছি, 'সচিবালয়ের ভেতর এককোণে কোথাও আমাকে সামান্য একটুকরো জায়গা দিতে পার তোমরা?' জীবন-সংগ্রামের দাঁতাল আক্রমণ থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্ত নির্জন পরিবেশের ভেতর, জীবনবিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা আমার পছন্দসই নয়। শান্তিনিকেতনের মতো তপোবন আদর্শে গড়ে তোলা শিক্ষাপ্রণালী একালের নিষ্ঠুর রক্ত-সংঘাতের যুগে অনেকখানি অচল বলেই আমার ধারণা।

[আজকের পাশ্চাত্যের কথা আলাদা। ওখানকার দেশগুলো আজ একেকটা বড় আকারের শহর ছাড়া কী? আপাতদৃষ্টে সেখানে যাকে প্রকৃতির কোলের স্নিগ্ধ শান্ত কুঞ্জবন বলে মনে হচ্ছে সেখানেও আধুনিক সভ্যতার সর্বশেষ ব্যসনগুলো ক্রূর ছোবল উঁচিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে।]

কিছুদিন আগে আমি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সহজ অনাড়ম্বর জীবনে নিবেদিত অধ্যাপকবৃন্দ, সুস্থিত মূল্যবোধ, সাধনা, নিষ্ঠা—সব মিলে রাবীন্দ্রিক পৃথিবীর একটা শেষ রশ্মি যেন এখনো বেঁচে আছে সেখানে। তবু প্রশ্ন

আসে, বাঙালি জীবনের সংগ্রাম আর অগ্রযাত্রার ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের অবদান সত্যি কতটুকু? এই জায়গাটায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত একক ভূমিকা কি ওই বিশাল প্রতিষ্ঠানটির সমস্ত আয়োজন আর প্রচেষ্টার চেয়েও অনেক বড় নয়?

ধারণা করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার শ্রমস্রস্ত দিনগুলোয় রবীন্দ্রনাথ হয়তো এমনি এক স্বপ্নের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে প্রকৃতিলালিত এই নির্জনতার কোলে, উপনিষদীয় জীবনচর্যার এই নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির ভেতর তাঁরই মতো প্রবুদ্ধ মানুষদের জন্ম একদিন সংঘটিত হবে এই শান্তিনিকেতনের অঙ্গনে। সময় তা ভুল প্রমাণ করেছে। আমার মনে হতে চায় তাঁর এই চিন্তার চাইতে তাঁর কাল অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তিনি নিজেও কি দ্বন্দ্ব-বিস্রস্ত নাগরিক হিংস্রতারই সন্তান ছিলেন না? মৌন সমাহিত উপনিষদীয় পৃথিবী তো তাঁর জীবনের বিকাশপর্বের পরিবেশ ছিল না। তাঁর বাস্তবতা ছিল বরং এর উল্টো। ইউরোপের সমাজব্যবস্থার তীব্র উচ্ছ্রিত গতিধারা যেখানে ফিরে ফিরে তাঁর জীবনাগ্রহকে প্রাণনা দিয়েছে সেখানে কী করে ভাবা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের শান্ত নির্বিরোধ জীবন-পরিবেশ তাঁর মতো শক্তিমান, সংগ্রামদীপ্র, পরাক্রান্ত মানুষদের উত্থান ঘটাবে?

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগ থেকেই এর ছাত্রছাত্রীরা জাতির চলমান বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে কমবেশি ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের সঙ্গে দুঃখজনক বিচ্ছিন্নতাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে এদের অধিকাংশের বিধিলিপি। সামাজিক সংঘাত এবং দ্বান্দ্বিক রক্তযাত্রার ভেতর থেকে যারা জন্মাচ্ছে না, পরিপার্শ্বকে আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধে নিজেদের শস্ত্রভাণ্ডারকে তাদের অপর্যাপ্ত মনে হবারই কথা। তা ছাড়া সমাজকে তাদের অনুকূলে মুখ ফেরাতে বাধ্য করার হিংস্র শক্তিমত্তাতেও এরা দুর্বল থেকে যায়। এদের ব্যাপারেও ঘটেছে প্রায় তা-ই। একটা উচ্চায়ত জীবনের লালিত স্বপ্নকে আজীবন বুকের ভেতর বয়ে বেড়িয়ে, পৃথিবী-জোড়া নিঃসঙ্গতার ভেতর, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেদের আদর্শকে সর্বোচ্চ ভেবে, শক্তিপ্রভাবহীনভাবে এরা নীরবে একসময় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতনের একজন মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন কৌতূহলী প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা হয়েছিল একদিন। এ ব্যাপারে তিনি আরো বিশদ শুনতে আগ্রহী হলে কাছাকাছি তুলনা হিসেবে বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রসঙ্গ তুলে ধরে তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। সবাই জানেন, আমাদের দেশে ক্যাডেট কলেজ নামে সামরিক প্রবণতাসম্পন্ন একধরনের চৌকশ বেসামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে এবং বিরাট অর্থব্যয়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশের সামরিক মহিমার প্রতিভূ এই বিদ্যালয়গুলোকে সম্প্রতি জনচক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের একধরনের উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎ সামরিকবাহিনীর জন্য ভালো অফিসার গড়ে তোলাই এগুলোর প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য। স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকাল সপ্তমশ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী। ধরে নেওয়া হয়েছে, শৈশবের এই অনুভূতিময় দিনগুলোয় যদি ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে গড়ে তোলা যায় তবে তাদের চরিত্রে এমন কিছু গুণাবলির সহযোগ ঘটবে যা ভবিষ্যতের সামরিক জীবনে তাদেরকে সুযোগ্য অফিসার হতে সাহায্য করবে। যারা সামরিকবাহিনীতে যেতে পারবে না কিংবা যেতে অনিচ্ছুক হবে তারাও এই শিক্ষাব্যবস্থার উপকার পেয়ে উন্নত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। আমি নিজেও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশকিছু অভিনন্দনযোগ্য দিক দেখতে পাই। এখানে ছাত্রছাত্রীদেরকে যে শৃঙ্খলা, সুশিক্ষা এবং সুস্মিত মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে গড়ে তোলা হয়, তা প্রশংসনীয়।

কিন্তু এখানেও সেই আগের সমস্যা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন সুদূর জায়গায়—দেশের রক্তাক্ত, নগ্ন বাস্তবতা থেকে দূরে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জাতির শক্তি ও নিঃস্বতা, ভূয়িষ্ঠতা ও পচন, বৈচিত্র্য ও অগ্রযাত্রা সবকিছু সম্বন্ধেই অনবহিত থেকে যাচ্ছে। চারপাশের প্রকৃতির নিরীহ নির্বিরোধ জগতের মধ্যে তারা বড় হয়। এখানে সুস্মিত মূল্যবোধ আছে, কিন্তু তা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে। এখানে নিয়মানুবর্তিতা আছে, কিন্তু তাকে একধরনের পাশবিকতা বলাই ভালো। শিক্ষার্থীদের তরুণ মনের বৈচিত্র্য, কৌতূহল, প্রতিভা, স্বাতন্ত্র্য—সবকিছুকে দলে পিষে সবাইকে একটা ভেদাভেদহীন একাকার মানুষ করে ফেলাতেই এই শিক্ষার আসল আগ্রহ। হৃদয়ের ওপর এই অমানবিক অত্যাচার কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলোকে এক একটা উদ্ধারহীন নির্যাতনশালা করে রেখেছে।

প্রায় প্রতি বছরই শোনা যায় পঞ্চাশ–ষাট–সত্তর–আশি জনের একেক দল ছাত্র একসঙ্গে জোট বেঁধে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে কলেজ থেকে। তারপর পঞ্চাশ–একশ মাইল হেঁটে বা বাস–লঞ্চ–নৌকায় চেপে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফিরে গেছে যে যার বাড়িতে। এই বেদনাদায়ক ইতিবৃত্তের এখানেই শেষ নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিষ্কৃতিহীন। ওই ছাত্রদের পেছনে কলেজ যে বিস্তর অর্থব্যয় ইতিমধ্যে করে ফেলেছে, অভিভাবকেরা তা ফেরত দিতে না পারলে ওখান থেকেও মুক্তি নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই হতভাগ্য ছাত্রদের বাড়ি ঘেরাও করে আইনের আশ্রয়ে আবার তাদের ওই নির্মম বন্দিশালায় ধরে নিয়ে যায়।

এসব ঘটনা অষ্টাদশ–উনবিংশ শতকে প্রভুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসদের ধরা পড়ার পর গলায় বেল্ট লাগিয়ে আবার প্রভুর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার রোমহর্ষক স্মৃতিকেই কেবল মনে পড়িয়ে দেয়। কী ধরনের নির্মম আর অত্যাচারী শিক্ষাপদ্ধতি এই ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী তা সহজেই অনুমেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুমনের ওপর এই পাশবতা কি কোনো উন্নত বা আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে? অথচ আমাদের দেশের সামগ্রিক শিক্ষাপরিস্থিতি আজ নৈরাজ্য আর অবক্ষয়ের মধ্যে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অভিভাবকেরা উপায়হীন হয়ে এই অমানবিক শিক্ষার কাছে সন্তানদের পাঠানোকে আজকাল বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করছেন।

আমি সেই অধ্যাপক মহোদয়কে বিনীতভাবে বললাম : আজকের দিনে ভালো শিক্ষার জন্য দুটো উপাদানের সহযোগ খুবই জরুরি। এক, দেশের কঠিন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিকশিত করে তোলা ; দুই, উদার পরিবেশের মধ্যদিয়ে তাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া। শান্তিনিকেতন বা আমাদের ক্যাডেট কলেজগুলোর বিচ্ছন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম শর্তটিকে প্রায় পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে। তা ছাড়া আমার ধারণা এই দুটো শিক্ষাপদ্ধতির অবয়ব জুড়েই একটা নির্মম অত্যাচার নীরবে সক্রিয় রয়েছে। ক্যাডেট কলেজগুলোর যে অত্যাচার তা প্রত্যক্ষ সেটা বর্বরতার অত্যাচার। শান্তিনিকেতনে তা অনেক মার্জিত এবং সূক্ষ্ম : মাধুর্যের অত্যাচার।'

আমার কথা শুনে অধ্যাপক মহোদয় অবাক হবার ভঙ্গিতে, কথাটার তাৎপর্য হঠাৎ করে এইমাত্র যেন বুঝতে পেরেছেন, এভাবে, হেসে বললেন : 'সত্যি, ব্যাপারটা কখনো এভাবে ভেবে দেখি নি তো!'

তাঁর বিনয়ের বিগলিত প্রাচুর্য দেখেই বুঝতে পারলাম আমার বক্তৃতাটা তাঁর কাছে পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে।

৮.৯.৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রিয় লাইব্রেরি

আমি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে লাইব্রেরি বাড়ানোর পক্ষে নই। কী হবে নতুন লাইব্রেরি বানিয়ে? কে পড়বে? কোথায় পাঠক? যেসব জাগ্রত হৃদয় আর্ত পিপাসা নিয়ে আজ লাইব্রেরির দরজায় এসে দাঁড়াবে—সেইসব জ্বলন্ত উদ্দীপ্ত মানুষ কোথায় আজ এদেশে?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা বড় লাইব্রেরি গড়ে তোলার। সে লাইব্রেরি হবে এখানকার জ্ঞানপিপাসু ঋদ্ধ মানুষদের আলোকিত মিলনক্ষেত্র। না, কেবল লাইব্রেরি নয়; চিত্রশালা, চলচ্চিত্রশালা, সঙ্গীত লাইব্রেরি, অভিনয় মঞ্চ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া—আরো যা কিছু ভাবা যেতে পারে—সব। ঢাকার এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজে হাতে দেওয়া হয়েছিল কিছুটা। পাঁচ বছরের সমস্ত শ্রম আর যত্ন ব্যয় হয়েছিল এর পেছনে। গড়ে উঠেছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি, সঙ্গীতশালা, শ্রবণ-দর্শন বিভাগ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া—গাছপালা—দালান আর লনের একটা নিটোল পরিচ্ছন্ন পরিবেশ—জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একটা ছোট্ট সুস্মিত পূর্বপুরুষ।

কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল মানুষ জন্মাবার আগেই যদি তার ঘর তৈরি হয়ে যায় তবে সেখানে সাপ ব্যাং আর সরীসৃপ বসবাস করে। সুসমৃদ্ধ বিশাল একটা লাইব্রেরি নাহয় গড়ে উঠল, কিন্তু ওটা তো দেশের বর্তমান প্রয়োজন নয়। কে পড়তে আসবে সেখানে? কষ্টে পরিশ্রমে একটা সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি নাহয় গড়ে তোলা হল, কিন্তু চিত্রকলার প্রবুদ্ধ রসাস্বাদনকারী কোথায়? কজন আসবে শ্রবণ-দর্শন বিভাগে--পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কিংবা সঙ্গীত উপভোগের জন্যে? সেইসব প্রগাঢ় নাট্যগোষ্ঠী কিংবা নাট্যশিল্পবোদ্ধারা কোথায় যারা সমৃদ্ধ হৃদয় নিয়ে ভিড় করবে নাট্যমঞ্চের চারপাশে? আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কিছুদিনের মধ্যেই দুরপনেয় বিপর্যয়ের মুখে অবসিত হল। অবসরলিপ্সুদের উদ্দেশ্যহীন ভিড়, দলাদলি আর রুচিহীন খেউড়ে একটা ক্লেদাক্ত পরিবেশের ভেতর নোংরা হয়ে উঠল এলাকাটা।

আজো আমি এদেশে নতুন লাইব্রেরি খোলার পক্ষপাতী নই। কার প্রয়োজনে লাগবে এই লাইব্রেরি? কে মূল্য দেবে? আজ আকস্মিক খোঁড়াখুঁড়ির ফলে

বিক্রমপুরের অজ-পাড়াগাঁর দশ হাত মাটির নিচ থেকে যদি পালযুগের কোনো বিখ্যাত ভাস্কর্য বের হয় তাতে চারপাশের নিরক্ষর গ্রামবাসীর কী এসে যায়? একটা বিরাট ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরি রয়েছে শহরের মাঝখানে—চারপাশে মূর্খের রাজত্ব—কী তার অর্থ?

আমার আশঙ্কা, আমাদের সমাজে হয় কোনোদিন জ্ঞান প্রবেশ করে নি, নয়তো প্রবেশ করে থাকলেও আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

লাইব্রেরি তৈরির আগে ওই লাইব্রেরিতে কারা আসবে আজ প্রথমে তাদের জন্ম দেবার কথা ভাবতে হবে। ইশকুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আজ আর তাদের জন্ম দিচ্ছে না। কিছু পরিমাণে তাদের গড়ে তোলার পরই কেবল হাত দেওয়া যেতে পারে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কাজে, আগে নয়।

এইজন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা লাইব্রেরিকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে এনেছি—প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে 'জাতীয়ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'।

ইংরেজ বেনিয়ারা একদিন যেভাবে এদেশের মানুষকে 'চা' ধরিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে আজ বই ধরাতে হবে আমাদের। বই ধরানোর প্রক্রিয়া হবে 'চা' ধরানোরই অনুরূপ—হুবহু এক। শুধু উদ্দেশ্য হবে আলাদা। হাজার হাজার বই পড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আজ সারাদেশের ছেলেমেয়েদের পড়ার আনন্দে মাতিয়ে তুলতে হবে। আর সেইসঙ্গে যুক্ত করতে হবে মানসিক বিকাশের উপযোগী সুন্দর সাংস্কৃতিক সব কর্মসূচি। ভালো ভালো পুরস্কারের প্রলোভনের সামনে ফেলে তাদের জয়ের পিপাসাকে লুব্ধ করে তুলতে হবে; কিন্তু তা কেবল বইপড়ার মতো একটা উচ্চায়ত দরকারেই। এভাবেই নিজের অজান্তে তারা গৃহীত হয়ে যাবে বইয়ের অমেয় অনির্বচনীয় জগতে। বইয়ের ভেতর দিয়ে বিকাশের দিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শ্রেয় ও মহানের জন্য আর্ত হয়ে উঠবে। তখনই আসতে পারে কেবল নতুন লাইব্রেরি তৈরির প্রসঙ্গ।

আজ দেশের লাইব্রেরিগুলোর দুরবস্থা অনেকেরই জানা। সেখানে বইয়ের পাঠক প্রায় শূন্যের কোঠায়। যে দু'চার জন এখনো আছে তাদেরও অধিকাংশই শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর উপন্যাসের পাঠক। এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে করতে হয় এক হৃদয়বিদারক পন্থায় : পাঠকক্ষের টেবিলে বিনোদনসর্বস্ব নোংরা পত্রপত্রিকা সাজিয়ে রেখে, আর সেগুলো ঘিরে জড়ো-হওয়া রুচিহীন লোকজনদের লাইব্রেরি ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে।

মনে রাখতে হবে লাইব্রেরি কেবল কতকগুলো সুন্দর সুশোভন বইয়ের সমষ্টি নয়। এমনকি বিপুলসংখ্যক বইয়ের সমষ্টিকেও লাইব্রেরি বলে না। লাইব্রেরির প্রধান সম্বল একজন উজ্জীবিত হৃদয়সম্পন্ন মানুষ—যিনি ডাক দেন।

আমরা সবাই জানি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়—কখন কোন্ নামাজ পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় তাও আমাদের জানা। তবু মসজিদের মিনার থেকে প্রতিটি নামাজের সময় আর্ত উচ্চকণ্ঠে একটি উদ্বুদ্ধ মানুষকে ডাক দিতে হয়। বলতে হয় : 'এসো, নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনা উত্তম।' লাইব্রেরি থেকেও তেমনি একজন মানুষকে আহ্বান জানাতে হয়। সবাইকে তাঁর ডেকে বলতে হয় : এসো, এখানে এসো, এখানে তোমাদের বৃদ্ধি, বিকাশ, আলোকসম্মত মুক্তি। হ্যাঁ, এইখানেই—আর কোথাও নয়।' ওই মানুষটি গ্রন্থাগারিক হতে পারেন—হতে পারেন অন্য কোনো প্রাণিত মানুষ। এই মানুষ একজনের জায়গায় অনেকজনও হতে পারেন। কিন্তু যে লাইব্রেরিতে ওই উদ্বুদ্ধ আহ্বানকারী নেই—মুয়াজ্জিন নেই—সেটা লাইব্রেরি নয়।

আমাদের সমাজে আজ এই বেদনাজাগ্রত মানুষটি কোথায়—সেই মানুষটি, যে ডাক দেবে?

৩.৬.৯০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সময় ও আমি

আমার জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল এবং বিয়ের আগের দিন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ থেকে আমার অনেক শুভানুধ্যায়ীর মনেই এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতোন এমন একটা সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ যদি সত্যি সত্যি পৃথিবীতে ঘটতেই হয় তবে অনুগ্রহ করে তা যেন আমার মৃত্যুর অন্তত ঘণ্টাখানেক পরে ঘটে। সমস্ত দিক থেকেই তা সন্তোষজনক। প্রথমত, এতে আমার নিয়তিনির্ধারিত আয়ুর ব্যাপারটা একটা মোটামুটি পূর্ণতা পাবার সুযোগ পাবে। কেননা এই আমি মানুষটা—যে কিনা মৃত্যুর আজন্ম আতঙ্কে অপরিসীমভাবে ভীত ও ব্যথিত ছিল বলে জীবনের দুই গণ্ড থেকে সমস্ত রক্তিমতা হাঙরের হিংস্রতায় ছিঁড়ে নিতে চাইত, সেই মানুষটা একদিন টানটান শক্ত হয়ে চাদরের নিচে নিঃসাড় শুয়ে থাকবে অথচ পৃথিবীর সব রঙিন টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এমনি মুখর উৎসাহে চলতে থাকবে, লোকেরা বেলেল্লাহল্লায় মেতে থাকবে, গান গাইবে, ফুর্তি করবে--আমার মানবজন্মের প্রতি এর চেয়ে মর্মান্তিক উপহাস আর কী হতে পারে! কিন্তু ধরা যাক, দৃশ্যটা যদি এরকম না হয়ে এমন হয় : আমার মৃত্যুসংবাদে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় তাবৎ পথচারী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, যানবাহন বিমূঢ় স্তব্ধ, দেশে দেশে রাষ্ট্রপ্রধানেরা আমার শেষকৃত্যে যোগদানের জন্য তড়িঘড়ি উদ্যত—এককথায় সারা পৃথিবীর জনজীবনে শোকের কালো ছায়া—তবে আমার মৃত্যুর তার চেয়ে জ্যোতির্ময় ছবি আর কী হওয়া সম্ভব? ধরা যাক এর চেয়েও আরো কাম্য আরো আকাঙ্ক্ষিত সেই অসম্ভব ঘটনাটিই যদি ঘটে—আমার মৃত্যু-মুহূর্তেই বিশ্বসৃষ্টির সেই অন্তিম ধ্বংস-সঙ্গীত তুলকালাম শব্দে বেজে ওঠে—এককথায় পৃথিবীর সব হাসি-গান, অফিস-যাওয়া, সরগরম সন্ধ্যা আর টেলিভিশনের মুখর রাত—এক তুড়িতে উধাও হয়ে যায়, তবে আমার চেয়ে সুখী আর কে?

তবু জানি, সব দুরাশার মতোই আমার এই ভাবনাগুলোও নিরেট মূর্খতা। আমার মৃত্যুর ব্যথায় মহান বা সামান্য কোনো আপতিক বিপর্যয়ই ঘটবে না কোনোখানে, পৃথিবীতে একটা হল্লার শব্দও কম হবে না কোথাও।

না, যুবরাজ হ্যামলেট আমি নই, আর তা হবার জন্যে জন্মিও নি পৃথিবীতে। আমি তো 'চলনসই পদ্য লিখি'—আমার ডাকে কোন্ নিঃশব্দ শূন্য সাড়া দেবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রা যাঁদের কাছে সম্পন্ন আত্মজীবনী প্রত্যাশা করে, আমি সেই পঙ্‌ক্তির নই। তবে কেন এই অকারণ ঔদ্ধত্য? আত্মজীবনীর বেনামীতে এই নির্বোধ আত্মপ্রতারণা!

না, আমার রক্তের ধারায় প্রতিভার জ্বলন্ত অগ্নিকণারা অসাধারণ স্ফূরণে জ্বলে ওঠে নি কখনো—অসম্ভবের উদগ্র কামনা জন্মান্ধ আক্রমণে আমার হৃদয়কে হিংস্র করে তোলে নি। গৃহপালিত রক্তে আমি একটা নিরীহ আর গতানুগতিক মানুষের হৃদয়কেই লালন করেছি আজীবন।

তবু বলি : আমি নই, কিন্তু যে-যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অন্তত একটা কারণে তা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটা বিরতিহীন বিশাল পতনকে আমার যুগে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

গিন্সবার্গের মতো বন্য বিষণ্ন চিৎকারে আমি শুধু বলতে পারি : 'আমার যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষদের উন্মাদ হয়ে শেষ হতে দেখেছি আমি।'

আমার যুগের প্রায় প্রতিটি মানুষকে আমি ধুলোর দামে বিক্রি হয়ে যেতে দেখেছি। দেখেছি কী করে একটা বিশাল জাতি পুরুষত্বহীন হয়—প্রতিটা মানুষ তার বিশ্বাসকে কত অল্পদামে বেচে দিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মতো আমার যুগের কোনো কৃতার্থ কবি কি জীবনের পরিপূর্ণতা থেকে জেগে উঠে বলতে পারবে : 'আমি জীর্ণজগতে জন্মগ্রহণ করি নি।'

এ যুগের তরুণ কবি কী করে তাঁর মতো করে লিখতে পারবে :

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'?

আমাদের সময়কার তরুণ কবির কালসম্মত অনিবার্য উচ্চারণ হয়তো তাই :

'দীর্ঘ আয়ু ভালোবাসিনে
মরিতে চাই দ্রুত।'

আমাদের অকালপ্রয়াত কবিবন্ধু হুমায়ুন কবিরের একটা ছোট্ট কবিতার নায়কের মতোই ছিল এ-যুগের দুঃখময় রক্তাক্ত অবয়ব :

"ফিরে আসি ফের। ভীরু,
পদাঘাতে পিষ্ট, তবু কুকুর যেমন করে
ফিরে আসে তার প্রভু ঘাতকের কাছে,
তেমনি আবার দ্যাখো ফিরে আসি তোমার দুয়ারে,
তোমার আলোর দিকে ফিরে আসি—ক্লান্ত ক্রীতদাস,
তোমার নিষ্ঠুর ঘরে, হে আমার পরম ঘাতক!

অসহায়তা—উদ্ধারহীন বিশাল এক সর্বগ্রাসী অসহায়তার কাছে ফিরে ফিরে আসার আত্মধ্বংসী দুর্ভাগ্যই আমাদের বিধিলিপি। তবু আলোকোজ্জ্বলতার একটা পৃথিবীকেও এর পাশাপাশি আমি দেখেছি আমার কালে। সম্ভাবনা এবং ব্যর্থতা, উদ্যম এবং আশাভঙ্গ, উৎসাহ এবং পতন পালাক্রমে বা পাশাপাশি স্থান গ্রহণ করেছে আমার সমকালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্লজ্জ স্বার্থপরতা এবং স্থূল রজতলিপ্সার অধঃপতিত রাস্তায় আমার যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষদেরও অসহায়ের মতো গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছি আমি।

আর্থিক সংকটের নির্দয়তম অভিঘাতের পাশাপাশি জাগতিক উন্নতির অবাধ লিপ্সা আমার কালের সবচেয়ে মূল্যবোধসম্মত মানুষদেরও নিঃস্ব করে দিয়েছে, দেখেছি কী করে তাদের সৃজনশীল সম্ভাবনা ভিখিরি হয়ে যায়।

দেখেছি জাতীয় জাগরণের প্রাথমিক বিপুল সূচনা, সর্বগ্রাসী জলোচ্ছ্বাসের মতোই বর্বর উল্লাসে, মূল্যবোধের দীর্ঘকালবাহিত সুস্থিত সীমিত অঙ্গনকে দলে ধর্ষে শ্রেয়োবোধের সব শ্রদ্ধেয় সৌধকে কীভাবে অসম্মানিত করেছে আমার যুগে।

'আমি বিজয় দেখেছি' এবং দেখেছি বিজয় কী নিদারুণভাবে পরাজিত হতে পারে। স্বাধীনতার অর্থ কীভাবে হয়ে দাঁড়ায় অকর্ষিত দস্যুতার বিবেকহীন অবাধ উপনিবেশ। চিরায়ত মূল্যবোধ এবং বৈদগ্ধের গর্বোদ্ধত মাথা কীভাবে ধূলা আর রক্তের অসম্মানিত লাঞ্ছনায় নিপতিত হতে পারে।

তবু অবক্ষয়ের কালো অন্ধকারের ভেতর তিমিরহননের অম্লান স্ফুরণ আশান্বিত মুখ দেখিয়ে গেছে প্রতিটি সম্ভাব্য বিরতিতে। জাতীয় জীবনের ভিত থেকে মুক্তির অপরাজিত পিপাসা ক্ষুধিত জাগুয়ারের মতো জেগে উঠে এই সময়ের মধ্যে ছিনিয়ে এনেছে দু-দুটি স্বাধীনতার অনিন্দ্য নিষ্ঠুর রক্তগোলাপ।

একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে এই দেশের জন্মমুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেছি আমি। আশঙ্কাস্পন্দিত বুকে সুনীল আকাশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম দর্পিত উত্তোলন স্বচক্ষে দেখার দুর্লভ ভাগ্যের আমি অধিকারী ছিলাম। অশ্রু এবং উল্লাসের অকথ্য অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন হতে হতে বাংলার প্রতিটি গৃহে কার্ণিশে সেই পতাকার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠা আমি দেখেছি।

তিন তিনটি রাষ্ট্রকাঠামোর সার্বভৌমত্বের নিচে এই দেশ ও জাতি এই সময়ে অস্থির বিপুল এক পরিবর্তমানতার ভেতর প্রকৃত আত্মস্বরূপের অন্বেষণে ক্ষান্তহীন ছিল।

অসংখ্য উজ্জ্বল সংগ্রাম এবং দুঃখময় আত্মদান—এই কালপরিধির আকাশকে দীর্ঘশ্বাসে মথিত করেছে।

বৈরী অন্ধকার এবং দাঁতাল বর্বরতার মুখে ফিরে ফিরে দুর্জয় হয়েছে সেই অমেয় ও জন্মান্ধ চেতনা যা কালে ও ভূগোলে পরাভবহীন।

এককথায় উত্থান এবং উন্মোচন, বিজয় এবং বিপর্যয়, উন্মুখতা এবং ক্ষান্তি এই ক্রান্তিযুগের রক্তাক্ত মুখাবয়বকে এক বিরোধব্যথিত দ্বৈতচরিত্রে দ্বিখণ্ডিত ও অনন্য করে তুলেছে। সুতরাং আমি নই, কিন্তু যে-সময় পরিসরে আমি এই পৃথিবীতে বেঁচেছিলাম, (কিংবা আরো সঠিকভাবে বলা যায় : একটি অবধারিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে গিয়েছিলাম) নানা কারণে তা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের এযাবৎকালের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়। এটা সেই সময় যখন আবহমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই নিষ্ক্রিয় জনগোষ্ঠী একটা সর্বাত্মক জাতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আত্মদানের ভেতর দিয়ে একটা মহান পবিত্রতায় স্নাত হয়েছে ; যখন ভেদাভেদহীন দুঃখ সারাজাতিকে একটা অভিন্ন ছাদের নিচে এক ও অভেদ্য করে তুলেছিল এবং মুখরিত যুদ্ধযাত্রার উচ্চকিত পদশব্দের ভেতর দিয়ে এই জাতি প্রথমবারের মতো জেগে উঠেছিল সামরিক পরিচয়ে।

এটা সেই সময় যখন আবহমানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, এক বিশাল রক্তসাগরের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে, নতুন চরের মতো, একটা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে অভ্যুদয় ঘটেছিল আমাদের। আমাদের এই সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী বিশ্বজনীনতার উজ্জ্বল আকাশে স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আবার বলি : আমি নই, কিন্তু যে দেশ ও কালে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম তা নানা কারণে আগামীকালের মানুষদের চোখে ফিরে ফিরে বিস্ময় জাগাবে। সেই মহান ও মর্মন্তুদ, অভাবনীয় ও আত্মবিরোধী, বিস্ময়কর ও বিভ্রান্তিপূর্ণ কালপরিধিই আমার এই অস্তিত্ব ভুবনের মূল পরিচয়।

১০.১০.৯০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাসাগরের ওপর আলোচনা সভায় বক্তৃতা

সুধীমণ্ডলী,

আজকের সভার অন্যতম নির্ধারিত বক্তা বদরুদ্দীন উমর সাহেব অনুপস্থিত। খেসারত হিসেবে আমাকে বিনা নোটিশে মঞ্চের ওপর তুলে দেওয়া হল। তিনি থাকলে আমাকে এভাবে হাস্যকর হতে হত না। বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষের বিষয়ে কথা বলা এমনিতেই কঠিন। এভাবে হলে আরো কঠিন।

বেশ কয়েকজন বক্তা নানান দিক থেকে বিদ্যাসাগরের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিদ্যাসাগরের সব ভূমিকাই প্রায় স্পর্শ করা হয়েছে। তাই আমি ও বিষয়গুলোর দিকে না গিয়ে তাঁর একটা ছোট্ট দিক নিয়ে দু'চারটা কথা বলে বক্তব্য শেষ করব।

কিছুদিন আগে 'ভোরের কাগজে'র একটা বিভাগে আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। বিভাগটার নাম 'আমার আমি'। কী ভালো লাগে, কী মনে হলে হাসি পায়, প্রিয় অভিনেত্রীর নাম কী, এমনি সব কৌতুককর প্রশ্নের জবাব দিতে হয় বিভাগটায়। একেক সপ্তাহে দিতে হয় একেকজনকে। একবার দেখলাম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্বয়ং উত্তর দিয়েছেন। তাতে আমার সাহস বেড়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীই যদি পারেন আমার বাধা কোথায়। আমিও দিয়েছিলাম। অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল : যেসব উপদেশ সারাজীবন পেয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কোনটি? আমি লিখেছিলাম ছেলেবেলায় শোনা আব্বার একটা উপদেশ : 'বোকা হোস'। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখানে বোকা হোস অর্থ এ নয় যে বেকুব হোস। এর অর্থ স্বার্থের ব্যাপারে বোকা হোস। স্বার্থ ভুলতে চেষ্টা করিস। ভোরের কাগজের বিভাগীয় সম্পাদক আমার ওই উত্তরটা ছাপেন নি। হয়তো ভেবেছিলেন স্বভাব-অভ্যাসবশত আমি তামাশা করে উত্তরটা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা ছিল না। খুবই সিরিয়াসভাবে কথাটা আমি লিখেছিলাম।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে শক্তিকে আমি সবচেয়ে বড় বলে অনুভব করেছি তা হল এই বোকা হওয়ার শক্তি। যেসব কারণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমার অনিঃশেষ তার একটা অন্তত ওই : তিনি বোকা ছিলেন।

আপনারা জানেন আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে সারাদেশে ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বই পড়ার কর্মসূচি চালিয়ে থাকি। আমরা কেবল বই পড়াই না। কে কটা ভালো বই কত ভালোভাবে পড়ল তার মূল্যায়নের পাশাপাশি তাদের মেধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যায়নেরও চেষ্টা করি। এই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে নানারকম পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আছে। তো সেই মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে সব জায়গায় ছাত্রছাত্রীদের ধীশক্তি, মনন এবং বুদ্ধিমত্তাকে মূল্যায়ন করারই কেবল ব্যবস্থা আছে। মূল জোরটা মেধার ওপরেই। আমরা বহুদিন পর্যন্ত শুধু মেধাকে মূল্যায়ন করেই তাদের পুরস্কার দিয়েছি এবং মেধাকেই তাদের মূল শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কার স্মৃতিশক্তি কত প্রখর, চিন্তাশক্তি কত ক্ষিপ্র ও অন্তর্গামী, মৌলিকতা কত উজ্জ্বল এইসবই ছিল ওই মূল্যায়নের ভিত্তি। কিন্তু একদিন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূল্যায়নের এই পদ্ধতি নিয়ে আমার মনে বিরাট সন্দেহ জাগে। মনে হয় কেবল মেধার মূল্যায়ন করে কি একজন মানুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতার মূল্যায়ন সম্ভব? মেধা তো মানুষের সামগ্রিক শক্তির একটা অংশ মাত্র। তার তো আরো অনেক শক্তি আছে যা মেধার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যেমন শারীরিক শক্তি, পরিশ্রমক্ষমতা, মূল্যবোধ, দুঃসাহস, উদ্যম, হৃদয়ের শুভত্ব ও পরার্থপরতা এমনি আরো অনেক কিছু। কী করে এই সন্দেহটা জাগল সে গল্পটা আপনাদের বলি। ঘটনাটা ঘটেছিল এই ঘরটার মধ্যেই। একদিন একাদশ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ঘরটাতে ক্লাস করছি। ক্লাসে এক শ'র মতো ছেলেমেয়ে। হঠাৎ পাশের ওই বস্তিতে আগুন লাগল। আমাদের দেওয়ালের একদম পাশেই বস্তি, কাজেই আগুনের ভয়ঙ্করতম তাণ্ডবের মধ্যে পড়ে গেলাম। একটা মহল্লা জুড়ে আগুনলাগা ব্যাপারটা যে কতটা ভীতিপ্রদ তা এত কাছে থেকে এর আগে দেখি নি। মুহূর্তের মধ্যে হিংস্র উন্মত্ত হাওয়া ডাকাতের মতো চারপাশ থেকে যে কী ভয়াবহভাবে ছুটে আসে, কী ভয়ঙ্করভাবে তার লেলিহান জিহ্বা সবদিক গ্রাস করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে সেদিন প্রথম দেখার সুযোগ হল। আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লাম। ভয় হল আমাদের এত কষ্টে তৈরি লাইব্রেরিটা পুড়ে না যায়। শ'খানেক ছেলেমেয়ে ক্লাসে, দেখলাম, তারা চোখের পলকে তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল লেজ তুলে রওনা দিল কেন্দ্রের গেটের দিকে, যত পেছনে তাকায় তত সামনে দৌড়ায়। আরেকটা দলকে দেখলাম তারাও যাচ্ছে গেটের দিকেই, কিন্তু গেট পেরোচ্ছে না। গেটের কাছাকাছি একটা নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খল ছেলেমেয়েদের প্রভুর মতো ক্রমাগত অর্ডার দিয়ে চলেছে : 'পানি আন, বালু আন'—শ্রীকান্তের সেই ছিনাত বহুরূপীর গল্পের পিসেমশায়ের মতো : 'বন্দুক লাও, শড়কি লাও!'—এখন 'লাও তো বটে কিন্তু আনে কে?' আমি ভীত-সরিয়া হয়ে আট-দশ জন ছেলেমেয়েকে ডেকে লাইব্রেরির দেয়ালগুলোতে বালতি বালতি পানি ঢালতে লাগলাম যাতে ভেজা দেয়ালে আগুন সুবিধা করতে না পারে। যাই হোক ঘণ্টা দুয়েক পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এল। আমরা নেমে এলাম। ভেগে পড়া সেই দুই পার্টি পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝে বীরদর্পে আবার ক্লাসে এসে বসল, কিন্তু পড়াশোনায় আর মন বসল না। আগুনের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে রোমহর্ষক কথাবার্তা চলতে লাগল। যারা গেট পেরিয়ে ভেগে পড়েছিল বা যারা গেটের এপাশ থেকেই কল্পিত আজ্ঞাবহদের উদ্দেশে বন্দুক শড়কি আহরণ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুকুম দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের গলার স্বরই তখন সবার ওপর দিয়ে। কিন্তু এই বাকসর্বস্বদের বাইরেও আরো একদল অপ্রত্যাশিত ছেলেকে দেখতে পেলাম ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এই ক্লাসেরই ছাত্র তারা কিন্তু এতই সাধারণ যে ক্লাসের প্রাত্যহিক পড়াশোনায় তাদের কোনোদিন দেখেছি বলেই যেন মনে পড়ে না। রোজকার ক্লাসের উত্তপ্ত জমজমাট আলোচনায় অংশ নিয়ে লাঙ্গুল-আস্ফালন করতে এদের যেন প্রায় দেখিই নি। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ওরা প্রায়ই সবাই কমবেশি আহত, কারো হাতে ফোস্কা, কারো গালে স্যাঁকা-লাগা কালো দাগ, কারো কনুইয়ের পাশ থেকে রক্ত ঝরছে, কারো জামা ছেঁড়া, এমনি সব অবস্থা। ক্লাসের দৈনন্দিন পড়াশোনায় পেছনের বঞ্চির অতি সাধারণ ছাত্র এরা, অনেকে এতই মেধাহীন যে প্রায় তিন-চার মাস নিয়মিত ক্লাস করার পরেও তাদের চেহারা আমার মনে কোনোরকম ছাপ ফেলে নি। তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? এসব হল কী করে? তাদের অস্ফুট অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল আমাদের বাক্যবাগীশ বীর পুঙ্গবেরা যখন গেট পেরিয়ে নিরাপদ জায়গার দিকে ছুটে গিয়েছিল তখন তারা করেছিল উল্টো ব্যাপার। আগুন নেভাবার জন্যে চলে গিয়েছিল বস্তির ভেতরে। এরকম আট/দশটা ছেলে দেখলাম এই দলে। তখন আমার সামনে বসে থাকা ছাত্রদের মধ্যে আমি স্পষ্ট দুটো ভাগ দেখতে পেলাম। একদল—যারা পেছনে তাকিয়েছে আর সামনে দৌড়িয়েছে, নিজেদের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করে পেছনের মানবিক বিপর্যয়ের এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য উপভোগ করেছে, হুকুম-হাকাম দিয়েছে; আর একদল—যারা বোকার মতো সেই আগুন নেভাতে ছুটে গেছে। না, কেউ তাদের যেতে বলে নি সেখানে। নিজেদের তাড়নাতেই তারা চলে গেছে। মানবতা বিপন্ন হচ্ছে অনুভব করে ভেতরের আকুতিতে ছুটে এগিয়ে গেছে। নিজেদের ভালোমন্দ ভাবার সময় পায় নি। বুঝতে পারে নি কী করলে আগুন নেভানো যাবে, তবু এগিয়ে গিয়ে সাধ্যমতো দৌড়োদৌড়ি করেছে, বিপদ দেখেও তার ভেতর ঢুকে গেছে, আহত হয়েছে, সাহায্য করেছে। কাজেই দল দুটো : একদল যারা কাজ করেছিল নিজেদের বাঁচাতে, অন্যদল যারা ছুটে গিয়েছিল অন্যদের সহায়তায়। ছেলেগুলোর জন্য খুব মমতা হল আমার। মনে হল আমাদের কেন্দ্রের যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা তাতে মেধার দিক থেকে সাদামাঠা অথচ হৃদয়ের দিক থেকে শক্তিশালী এই ছেলেমেয়েদের পুরস্কৃত করার তো কোনো ব্যবস্থা নেই। নম্বর কি পাবে শুধু স্বার্থপর মেধা? লোভাতুর বুদ্ধিবৃত্তি? হৃদয় নয়? ভালোবাসা নয়? মানবিক অনুভূতি নয়?

আপনাদের সবার হয়তো মনে আছে যখন একাত্তুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ডঙ্কা বেজে উঠেছিল তখন কীভাবে রাতারাতি একদল জ্বালাময়ী বক্তা ব্যাঙের ছাতার মতো জন্ম নিয়েছিল এই দেশের পথে প্রান্তরে—সবখানে। স্বাধীনতার আগের অন্তত দু বছর তাঁদের অগ্নিময় ভাষণে সারাদেশ প্রকম্পিত ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্ষুধার্ত পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশবাসীর ওপর তাদের সেইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগাড়ম্বর আর উদ্দীপনার ওপর যেন পানি ঢেলে দিল কেউ হঠাৎ। সবকিছু মুহূর্তে থেমে নীরব হয়ে গেল। আর সেই বাকসর্বস্ব যোদ্ধার দল দেশ ছেড়ে গিয়ে উঠল কলকাতায়, ভাষণ-সুযোগহীনভাবে মুক্তিযুদ্ধের বুকের ওপর বসে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণ করতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। স্বাভাবিকভাবেই একটা ভয়াবহ উৎকণ্ঠায় পড়ে গেল সারা দেশ। এই অবস্থাতে দেশকে বাঁচাবে কে? আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল কি চিরস্থায়ী হয়ে যাবে? যুদ্ধ করবে কারা? কোথায় জাতির পরিত্রাণকারী? এই উদ্ধারহীন সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল সারা দেশে। এক ধরনের অপরিচিত অবোধ আত্মদানকাতর যুবক জেগে উঠতে লাগল গ্রামবাংলার বুকের ভিতর থেকে, কেউ এদের এর আগে কোনোদিন দেখে নি। গ্রামবাংলার মতো তাদের হৃদয় নির্বোধ ও লাঞ্ছনা-ব্যথিত। আমি তখন গ্রামে। সেখানে দেখতাম চারপাশের গ্রামগুলো থেকে এক একদিন বিশ জন পঁচিশ জন করে ছেলে চলে যাচ্ছে যুদ্ধে। এক একদিন সকালে উঠেই দেখা যাচ্ছে গোটা একটা গ্রামের ছেলেপেলের একজনও প্রায় নেই। এই অবোধ এবং মূঢ় যুবকেরা যুদ্ধ করে তাদের মূল্যহীন রক্তে জাতিকে উপহার দিয়েছিল স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরে ঘটেছিল পুরো অন্য দৃশ্য। ওই জ্বালাময়ী বক্তারা, চোখের পলকে কীভাবে যেন ফিরে এসেছিল রাজধানীসহ সারাদেশের সবখানে। দখল করে নিয়েছিল জাতির প্রাণকেন্দ্র ঢাকা মহানগরী। ১৬ই ডিসেম্বর তাদের দেখা গিয়েছিল বলে দেশের হতাশাগ্রস্ত জনসাধারণ বিদ্রূপ করে তাদের নাম রেখেছিল সিক্সটিন্থ ডিভিশন। এদিকে যুদ্ধ শেষ না হতেই যুদ্ধক্লান্ত ওই অবোধ যুবকেরা টের পেয়েছিল এই বিজয় তাদের জন্য নয়, এই মহানগরীতে তারা পুরো অবাঞ্ছিত, অতিরিক্ত। তারা নিঃশব্দে মুছে গিয়েছিল বাংলার বুকের ওপর থেকে যেভাবে একদিন তারা জেগে উঠেছিল, ঠিক সেভাবে। তাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ এরাই তো ছিল সেদিনকার এই জাতির মূল শক্তি, আশ্রয়, উদ্ধার ও একমাত্র আশ্বাস। জাতির বিবেক, বেদনা, সংগ্রাম আর শক্তিমত্তাকে তো ধারণ করেছিল এরাই--নিজেদের রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে। অথচ এর কোনো মূল্য নেই। স্বীকৃতি বা পুরস্কার নেই, অভিনন্দন বা আবাহন নেই—বরং আছে উল্টো আচরণ। যেন জাতির প্রতিপক্ষ এরা সব। এদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে, ধ্বংস করতে না পারলে কারো স্বস্তি নেই, নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।

সেদিন আমাদের আলোচনা ক্লাসে আমার সামনে আগুনের আঁচ লাগা, পুড়ে ছড়ে যাওয়া ছেলেগুলোকে দেখে আমার মনে নতুন ভাবনা এসে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল কেন্দ্রে আমরা ছাত্রছাত্রীদের মেধা প্রতিভা অনেক কিছুরই মূল্যায়ন করি, কিন্তু তাদের ভেতর যে আত্মোৎসর্গী হৃদয়টা রয়েছে, যে পরোপকারী বেদনাবান মানুষটি রয়েছে একটা জাতির যা সবচেয়ে বড় সম্পদ—তাকে তো কোনো সম্মান দিই না। তো, ওই ঘটনার পরে আমি আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিই। আমরা এখন শতকরা পঞ্চাশভাগ নম্বর দিই মেধার জন্য আর পঞ্চাশভাগ দেই নির্বোধ হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতার জন্য। ওই যে ছেলেগুলো আগুনের ভেতর চলে গিয়েছিল, কী শক্তি থাকায় ওরা তার মধ্যে চলে যেতে পেরেছিল? ওদের মধ্যে ছিল নির্বোধ হওয়ার ক্ষমতা, অন্যের দুঃখে নিজের স্বার্থকে ভালোমন্দকে ভুলে যেতে পারার ক্ষমতা; প্রেমের ক্ষমতা, ভালোবাসার ক্ষমতা, অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে অনুভব করে নিজের লাভালাভকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা যে কেবল অসাধারণ মানুষের মধ্যেই থাকে তা নয়, বহু সাধারণ মানুষের মধ্যেও একইভাবে থাকে। আসলে মেধাবী মানুষ যা দিয়ে সত্যিকার অর্থে অসাধারণ হয়ে ওঠেন তা তো এই ক্ষমতাই। এই ক্ষমতার একটা উদাহরণ দিই। গল্পটা সেকেলে, কিন্তু এখনো বাতিল নয়। ঘুমের মধ্যে বায়েজিদ বোস্তামীর মা বায়েজিদ বোস্তামীকে বলেছিলেন এক গ্লাস পানি দিতে। বায়েজিদ বোস্তামী পানি নিয়ে এসেছেন। এসে দেখলেন মা ঘুমিয়ে গেছেন। আমরা যে কেউ হলে এই অবস্থায় কী করতাম? হয়তো গ্লাসটা যত্ন করে কোথাও রেখে মাকে অনুসরণ করে গভীর ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতাম, পরের দিন মা জাগার তিন ঘণ্টা পরে জেগে বলতাম, ও হো হো, তুমি মা তখন রাত্রে এমনভাবে ঘুমিয়ে গেলে যে আমি ভাবলাম সাত–আট ঘণ্টার মধ্যে আর হয়তো উঠবেই না। তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কিন্তু বায়েজিদের ব্যাপারে কী হল? এমন কোনো অজুহাত তুললেন না তিনি। পানি নিয়ে এসে দেখলেন, মা ঘুমিয়ে গেছেন। মা পানি চেয়েছেন, প্রথম সুযোগে তাঁর হাতে তা তুলে দিতে হবে, কিন্তু তিনি তো এখন ঘুমে। এখন দিতে গেলে ঘুম থেকে তুলে তাঁকে কষ্ট দেওয়া হবে। এখন কী কর্তব্য? পানি হাতে বোকার মতো একঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সারারাত, যেন মায়ের কল্যাণে তঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে প্রার্থনারত স্নিগ্ধ একরাশ হাসনাহেনা। মার ঘুম ভাঙতেই তাঁর হাতে তুলে দিলেন গ্লাসটা। আমাদের মতো না করে কেন করলেন তিনি অমনটা? কারণ একটাই। মায়ের জন্যে তাঁর ভালোবাসা ছিল আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। তাঁর সুখ দুঃখ ভালো মন্দের জন্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সেটা এতটাই জন্মান্ধ আর অবোধ যে এমন একজন মেধাবী মানুষ হয়েও এমন অবোধ শিশুর মতো আচরণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয় নি, যা কোনো নিচু বুদ্ধির মানুষ হলেও হয়তো করত না। কিংবা ধরা যাক বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটা। এখন অবশ্য গল্পটা সত্য নয় বলেই শোনা যাচ্ছে, হয়তো তা প্রমাণিতও হয়েছে : সেই যে ভাইয়ের বিয়েতে মা তাঁকে যেতে বলেছিলেন। ছুটি না পাওয়ায় চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় দুর্দান্ত পার্বত্য নদী দামোদর সাঁতরে মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'মা আমি এসেছি', সেই গল্পটা।

গল্পটা হয়তো একটু অতিরঞ্জিত। কিন্তু একটু আগে মিজান ভাই বিদ্যাসাগরের যে গল্পটা করলেন সেটা তো মিথ্যা নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন গল্পটা।

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছে। তাঁর উৎকণ্ঠা একজন যোগ্য মানুষ যেন চাকরিটা পায়। না হলে একজন অযোগ্য লোক সেটা হাতিয়ে নেবে। কিন্তু যোগ্য মানুষটি তারকনাথ তর্কবাচস্পতি—তখন কলকাতায় নেই। তিনি থাকেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরিশ ক্রোশ দূরে, কলনায়, গ্রামের বাড়িতে। অথচ হার্শেল সাহেব অবিলম্বে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও আবেদনপত্র চান। হাতে সবসুদ্ধ সময় মাত্র একদিন। দুর্গম মেঠোপথে গাড়ি-ঘোড়া পাঠিয়ে তাঁর দরখাস্ত আনাবার কোনো উপায় নেই। তো কী করেন তিনি? কেবল এই নৈতিক মূল্যবোধের তাড়নায়, নিজেই পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন তার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। সারারাত হেঁটে তিরিশ ক্রোশ দূরে তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন, সেখান থেকে দরখাস্তে তাঁর স্বাক্ষর আর প্রশংসাপত্রগুলো সংগ্রহ করে আবার পরের দিন সারাটা পথ হেঁটে কলকাতায় ফিরে এসে সময়মতো দরখাস্তটা জমা দিয়ে দিলেন।

আত্মীয় না, বন্ধু না, কোনোরকম স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে না, কেবল একটা শ্রেয়বোধের জন্য তিরিশ ক্রোশ এভাবে হেঁটে যাওয়া আর ফিরে আসার ব্যাপারটা কি এতই সোজা? কতটা মূল্যবোধের শক্তি আর মমতার প্রস্রবণ ভেতরে থাকলে মানুষ এটা পারে! এসব ছাড়াও বিদ্যাসাগরের কুলিগিরি করার সেই বিখ্যাত গল্প, সাহেবের ঔদ্ধত্যকে শিক্ষা দেবার জন্যে তার সামনে টেবিলের ওপর চটিসুদ্ধ পা তুলে বসে থাকার গল্প, নীলদর্পণ নাটক দেখতে গিয়ে ক্ষেত্রমণিকে বলাৎকারের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে লম্পট রোগের দিকে চটি ছুড়ে মারার ঘটনা—এসব থেকে কি বোঝা যায় না কী অসীম প্রেমের শক্তি, কী অনমনীয় ও দুর্জয় আত্মমর্যাদাবোধ ও অবোধ ভালোবাসার অথৈ একটা সাগর ছিল তাঁর মধ্যে।

যে মানুষ এমন সব অবিশ্বাস্য কাজ করতে পারেন তাঁর মতো একজন মানুষকে নিয়েই কেবল গড়ে উঠতে পারে মাতৃভক্তির জন্যে চাকরি ছেড়ে দামোদর সাঁতরে ভাইয়ের বিয়েতে উপস্থিত হবার সেই কিংবদন্তি। মিথ্যা হয়েও সত্যের বিভ্রম জাগিয়ে রেখেছে গল্পটা। দীর্ঘ দেড় শ বছর ধরে কোটি কোটি বাঙালি গল্পটাকে বিশ্বাসযোগ্য ভেবে অনুপ্রাণিত বোধ করতে ভালোবেসেছে। আমার বা আমাদের কাউকে নিয়ে কি এই কিংবদন্তি তৈরি হতে পারত? এমন অবস্থায় আমরা কী করতাম। ধরা যাক যদি ছোট ভাইয়ের বিয়েতে উপস্থিত হতে আমার মা আমাকে তাগিদ দিয়ে ওরকম চিঠি দিতেন আর বড়কর্তার কাছ থেকে সময়মতো ছুটি না পেতাম, কী করতাম আমি? নিশ্চয়ই মায়ের কাছে প্রগাঢ় মাতৃভক্তিমূলক একটা চমৎকার চিঠি লিখতাম : মা আসিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এমন দুর্বৃত্ত এক সাহেব আমাদের বড়কর্তা হইয়া আসিয়াছেন যে মাতৃভক্তির মর্মার্থ পর্যন্ত বুঝিতে পারেন না। কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না। তোমার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে যে কতটা দু:সহ তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতেছ। তবু বাধ্য হইয়া থাকিয়া যাইতে হইতেছে। সাধ্যমতো টাকা পাঠাইয়া দিলাম। বিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া লইও। আমি প্রথম সুযোগ পাইবামাত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব। ইতি তোমার বাধ্যগত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন এই যে গল্পগুলো : তিরিশ ক্রোশ হাঁটা এবং ফিরে আসা কিংবা বায়েজিদ বোস্তামীর গল্প, অথবা দামোদর সাঁতরে চলে যাওয়া, স্বেচ্ছায় নিজের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রেটিসের বিষপান—এই গল্পগুলো কি মানবজাতির বুদ্ধির গল্প। এসব কি মানুষের ধীশক্তির পরিচয়বাহী? এগুলো তো সব বুদ্ধিহীনতার গল্প। ভালোবাসা মানুষকে যে কতখানি নির্বোধ করে দিতে পারে, তার সর্বোচ্চ উদাহরণ। মানুষের নির্বোধ হবার ক্ষমতা যে কোন আত্মঘাতী পর্যায়ে যেতে পারে তার লোকশ্রুত প্রতীক। তাই এঁরা কেবল সাধারণ গল্প হয়ে থাকে নি, হয়ে উঠেছে মানবজাতির জীবন্ত কিংবদন্তি, তাদের জীবনের আচরণীয় আদর্শ।

আলোচ্য ব্যক্তিরা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান মানুষদের দলের। সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষদের অন্যতম। তাঁরা কী করে এত নির্বোধ হতে পারলেন? তাঁরা যে ওইসব পারেন, আর আমরা পারি না, তার কারণও একটাই। তাঁদের ভেতর ভালোবাসার শক্তি আমাদের চাইতে বেশি। তাই মায়ের ডাক এলে অমন প্রবলভাবে তাঁর সমস্ত কিছু ভেসে ভেস্তে যায়। আমার যায় না। একজন যোগ্য মানুষ চাকরি হারালে সমাজের ক্ষতি হয়ে যাবে এই উৎকণ্ঠা তার ভেতর এমনই প্রচণ্ড যে এর সামনে তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত সুখ–দুঃখ, লাভালাভ, কষ্ট সমস্ত কিছুই মিথ্যা হয়ে পড়ে। এই ভালোবাসা তার ভেতর যে কত পরিব্যাপ্ত ছিল তা কবি নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত করছি। নিজের তরুণ বয়সের অসহায় দুর্দশার ভেতর উজ্জ্বল উদ্ধারকারী হিসেবে তিনিও পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে : "যে এক ভেলার ভরসা করিয়া ভাসিতেছিলাম, তাহাও তো ডুবিয়া গেল। এখন কি করি? অবস্থার ঘোর ঘটায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। মস্তকের উপর ঝটিকা গর্জ্জিতেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ঘোরতর অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতেছি না। একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ, একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রও কোন দিকে দেখিতেছি না যে, উহাকে উপলক্ষ করিয়া ভাসিয়া থাকি। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া এরূপ আহত ও নিমজ্জিত করিতেছে যে, আর ভাসিয়া থাকিবার আশা দেখিতেছি না। একটি কিশোরবয়স্ক কলিকাতার পথের কাঙ্গাল কেমন করিয়া কূল পাইবে? সকল অবলম্বন ভাসিয়া গিয়াছে, সকল আশা নিভিয়া গিয়াছে। একমাত্র আশা সেই বিপদ্‌ভঞ্জন হরি। ভক্তিভরে, অবসন্নপ্রাণে, কাতর অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি প্রহ্লাদের মতো আমাকেও তাঁহার নরমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। সেই নরনারায়ণ *শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।...* সেই ভগবদ্বাক্য—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—মানবের একমাত্র সান্ত্বনার কথা। *"পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে"*—এই মহাধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অবতার। সেই মহাব্রত সাধন করিয়া, তাঁহার অবতারে বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়া তিনি তিরোহিত হইয়াছেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি চিরজীবী। তিনি চিরদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থাকিবেন।"

তাঁর প্রতিটি আচরণের মধ্যে যে দেশপ্রেম, দেশের মর্যাদার জন্য ভালোবাসা, এর মঙ্গলের জন্য আকুতি, প্রতিটা মানুষের কল্যাণের জন্যে মমতা, মায়ের জন্য প্রেম, ভাইয়ের জন্য প্রেম, প্রত্যেকটি চেনা অচেনা মানুষের জন্যে প্রেম, মানুষেপ্রেম এবং প্রেমের জন্য নিজের সুখ–শান্তিকে বিসর্জন, বুদ্ধিকে বিসর্জন, বৈষয়িক বিষয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনাকে বিসর্জন, এর সমকক্ষ শক্তি কোথায় কতটুকু দেখা গেছে এই জাতির জীবনে?

নবীনসেন সেকালের একজন ঝানু ডেপুটি, যথেষ্ট প্রখর মানুষ। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী পড়লে টের পেতে অসুবিধা হয় না বিদ্যাসাগরের কথা বলতে কেন এভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে যান তিনি? মাইকেলের মতো এমন দুর্বিনীত মানুষও কেন তাঁর সামনে এমন অসহায়? গান্ধীর প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলেই নেহরু যেমন শিশুসুলভ আর প্রগলভ হয়ে পড়তেন এ–ও প্রায় তেমনি। কেন? কী ছিল তাঁর ভেতরে। সবাই জানেন কী ছিল। ছিল নির্বোধ অবোধ ভালোবসার শক্তি, সব বুদ্ধি বিবেচনাকে ভাসিয়ে নেওয়া অমিত, অন্ধ, আত্মবিস্মৃত ও উৎসারিত একটা হৃদয়। যে ছোট্ট মেয়েটিকে অকালে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ির অন্ধকার নিষ্পেষণের মধ্যে চিরদিনের মতো ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার থেকে শুরু করে অভিশপ্ত জীবনের ভেতর ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যাওয়া বিধবা, এদেশের শিক্ষাবঞ্চিত কোটি কোটি শিশু, মাইকেল, নবীনসেনের মতো প্রতিভা, তাঁর আশপাশের প্রতিটি মানুষ, তাঁর সমাজ, তাঁর দেশ—কে এই উপচে পড়া ভালোবাসা থেকে, তাঁর নির্বোধ ভালোবাসার অসীম প্রস্রবণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

সুধীবৃন্দ, আমি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে যাই নি। আমি হৃদয়ের দিক থেকে বিদ্যাসাগরকে অনুভব করার চেষ্টা করেছি। আমার ধারণা, বিদ্যাসাগর এখানেই বড়। আলোচনা সভার অন্যান্য বক্তা বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর কাছে জাতির ঋণ অসীম। এদেশের ভাষাকে, সাহিত্যকে, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মের দ্বারা ঋণী করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে তিনি বড় ছিলেন তাঁর ভেতরকার মানবিকতায়। আপ্লুত হৃদয়ৈশ্বর্যে। সবকিছুকে সবল ভালোবাসা ও মমতার চোখে দেখতে পারার ক্ষমতায়। তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড ছিল এই হৃদয়–স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। আমি সেই অমিত ও সম্পন্ন হৃদয়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১৯৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিভিশনের 'মুক্তধারা' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা

আমরা এই দেশের এমন একটা যুগে বেঁচে আছি যখন গভীরতম হতাশা এবং অন্তহীন আশাবাদ একই সঙ্গে আমাদেরকে উজ্জীবিত ও স্নায়ুহীন করে রেখেছে।

হতাশার দিকটা নিয়েই আমি প্রথমে কিছু বলব।

আজ আমাদের সমাজের ষোল থেকে আরম্ভ করে ছিয়াত্তর বছরের প্রতিটা মানুষের কথাবার্তায় বেদনার একই বেহালা : "হবে না, হবে না! যতই চেষ্টা করুন কিছুই হবে না।" মূল্যবোধের অবক্ষয়, সার্বিক বিশৃঙ্খলতা এবং অরাজকতা সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয়কেও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

এবার দেখা যাক, এই অবক্ষয়ের আসল চেহারাটা ঠিক কী রকম। খুব বেশি দিনের কথা নয়, আমাদের ছেলেবেলাতেই একজন শিক্ষককে মাইলখানেক দূর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেও আমরা প্রায় অভ্রান্তভাবেই বলে দিতে পারতাম : একজন শিক্ষক যাচ্ছেন।

ওই শিক্ষকের হেঁটে যাবার বিশিষ্ট ভঙ্গি, পোশাকের স্বাতন্ত্র্য, হাতের মুঠোয় বই ধরার সুপরিচিত বিশিষ্টতা—সবকিছু মিলে তাঁর আপাদমস্তক অবয়বে এমন একটা শিক্ষকোচিত চরিত্র ফুটিয়ে তুলত যার ফলে তাঁকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হত না। এখন ব্যাপারটা হুবহু সেরকম নেই।

এমন বেশকিছু শিক্ষককে আমি ব্যক্তিগতভাবেই চিনি যাঁদের দেখে বোঝাই মুশকিল আসলে তাঁদের পেশা ঠিক কী? তারা কি ডাক্তার, কন্ট্রাক্টর, দারোগা, না আমলা, নাকি অন্যকিছু—কিছুই ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না।

সবকিছু একাকার হয়ে আজ আদ্যোপান্ত 'এক পাতলুনের ভেতর' চলে গেছে।

আজ কেউ আর তার নিজস্ব মর্যাদার অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই।

দেশ বা জাতির উত্থানকে কেউ আর তার নিজের কল্যাণ বা উত্থান বলে ভাবছে না। প্রায় কেউ ভাবছেই না, জাতি এবং রাষ্ট্রের দৃঢ়প্রথিত ভিত্তিই শুধুমাত্র হতে পারে সকলের মর্যাদাবান অস্তিত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা।

এখন পাড়ায় আগুন লাগলে যে যার ব্যক্তিগত কপাট শক্ত করে এঁটে দিয়ে একা একা বাঁচতে চাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতেই পারছে না চারধার থেকে মৃত্যু–সাম্রাজ্য পরিবেষ্টিত হয়ে সে একা বাঁচতে পারবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চারপাশের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম চালানো আজ তার প্রয়োজন ; সকলের অস্তিত্বের স্বার্থে এবং সেইসঙ্গে নিজেরও।

এখন চিকিৎসক রোগীর হিতকে দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিতকে না, আমলা লোকহিতকে না, রাজনীতিবিদ জাতির হিতকে না।

সব হিতের ওপর দিয়ে সারাদেশে সমস্ত জায়গায় শুধুমাত্র একটি হিতের মাথাই আজ দাঁতালের মতো অস্তিত্ব উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে : আত্মহিত। 'আমার হবে তো', 'আমি পাব তো', 'আমি আছি তো',—এই কদর্য অশ্লীল চিৎকারের নিচে আজ সারাদেশের সমস্ত কণ্ঠস্বর নিপিষ্ট।

সমষ্টির হিতকে পায়ে মাড়িয়ে সারাদেশ আজ আত্মস্বার্থের ক্লেদাক্ত অধঃপতনের মধ্যে ক্রন্দনরত ও অসহায়।

কোনোরকম ন্যায়নীতি নেই, সামাজিক কল্যাণ নেই, ন্যূনতম বিবেক বা চক্ষুলজ্জার প্রশ্রয় নেই, আদর্শ বা মূল্যবোধ নেই—আছে কেবল 'ব্যক্তি' আর তার বর্বর অলজ্জ স্বার্থ—অদ্ভুত আঁধারের নিচে সারাদেশ আজ বিমূঢ় ও উদ্ধারহিত।

কেন ঘটল এই অবক্ষয়? চার বা পাঁচ দশক আগে, এমনকি আমাদের ছেলেবেলার অবস্থা তো এমন বেদনাবহ ছিল না ; বরং সুস্থিত বুদ্ধি এবং শুভ চেতনাকে জাতীয় অস্তিত্বের অনেক জায়গাতেই অম্লান আলো ছড়াতে দেখা গেছে।

অথচ এই সময়ের মধ্যে জাতির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছে অবিশ্বাস্য হারে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই উন্নতির পরিমাণ এমন বিপুল যে এর আগে যে কোনো কাল–পরিসরের সঙ্গে তা তুলনীয়ই নয়। সহজেই প্রশ্ন আসে এমন বিপুল সমৃদ্ধির পাশাপাশি এই বেদনাদায়ক অবক্ষয় ঘটতে পারল কী করে! এ ব্যাপারে আমার উত্তর সাদামাঠা। আমার ধারণা, আমাদের আজকের এই অবক্ষয় আমাদের আজকের বিপুল বিকাশেরই ফলশ্রুতি। কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে বলে প্রথমেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে নিতে চাই। আমাদের ছেলেবেলায় এদেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখেছি তার আয়তন ছিল নিতান্তই ছোট। দেশের ভেতর সে সময় যে অল্পবিস্তর বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ সুবিধার সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিত তা ছিল কমবেশি এদেরই দখলে। দেশের আপামর জনসাধারণের তাতে কোনো অধিকার ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে যেন সবকিছু বদলে গেল। সাতচল্লিশ সালে আংশিকভাবে এবং একাত্তুরের পর সারাদেশে সমস্ত জনসাধারণের সামনে কোটি কোটি সুযোগের অবিশ্বাস্য দরজা হঠাৎ করে খুলে গেল। ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি স্বাস্থ্য যাতায়াত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এ সুযোগের বিশাল প্রসার দেশের প্রায় প্রতিটি দরজাকে স্পর্শ করেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সীমিত। লেখাপড়ার সুযোগের ভেতরে আসা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। গত চল্লিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা-সুযোগের যে কী বিশাল প্রসার ঘটেছে তা সবারই জানা। হাজার হাজার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার সুযোগের মধ্যে নিয়ে এসেছে। এরই পাশাপাশি অসংখ্য নতুন কলকারখানা ব্যবসা চাকরি কর্মসংস্থান তৈরি হয়ে জাতীয় জীবনে সূচিত করেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদন উদ্যোগ যেমন বেড়েছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি স্নায়ুতন্ত্রের মতো অজস্ররেখায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেশের সবচেয়ে সুদূর এবং পশ্চাৎপদ গ্রামটির স্তব্ধ অনড় জীবনযাত্রার নিশ্চল অচলায়তনের ভেতরেও আজ এই উন্নয়নের হাওয়া। আমি নিশ্চিত গত চল্লিশ বছরের আমাদের দেশের যে বিপুল ঐহিক উন্নতি ঘটেছে তা আর আগের এক হাজার বছরের বৈষয়িক সমৃদ্ধিকেও অতিক্রম করেছে। এই ধরনের প্রস্তুতিহীন আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ও সর্বগ্রাসী বিকাশের মুখে যে কোনো সুশীল মূল্যবোধের পতন ঘটে যাবার কথা এবং সত্যি সত্যি ঘটেছেও তাই। আমাদের ছেলেবেলার ছোট্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই শান্ত নিরুদ্বেগ মূল্যবোধগুলোকে এখন, এই বিশাল 'উত্থানের' মুখে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন নীতিবোধ পদদলিত, 'সুবচন নির্বাসনে', 'শুভ্র সুন্দর কল্যাণ আনন্দ' পলাতক এবং ব্যক্তি আর ব্যক্তিস্বার্থের বর্বর আগ্রাসনের নিচে সারাটা জাতি লুণ্ঠিত এবং বিস্রস্ত।

শুধুমাত্র এ থেকেই আমি কিন্তু এমন বিশ্বাসে উপনীত হতে চাই না যে এই পতন সামগ্রিক বা উদ্ধারহীন। বরং অবস্থাটাকে তুলনা করা যেতে পারে নদীর প্রথম বর্ষার হিংস্র উচ্ছ্বিত জলস্রোতের সঙ্গে। সকলেরই জানা আছে নদীতে প্রথম বর্ষায় পানির ঢল যখন দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তা কী পরিমাণ কদর্যতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটাই নদীর চিরকালীন রূপ নয়। কেননা এর পরই নদীর পানি ধীরে ধীরে থিতিয়ে এসে শুরু হয় তার সম্পন্ন ও গভীর হয়ে ওঠার পর্ব। আর এমনি এক সহজ পরিণতির ধারার ভেতর থেকেই আমরা ভাদ্রের পরিপূর্ণ নিটোল নদীটাকে প্রাকৃতিক নিয়মেই একসময় পেয়ে যাই।

কাজেই যাকে আমরা অনেক সময় পশ্চাদ্‌যাত্রা বা পতন বলে ধরে নিই, প্রকৃত সত্যটা হয়তো তা নয় ; বরং হেরে যাওয়ার ছদ্মাবরণের আড়ালে তা হয়তো এক ধরনের অগ্রযাত্রারই অন্য নাম। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটা গাড়ি পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। আমরা এই ওঠার পর্বটাকে কী নামে চিহ্নিত করব? আমরা বলব : গাড়িটা উঠছে, অর্থাৎ উত্থান হচ্ছে। কিন্তু গাড়িটা যখন পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করবে তখন ওই নামার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা কি বলতে পারব, গাড়িটা যেহেতু নামছে, সুতরাং তার পতন হচ্ছে? না, তা বলতে পারব না। কেননা গাড়িটা নিচের দিকে নামলেও তার চাকা তো পেছন দিকে ঘুরছে না? তাহলে ঘড়িটা নামছে কেন? নামছে সামনের পাহাড়ে উঠবে বলে। সুতরাং এই অবতরণ আসলে একটা আরোহণেরই প্রস্তুতি পর্ব। আমার ধারণা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবোধের আজকের এই পতন আসলে আমাদের জাতির উত্থানেরই একটা ছদ্মবেশী প্রস্তুতি। আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই মূল্যবোধের পতন ঘটেছে জাতীয় জীবনে বিত্তের অভাবিত প্রবেশের ফলশ্রুতিতেই, যা থিতিয়ে এলে তার ভেতর থেকে ঋদ্ধতর মূল্যবোধসম্পন্ন একটা জাতির জন্ম আমরা প্রত্যাশা করতে পারব।

আমি বুঝি না একটা জাতির জীবনে পুঁজির প্রথম পদপাত অপরাধের পথ ছাড়া অন্য কিভাবে অর্জিত হতে পারে।

আজ যখন এই জাতির দূর অতীতের দিকে চোখ ফেরাই তখন এর কোন্ চেহারা আমাদের চোখে ভাসে? অনাহারক্লিষ্ট নির্জীব একটা সুবিশাল জনগোষ্ঠী—পৃথিবীর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত যারা প্রায় কিছুই পায় নি। রুটি, মাখন, জ্যাম, জেলি, পনির—না, কোনো কিছুই খাওয়া হয়ে ওঠে নি এদের আজো। একটা ভালো জামা গায় দেয় নি এরা ; ভালো সোফায় বসে নি। একটা ভালো বিছানায় শোয় নি। এমনি সময়ে এই উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু মানুষের সামনে, প্রায় অলৌকিক ঘটনার মতো বৈষয়িক সুযোগের কোটি কোটি দরজা একসঙ্গে হঠাৎ খুলে গেছে। কেবল দেশের নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ আজ তার সামনে অবারিত। হংকং, দুবাই, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, নিউইয়র্ক, প্যারিস—সারা পৃথিবী সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কোনোকিছুই আজ তার আয়ত্তের বাইরে নয়। ঐশ্বর্যের এই অবারিত হাতছানির সামনে দাঁড়িয়ে এখন, এই মুহূর্তে, সে কী করবে? আদর্শ আর মূল্যবোধের ধুয়ো তুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? চোখের সামনে ইপ্সিত ঐশ্বর্যের অবাধ লুণ্ঠনকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করবে? আমার ধারণা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-আশ্রয়হীন নিঃস্ব মানুষের যা করার কথা সে তাই করেছে। এই বিশাল সুযোগযজ্ঞের ওপর উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খুন করে হোক, মেরে হোক, কেড়ে হোক, আজ তাকে সব পেতে হবে। যুগ যুগান্তরে অসমাপ্ত সাধ অচরিতার্থ বাসনাকে পূর্ণ করে নিতে হবে এই সুযোগে। মহান কথার ছেঁদোবুলিতে কান দিয়ে ঐশ্বর্যের এই অপ্রত্যাশিত সুযোগকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না। এ সুযোগ তার আর আসবে না। সে জেনে গেছে : এটা তার 'মূল্যবোধে'র যুগ নয়, এটা তার 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'র যুগ। আজ আদর্শের ছেঁদো দোহাই তুলে, বিত্তকে বর্বরতা আখ্যা দিয়ে, সম্পদ জড়ো করার উন্মাদনা থেকে তাকে নিরস্ত করতে গেলে তার প্রতি নিষ্ঠুরতা করাই হবে। এখন সে জড়ো করুক, পাহাড় গড়ুক, লিপ্সায় ভোগে মাতাল হোক, সাধ মেটাক, তৃপ্ত হোক, তারপরে প্রকৃতির নিয়মে একদিন সে আপনিই 'মূল্যবোধ' উপহার দেবে। First we have to feed ourselves and then philosophise.

আমার ধারণা, আমাদের আজকের এই মূল্যবোধের অবক্ষয়কে যত নৈরাশ্যজনক বলেই মনে হোক, আসলে আজকের প্রেক্ষাপটে তা একটা প্রগতিশীল ঘটনা—বাইরের নিঃস্ব পরিচয়ের অন্তরালে একটা বিপুল জাতীয় উত্থান।

১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রণদাপ্রসাদ সাহার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা

আজকের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী, (সভাপতি বললেই হয়তো ঠিক হত—তা হলে কবিতার মতো মিল হয়ে যেত—'সভাপতি জয়াপতি'। কবিতা এড়ানোর জন্যেই সভানেত্রী বললাম), ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, রাজীব এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী।

এই সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে আমি অপ্রস্তুত বোধ করছি এই জন্য যে, বক্তৃতাটা আমাকে করতে হচ্ছে এমন কিছু মানুষের সামনে যাঁরা রণদা প্রসাদ সাহাকে আমার চেয়ে অনেক ভালো করে জানেন—তাঁর জীবন, কর্ম, সাধনা, প্রতিভা, ত্যাগ আর আত্মোৎসর্গের গোটা ইতিহাস, যাঁদের কাছে, আমার তুলনায় অনেক ভালোভাবে জানা। আপনারা মির্জাপুরের অধিবাসীরা তাঁকে এত গভীরভাবে চেনেন যে, আমি বাইরের থেকে এসে যদি সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনাদের জ্ঞানদান করতে শুরু করি তবে সমুদ্রে পানি নিয়ে যাওয়ার মতোই ঔদ্ধত্য হবে। তবু আমাকে উনি (অনুষ্ঠানের সংগঠককে দেখিয়ে) পাকড়াও করে এখানে এনেছেন এবং কিছু বলতে আদেশ করেছেন। কাজেই আমার কথাগুলোকে আপনারা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

রণদা প্রসাদ সাহা তাঁর জীবনের সমস্ত বৈষয়িক অর্জন এবং সম্বলকে—যা তিনি ব্যক্তিগত যোগ্যতায় পেয়েছিলেন এবং আজীবন ভোগ করে যেতে পারতেন—মানুষের কল্যাণে দান করে গিয়েছেন। ব্যাপারটা বলা বা এ নিয়ে বক্তৃতা করা সোজা, কিন্তু এটা ঘটানো যে কতটা কঠিন, তা সচেতন মানুষ মাত্রেই উপলব্ধি করেন। পাওয়ার ব্যাপারে আমরা খুবই উৎসুক। আমার কী হবে, আমি কী পাব, এই স্বার্থ-সর্বস্বতার ক্লেদাক্ত বীভৎস চিৎকারের নিচে মানুষের সব প্রণোদনা, সব বুদ্ধি আজ যখন সারা দেশে সবখানে মিথ্যা হয়ে গেছে তখন এ কথা ভাবাটা খুবই কঠিন যে, একটি মানুষ তার সমস্ত জীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ জনকল্যাণের জন্য দিয়ে গেলেন কীভাবে। আমরা তো শুধু পাবার জন্যেই প্রত্যাশী। প্রাপ্তির সামান্যতম সম্ভাবনায় আমাদের চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে, সব মহৎ অঙ্গীকার শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে। এই তো আমরা, আমাদের সমাজ। এমনি এক সমাজের ভেতর জন্মে একজন মানুষ তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু মানুষের ভালোর জন্যে দিয়ে যাচ্ছেন—এটা একটা অসাধারণ ঘটনা নয় কি?

আমি ঢাকা শহরের একটা পাড়ায় থাকি। সেই পাড়ায় বিশাল বিশাল ইমারত আছে। কোনোটা সাত তলা, কোনোটা আট তলা, কোনোটা দশ তলা বা পনের তলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সেই পাড়ার রাস্তা এত সংকীর্ণ যে সেখান থেকে লাশ বের করাও রীতিমতো দুষ্কর। নতুন ঢাকার অনেক পাড়াই আজ এরকম। আমরা এত বড় দালান বানাতে পেরেছি কিন্তু রাস্তা বানাতে পারি নি কেন? আমার ধারণা যে কারণে দালান বানিয়েছি, সে কারণেই রাস্তা বানাতে পারি নি। দুটোই ঘটেছে বল্গাহীন বৈষয়িক লিপ্সার কারণে। বিত্তের উৎকট লালসার কারণে অকাশছোঁয়া সব দালান বানিয়েছি এবং ওই আত্মসর্বস্ব মনোভঙ্গির কারণেই রাস্তা বানানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রাস্তাটাকেও আমরা আমাদের সুউচ্চ বাড়ির মতোই আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে নিয়েছি। রাস্তাকে আমাদের জমি থেকে জায়গা ছেড়ে দেই নি। রাস্তার জমি আমাদের বাড়ির জন্যে দখল করে নিয়েছি। পৃথিবীতে দেওয়া অত সহজ নয়। পৃথিবীতে খুব কম মানুষই দিতে পারে। আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত আছি। (একটু আগে সভানেত্রী বলছিলেন আপনারা তো সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স বানাতে যাচ্ছেন, আমরা এর অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে একসঙ্গে হয়ে কিছু করতে পারি কি না? তাঁর এই সহৃদয় প্রস্তাবের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।) সুধীমণ্ডলী, এই দালানটা আমি বাংলাদেশের বড়লোকদের অর্থ সাহায্য দিয়ে বানানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। বাংলাদেশে তো কম বড়লোক নেই! আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে একটা বাড়ি বানিয়েছে সাত কোটি টাকা দিয়ে। দেশে এদের সংখ্যা আজ অনেক। পাকিস্তানি আমলে এদেশে ২২ পরিবার ছিল। আজকে হয়তো আছে ২২ হাজার। টাকাওয়ালা মানুষ আজ অসংখ্য। কয়েক দশক ধরে একনাগাড়ে লুণ্ঠিত হয়েছে এই দেশ। গরিবের অর্থ লুণ্ঠিত হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য লুণ্ঠিত হয়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে ব্যাংকের টাকা, মানুষের ধনসম্পদ। দেশকে লুটপাট করে বিশাল ধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই ধনিক সম্প্রদায়ের কাছে আমি যখন টাকার জন্য চেষ্টা করেছি আমি পাই নি। আমাকে বলেছেন অমুক দিন আসবেন। গেছি, তিনি অফিসে আছেন, কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে তিনি অফিসে নেই। কারণ তাঁর সাথে আমার দেখা হলে তাঁর বিত্তের পাহাড় থেকে খড়কুটোর মতো যে সামান্য একটু অংশ খসে যাবে তা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। কেন পারছেন না? কারণ, এই বিত্ত নতুন। কয়েকদিন আগে এই লোকগুলো গরিব ছিল। ঢাকায় মেসে থাকত। আধপেটা খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভাগ্যান্বেষণ করে বেড়াত। আজকে তারা বড়লোক হয়েছে। খুব সৎপথে হয়েছে এটা বলা যাবে না। কিন্তু ভয় যায় নি ভেতর থেকে। এখনো সেই দারিদ্র্যের প্রেত তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলছে, তাদের আশঙ্কা আবার যদি কখনো ওইখানে ফিরে যেতে হয়? সেজন্য সেই একই লুব্ধ জিকির : আরো চাই, আরো চাই। নিজের ভিতকে আরো মজবুত করে দাঁড় করানো চাই। নিজের অস্তিত্বকে নিরঙ্কুশ করা চাই। তাই দেওয়ার কথা মনে হলেই তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে, হয়তো মনে হয় দিয়ে দিলে আমি আর থাকব না। আমি বোধহয় চিরদিনের মতো শেষ হয়ে আগের মতো হয়ে যাব। তো এরকম অবস্থাতে দিতে যাওয়া হয়ে ওঠে একটা দুরপনেয় যন্ত্রণার ব্যাপার। সমাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন প্রথম সম্পদ আসে তখন মানুষ অন্যকে কিছু দিচ্ছে এ-ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করলেন, তখন কারা জমিদারি কিনতে পেরেছিল? মুসলমানরা কিনতে পারে নি। কারণ মুসলমানরা নিজেরাই ছিল জমিদার আর সামন্ত। জমিদারদের কাছে নগদ টাকা থাকে না। থাকে একধরনের রাজকীয় ভাবসাব। তারা ওড়ানো-স্বভাবের হয়। তাই তারা কিছু রাখতে পারে নি। সাধারণ হিন্দুদের হাতেও কিছু ছিল না। ছিল কাদের হাতে? কিছু হিন্দু ব্যবসায়ী আর কিছু ডাকাতের হাতে। হারু ডাকাত জাতের লোকজনের হাতে। অরাজক যুগে খুন, লুঠ, ডাকাতি করে যারা টাকার পাহাড় বানিয়েছিল। ওই পয়সা ছিল বলে তারা জমিদারিগুলো কিনে নিয়েছিল। কিনেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে তারা এদেশে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে শুরু করেছে—তা কিন্তু নয়। ওই হারু ডাকাতেরা তা পারে নি। যদি আমরা ইতিহাস দেখি তা হলে দেখব ১৯৭৩ সালে জমিদারি প্রথা এখানে চালু হলেও ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত ওই জমিদারেরা এদেশের মানুষকে কার্যত কিছুই দেয় নি। বরং করেছিল উল্টো। আরো বেশি সম্পদশালী হবার চেষ্টা করেছিল। পায়ের নিচের মাটিকে মজবুত করতে চেষ্টা করেছিল। তারা দিতে শুরু করেছে অনেক পরে, প্রায় তৃতীয় পুরুষে এসে। সেই হারু ডাকাতের নাতিদের যুগে এসে। যখন সম্পদ পিপাসা থিতিয়ে এসেছে তখন। বৈভবে-জলুসে, দানে ধ্যানে সেই নাতি তখন এমনই সর্বজননন্দিত যে সে যে হারু ডাকাতের নাতি তা সবার মন থেকে মুছে গেছে। তার নামই তখন হয়ে গেছে মহারাজা জীবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। সে তখন মানুষকে দান করে চলেছে। তাই বলছিলাম, দেওয়া অত সহজ নয়। অন্তত তিনটা পুরুষ না গেলে সেটা পারা যায় না। রণদাপ্রসাদ সাহাকে আমি অন্তরের থেকে শ্রদ্ধা করি এই অসাধারণ শক্তির জন্যে যে তিনি এই কাজটি করেছিলেন একই পুরুষে। নিজে রোজগার করে নিজেই তা দান করে গিয়েছিলেন। এক পুরুষে তিনি তিন পুরুষের অসাধ্য সাধন করেছিলেন। প্রচণ্ড আত্মশক্তি আর মহানুভবতা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে দিতে পারে কে? আপনারা ঢাকার ডায়াবেটিক হাসপাতালের কথা জানেন। বারডেম। সারা বাংলাদেশে সবখানে এখন তার শাখা বিস্তৃত। বিশাল এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান এটা আজ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ ইব্রাহিম। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডায়াবেটিক হাসপাতাল বানানোর প্রেরণা আপনার ভেতর কী করে এল। উনি বলেছিলেন, 'আমি তখন ফরিদপুরে ডাক্তার। একদিন আমার চোখের সামনে একটা আট বছরের ছেলে ডায়াবেটিসে মারা গেল। শিশুটিকে এভাবে মরতে দেখে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু ডায়াবেটিসের ভালো চিকিৎসা সেখানে ছিল না বলে কিছুই করা গেল না। আমার তখন মনে হল ভালো চিকিৎসা দিতে পারলে আমি তো একে বাঁচাতে পারতাম! কেবল একে কেন এদেশের এমনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাতে পারতাম! আমার একটামাত্র জীবন দিয়ে দিলেই তো সেটা হতে পারে। সেদিন ঠিক করলাম জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকি দিনগুলো আমি ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য উৎসর্গ করব। সুধীবৃন্দ, মানুষ কখন দিতে পারে? যখন এইভাবে তার হৃদয়টা কেঁদে ওঠে। এ তাকে পুরোপুরি অন্য মানুষ করে দেয়। ছেলেটার মৃত্যুতে যে কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন—এই কষ্ট না পেলে ওই জাগরণ তাঁর মধ্যে হত না। কিন্তু সামনে কষ্ট দেখলেই কি মানুষের এমনি জাগরণ হয়? সে এমনি বদলে যায়? তা হয় না। সবার ভেতর এ আলোড়ন হয় না। সবাই এভাবে প্রাথমিক জীবজন্মকে অতিক্রম করে না। কার জাগরণ হয়? অন্যের জন্যে যার হৃদয়ের ভেতর বেদনা রয়েছে, তারই হয়। পরের কষ্টে যার চোখে পানি আসে তারই হয়। যার হৃদয় আছে, মনুষ্যত্ব আছে, অপরের জন্য অশ্রু আছে, পরিপার্শ্বের সুখের জন্য আকুতি আছে তারই হয়। ওগুলো না থাকলে হৃদয়ের ভেতর উপপ্লব ঘটে না। মানুষের কল্যাণের জন্যে হাত অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে চায় না। এই যে, হাজি মোহাম্মদ মহসিন—দান করেছিলেন এ জন্যই কেবল হাজি মোহাম্মদ মহসীন মহান নন। মহান এ জন্যে যে তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি মানুষের জন্যে দিয়ে দিয়েছিলেন। কোন প্রেরণায় এমন অসাধারণ কাজ করলেন তিনি? এমন দান যে সেই দানের পর বেঁচে থাকার সম্বলও তাঁর হাতে রইল না। হাতে কোরান লিখে তাঁকে বেঁচে থাকতে হল। প্রেরণা একটাই : আমার জাতির মধ্যে শিক্ষা নেই। চারদিকে গভীর কালো অন্ধকার। সে ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাকে বাঁচাতে হবে। আলোর ভেতর নিয়ে আসতে হবে। আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করতে পারলে সেই দিনটি আসবে। এমনি গাঢ় বেদনায় হৃদয় কেঁদে না উঠলে মানুষ এত অসম্ভব কাজ করতে পারে না। হাজি মোহাম্মদ মহসিন কোনো প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন না। কিন্তু একটা বেদনার জন্য তিনি যে তাঁর সমস্ত কিছু দিয়ে দিতে পেরেছিলেন এইজন্য আজও এই জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করে। সম্রাট অশোক প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করে ফেলেছিলেন। এই জয়ের শেষ পর্বে তিনি গিয়েছিলেন কলিঙ্গ বিজয়ে। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় যুদ্ধের মাঠে কলিঙ্গদের দেড় লক্ষ যোদ্ধা নিহত হয়, কয়েক লক্ষ লোক আহত আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষকে এভাবে মাছির মতো মরতে দেখে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠল। এ কী পাশবিক নির্মমতা? এ কী রক্তঘাত? কী করছি আমরা? এই কষ্ট তাঁকে পুরো বদলে দিল। সমস্ত ভারতই প্রায় তখন তাঁর পদানত। শুধুমাত্র দাক্ষিণাত্যের শেষে এতটুকু এলাকা ছাড়া। কিন্তু উনি আর এগোলেন না। ওইটুকু অবিজিত রেখেই ফিরে এলেন। এইচ. জি ওয়েলস লিখেছেন, 'মানবজাতির ইতিহাসে একমাত্র অশোকই সেই নৃপতি যিনি যুদ্ধে পরাজিত না হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন'। কী দিয়ে করতে পেরেছিলেন? এই বেদনা ছিল বলে। রণদাপ্রসাদ সাহার মধ্যে এমনি একটি ব্যথিত চিত্ত ছিল। মানুষের দুঃখকে অনুভব করার ক্ষমতা ছিল। একটু আগেই শুনেছি এই কুমুদিনী হাসপাতালের প্রথম পর্যায়ে তিনি ছোট্ট একটা চোখের রোগ চিকিৎসার ইউনিট করেছিলেন মাত্র। কিন্তু ওখানে তিনি থামতে পারেন নি। তার ভেতরকার দুর্বার বেদনা এবং মানবপ্রেম তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত কিছু নিঃশেষ না করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামতে দেয় নি। এই যে কামড়ে ধরা শুভত্বের অন্ধ শক্তি একে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমি আজকে কৃতজ্ঞ যে, এমন একজন ত্যাগী মানুষের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার সৌভাগ্য পেয়েছি। আমাদের দেশে আজকে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো একটা পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি। একটু আগে ওনার (সভাপতিকে দেখিয়ে) সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল। বলাবলি করছিলাম, আমাদের দেশে পাগল মানুষ এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। সেইসব মহৎ পাগল যারা একটা জাতির নিয়তিকে পাল্টে দেয়। সেই পাগল ডাক্তার পাগল শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না যারা বলবে মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য, সেবার জন্য আমি আমার ছোট্ট জীবনটা দিয়ে দিতে চাই। আজ আমাদের কাছে আমাদের জীবনটা বড় মূল্যবান। বোকার মতো তার একটা কণাও আজ আমরা বেহাত করতে রাজি নই। আমি ঢাকা কলেজে প্রায় পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করেছি। দেশের সেরা ছাত্রদের পড়িয়েছি। তাদের, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের আমি প্রায়ই জিজ্ঞেস করতাম, কী হতে চাও? অনেকেই বলত : 'ডাক্তার'। 'কেন?' 'মানুষের কল্যাণ করতে চাই।' কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের যখন ডাক্তার হিসেবে দেখেছি তখন তাদের অনেকেরই যে চেহারা দেখেছি সেখানে মানবকল্যাণের চিহ্ন খুব বেশি চোখে পড়ে নি। সেখানে কেবল নিজের প্রাপ্তি, নিজের সমৃদ্ধি, নিজের স্বার্থ। একটা উন্নত দেশে এরকমটা হলেও চলতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো অন্নবস্ত্রহীন দুঃখী মানুষের দেশে পরের জন্যে জীবন দেবার মতো বেদনাবিদ্ধ মানুষ যদি এমনভাবে শূন্য হয়ে আসে তবে আমাদের চলবে কী করে। আমাদের সমাজে এখন আর সুস্থ মধ্যবিত্ত নেই। আমার চাওয়া এখানেই শেষ—এ কথা বলার লোক নেই। থামবার, প্রত্যাখ্যান করার লোক নেই। সবাই শুধু ছুটছে—দুই দু'গুণে চার, চার দুগণে আট, আট দু'গণে ষোলো, ষোলো দু'গুণে বত্রিশ, বত্রিশ দু'গুণে চৌষট্টি, চৌষট্টি দু'গুণে একশ আটাশ—এমনিভাবে মাথায় রক্ত-ওঠা একটা বিকৃতমস্তিষ্ক অসুস্থ সমাজ এখন আমাদের চারপাশে। একটা খুনে-চাপা ঊর্ধ্বশ্বাস দেশ। কেবলই গতি থেকে গতিতে, তীব্র থেকে তীব্রতর ঘোরের ভেতরে উধাও আর বিধ্বস্ত হওয়া একটা আত্মঘাতী বিকলাঙ্গ পরিপার্শ্ব।

সবাই পাগলের মতো ডাকাতি করছে। যে-যা পারছে, যাকে পারছে। এই সমাজের আজ প্রায় প্রত্যেকটা মানুষই মাস্তান—যে যার জায়গায়। আমি একটা ছোট গল্প বলেই শেষ করি। আপনারা কৌতুক অভিনেতা সাইফুদ্দিন আহমদকে চেনেন। একদিন আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন তিনি। তাঁর গল্পটা সত্যি মজার। তাঁর জবানীতে গল্পটা এরকম : 'বাঁজারে মনখানেক চাল কিনতে গেছি। চালের দোকানদারের কাছ থেকে চাল কিনতে কিনতেই লক্ষ করলাম, একটা মিস্তি আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর একটা মিস্তি দাঁড়িয়ে আছে বেশ দূরে। গজবিশেক তফাতে। চাল কেনা হয়ে গেলে রিকশায় তুলতে গিয়ে দেখলাম বস্তাটা তুলতে পারছি না। সামনে দাঁড়ানো মিস্তিটাকে বললাম, 'ধর তো ভাই বস্তাটা, দুজনে মিলে তুলি।' সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে আমাকে সাহায্য করল। চালের বস্তাটা রিকশায় তোলা হলে পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে মিস্তিটাকে দিয়ে বললাম, 'কষ্ট করলে, চা খেয়ে নিও।' সে কাঁচুমাচু হয়ে টাকা দুটো নিল। এমন সময় দূরে যে মিস্তিটা দাঁড়িয়ে ছিল সে হেঁটে হেঁটে সামনে এসে হাজির : "স্যার আমারে কিছু দিলেন না।" সাইফুদিন সাহেব তো খুব রসিক লোক। বললেন, 'আমার মাথায় রাগ উঠে গেল। বললাম, "ওকে দিলাম কষ্ট করে তুলে দিল বলে। তোমাকে দেব কেন? চোখের ভাড়া? দয়া করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছ সেই জন্যে?" আজকে আমাদের দেশের চারদিকে—রাজনীতিতে, শিক্ষায়, সরকারি অফিসে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিচার ব্যবস্থায়, পথে-ঘাটে সবখানে এই একই মাস্তানি। একটা ছাত্র ক্লাসে বেশি প্রশ্ন করলে স্যার রেগে ওঠেন, "ক্লাসে এত কথা কিসের? বাড়িতে আসতে পারস না।" এটাও একটা মাস্তানি। চাপের মুখে বাড়িতে নিয়ে ছাত্রের টাকা ছিনতাই। রাজনীতিতে কী? সারা দেশের মানুষকে জিম্মি করে কিছু ক্ষমতাগৃধ্নু মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা। বৈদেশিক সাহায্য আসছে, কিন্তু দুর্বৃত্ত লুট করে নিচ্ছে। দেশের অসাধু বড়লোকেরা লুট করছে ব্যাংক। ছাত্রেরা বুক ফুলিয়ে নকল করে, নম্বর লুঠ করছে। সন্ত্রাসীরা লুঠ করছে মানুষের ধনসম্পদ। কোথাও 'দেওয়া' নেই। কেবলই নিজের স্বার্থের জন্য অলজ্জ নির্বিবেক লুণ্ঠন। রণদাপ্রসাদ সাহা যে বাংলাদেশ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল এর উল্টো। তা নেওয়ার ছিল না, ছিল দেওয়ার। আজকে যেখানে সারা দেশের প্রায় প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে স্বার্থের অলজ্জ উন্মাদনা--সেই সময়, সেই দেশেই একজন মানুষ একসময় ছিলেন যিনি স্বার্থকে অতিক্রম করেছিলেন, যিনি জীবনের সমস্ত শক্তিকে, সমস্ত অর্জনকে দেশবাসীর কল্যাণের জন্য, চিকিৎসার জন্য, শিক্ষার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এই অসাধ্য কাজটির জন্য আজ তিনি স্মরণীয়। আপনারা মির্জাপুরের অধিবাসীরা একটা কথা নিশ্চয় ভেবে দেখেছেন যে মির্জাপুর বাংলাদেশের চার শ চৌষট্টিটা থানার মধ্যে একটা থানা মাত্র, এর আর কোনো বিশেষ পরিচয় নেই। এখানে কখনো কোনো অসাধারণ কিছু ঘটে নি। আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্যও নেই এর। মির্জাপুরের নামটা বিশেষ করে কারো জানার কথাও নয়। কিন্তু আজ সারাদেশ সারা জাতি এই মির্জাপুরকে চেনে। কী দিয়ে চেনে? একটা ফুল ফুটেছিল একদিন গ্রামবাংলার এই নিভৃত কোণে। সেই ফুলের সৌন্দর্য শোভা সৌরভ সারা বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছিল। নিজেকে আর তার জন্মস্থানকে সে ফুল দেশবাসীর কাছে পরিচিত করে রেখে গেছে। আজ মির্জাপুরকে না চিনে কারো উপায় নেই। যার জন্যে এই পরিচিতি, সেই নমস্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ!

১৯৯৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিতর্ক : প্রতিভাবান প্রতারণা

অনেককেই আমরা তর্ক করতে দেখি। কিন্তু কাউকে কখনো তর্কে হেরে যেতে দেখি কি? দেখি না। এর কারণ, আমি যে কারো চেয়ে কম এটা আমরা কেউ কখনো স্বীকার করতে চাই না। করলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না। তাই আমরা তর্ক করি, কিন্তু হারি না। অথচ হার স্বীকার না করলেও, তর্কের শেষে বাড়ি ফেরার সময়, যখন আমরা নিজের কাছে খুব একা হই তখন, নিজের সেই নির্জনে, আমরা কিন্তু কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করি। এই ভাবাভাবির পথেই নিজেদের ভুলগুলোকে আমরা চিনতে পারি, বিরুদ্ধপক্ষের যুক্তিগুলোকে বুঝে উঠতে শিখি। এককথায়, পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্ট আরো সুপরিসর হয়ে ওঠে। আমাদের বাইরেও যে অন্য কোনো মতবাদ বা বিশ্বাস থাকতে পারে, সে বিশ্বাসের মধ্যেও যে অর্থপূর্ণ সত্য থাকতে পারে তা আমরা অনুভব করি। এর ফলে আমরা আগের চেয়ে আরো পরিণত আরো সমৃদ্ধ মানুষ হয়ে উঠি। সুতরাং তর্ক আমাদেরকে ঠিক হার বা জিত, কোনোটাই দেয় না; জীবনকে বোঝার ব্যাপারে আমাদেরকে লাভবান হবার সুযোগ দেয়—জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

তর্ক আর বিতর্ক এক জিনিশ নয়। অনেকেই এ দুটো শব্দকে একাকার করে ফেলেন। তর্ক হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, কখনোবা অনেক ক–জন আলাদা ব্যক্তির মধ্যে। সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশ্বাসের পক্ষ থেকে কথা বলে। কিন্তু বিতর্ক জিনিশটি একটি দলীয় বা পক্ষীয় ব্যাপার। বিতর্ক হল, এক পক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের তর্ক(এই তর্ক যদি একজনও করে তবু সে একটি দলের প্রতিনিধি হয়েই করে)। এক দলের বিশ্বাসের সঙ্গে, ভাবনা–চেতনার সঙ্গে আরেক দলের ভাবনা ও বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক লড়াই হল বিতর্ক। সুতরাং তর্কের মধ্যে যে উচ্চস্তরের ব্যক্তিগত সততা খুঁজে পাওয়া যায়, বিতর্কে তা পাওয়া যায় না। বিতর্ক ব্যক্তির অনুভূতি এবং তার বিশ্বাস তার দলীয় প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত হয়ে পড়ে—দলীয় স্বার্থের সাথে সে খানিকটা আপোষ করে নেয়। এইজন্য বিতর্ক তর্কের চেয়ে অনেকখানি সততাহীন এবং সত্য থেকে দূরে। সত্যকে পেতে হলে আমাদেরকে তর্কের পথ ধরেই এগোতে হবে, বিতর্কের নয়। ব্যক্তিগত মতের বা বিশ্বাসের পথ ধরে যেভাবে এগিয়ে গেছেন সক্রেটিস থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর এযাবৎকালের সব সত্যান্বেষী মানুষ—সেভাবে। বিতর্ক দ্বন্দ্বমান সামাজিক বিরোধ সমাধানের উপায় হতে পারে, কিন্তু সত্যকে পাবার উপায় নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিতর্ক একটি আলোময়, দ্যুতিময়, আনন্দময় বুদ্ধি-উদ্ভাসিত জগৎ। যাঁরা বিতর্কে অংশ নে বা বিতর্ক শোনে, তাদের কাছে এটি একটি অনবদ্য শিল্পিত মুহূর্ত। শাণিত প্রদীপ্ত বিরোধিতার ভেতর থেকে উপলব্ধির প্রদীপ একের পর এক কীভাবে জ্বলে ওঠে তা বিতর্কে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগেই বলেছি আমরা বিতর্ক বলতে যে জিনিশটি চারপাশে দেখতে পাই, সেখানে অংশগ্রহণকারীরা নিজের সত্যকে বা নিজের বিশ্বাসকে সুমুন্নত করে দাঁড় করানোর পরিবর্তে কাজ করে যায় দলীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। কাজেই তারা সেখানে দলীয় প্রয়োজনের প্রভু নয়, দাস। নিজেদের বক্তব্য-বিষয়কে অনেক সময় সম্পূর্ণ ভুল বা মিথ্যা জেনেও, সেই ভুলকে তারা তাদের যুক্তির উজ্জ্বল অলীক অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রভায় সত্যের নামে বেনামী করে দর্শককে বিভ্রান্ত করে বসে। এটাই বিতর্কের নিয়ম এবং সাফল্য। এইজন্য বিতর্ককে আমার কাছে অনেক সময়ই একধরণের সুন্দর,উজ্জ্বল মিথ্যাচার বলেই মনে হয়। বিতর্কের মূল লক্ষ্য সত্য নয়—বিজয়। বিশ্বাসীর সরল হৃদয় এখানে উপেক্ষিত। তাই বাইরের দিক থেকে বিতর্ককে যত বর্ণিল আর দীপান্বিত বলেই মনে হোক না কেন, ভেতরে-ভেতরে সেটা দলীয় স্বার্থ-উদ্ধারেরই একটা কুশলী প্রয়াস মাত্র—যা বাইরের কারুকার্যময় চাকচিক্যের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে একটি অন্তঃসারশূন্য অনৈতিক কাজ। নিজের বক্তব্য তুলে ধরে বিতার্কিকেরা শ্রোতার সঙ্গে একধরণের প্রতিভাবান প্রতারণা চালিয়ে যায় বলেই আমার ধারণা।

এটা তাই প্রধানত সত্যচর্চা নয়, শব্দচর্চা।

তবে বিতর্কের দ্বারা সত্যোদ্ঘাটনের কাজ যে কিছুটা হয় না, তা নয়। বিতর্ক আমাদেরকে দুই পক্ষের সত্যগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের চিন্তাভাবনা এতে স্বচ্ছ হয়।

আমার প্রস্তাব, তর্ক চলুক যত খুশি—বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের, সত্যের সঙ্গে সত্যের দীপ্তিময় উজ্জ্বল বিরোধে পৃথিবী সুন্দর, আনন্দময় এবং সত্যান্বেষী হয়ে উঠুক। বক্তা হয়ে উঠুক সত্য প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সৈনিক। বিতর্কের শব্দসবর্স্ব কূটকৌশলের কুটিলতা চালিয়ে কী হবে আজ, যখন একটা নতুন জাতি গড়ে তোলার দায়িত্বে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা—যেখানে চাকচিক্যময় চতুর শব্দ নয়, সত্য এবং সততায় পরিপূর্ণ অসংখ্য বিশ্বাসীর সরল হৃদয় আমাদের প্রয়োজন।

১৯৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~